খতিবে আজম, মুনাজেরে জমান
তরজুমানে আহলে সুন্নত
ওয়াল জামাত
মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান

খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,
তরজুমানে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত
মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান

সংকলন
মাওলানা আ. শ. ম নজরুল ইসলাম
সহকারী সম্পাদক, মাসিক হেফাজতে ইসলাম

সম্পাদনায়
মুফতী মুহাম্মদ আবুল খায়ের বিথঙ্গলী
মুহাদ্দিস জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম
দরগাহে হযরত শাহজালাল রহ. সিলেট।

আল-কাউসার প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার ॥ পাঠক বন্ধু মার্কেট
১১, বাংলাবাজার ॥ ৫০,বাংলাবাজার ঢাকা
মোবা. ০১৭১৬৮৫৭৭২৮ ফোন- ৭১৬৫৪৭৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ইরশাদ করেন.................................

আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে
ভালবাসেন–
তখন জিব্রীল আ.-কে ডেকে বলেন–
আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি।
তুমিও তাকে
ভালবাস।
ফলে জিব্রীল আ.-ও তাকে ভালবাসতে
শুরু করেন।
অতঃপর জিব্রীল আ. আসমানে
ঘোষণা দিয়ে দেন-
অমুক বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা
ভালবাসেন, তোমরাও তাকে
ভালবাস।
ফলে আসমানের বাসিন্দারাও তাকে
ভালবাসতে শুরু করে।
এরপর তাকে আসমানের মতো
যমীনেও প্রিয়পাত্র ও
গ্রহণযোগ্য বানিয়ে
দেওয়া হয়।
(আল-হাদীস)

মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর নির্বাচিত বয়ান এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য

- প্রতিটি বয়ানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি কথাই জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্ম তত্ত্ব, সারগর্ভ চিন্তার বিকাশ এবং সংস্কারমূলক হেদায়াতে পরিপূর্ণ, শুধু জোর গলাবাজী ও বিচিত্র বর্ণনাভঙ্গী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থহীন ও অমূলক বাক্য ও স্বরের সংমিশ্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ।

- প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত সমস্ত কিসসা-কাহিনী এবং কৌতুক বাক্যই উপদেশ মূলক এবং জ্ঞান বর্ধক। এমন কোনো ঘটনাই তাতে নেই যা কেবল সাময়িক আনন্দ প্রদান এবং শ্রোতাদেরকে খুশী করে বাহবা হাসিল করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

- এতে মিথ্যা ও অলীক রেওয়ায়াত এবং কাল্পনিক কিসসা-কাহিনী লেশমাত্র নেই। যা কিছু বলা হয়েছে, যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য ও সঠিক বরাত যাচাই করেই বর্ণনা করা হয়েছে।

- আমলের ফযীলত বর্ণনা, বেহেশতের প্রতি উৎসাহিত করা এবং দোযখের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শনের মধ্যেই বয়ানগুলো সীমাবদ্ধ নয়; বরং অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দ্বীনী মাসায়েলের ব্যাখ্যা, রহস্য ও হেকমতে এসব বয়ান পরিপূর্ণ।

ایں سعادت بزور بازو نیست + تانہ بخشد خدائے بخشندہ

"আল্লাহ তা'আলা দান না করলে এই সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জন করা যায় না।"

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণে সমকালীন বিশিষ্ট আলেমগণ হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর নির্বাচিত বয়ানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা, বেফাকুল মাদারিস- কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশ-এর সভাপতি, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার শাইখুল হাদীস ও মুহতামিম

হযরত মাওলানা আহমদ শফী দা. বা.-এর দু'আ ও বাণী

স্নেহ ভাজন তরুণ আলেম মাওলানা আ. শ. ম. নজরুল ইসলাম সাহেব সংকলিত মাওলানা ওলীপুরী সাহেবের বিভিন্ন ওয়াজ "মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের নির্বাচিত বয়ান" নামে বই আকারে বের হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি।

বাংলাদেশের যে সমস্ত উলামায়ে কিরাম হক প্রতিষ্ঠার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে আজীবন বহুমুখী সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, তাদের অন্যতম একজন হলেন, মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী। তিনি ইসলামের সঠিক ভাষ্যকার বা তরজুমানে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত হিসেবে পরিচিত।

আমি তার বহু বয়ান শুনেছি এবং তার লিখিত অনেক পুস্তকাবলিও পড়েছি, যেগুলো জাতির জন্য দিশারী হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি। আশা করি পাঠক মহল সংকলনটি দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

দু'আ করি সংকলক ও এ বইয়ের আয়োজক সবাইকে আল্লাহ তা'আলা আরও বেশি করে দীনের খেদমত করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

১৫. ০৪. ২০১০

(হযরত মাওলানা) আহমদ শফি
(দামাত বারাকাতুহুম)
মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস
আল জামিয়াতুল আহলিয়াহ
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

শায়খে বর্ণভী রহ.-এর সুযোগ্য উত্তরসূরী হেফাজতে ইসলামের মুহতারাম আমীর বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বহুমুখী বরুণা মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও শায়খুল হাদীস পীরে কামেল হযরত

মাওলানা শায়খ খলীলুর রহমান হামিদীর

অভিমত

হিদায়াতের আলো গণমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছেন মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী। আলোকিত পথে তার আহবান প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বহুদিন। সত্য-সুন্দরের পক্ষে তাঁর জোরালো বক্তব্য সংকলন করেছেন আমার একান্ত স্নেহভাজন সাংবাদিক আ. শ. ম নজরুল ইসলাম। মাসিক হেফাজতে ইসলামের সম্পাদনার ফাঁকে এ কঠিন কাজটা সাধন করেছেন সংকলক।

বাংলা ভাষায় মৌলিকভাবে হাজার পৃষ্ঠার বক্তৃতা সংকলন আমার জানা মতে এই প্রথম। আল কাউসার প্রকাশনীর মাধ্যমে তিন খণ্ডে **"মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর নির্বাসিচত বয়ান"** প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি অভিমত ব্যক্ত করে এ মহৎ কাজে অংশীদার হতে পেরেছি বলে আল্লাহর শুকরিয়া জানাই। আলোচক, সংকলক, সম্পাদক ও প্রকাশক সকলকে ধন্যবাদ।

আমি আশাবাদী এই গ্রন্থের মাধ্যমে হিদায়াতের আলো থেকে বঞ্চিত মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পাবে, আলোকোজ্জ্বল হিদায়াতের সরলপথে দাঁড়াবে পথভুলা মানুষ। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

১১.০১.২০১০ ঈসায়ী **(হযরত মাওলানা) খলীলুর রহমান হামিদী**

আমীর, হেফাজতে ইসলাম
মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস
বরুণা মাদরাসা, মৌলভীবাজার, সিলেট

মাওলানা ওলীপুরীর তাকরীর ও তাসনীফ সম্পর্কে

বড়দের মূল্যায়ন

জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমের সম্মানিত সাবেক খতীব

হযরত মাওলানা উবাইদুল হক সাহেব রহ.

বলেন,

"মুহতারাম মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর তথ্যসমৃদ্ধ বিষয় ভিত্তিক ওয়াজ শুনে মুগ্ধ হয়েছি বারবার। তার বক্তব্য যেমন জোরালো ও তথ্য নির্ভর তেমনি তার প্রতিটি লেখাও তথ্যনির্ভর ও জোরালো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার এ খেদমতকে কবুল করুন।"

বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক)-এর
সাবেক সভাপতি

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন গহরপুরী রহ. বলেন,

"মাওলানা ওলীপুরী সম্পর্কে আমার রূহানী নাতি হন অর্থাৎ তিনি আমার ছাত্রের ছাত্র। তিনি আহলে হকের তরজুমান। তার উক্তির সাথে যুক্তি থাকে। যে কারণে সর্বস্তরের মানুষ তার কথা সহজে বুঝতে পারে। আমি দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা তাকে হক প্রচারের জন্য কবুল করুন।"

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ, মাসিক মদীনা সম্পাদক

হযরত মাওলানা মুহিউদ্দিন খান দা. বা.

বলেন–

"মাওলানা ওলীপুরী সাহেব দেশে প্রচলিত নানা কুসংস্কার; শিরক-বিদআত এবং ধর্মের নামে ব্যাপকভাবে আচরিত বিভিন্ন ধরনের অনাচারের বিরুদ্ধে ওয়াজের মাধ্যমে যেমন বিরামহীন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন; তেমনি লেখনীর মাধ্যমেও তার সংগ্রাম অব্যাহত আছে।"

মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান

এর জন্য

মাওলানা ওলীপুরী সাহেবের দু'আ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার এবং সালাত ও সালাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর।

আল-কাউসার প্রকাশনী, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা, আমার বিভিন্ন সময়ের বয়ান ক্যাসেট থেকে সংকলন করতঃ

"মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর
নির্বাচিত বয়ান"

নামে পুস্তক আকারে প্রকাশ করছে জেনে, আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি।

দু'আ করি আল্লাহ তাআলা সংকলক সম্পাদক ও প্রকাশক সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহ ও পরকালিন কামিয়াবী দান করুন।

সাথে সাথে এ খেদমত কবুল করতঃ সকলের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

(মাওলানা) নূরুল ইসলাম ওলীপুরী

তাং-২৫/০৪/১০ইং

সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِاَهْلِهِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى اَهْلِهَا

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নাজিল করেছেন অসংখ্য আসমানী গ্রন্থ। এসবের একমাত্র উদ্দেশ্য মানবজাতিকে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দেয়া, যাতে তারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে পথভ্রষ্ট না হয়, হারিয়ে না ফেলে জান্নাতের রাস্তা, না হয়ে যায় জাহান্নাম মুখী।

নবী-রাসূল প্রেরণের এ ধারাবাহিকতা হযরত আদম আ.-এর মাধ্যমে শুরু হয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে শেষ হয়।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ ও সর্ব শ্রেষ্ঠ রাসূল। তাঁর পর এ ধরায় নবী-রাসূল হিসেবে আর কারো আগমন ঘটবে না। তাই মানব জাতির পথপ্রদর্শন তথা হেদায়াতের এই গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলিম সমাজের উপর। আলহামদুলিল্লাহ! তাঁরাও যুগ যুগ ধরে অত্যন্ত সফলতার সাথে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন।

অনেকে ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে পালন করছেন এ দায়িত্ব। তন্মধ্যে অনেকের ওয়াজ নসীহত তথা বয়ানসমূহ সংকলিত হয়ে পুস্তক আকারেও সংরক্ষিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

বাংলাদেশসহ গোটা মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে যাঁরা এ ধরনের দ্বীনি খেদমত আন্‌জাম দিচ্ছেন, তাদের অন্যতম মর্দে মুজাহিদ, মুনাজিরে আজম, তরজুমানে আহলে সুন্নত ওয়াল জমাত হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম। যিনি প্রায় তিন যুগ ধরে পথহারা মানবতাকে ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা দিচ্ছেন। কুফর, শিরক ও বিদাআতসহ যে কোন প্রকার কুসংস্কার ও পথভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে তাঁর কণ্ঠ। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দীর্ঘজীবি করুন। আমীন!

মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর-১২, পল্লবী, ঢাকা'এর স্বনামধন্য শায়খুল হাদীস হাফিয মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান সাহেবের তত্ত্বাবধানে মাসিক হেফাজতে ইসলামের সহকারী সম্পাদক মাওলানা আ,শ,ম নজরুল ইসলাম মাওলানা ওলীপুরী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এর বিভিন্ন বিষয়ের ওয়াজ নসীহত তথা বয়ান ক্যাসেট থেকে সংকলন করেছেন।

হযরত ওলীপুরী হুজুর কর্তৃক "মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর নির্বাচিত বয়ান" নামক এ সংকলনটি সম্পাদনার দায়িত্ব আমি অধমের উপর ন্যাস্ত হয়। আলহামদুলিল্লাহ! পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া দেখা, প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন- বিয়োজন এবং মূলানুগ বরাতসমূহের প্রতি যথাসাধ্য গুরুত্ব দিয়েই সম্পাদনার কাজ করেছি।

তথাপি এটি প্রথমতঃ একটি ওয়াজ বা বয়ানের ক্যাসেট সংকলন, দ্বিতীয়তঃ মানুষ হিসেবে আমরাও ভুলের উর্ধ্বে নই, তৃতীয়তঃ মুদ্রণজনিত ত্রুটি ইত্যাদি কারণে কিছু ভুল থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। অতএব, ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, পাঠক মহলের নিকট এই প্রত্যাশা।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র মেহনতটুকু কবুল করে নাজাতের উসিলা বনিয়ে দিন।

আমীন!

আবুল খায়ের বিথঙ্গলী।
জামেয়া কাসিমুল উলূম
দরগাহে হযরত শাহজালাল রহ. সিলেট।
তাং-২৫/০৪/১০ইং

এক নজরে
ওলীপুরীর কর্মময় জীবন

নাম ঃ নূরুল ইসলাম

পিতা ঃ মরহুম মাওলানা আব্দুর রহীম

ভাই-বোন ঃ ৫ ভাই ৫ বোন

জন্ম ঃ ১৯৫৫ ঈসায়ী

জন্মস্থান ঃ হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন ওলীপুর গ্রামে।

লেখাপড়ার হাতে খড়ি ঃ বড় বোনের নিকট আরবী ও বাংলা বর্ণ পরিচয়।

প্রিয় শিক্ষক ঃ মুজাহিদে মিল্লাত মরহুম মাওলানা মুখলেসুর রহমান রায়ধরী।

দাওরায়ে হাদীস ঃ ১৯৭৫ সালে, জামেয়া কুরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা।

প্রথম শিক্ষকতা ঃ হুসাইনিয়া মাদরাসা, শাহপুর চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ

বিদেশ সফর ঃ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ।

প্রকাশিত গ্রন্থ ও রচনাবলী ঃ মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর নির্বাচিত বয়ান, প্রকৃত আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামা'ত পরিচিতি, নূরে মদীনাসহ অসংখ্য পুস্তিকা ও রচনাবলী।

বর্তমান দায়িত্ব ঃ মুহতামিম মাদরাসায়ে নূরে মদীনা, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

সন্তানাদি ঃ ১ ছেলে ও ৪ মেয়ে ।

আগামী পরিকল্পনা ঃ নিজ মাদরাসাকে যুগোপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান।

পাঠকদের প্রতি ঃ হিদায়াতের উদ্দেশ্যে খালিছ নিয়তে পাঠ করবেন।

সংকলকের কথা

মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী একটি নাম, একটি চলমান দাওয়াতী মিশন। তিন দশক পূর্ব থেকে তার যাত্রা। দীর্ঘ দিন যাবত ইসলামের বাণী উপস্থাপনার ফলে ইসলামপ্রিয় জনতার কাছে অতি পরিচিত একটি কণ্ঠ। তাঁর মাহফিলে হাজার হাজার জনতার ঢল নামে। সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকাসহ সারা দেশেই তার বিচরণ। নিশাচরের ন্যায় তার জীবন যাত্রা। দেশ থেকে বিদেশ ছুটে চলা নাবিক।

এশিয়া, ইউরোপ সর্বত্রই তাঁর মাহফিল। ইসলামের সঠিক বাণী জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়াই তার লক্ষ্য। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা সহজ ভাষায় উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এক বিরল ব্যক্তিত্ব মাওলানা ওলীপুরী। মাওলানা ওলীপুরীর বক্তৃতা ধরে রাখতে তার লিখিত রূপ সময়ের অনিবার্য দাবী। আর তা আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার জরুরত অনুভব করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় রাহবার মাওলানা হাবীবুর রহামান সাহেব প্রায় একবৎসর পূর্বে একদিন ফোন করে আমাকে মাওলানা ওলীপুরীর বয়ান সংকলনের নির্দেশ দিলেন। সংকলনে হাত দিয়ে বুঝতে পারলাম নির্দেশ পেয়ে জ্বী হ্যাঁ বলা যত সহজ তা বাস্তবায়ন ততটা সহজ নয়, তাই পালাবার চেষ্টা করলাম। ধরা পড়লাম। ফের সময় দিলাম।

হুজুরের বারংবার তাগিদে অডিওর কল্যাণে 'ওলীপুরীর নির্বাচিত বয়ান'-এর প্রথম খণ্ড তৈরী হয়ে গেল। হুযুরের পরামর্শক্রমে সংকলনটি মাওলানা ওলীপুরীর খেদমতে পেশ করলাম। ওলীপুরী হুযুর সংকলনটি দেখে খুশী হলেন এবং ওলীপুরী হুযুর নিজেই কপিটি সম্পাদনার দায়িত্ব দিলেন জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল রহ. এর মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আবুল খায়ের বিথঙ্গলীকে। মুফতী সাহেব পাণ্ডুলিপিটিকে দু'বার দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন-বিয়োজন এবং মূলানুগ বরাত সমূহের প্রতি যথাসাধ্য গুরুত্ব দিয়েই সম্পাদনা করে দিয়েছেন ।

বহু প্রতীক্ষার পর আজ "মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর নির্বাচিত বয়ান" এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ হতে যাচ্ছে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বলছি আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ যদি তাওফীক দেন তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড অচিরেই বের হবে বলে আশা করছি। হে আল্লাহ! আমাদের চেষ্টা কবুল করো। ক্ষমা করো হে ক্ষমাশীল ॥

২৮.০৪.২০১০
ঢাকা।

আ. শ. ম নজরুল ইসলাম
সহকারী সম্পাদক, মাসিক হেফাজতে ইসলাম

সূচিপত্র

খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,
তরজুমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত
মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান–১

ওয়াজ কী ও কেন?

মাওয়ায়েজে হাসানাহ
খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,
তরজমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত
মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান–১

ওয়াজ কী ও কেন?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ – وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ، سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ، ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ، قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ، بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ، اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ، صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَ اِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, হযরাত উলামায়ে কেরাম,
এলাকার সর্বস্তরের মুসলমান ভাইসব ও
পর্দানশীন মা-বোনেরা!

আল্লাহ্‌র পবিত্র কালামের তাফসীর বা ব্যাখ্যা শুনা ও বুঝার জন্য এবং কুরআনের আলোকে নিজের জীবন গড়ার জন্য অনেক কষ্ট আর অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আপনারা এই মোবারক তাফসীরুল কুরআন সম্মেলনের আয়োজন করেছেন এবং দূর-দূরান্তের বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেক অনেক কষ্ট স্বীকার করে এখানে যোগদান করেছেন, গভীর রাত পর্যন্ত অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আল্লাহ্‌র কালামের তাফসীর শোনার জন্য বসে আছেন। আল্লাহ্‌র পবিত্র কালামের প্রতি আপনাদের এই আন্তরিক আগ্রহের খাতিরে আপনাদের আমাদের সবাইকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের হিদায়াত দান করুন।

আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামের ছোটখাটো এক সূরা সূরায়ে আ'লা-এর শেষের দিকের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছি। তিলাওয়াত-কৃত আয়াতগুলো আল্লাহ্পাক রব্বুল আলামীন এক বিশেষ অবস্থায় নাজিল করেছিলেন। এই বিশেষ অবস্থাকে এই আয়াতগুলোর শানে নুযূল বলা হয়। তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর তাফসীর সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য বুঝার জন্য আয়াত গুলোর শানে নুযূল ভাল করে স্মরণ রাখা দরকার, বুঝা দরকার।

একটি ঘটনা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় এক মুসলমানের বাড়ী আর এক মুনাফিকের বাড়ী ছিল পাশাপাশি। কুরআনের ভাষায় মুমিন তাদেরকেই বলা হয়, যারা কুরআনের সবগুলো কথা বিশ্বাস করে, কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে রাসূলের হাদীসের সবগুলো কথা বিশ্বাস করে।

আর কুরআনের ভাষায় মুনাফিক তাদেরকেই বলা হয়, যারা আন্তররিকভাবে কুরআনের বিধানে বিশ্বাসী নয়, আন্তরিকভাবে ইসলামের কথায় বিশ্বাসী নয়। কিন্তু মুসলমান সমাজকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ধোঁকা দেওয়ার জন্য মিছামিছি নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়। তো রাসূলের যামানায় এক মুসলমান ও এক মুনাফিকের বাড়ী পাশাপাশি ছিল। মুনাফিকের বাড়ীর ভিতরে ছিল একটা খেজুর গাছ। খেজুর গাছের অগ্রভাগ বাঁকা হয়ে মুমিনের বাড়ীতে ঝুঁকে পড়েছিল। এ অবস্থায় তার খেজুর গাছে যখন খেজুর পাকত এবং একটা-দু'টা করে ঝরে পড়ত। তা মুমিনের বাড়ীর ভেতরে পড়ত। এই সুযোগে মুমিনের সন্তানরা তার গাছের একটা দু'টা খেজুর কুড়িয়ে খেয়ে ফেলত।

এ কারণে এই মুনাফেক লোকটা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়ে তার পাশের বাড়ীর মুমিনের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হল। বলল, ওগো আল্লাহ্র রাসূল! আমি একজন মুসলমান। আমার পাশের বাড়ীর লোকটাও মুসলমান। আমার খেজুর গাছের অগ্রভাগ তার বাড়ীর উপর ঝুঁকে আছে। এই কারণে আমার খেজুর গাছের খেজুর পাকার পরে একটা দু'টা খেজুর ঝরে পড়ে আর তার

সন্তানেরা সেই ঝরে পড়া খেজুর কুড়িয়ে খেয়ে ফেলে। আমি আপনার আদালতে এর বিচার চাই।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দায়ের করা নালিশের নিষ্পত্তি কিভাবে করলেন, তা বুঝার জন্য প্রথমে আমাদের স্মরণ থাকা দরকার ইসলামী আদলতে বিচার দু'রকমের হয়। একটা আপসের বিচার আরেকটা আইনের বিচার। আইনের বিচার বলে, আইনত যার পাওনা হয় বিচারক তার পক্ষে রায় দেবেন, নির্দেশ দেবেন। এতে কোন পক্ষ লাভবান হল আর কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হল, কোন পক্ষ সন্তুষ্ট হল আর কোন পক্ষ অসন্তুষ্ট হল এটা দেখা বিচারকের দায়িত্ব নয়। এর নাম আইনের বিচার।

আর আপসের বিচার বলে, আইনের বিচারে যদি একপক্ষ সন্তুষ্ট হয় আর অপর পক্ষ অসন্তুষ্ট হয়, তা হলে এমন একটা পদ্ধতি বিচারক বের করবেন যে পদ্ধতিতে আপস-মীমাংসা করে দিলে উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট হয়। এভাবে আপস-মীমাংসা করার জন্য রায় দেওয়ার শর্ত হল, বাদী-বিবাদী উভয়ের সম্মতি আছে কি না, তা দেখতে হবে, তাদের অনুমতি নিতে হবে। বাদী বিবাদীর অনুমতি ছাড়া আপস-মীমাংসার রায় দেওয়া জায়েয নয় হালাল নয়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু বিচারকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ হিদায়াতকারী।

সমস্ত নবী রাসূলের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এই মুনাফেক লোকটা তার পাশের বাড়ীর মুমিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার পর আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে মুনাফিক লোকটাকে ওয়াজ করলেন নসীহত করলেন অপর দিকে ওয়াজের পদ্ধতিতে আপসে রায় দেওয়ার একটা প্রস্তাব রাখলেন।

একদিকে নসীহত অপর দিকে আপসের প্রস্তাব। প্রস্তাবটা আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে রাখলেন, তুমি বলেছ তুমি একজন মুসলমান আর তোমার প্রতিবেশী লোকটাও মুসলমান। অথচ

পবিত্র কুরআনে এক মুসলমানকে আরেক মুসলমানের ভাই বলা হয়েছে। সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

মুমিনগণ একে অপরের ধর্মীয় ভাই।

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, ধর্মের কারণে এক মুমিন আরেক মুমিনের ভাই। দু'টা লোকের পিতা যদি এক হয় তাহলে একে অপরের ভাই হয়। তারা বংশগত ভাই। আর যে দু'টো লোকের ধর্ম এক হয় তারা একে অপরের ভাই- ধর্মীয় ভাই। এ হিসাবে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন সারা দুনিয়ার সকল মুসলমানকে একে অপরের ভাই বলেছেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

"মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই।"

তাই আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, তুমি বলছ তুমি একজন মুসলমান আর তোমার পাশের বাড়ীর লোকটাও মুসলমান। এক সাথে দু'একটা খেজুরের বেশি ঝরে না। গাছের সবগুলো খেজুর একসাথে পাকে না। দু'একটা পাকলেই গাছের মালিককে বুঝে নিতে হয় যে, এখন সবগুলো খেজুর কেটে ফেলতে হবে, তা না হলে দু'একটা করে সবগুলো ঝরে পড়বে। কাজেই ঝরে পড়লে একটা দু'টার বেশি হয় না।

তাই রাসূল বুঝালেন তোমার গাছের একটা দু'টা ঝরা খেজুর খেলেও পেট ভরে না, আর বাজারে বিক্রি করলেও উল্লেখযোগ্য পয়সা পাওয়া যায় না। আর তোমার মুসলমান ভাইয়ের সন্তানেরা কুড়িয়ে খেয়েছে। এত অল্প মূল্যের এক দু'টা খেজুর তোমার ভাইয়ের সন্তানেরা খেয়েছে, তা যদি তুমি মাফ করে দাও, তাহলে আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন তোমাকে জান্নাতের ফল খাইয়ে তুষ্ট করবেন। তখন এই মুনাফেক বলে উঠলো, ওগো আল্লাহ্র রাসূল! আমার গাছের দু'একটা খেজুর যতই অল্প মূল্যের হোক না কেন, এটা হল নগদ আর আপনি যে বলেছেন, আমি মাফ করে দিলে আল্লাহ্ আমাকে জান্নাতের ফল খাইয়ে তুষ্ট করবেন, জান্নাতের ফল যতই মূল্যবান হোক না কেন সেটা হল বাকি।

আমি বাকির আশায় নগদ ছাড়তে রাজি নই। তার একথায় সে যে মুসলমান হওয়ার মিথ্যা দাবীদার তা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে ধরা পড়ল। সে যে আসলে মুমিন নয়, সেটা ধরা পড়ল। আর এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন সেই আয়াতগুলো নাজিল করলেন, যে আয়াতগুলো আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি। এই মুনাফিকের জবাবের খণ্ডনে আল্লাহ্ এই আয়াত নাজিল করলেন,

فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرٰى ، سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ، ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ، قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ، بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ، اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ، صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى

যেই মুনাফিকের ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক এই আয়াতগুলো নাজিল করলেন সেই ঘটনাটাই হল এই আয়াতগুলোর শানে নুযূল। যেহেতু মুনাফিক জবাব দিল আমার গাছের ঝরা খেজুর যতই অল্প হোক না কেন, এটা নগদ আর এর দাবী আমি মাফ করে দিলে পরকালে আল্লাহ্ আমাকে ফল খাওয়াবেন সেটা বাকী। আমি বাকীর আশায় নগদ ছাড়তে রাজী নই। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন এই আয়াতগুলো নাজিল করেছেন। কাজেই আয়াতগুলো বুঝার আগে আয়াতের শানে নুযূল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

দুনিয়ার নগদ ছাড়তে রাজী নন

বর্তমান সময়ে অনেক মুসলমান এমন আছেন, যারা পরকালের বাকীর আশায় দুনিয়ার নগদ ছাড়তে রাজী নন। যেমন, কয়েকজন বন্ধু একত্রে বসে গল্প করছে। এমতাবস্থায় নামাযের আযান হল। এখন যদি গল্প বন্ধ করে নামায পড়তে যায়, তাহলে গল্পের মজা নষ্ট হয়ে যায়। তাই নামায বাদ দিয়ে গল্প করতেই থাকে। এ রকম মুসলমান কি নেই? নামায ছাড়ল কেন? এর ফল পাবে বাকি। গল্প ছাড়ল না কেন? এর মজা দুনিয়াতে নগদ পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে একজন দোকানদার দোকানে বসে বেচাকেনা করছে। এমতাবস্থায় আজান হল। দোকান বন্ধ করে যদি নামাযে যায়, তা হলে বেচাকেনা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। নামায পড়লে পরকালে ফল পাওয়া যাবে বাকি, আর দোকানে বেচা-কেনা করলে ফল পাওয়া যাবে নগদ, মুনাফা পাওয়া যাবে নগদ। বাকির আশায় নগদ ছাড়তে রাজী নয়। এ কারণে নামাযের জন্য দোকান বন্ধ করতে রাজি নয়, এমন মুসলমান কি আছে সমাজে? আছে।

রমাযান মাসে রোযা রাখলে ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট স্বীকার করলে, পরকালে এই রোযা হবে জাহান্নাম থেকে বাঁচার হাতিয়ার। হাদীস শরীফে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ রোযা হল জাহান্নাম থেকে বাঁচার হাতিয়ার। কিন্তু রোযা রাখলে ফল পাওয়া যাবে পরকালে, না রাখলে খানাপিনা খাওয়া যাবে দুনিয়াতে। এই কারণে পরকালের বাকির আশা করে না, দুনিয়ার খানাপিনার লালসায় রোযা রাখে না। এমন মুসলমান কি সমাজে আছে? এই ধরনের যত মুসলমান দুনিয়াতে আছে, যারা দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থকে ছাড়তে পারে না পরকালের উচ্চ স্বার্থের আশায়, তাদের সবাইকে এই মুনাফিকের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার।

মুনাফিক বলেছিল, আমার গাছের ঝরা খেজুর যতই অল্প হোক না কেন এটা নগদ, আর বেহেশতের ফলের মূল্য যতই বেশি হোক না কেন সেটা বাকি। আমি পরকালের বাকির আশায় দুনিয়ার নগদ ছাড়তে রাজী নই। এরই প্রেক্ষিতে তো আল্লাহ্ পাক আয়াতগুলো নাযিল করলেন।

মুমিনের চরিত্র কেমন হবে

আমাদের অনেক মুসলমানের মাঝে মুনাফিকের এই চরিত্রটা বিদ্যমান আছে। কুরআনের তাফসীর দ্বারা যদি আমরা হিদায়াত পেতে চাই তাহলে কুরআনের তাফসীরের আলোকে আমাদের চরিত্রের যে অংশ দূষণীয় সাব্যস্ত হবে সেটা ধরে রাখলে হিদায়াত পাব, না ছেড়ে দিলে? ছেড়ে দিলে। এই মনোভাব নিয়ে কুরআনের তাফসীর শুনার দরকার, বুঝা দরকার। কুরআনের তাফসীরের আলোকে যদি আমাদের চরিত্রের কোনও অংশ মুনাফিকের চরিত্রের মতো হয়, তাহলে আমাকে সেই দূষণীয় চরিত্র

ছেড়ে দিয়ে সৎচরিত্র অবলম্বন করতে হবে। মুমিনের চরিত্র অবলম্বন করতে হবে। মুনাফিকের চরিত্র আমার মাঝে থাকুক এমন ধারণায় যদি লেগে যাই তা হলে তাফসীর শোনা, তাফসীরের আয়োজন করা, মাহফিলের জন্য কষ্ট স্বীকার করা, দূর-দূরান্ত থেকে এই গভীর রাতে কষ্ট করে আসা-যাওয়া সবগুলো ব্যর্থ হবে।

আল্লাহ্‌পাক আয়াত নাজিল করে বলেন, فَذَكِّرْ হে রাসূলে কারীম! আপনি ওয়াজ করতে থাকুন। আল্লাহ্‌র রাসূল একদিকে মুনাফিককে ওয়াজ করলেন, অপরদিকে আপস-মীমাংসার প্রস্তাব দিলেন। রাসূলের ওয়াজ মুনাফিক গ্রহণ করল না। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌পাক রাব্বুল আলামীন বলেন, فَذَكِّرْ আপনি ওয়াজ করতে থাকুন। اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرٰى ওয়াজে নিশ্চয়ই উপকার হবে। একজন গ্রহণ করে নি, আরেকজন গ্রহণ করবে, আরেক জন গ্রহণ করেনি, অপরজন গ্রহণ করবে। কোন একদল লোক যদি ওয়াজ গ্রহণ না করে, তা হলে ওয়াজ বন্ধ করে দেওয়ার যুক্তি নেই।

ওয়াজ কাকে বলে?

একটা লোক ওয়াজ গ্রহণ করল না বলে ওয়াজ বন্ধ করবেন না, ওয়াজ করতে থাকুন। নিশ্চয় ওয়াজের উপকার আছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের বুঝা দরকার, ওয়াজ কাকে বলে? ওয়াজ করা কার দায়িত্ব? আর যারা ওয়াজ শোনে তাদের মাঝে কে কে ওয়াজ গ্রহণ করতে পারবে আর কে কে ওয়াজ গ্রহণ করতে পারবে না। আমাদের বাংলাদেশে ওয়াজ খুব বেশি হয়। কিন্তু অপকর্ম বন্ধ হচ্ছে না। এর মূলে অনেক কারণ রয়েছে। আমরা সারা জীবন ওয়াজ শুনি অথচ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি না ওয়াজ কাকে বলে, ওয়াজ কার নাম? আমরা যারা ওয়াজ করি তাদের অনেকের মাঝেই সেই গুণ নেই, যে গুণে গুণান্বিত হলে ওয়াইজের ওয়াজে মানুষের হেদায়াত হয়। আর আপনরা যারা ওয়াজ শুনেন তাদের অনেকের মাঝেই সেই মনোভাব নেই, যে মনোভাব নিয়ে শুনলে হেদায়াত পাওয়া যায়, এজন্য প্রথমে আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার যে, ওয়াজ কাকে বলে? দ্বিতীয়ত কেমন লোক ওয়াজ করলে তার ওয়াজের দ্বারা মানুষের হিদায়াত হবে? তৃতীয়ত শ্রোতারা কেমন মনোভাব নিয়ে ওয়াজ শুনলে ওয়াজের দ্বারা উপকৃত হতে পারবেন।

প্রথম কথা হল, ওয়াজ কাকে বলে? আল্লাহ্‌র হুকুম নবীর তরীকা মতে চললে কি পুরস্কার পাওয়া যাবে, আল্লাহ্‌র হুকুম নবীর তরীকা ছাড়লে কি শাস্তি হবে, এর বিশদ ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেওয়ার নাম ওয়াজ। নামায পড়া আল্লাহ্‌র হুকুম। নামায পড়লে কী উপকার হবে আর না পড়লে কী শাস্তি হবে, তা বুঝিয়ে দেওয়া হল একটি ওয়াজ। রোযা রাখা আল্লাহ্‌র হুকুম। রাখলে কী উপকার হবে আর না রাখলে কী শাস্তি হবে বুঝিয়ে দেওয়ার নাম ওয়াজ। পর্দা পালন করা আল্লাহ্‌র বিধান। পর্দা পালন করলে কী উপকার, আর লঙ্ঘন করলে কী সাজা তা বুঝিয়ে দেওয়ার নাম ওয়াজ।

তা হলে আল্লাহ্‌র হুকুম নবীর তরীকা পালন করলে পুরস্কার কী, আর লঙ্ঘন করলে সাজা কী, তা বুঝিয়ে দেওয়া ওয়াজ। কাজেই যে বক্তব্যের মাঝে আল্লাহ্‌র হুকুম পালনের ফলাফল বুঝিয়ে দেওয়া হয় না আর নবীর তরীকায় আমলের ফলাফল বুঝিয়ে দেওয়া হয় না, আল্লাহ্‌র হুকুম লঙ্ঘন করার সাজা বুঝিয়ে দেওয়া হয় না, নবীর তরীকা লঙ্ঘনের সাজা বুঝিয়ে দেওয়া হয় না, তা হলে এই বক্তব্য যতই সুন্দর হোক, যতই চটকদার হোক, যতই শ্রুতীমধুর হোক, এটাকে আর যা কিছুই বলা হোক না কেন, ওয়াজ বলা যায় না।

আমাদের দেশে ওয়াজের নামে যে সব অনুষ্ঠান হয় এর সবগুলো ওয়াজ হয় না। অনেক অনুষ্ঠানে ওয়াজের নামে বিভিন্ন গল্প-গুজব, ওয়াজের নামে বিভিন্ন মুখরোচক কথা, হাস্বানো-কাঁদানো, ওয়াজের নামে শুধু আনুষ্ঠানিক চাকচিক্য পালন করা হয়। আসলে যে জিনিসের নাম ওয়াজ সেই জিনিসটা খুব কমই হয়। এটা হল আমাদের দেশে বেশি বেশি ওয়াজ হওয়ার পরও হিদায়াত না হওয়ার এবং ভাল আমল না করার একটা কারণ। দ্বিতীয় কারণ, যে কোন লোক ওয়াজ করলেই তার ওয়াজের দ্বারা মানুষের হিদায়াত হয় না।

ওয়াজ কারীর কয়টি গুণ থাকা দরকার

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন, ওয়াজকারী ব্যক্তির যদি দু'টি গুণ না থাকে, তা হলে মানুষের হিদায়াত হবে না। **এক নম্বর:** আল্লাহ্ বলেন–

اِتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

ওয়াজকারীর দুই গুণের প্রথম গুণ সে অপরকে যেপথে উপদেশ দিবে, সে নিজে সেই পথে চলবে। যে ব্যক্তি নিজে নামায পড়ে না তার ওয়াজের দ্বারা মানুষ নামাযী হবে না। যে ব্যক্তি নিজে রোযা রাখে না, সে যদি অপরকে রোযা রাখার ওয়াজ করে, তাহলে তার ওয়াজে মানুষ রোযাদার হবে না। যে ব্যক্তি নিজে পর্দা পালন করে না, সে যদি অপরকে পর্দা পালনের ওয়াজ করে, তাহলে তার ওয়াজে মানুষ পর্দা পালন করবে না। যে ব্যক্তি নিজে সুদের কারবারে জড়িত, নিজে ঘুষের কারবারে জড়িত, যে ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত অপকর্মে লিপ্ত, সে যদি মানুষকে ভাল কাজ করার ওয়াজ করে, তাহলে তার ওয়াজে মানুষ ভাল কাজ করবে না। তাহলে ওয়াজকারী ব্যক্তির দুই গুণের প্রথম গুণ হচ্ছে, অপরকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে প্রথমে তার নিজেকে দ্বীনের পথে চলতে হবে।

দুই নম্বর গুণ হল, দাওয়াত দিবে মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে। স্বার্থহীনভাবে শুধু মানুষের উপকারের জন্য। মানুষ পাপ করলে জাহান্নামে যাবে, আল্লাহ্‌র বান্দারা শাস্তি পাবে, নবীর উম্মত জাহান্নামে গিয়ে কষ্ট পাবে, তাদের সেই কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য, তাদের দরদী হয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার দরদমাখা মনোভাব নিয়ে মানুষকে ওয়াজ করবে। নিজের কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি ওয়াজের বেলায় টাকার চুক্তি করে যে, তোমাদের মাহফিলে যাব, ওয়াজ করব, কত হাজার টাকা দিবে বল? এই লোক দরদমাখা অন্তর নিয়ে ওয়াজ করবে, না টাকার লোভে ওয়াজ করবে? টাকার লোভে।

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন, ওয়াজকারীর যদি দু'টি গুণ থাকে, তাহলে তাকে অনুসরণ করবে। তার ওয়াজে তোমাদের হিদায়াত হবে।

এক নম্বর : অন্যকে দাওয়াত দেয়ার পূর্বে নিজে আল্লাহ্‌র পথে চলবে।

দুই নম্বর : ওয়াজের বিনিময়ে মানুষের সাথে বায়না করবে না, চুক্তি করবে না। যারা টাকার বিনিময়ে ওয়াজ করে তাদের ওয়াজ ব্যাটারীর পাওয়ারের মত পাওয়ারলেস হয়ে যায়।

কারণ, আমি যদি আপনাদের এখানে দশ হাজার টাকার চুক্তি করে আসি বা বিশ হাজার টাকার চুক্তি করে আসি, তাহলে আমাকে যে কমিটি

দাওয়াত দিল ঐ কমিটি যে টাকা দিবে, সে টাকা কি তারা নিজের পকেট থেকে দিবে, না আপনাদের কাছ থেকে চাঁদা করে দিবে? তাহলে সকলের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে আমার এই দশ হাজার টাকা বা বিশ হাজার টাকা যোগার করতে গিয়ে তাদেরকে নামাযির কাছ থেকেও চাঁদা নিতে হয়, বেনামাযির কাছ থেকেও চাঁদা নিতে হয়, হালাল ব্যবসায়ীর কাছ থেকেও চাঁদা নিতে হয়, সুদের কারবারীর কাছ থেকেও চাঁদা নিতে হয়, মদখোরের কাছ থেকেও চাঁদা নিতে হয়, পর্দানশীনদের কাছ থেকেও চাঁদা নিতে হয়, বেপর্দার কাছ থেকেও চাঁদা নিতে হয়।

তখন কমিটি আমাকে বলে দিবে, হুযুর! বে নামাযীর বিরুদ্ধে বলবেন না। কারণ, আপনার দশ/ বিশ হাজার টাকা পূর্ণ করতে আমরা বেনামাযির কাছ থেকেও চাঁদা নিয়েছি। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে তারা চাঁদা দেবে না, আমরা দশ/ বিশ হাজার টকাও পূর্ণ করতে পারব না।

হুযুর বেপর্দার রিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। কারণ, যারা বেপর্দায় চলে তাদের কাছ থেকেও টাকা নিয়েছি। টাকা না নিলে আপনার দশ/ বিশ হাজার পূর্ণ করতে পারব না। কাজেই বেপর্দার বিরুদ্ধে কোন কিছু বললে চাঁদা দিবে না, আপনার টাকাও পূর্ণ করতে পারব না। এভাবে যারা সুদখোর, মদখোর, গাঁজাখোর, তাদের কাছ থেকেও চাঁদা নিয়েছি আপনার টাকা পরিশোধের জন্য। কাজেই ওদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে ওরা চাঁদা দেবে না। আর আপনাকেও দশ/বিশ হাজার টাকা দিতে পারব না।

এ ধরনের ওয়াজীরা এমন ওয়াজ করবেন, যাতে কারো বিরুদ্ধে না যায়। ঐ সমস্ত পাওয়ারলেস বক্তারা এমন ওয়াজ করে, যা বেনামাযীর বিরুদ্ধেও যায় না, বেরোযাদারের বিরুদ্ধেও যায় না, বেপর্দার বিরুদ্ধেও যায় না। সুদখোরের বিরুদ্ধেও যায় না, ঘুষখোরের বিরুদ্ধেও যায় না। হয়তো সাত আসমানের উপরের ওয়াজ করে, আর না হয় তো সাত জমিনের নিচের ওয়াজ করে, দুনিয়ার আর কোন ওয়াজ করে না। এটার নাম ফিউজ ব্যাটারী পাওয়ারলেস।

পক্ষান্তরে যিনি আপনাদের এখানে আসবেন ওয়াজ করতে, আপনাদের সাথে বায়না করবেন না, কন্ট্রাকের মাধ্যমে টাকা নেবেন না। তিনি ইচ্ছা করলে নামাযের ওয়াজ করবেন, ইচ্ছা করলে পর্দার ওয়াজ করবেন, ইচ্ছা

করলে সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করবেন, ইচ্ছা করলে ঘুষের বিরুদ্ধে ওয়াজ করবেন, কে চাঁদা দিল বা না দিল, তাকে টাকা দিবে কিনা সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। তিনি ভাববেন তোমাদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার রাস্তা বাতলে দেওয়া আমার দায়িত্ব। আগামীতে তোমরা আমাকে দাওয়াত দিবে কি না সেটা আমার দেখার বিষয় নয়। আল্লাহ্ আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, তোমাকে দাওয়াত দিয়েছিল কি না, তোমার প্রতি মানুষ আগ্রহী হয়েছিল কি না, তিনি জিজ্ঞেস করবেন, বেহেশতের পথ তুমি বুঝিয়েছ কি না, জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলে কি না।

সত্য কথা যা তুমি জান সেটা বলেছিলে কি না? আপনারা আল্লাহ্র পথে চলেছেন কি না সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। সেটা জিজ্ঞেস করবেন আপনাদেরকে। সত্য কথা বললাম কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে, আর সত্য কথা বলার পর শোনলেন কি শোনলেন না, সেই জবাব আমাকে দিতে হবে না; আপনাদের দিতে হবে। এ কারণে আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন ফরমান, আল্লাহ্র পথে যারা দাওয়াত দেয় তাদের মাঝে দু'টা গুণ আছে কি না আগে দেখে নাও।

এক নম্বর, আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়ার পূর্বে নিজে আল্লাহ্র পথে চলবেন। দুই নম্বর, ওয়াজের বিনিময়ে মানুষের সাথে টাকার চুক্তি করবেন না। টাকার লোভে ওয়াজ করবেন না, মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য দরদমাখা অন্তর নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে ওয়াজ করবেন। আর এই ওয়াজের মাঝেই হিদায়াত আছে। যারা মানুষকে নিজের স্বার্থের লোভে ওয়াজ করে তাদের ওয়াজে হিদায়েত নেই।

স্বচক্ষে দেখা একটি ঘটনা

বিষয়টা বুঝার জন্য আপনাদের সামনে একটি সহজ উদাহরণ পেশ করছি। আমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনা, এক ক্যানভাসার রেল গাড়ীতে ক্যানভাস করে ঔষধ বেচে। দাঁতের মাজন বেচে। গাড়ীতে উঠেই বলে, ভদ্র মহোদয়গণ! আমার কাছে শুধু দাঁত মাজন আছে। দাঁত মাজা বাহাদুরী নয়, দাঁত মাজা নবীর সুন্নাত। হাদীস শরীফে আছে, নবীর একটা সুন্নাত পালন করলে একশ শহীদের সওয়াব পাওয়া যায়। কার কথা? মাজন বিক্রেতার। নবীর একটা সুন্নত আদায় করলে একশ শহীদের সাওয়াব

পাওয়া যায়, এটা কি ওয়াজ নয়? অবশ্যই ওয়াজ। তাহলে এক বিক্রেতা গাড়ীর যাত্রীদেরকে কিসের জন্য ওয়াজ করে? প্যাসেঞ্জারদের ওয়াজ করে নবীর সুন্নাতওয়ালা বানানোর জন্য, না নিজের দাঁতমাজন বিক্রির জন্য? দাঁতমাজন বিক্রির জন্য। এই ব্যক্তির ওয়াজে মানুষ সুন্নাত ওয়ালা হবে কি? না। কারণ, এই লোক মানুষের দরদে দরদী হয়ে ওয়াজ করেনি, এই লোক নিজের স্বার্থের জন্য লোভী হয়ে মানুষকে ওয়াজ করছে। এই ব্যক্তির ওয়াজে আর যাই কিছু হোক না কেন মানুষের হিদায়েত হবে না।

তাহলে আপনারা ওয়াজ শুনেন কিন্তু আমাদের দোষের কারণে আপনাদের হিদায়েত হচ্ছে না। আমরা যারা ওয়াজ করি আমাদের মাঝে হয়তো প্রথম গুণটা নেই অথবা দ্বিতীয় গুণটা নেই। আমি নিজে নামায পড়ি না অথচ আপনাদেরকে নামাযের ওয়াজ করি এই কারণে আমার ওয়াজে আপনারা নামাযী হতে পারেন না। আমি নিজে পর্দা মানি না অথচ আপনাদেরকে পর্দা মানতে ওয়াজ করি এই কারণে আপনারা পর্দা মানতে পারেন না। আমি নিজে সুদের কারবার করছি, ঘুষের কারবার করছি অথচ আপনাদের সুদ-ঘুষ ত্যাগের ওয়াজ করি, এই কারণে আপনারা সুদ-ঘুষ থেকে বিরত থাকতে পারছেন না।

হিদায়াত না হওয়ার এক কারণ এটা। আর না হয় আমি ওয়াজ করি আপনাদের দরদে দরদী হয়ে নয়, আপনাদের বেহেশতের পথ দেখাবার জন্য নয়, আপনাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার জন্য নয়, ওয়াজ করি মোটা অঙ্কের টাকার জন্য। এই টাকার জন্যই ওয়াজ করি। আপনাদেরকে রক্ষা করার আশায় নয়। এই কারণে এ রকম দোষ যাদের মাঝে আছে, তাদের ওয়াজ দলে দলে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ শুনতে পারে, কিন্তু এই রকম ওয়াজ জিন্দেগীভর শুনলেও হিদায়াত হবে না। ওয়াজের দ্বারা কোন ফল হবে না। কোন উপকার হবে না।

আল্লামা মুফতী শফী রহ. তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে লিখেন, দুই দল বক্তার বক্তৃতায় মানুষের হিদায়াত হবে না। একদল যারা মানুষকে ভাল চলার কথা বলে আর নিজে ভাল পথে চলে না। আরেক দল যারা ওয়াজ করে মানুষের কাছে টাকা চায়। এই দুই দল বক্তার বক্তৃতায় হিদায়াত নেই। তাদের ওয়াজে মানুষের উপকার হবে না।

ওয়াজ শ্রবণকারীর কি গুণ থাকা দরকার

আমাদের কথা যখন বলেই ফেললাম, তো আপনাদের কথা বললে তো কোন অসুবিধা নেই! সেই দোষ আপনাদের মাঝেও আছে। যেই দোষের কারণে পূর্বোল্লিখিত দুই গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিও যদি ওয়াজ করেন তবুও আপনাদের উপকার হয় না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাঝে এই দু'টা গুণ ছিল কি না, আপনারা কি মনে করেন? মানুষকে আল্লাহ্র পথে ডাকার আগে নিজে আল্লাহ্র পথে চলবেন। এই গুণ ছিল কী? টাকার লোভে ওয়াজ না করে মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর দরদ নিয়ে ওয়াজ করবেন, এ গুণ রাসূলের মাঝে ছিল কী? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে এই দুই গুণ এমন পরিপূর্ণভাবে ছিল জগতের আর কারো মাঝে এমন পরিপূর্ণ থাকতে পারে না। তার পরেও ঐ খেজুর গাছের মালিককে যখন আল্লাহ্র রাসূল ওয়াজ করলেন, তখন সে ওয়াজকে গ্রহণ করল না, ফিরিয়ে দিল।

এখন বলুনতো! সে ক্ষেত্রে ওয়াজীর দোষে না শ্রবণকারীর দোষে সমস্যা হল। এখানে ওয়াজীর দোষ নেই। যে দু'টি গুণ অর্জন করে ওয়াজ করতে হয়, সেই দু'টি গুণ সমস্ত জগদ্বাসীর চেয়ে অধিক পরিপূর্ণভাবে অর্জন করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ মুনাফেককে ওয়াজ করেছিলেন। কিন্তু সে গ্রহণ করতে পারে নি কেন? ওয়াজীর দোষে নয়, শ্রবণকারীর দোষে।

ওয়াজের দ্বারা কার উপকার হবে?

এখন আমাদের বুঝা দরকার, যারা ওয়ায শোনে তারা কেমন মনোভাব নিয়ে শুনলে ওয়াজে উপকার হবে, ওয়াযে আমল করতে পারবে। আর কেমন মনোভাব এর অভাবে ওয়াজ শুনবে কিন্তু আমল করতে পারবে না। আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন সেই নির্দেশনা দিয়ে বলেন,

فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرٰى ، سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى

"হে রাসূলে করীম! আপনার ওয়াজ এই মুনাফেক গ্রহণ করল না বলে ওয়াজ বন্ধ করে দেবেন না। আপনি ওয়াজ করতে থাকুন। নিশ্চয়ই ওয়াযে

উপকার হবে, তবে সর্বলোকের নয়। দুইগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির ওয়াযের দ্বারাও সর্বলোকের উপকার হবে না। আমাদের বুঝা দরকর উপকার হবে কার, আর উপকার হবে না কার?

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন– سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ওয়ায শুনবে নসীহত পালন করবে ঐ সমস্ত শ্রোতারা যারা কোন পথে চললে আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন জানেন না, জানলে সেই পথে চলবে না। যারা আল্লাহ্কে ভয় পায়, আল্লাহ্র শাস্তির ভয় যাদের অন্তরে আছে অথচ তারা জানে না কোন কাজ করলে আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন, জানলে সেই কাজ করবে না সেই মনোভাব যাদের অন্তরে আছে তারা সেই দু'গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির ওয়ায শোনলে অবশ্যই তাদের উপকার হবে। কেমন মনোভাব নিয়ে আমরা ওয়াজ শুনবো? যে কাজ করলে আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন, জানলে একাজ আর করবো না- এই মনোভাব নিয়ে যারা ওয়াজ শুনতে পারে না, তারা সারা জীবনভর ওয়ায শুনবে কিন্তু ওয়াযে তাদের কোন উপকার হবে না। ওয়াযে তাদের হিদায়াত হবে না।

এবার ওয়াজে উপকার হল না কার দোষে? বক্তার দোষে না শ্রোতার দোষে? শ্রোতার দোষে। তাহলে ওয়াযে উপকার হয় না- দোষ শুধু আমাদের মাঝে আছে, না আপনাদের মাঝেও আছে ? শ্রোতাদের মাঝেও আছে। আল্লাহ্ বলেন, سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى যারা আল্লাহ্র শাস্তির ভয় করে, ওয়ায শোনলে তাদের উপকার হবে। কিন্তু আমরা এতো চালাক যে যদি আমি জিজ্ঞেস করি আপনারা আল্লাহ্র শাস্তির ভয় করেন কি? একসাথে তখন বলবেন হ্যাঁ! আমরা আল্লাহ্র শাস্তির ভয় করি!

আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করার প্রমাণ কি?

এই জন্য মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন- আমি আল্লাহ্র শাস্তির ভয় করি বললেই, ভয় প্রমাণ হয় না। আল্লাহ্র শাস্তির ভয় করো কিনা প্রমাণ হবে তখন, যে কাজ করলে আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন আর এটা যদি জানতে পার, জানার পর যদি এই কাজ করার আর সাহস না করো তখন প্রমাণ হবে তুমি আল্লাহ্র শাস্তির ভয় কর। যেমন- আগে জানতে না যে, নামাজ না পড়লে জাহান্নামে যাবে। যে দিন শুনেছ আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন- নামায না পড়লে জাহান্নামে যাবে! এই দিন থেকে আর নামায ছাড়ে না।

আল্লাহ্র শাস্তি জাহান্নামের ভয়ে নামায ছাড়ে না। যখন থেকে জানতে পেরেছে নামায না পড়লে জাহান্নামে যেতে হবে, তখন থেকে নামায ছাড়ে না কেন? জাহান্নামের ভয়ে। তখন প্রমাণ হল তার অন্তরে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় আছে। যখন জানতে পারল সুদের কারবার করলে জাহান্নামে যেতে হবে, যখন জানতে পারলো ঘুষের কারবার করলে জাহান্নামে যেতে হবে, যখন জানতে পারল মদ খেলে জাহান্নামে যেতে হবে, যখন জানতে পারল গাঁজা খেলে জাহান্নামে যেতে হবে, যখন জানতে পারল পর্দা না করলে জাহান্নামে যেতে হবে, তখন থেকেই বেপর্দা হয় না, সুদের কারবার করে না, ঘুষের কারবার করে না, মদ খায় না, গাঁজা খায় না। কেন? সে আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় পায়।

আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন ফরমান, "আল্লাহ্র শাস্তির এমন ভয় যাদের অন্তরে আছে, এ রকম ভয় অন্তরে নিয়ে যারা ওয়াজ শুনবে নিশ্চয়ই তাদের উপকার হবে।

আল্লাহ্র মারিফত কে লাভ করতে পারে?

মুফাসসিরীনে কেরাম তাফসীরের কিতাবে লিখেছেন- এভাবে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় বদ্ধমূল হওয়া, আর আল্লাহ্র রহমতের আশা এভাবে বদ্ধমূল হওয়ার নাম আল্লাহ্র মারিফত হাসিল হওয়া। দু'টা জিনিস যদি একত্রে অন্তরে জায়গা দিতে পারে তাহলে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র মারিফত হাসিল করতে পারে। একটা হল আল্লাহ্র শাস্তির প্রতি এমন ভয়, যে ভয়ের কারণে হারাম কাজ করার সাহস করে না।

আরেকটা হল আল্লাহ্র রহমতের এমন আশা, যে আশার কারণে আল্লাহ্র কোন ইবাদত ছাড়তে মন চায় না। যে পরিমাণ ভয় থাকলে গোনাহর কাজ করার সাহস হয় না, যে পরিমাণ রহমতের আশা থাকলে ইবাদত-বন্দেগী ছাড়তে পারে না, ঐ পরিমাণ শাস্তির ভয় ঐ পরিমাণ রহমতের আশা একটি অন্তরে স্থান দেওয়ার নাম আল্লাহ্র মারিফত হাসিল হওয়া।

এই মর্মে হযরত উমর ফারুক রাযি. বলেন আল্লাহ্ যদি ঘোষণা দিতেন- সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ জাহান্নামে যাবে একটি মাত্র মানুষ জান্নাতে যাবে তাহলে আমি আশাবাদী হয়ে থাকতাম, এই একটি মানুষ

আমি হতে পারি কি না। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্ ঘোষণা দিতেন সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ জান্নাতে যাবে; তবে একটি মানুষ জাহান্নামে যাবে তখন আমি উমর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতাম, সেই একটা জাহান্নামী মানুষ আমি হয়ে যাই কি না। এইভাবে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় আর রহমতের আশা একটা অন্তরে স্থান দেওয়ার নাম আল্লাহ্র মারিফত।

আল্লাহকে পাওয়ার সঠিক পথ

মানুষ আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ কুরআনে পথ বাতলে দিয়েছেন। মানুষ আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ লাভের জন্য, আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করার জন্য আল্লাহ্র মারিফত হাসিল করার জন্য, দুনিয়ার মানুষ বেহেশত পর্যন্ত পৌঁছার জন্য আল্লাহ্ কুরআনে একটি পথ বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ্র বাতলানো পথটা কুরআনের ভাষায় সীরাতে মুস্তাকীম বলা হয়। এই পথের চারটি অংশ আছে। প্রথম অংশের নাম শরিয়ত। দ্বিতীয় অংশের নাম তরিকত। তৃতীয় অংশের নাম হাকীকত। চতুর্থ অংশের নাম মারিফত।

একটি তাত্ত্বিক ব্যাপার

আপনারা গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন শরীয়ত বানান করতে ৫টি অক্ষর লাগে। তরিকত বানানেও অক্ষর ৫টি, হাকীকত বানানেও অক্ষর ৫টি, মারিফত বানানেও অক্ষর ৫টি । আরবী বানান হিসেবে শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারিফত প্রত্যেকটি শব্দে ৫টি অক্ষর আছে। شريعت শব্দে ش ، ر ، ي ، ع ، ت ৫ টি অক্ষর, طريقت শব্দে ط ، ر ، ي ، ق ، ت ৫ টি অক্ষর, حقيقت শব্দে ح ، ق ، ي ، ق ، ت ৫টি অক্ষর, معرفت শব্দে م ، ع ، ر ، ف ، ت ৫টি অক্ষর।

সীরাতে মুস্তাকীম কাকে বলে?

আল্লাহ্কে পাওয়ার পথের নাম সীরাতে মুস্তাকীম। আল্লাহ্র মারিফত পাওয়ার পথের নাম সীরাতে মুস্তাকীম, দুনিয়ার মানুষ জান্নাতে পৌঁছার পথের নাম সীরাতে মুস্তাকীম। এই পথের অংশ ৪টি। প্রথম অংশের নাম শরীয়ত, বানানে অক্ষর ৫টি, দ্বিতীয় অংশের নাম হাকীকত বানানে অক্ষর ৫টি, তৃতীয় অংশের নাম হাকীকত বানানে অক্ষর ৫টি। চতুর্থ অংশের নাম মারিফত বানানে অক্ষর ৫টি। শরীয়ত বানানে ৫ অক্ষর কেন? তরীকত

বানানে ৫ অক্ষর কেন? হাকীকত বানানে ৫ অক্ষর কেন? এবং মারিফত বানানে ৫ অক্ষর কেন? এর রহস্য আছে দু'টা।

এক নাম্বার রহস্য হল- ইসলাম ধর্মের ভিত্তি ৫টি। ইসলাম ধর্মের ৫টি ভিত্তি যদি মেনে থাকো তাহলে শরীয়তের দরজা খোলা আছে। এজন্য শরীয়তের অক্ষর ৫টি। ইসলাম ধর্মের ৫টি ভিত্তি যদি মেনে থাকো তরীকত হাসিল হতে পারে। এজন্য তরীকত বানানে ৫টি অক্ষর। ইসলাম ধর্মের ৫টি ভিত্তি যদি মেনে নাও তাহলে হাকীকত হাসিল হতে পারে। এজন্য হাকীকত বানানে ৫টি অক্ষর।

ইসলাম ধর্মের ৫টি ভিত্তি যদি মেনে থাকো তাহলে মারিফত হাসিল হতে পারে। এজন্য মারিফত বানানে অক্ষর ৫টি। সুতরাং ইসলাম ধর্মের ৫টি ভিত্তি যে ব্যক্তি মানে না তার শরীয়ত নেই, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের ৫টি ভিত্তি মানে না তার তরীকত নেই, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের ৫টি ভিত্তি মানে না তার হাকীকত নেই, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের ৫টি ভিত্তি মানে না তার মারিফত নেই। এজন্য শরীয়ত বানানে ৫ অক্ষর, তরীকত বানানে ৫ অক্ষর, হাকীকত বানানে ৫ অক্ষর, মারিফত বানানে ৫ অক্ষর। ইসলাম ধর্মের ৫ ভিত্তির প্রথম ভিত্তি কালেমা পাঠ করা, দ্বিতীয় ভিত্তি দৈনিক পাঁচবার নামায আদায় করা, তৃতীয় ভিত্তি রমযান মাসে রোযা রাখা, চতুর্থ ভিত্তি সামর্থবানের হজ্জ করা, পঞ্চম ভিত্তি ধনী লোকের যাকাত দেয়া। ইসলাম ধর্মের পাঁচ ভিত্তি না মানলে- তার শরীয়তও নেই,তরীকতও নেই, হাকীকতও নেই এবং মারিফতও নেই। এজন্য শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারিফতের প্রত্যেকটির অক্ষর ৫টি করে।

আর ইসলামের পঞ্চ ভিত্তির দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে দৈনিক পাঁচ বেলা নামায আদায় করা। এটা হল শরীয়ত তরীকত, হাকীকত ও মারিফতের ৫ অক্ষরে বানানের দ্বিতীয় রহস্য। যার পাঁচ বেলা নামায ঠিক আছে তার শরীয়ত আছে, এজন্য শরীয়ত বানানে পাঁচ অক্ষর। যার পাঁচ বেলা নামায ঠিক আছে তার তরীকত ঠিক আছে, এজন্য তরীকত বানানে ৫ অক্ষর। যার পাঁচ বেলা নামায ঠিক আছে তার হাকীকত আছে, এজন্য হাকীকত বানানে পাঁচ অক্ষর। যার পাঁচ বেলা নামায ঠিক আছে তার মারিফত আছে, এজন্য মারিফত বানানে ৫ অক্ষর।

এবার বুঝে থাকলে বলুন বাংলাদেশে যত পীর আছে এদের অধিকাংশ নামাযী না বে নামাযী? যে সমস্ত পীর বে নামাযী এদের শরীয়ত আছে কি? নেই। এজন্য শরীয়ত বানানে পাঁচটি অক্ষর। যে সমস্ত পীর বেনামাযী তাদের তরীকত আছে কি? নেই। এজন্য তরীকত বানানে পাঁচ অক্ষর। যে সমস্ত পীর বে নামাযী তাদের হাকীকত আছে কি? নেই। এজন্য হাকীকত বানানেও পাঁচটি অক্ষর। যে সমস্ত পীর বেনামাযী তাদের মারিফাত আছে কি? নেই। এজন্য মারিফত বানানেও পাঁচটি অক্ষর।

ভণ্ড শব্দের অর্থ কী?

যার মাঝে যেই জিনিস নেই এই জিনিসের দাবী করা **'ভণ্ডামী'**। এ রকম মিথ্যা দাবী যে করে সেই ভণ্ড। ভণ্ড শব্দটা অনেকেই বলে থাকি। কিন্তু ভণ্ড শব্দটার অর্থ জানি না। ভণ্ড ঐ মিথ্যা দাবীদারকে বলা হয় যে ঐ জিনিসের দাবী করে যে জিনিস তার মাঝে নেই। যে ডাক্তার লেখাপড়া জানে না আর ডাক্তারী করেন সে সত্যিকারের ডাক্তার না ভণ্ড ডাক্তার। যে লোক কুরআন হাদীসের ইলম শিখেনি আর বলে আমি আলেম, সেই ব্যক্তি সত্যিকারের আলেম নয় ভণ্ড আলেম। যেই পীর মারিফাত শিখেনি আর বলে আমি পীর, সেই পীর সত্যিকারের পীর নয় ভণ্ডপীর। এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারলাম শরীয়ত বানানে পাঁচ অক্ষর, তরীকত বানানে পাঁচ অক্ষর, হাকীকত বানানে পাঁচ অক্ষর ও মারিফত বানানে পাঁচ অক্ষর কেন। এর রহস্য দু'টা।

এক নম্বর ইসলামের পাঁচ ভিত্তির দিকে ইঙ্গিত করে। দুই নম্বর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দিকে ইঙ্গিত করে। ইসলামের পাঁচ বেনা মানলে তোমার শরীয়ত আছে। এজন্য শরীয়তে পাঁচ অক্ষর। ইসলামের পাঁচ বেনা মানলে তোমার তরীকত আছে, এই জন্য তরীকতে পাঁচ অক্ষর। ইসলামের পাঁচ বেনা মানলে তোমার হাকীকত আছে, এই জন্য হাকীকতে পাঁচ অক্ষর। ইসলামের পাঁচ বেনা মানলে তোমার মারিফত আছে, এই জন্য মারিফতে পাঁচ অক্ষর।

দ্বিতীয় রহস্য হচ্ছে পাঁচ বেলা নামায, যদি পড় তাহলে তোমার শরীয়ত আছে, এ জন্য শরীয়তে পাঁচ অক্ষর। পাঁচ ওয়াক্তের নামায মানলে তরীকত আছে, এজন্য তরীকতে পাঁচ অক্ষর, পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানলে

হাকীকত আছে। এ জন্য হাকীকতে পাঁচ অক্ষর। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানলে মারিফত আছে, এজন্য মারিফতে পাঁচ অক্ষর। সুতরাং যেই পীরেরা ধনী হয়ে হজ্জ করে না তাদের শরীয়তও নেই, তরীকতও নেই, হাকীকতও নেই, মারিফতও নেই। তারা ভণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। আর যেই পীরেরা পীর দাবী করেও পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকমত আদায় করে না তাদের শরীয়তও নেই, তরীকতও নেই, হাকীকতও নেই, মারিফকতও নেই। তারা ভণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়।

শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারিফত-এর অর্থ

এখন শুনুন শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারিফত শব্দের অর্থ। এতক্ষণ শুনেছেন শরীয়ত শব্দের বানান, তরীকত শব্দের বানান, হাকীকত শব্দের বানান, মারিফত শব্দের বানান। এখন শুনুন শরীয়ত শব্দের অর্থ, তরীকত শব্দের অর্থ,হাকীকত শব্দের অর্থ, মারিফত শব্দের অর্থ।

শরীয়ত অর্থ চলার পথের বিধান। শয়তান পাওয়ার চলার পথের বিধান, না আল্লাহ্ পাওয়ার চলার পথের বিধান? আল্লাহ্ পাওয়ার চলার পথের বিধান। আল্লাহ্ পাওয়ার পথ আছে কি? এই পথটার নাম কুরআনের ভাষায় কি বলা হয়েছে? সীরাতে মুস্তাকীম। পথে চলার নিয়ম লাগে কি? লাগে। আল্লাহ্ পাওয়ার পথে চলার যে নিয়ম ও বিধি-বিধান লাগে সেটার নাম শরীয়ত। শরীয়ত শব্দের অর্থ হল চলার পথের বিধান।

তরীকত শব্দের অর্থ হল চলন্ত পথ। **হাকীকত শব্দের অর্থ** হল বাস্তব উপলব্ধি। **মারিফত শব্দের অর্থ** হল পরিচয়। মারিফত শব্দের অর্থ কি? পরিচয়।

শরীয়ত নামকরণের কারণ কি?

শরীয়তকে শরীয়ত বলে কেন? আল্লাহ্ পাওয়ার পথে অগ্রসর হতে হলে বিধান পালন করতে হবে, এ জন্য আল্লাহ্ পাওয়ার বিধানকে বলা হয় শরীয়ত। নামায পড়া ফরয। রোযা রাখা ফরয। সামর্থবানদের হজ করা ফরয। ধনীদের যাকাত দেওয়া ফরয। বেগানা নারী-পুরুষের পর্দা পালন করা ফরয।

চুরি করা হারাম। ডাকাতি করা হারাম। খুন-খারাবী করা হারাম। যিনা-ব্যভিচার করা হারাম। গান বাজনা করা হারাম। বেপর্দা চলা হারাম। এগুলোর নাম শরীয়ত। এগুলো চলার পথের বিধান। যদি তুমি বিধান পালন করো তাহলে তোমার পথ চলন্ত হতে পারে। এজন্য শরীয়ত পালন করলেই তরীকত পাওয়া যায়। শরীয়ত ছাড়া তরীকতের গন্ধও পাওয়া যাবে না। অথচ ভণ্ড পীর মেয়ে লোক মুরিদ করে আর মেয়েদের সাথে বেপর্দা চলে, এটা ভণ্ড পীরের আরেক আলামত। যখন তাদের বলা হয় বেগানা নারীদের সাথে পর্দা করা ফরয, পর্দা কর না কেন? তারা বলে পর্দা করা ফরয শরীয়তে, আমরা হলাম মারিফতপন্থী। মারিফত পাইলে শরীয়তের ফরয আর ফরয থাকে না। শরীয়তের হারাম মারিফতে হারাম থাকে না। এটা ভণ্ড পীরের আরেক আলামত। অথচ শরীয়তে যে জিনিস ফরয তরীকতে সেটা ফরয, হাকীকতেও ফরয, মারিফতেও ফরয। শরীয়তে যা হারাম, মারিফতেও তা হারাম।

একটি উদাহরণ

এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আপনাদের জানা মতে গোবর খাওয়া হালাল, না হারাম? হারাম। মারিফত হাসিল হলে হালাল হয়ে যায়? না। তাহলে বেপর্দা চলা হারাম শুধু শরীয়তে না মারিফতেও? মারিফতেও। যেমনভাবে গোবর খাওয়া হারাম, শুধু শরীয়তে নয় মারিফতেও। ঠিক তেমনি ভাবে বেপর্দা চলা হারাম শুধু শরীয়তে নয়, মারিফতেও হারাম। যেই ভণ্ডপীর বলে বেপর্দা চলা শরীয়তে হারাম, গান-বাজনা শরীয়তে হারাম। মারিফত হাসিল হলে শরীয়তের হারাম হালাল হয়ে যায়, এদেরকে বলবেন, গোবর খাওয়া হারাম, তোর মারিফত হাসিল হয়েছে, তুই ভাত খাবি না, শুধু গোবর খাবি।

এই ভণ্ডের দল নামায পড়ে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে মনের নামায বড় নামায। বেশ ভাল কথা। নামায যদি কাজ কর্মে না পড়ে বড় নামায হয়ে যায়, এদেরকে দাওয়াত দিয়ে এনে বলবেন– 'মনের ভাত বড় ভাত'। আপনারা কি মনে করেন, ভাত মনে মনে খেলে পেট ভরে না বাস্তবে খেলে? বাস্তবে। ঠিক তেমনিভাবে নামায মনে মনে পড়লে জাহান্নাম থেকে বাঁচা যায় না। নামায বাস্তবে পড়তে হয় জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য।

তাহলে ওরা যে বলে শরীয়তের হারাম মারিফতে হারাম থাকে না, ওটা কি ঠিক? না। বেপর্দা চলা শরীয়তে হারাম মারিফতেও হারাম। গান-বাজনা শরীয়তে হারাম মারিফতেও হারাম। শরীয়তে নামায কাযা করা হারাম মারিফতেও নামায কাযা করা হারাম। এজন্যে আল্লাহ্‌র কোন এক ওলী বলেন–

علم باطن ہم چوں مسک + وعلم ظاہر ہم چو شیر

کئے شود بے شیر مسک + وکئے بود بے شرع پیر

শরীয়ত হল দুধের মতো। মারিফত হল ঘিয়ের মতো। ঘি পানি থেকে বের করে না দুধ থেকে বের করে? যে বলে দুধ খালে ফেলে দাও। আমাকে ঘি দাও। যে ব্যক্তি খালে দুধ ঢেলে ফেলে দেয়, সে ব্যক্তি ঘি পাবে কি জীবনে কখনো? না। ঠিক তেমনিভাবে যে ব্যক্তি শরীয়ত পালন করে না সে ব্যক্তি জীবনে কোন দিন মারিফত পাবে না। কারণ কি? কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ পাওয়ার প্রথম অংশের নাম শরীয়ত। আল্লাহ্ পাওয়ার পথের নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান আছে, হালাল ও হারাম আছে।

শরীয়তের বিধান যদি পালন কর, তাহলে তোমার তরীকত হাসিল হবে। তারপর তোমার হাকীকত হাসিল হবে। তারপরে তোমার মারিফত হাসিল হবে। এজন্য শরীয়ত অর্থ হল চলার পথের বিধান। যখন তুমি শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করবে, তখন তোমার আল্লাহ্ পাওয়ার পথ চলন্ত হবে। এ অবস্থার নাম হল তরিকত। তরীকত শব্দের অর্থ হল চলন্ত পথ। আল্লাহ্ পাওয়ার পথ চলন্ত হয় শরীয়ত ছেড়ে দিলে, না শরীয়ত গ্রহণ করলে? শরীয়ত বাদ দিয়ে আল্লাহ্ পাওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারবে না। শরীয়ত বাদ দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। যখন আল্লাহ্ পাওয়ার পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিলের উপলব্ধি হতে থাকে তার আত্মার মাঝে। এই উপলব্ধিটাকে বলে হাকীকত।

একটি ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ. কে এক লোক জিজ্ঞাসা করেছিল, আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিল হলে আমি টের পাব কি? থানভী রহ. জবাবে বলেন, কোন লোকের নাবালক অবস্থায় বক্তৃতা দিয়ে তাকে সাবালক বুঝানো যায় না। ঠিক তেমনিভাবে হাকীকত হাসিল

হওয়ার আগে কোন ব্যক্তিকে লেকচার-বক্তৃতা দিয়ে তা বুঝানো যায় না। যে ব্যক্তি সাবালক হয়েছে তাকে সাবালক কাকে বলে বক্তৃতা দিয়ে বুঝানো লাগে না; নিজে নিজেই বুঝে। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র নৈকট্য যার হাসিল হয়েছে, হাকীকত যার হাসিল হয়েছে, তাকে লেকচার বক্তৃতা দিয়ে হাকীকত বুঝানো লাগে না। সে নিজে নিজেই টের পাবে, আমার আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাসিল হয়েছে। হাকীকত হাসিল হয়েছে। এরপর এক সময় আল্লাহ্‌র সাথে তার রূহানীভাবে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। অন্তরের চোখে আল্লাহ্‌কে দেখতে পায়। ঐ অবস্থার নাম হল মারিফত। আল্লাহ্‌র সাথে রূহানীভাবে সাক্ষাৎ হয় শরীয়ত বাদ দিয়ে, না শরীয়ত পালন করে? তরীকত বাদ দিয়ে, না তরীকত হাসিল করে? হাকীকত বাদ দিয়ে, না হাকীকত হাসিল করে?

আল্লাহ্‌কে পাওয়ার ক্লাশ কয়টি?

আপনাদের এখানে প্রাইমারী স্কুল আছে কি? আছে। ক্লাস কয়টা? প্রথম ক্লাশ ওয়ান যে পাশ করে না সে ক্লাস ফাইভ পাশ করবে কি কোন দিন? ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার ক্লাশও চারটা। প্রথম ক্লাশের নাম শরীয়ত, যেমনভাবে ক্লাশ ওয়ানে ভর্তি না হয়ে প্রাইমারী পাশের দাবী ভণ্ডামী তেমনিভাবে শরী'অতের বিধি-বিধান পালন না করে মারিফত হাসিল হওয়ার দাবী করাও ভণ্ডামী। কতটা জিনিস অন্তরে হাসিল হওয়ার নাম মারিফত? দুটা। যতটা ক্লাশ ততটা অংশ।

দুই জিনিস অন্তরে হাসিল হওয়ার নাম মারিফত। একটা হল আল্লাহ্‌র গজবের ভয়, যে পরিমাণ ভয় অন্তরে হাসিল হলে হারাম কাজের সাহস থাকে না। আরেকটা হল আল্লাহ্‌র রহমতের আশা, যে পরিমাণ রহমতের আশা অন্তরে থাকলে ইবাদত ছাড়তে পারে না। এই দুইটা জিনিস একটা অন্তরে হাসিল হওয়ার নাম আল্লাহ্‌র মারিফত। আল্লাহ্‌র মারিফত যাদের অন্তরে হাসিল হয়ে যায়, তাদের অন্তর-আত্মা পাক-পবিত্র হয়ে যায়। এদের দায়িত্ব হয়ে যায় যাদের আত্মা নাপাক তাদের আত্মাকে পাক পবিত্র করে দেওয়া।

এ পর্যায় আমাদের বুঝা দরকার অন্তর-আত্মা পাক হয় কিভাবে, আর নাপাক হয় কিভাবে। মুফাসসিরীনে কেরাম তাফসীরের কিতাবে লিখেছেন,

আল্লাহ্‌র বিধান মতে মানুষের জীবনে যত গোনাহ্‌র কাজ আছে, প্রত্যেকটা গোনাহের কাজে দু'টা করে ফলাফল আছে। একটা হল গোনাহের মজা; আরেকটা হল গোনাহের সাজা। গোনাহের কাজের মজা অনেক ছোট। আর সাজা অনেক বড়। যেমন ধরেন ফযরের নামাযের সময় মাত্র এক ঘণ্টা। এই একঘণ্টা সময়ের মধ্যে যদি কেউ ফযরের নামায না পড়ে আলসেমী করে গাফলতী করে অবহেলা করে ঘুমের মজার কারণে বিছানা ছাড়ল না, ফজরের নামাযে গেল না।

ফযরের নামায না পড়ে ঘুমের মজা উপভোগ করল মাত্র এক ঘণ্টা। এ কারণে কি লোকটা এক ঘণ্টার জন্য জাহান্নামে যাবে, না দুই কোটি আটাশি লক্ষ বছরের জন্য জাহান্নামে যাবে? বুঝে বলুন, ফজরের নামায না পড়ে ঘুমাল কতক্ষণ? এক ঘণ্টা। ফযরের নামায না পড়লে সাজা কতক্ষণ? দুই কোটি আটাশি লক্ষ বছর। মজার আর সাজার কি পরিমাণ ব্যবধান? সামান্য না আকাশ-পাতাল ব্যবধান? আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এমতাবস্থায় যে এত বড় সাজার ভয় করে না, সামান্য মজার লোভে গোনাহ্ করে, মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেন, তার বিবেক নষ্ট। তার বিবেক গান্দা-পঁচা। পঁচা জিনিস নাপাক।

এবার বলুন, যে সব ভণ্ডপীর নামায পড়ে না, তাদের আত্মা পাক, না নাপাক? নাপাক। যেসব ভণ্ডপীর শরীয়ত মানে না তাদের আত্মা পাক, না নাপাক? নাপাক। যে সব ভণ্ডপীর পর্দা মানে না তাদের আত্মা পাক, না নাপাক? নাপাক। তাহলে যারা ওদের কাছে মুরীদ হল তাদের আত্মা কিভাবে পাক হবে? এটা বুঝার জন্য একটা উদারহণ দিচ্ছি। এ ব্যক্তির লুঙ্গির মাঝে গোবর লেগেছে। এবার লুঙ্গি পাক রয়েছে কি? এই লুঙ্গি দিয়ে নামায হবে কি? না। ধুয়ে যদি গোবর ছাড়ায় তাহলে নামায হবে। ধোয়ার আগ পর্যন্ত এই লুঙ্গি দিয়ে নামায হবে না।

ঠিক তেমনিভাবে যে ব্যক্তির আত্মার মাঝে গোনাহের মজা আছে, গোনাহ্ ছাড়তে পারে না, এদের আত্মা নাপাক। এই আত্মা কোন দিন আল্লাহ্‌র মারিফত পাবে না। লুঙ্গির মাঝে গোবর লাগলে এই লুঙ্গি দিয়ে নামায হবে না। ঠিক তেমনিভাবে গোনাহের মজার লোভে গোনাহ্ করে, মজার লোভও ছাড়তে পারে না, গোনাহ্ও ছাড়তে পারে না। তার আত্মা

নাপাক। এই নাপাক আত্মা দিয়ে কোন দিন আল্লাহ্‌র মারিফত হাসিল করতে পারবে না।

যে লুঙ্গিতে গোবর লেগেছে সেই লুঙ্গি না ধুয়ে নামায হবে না। ধোয়ার পর নামায হবে। সে করেছে কি বলদ যখন পেশাব করে তখন বলদের পেশাবে লুঙ্গি ধরে রেখেছে। তখন বলদের পেশাব সব গুবর ছড়িয়ে দিয়েছে। এবার পাক হয়েছে কি? না। আরো বেশি নাপাক হয়েছে। আগে ছিল সামান্য জায়গায় এবার বেশি যায়গায়। আগে দেখা যেত এখন দেখা যায় না।

ঠিক তেমনিভাবে যে সমস্ত সাধারণ মুসলমান গোনাহের মজার লোভে গোনাহে লিপ্ত এদের আত্মা নাপাক। ভণ্ডপীরের কাছে মুরীদ হল, নাপাক আত্মাকে পাক করার জন্য। এই ভণ্ডপীরের আত্মা আরো বড় নাপাক। সে ছোট নাপাককে পাক করার জন্য বড় নাপাকের কাছে গিয়েছে। যেমন, গোবর ধোয়ার জন্য পেশাবের মাঝে ধরে রেখেছে। পেশাব দিয়ে গোবর ধৌত করলে যেমন নাপাকী আরো বাড়ে, ঠিক তেমনিভাবে জন সাধারণ ভণ্ডপীরের কাছে মুরীদ হলে আত্মার নাপাকী আরো বেশি বেড়ে যায়। মুরীদ হওয়ার আগে আল্লাহ্ থেকে যত দূরে ছিল মুরীদ হয়ে আল্লাহ্ থেকে আরো দূরে চলে যায়। তাহলে গোবর ধুয়ে পাক করতে হলে পাক-পবিত্র পানি দিয়ে ধোয়া লাগবে। তেমনিভাবে আমাদের অন্তরের মাঝে গোনাহের মজার লিপ্সা আছে। যে কারণে, গোনাহ্ ছাড়তে পারি না।

আমাদের এই নাপাক আত্মাকে কামিল পীরের পরশে পাক পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে। নাপাক আত্মাকে পাক করা যায় ভণ্ডপীরের পরশে, না কামেল পীরের পরশে? কামেল পীরের পরশে। ভণ্ডপীরের পরশে পাক হয় না কেন? কারণ সে নিজে নাপাক। যেখানে ছোঁয়া লাগবে সেখানে নাপাক হবে। কামেল পীরের পরশে পাক হয় কেন? কারণ তার নিজের আত্মা পাক। যেমন পাক পানি দিয়ে গোবর ধৌত করলে লুঙ্গি পাক হয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে যে সমস্ত মুরীদের আত্মা নাপাক কামেল পীরের রূহানী পরশে তাদের নাপাক আত্মা ধোয়ে পাক-পবিত্র হয়ে যায়।

এজন্য ভাল করে স্মরণ রাখতে হবে, পীর ধরে আল্লাহ্ পাওয়ার জন্য চারটা শর্ত আছে। এক নম্বর শর্ত, পীর যে তোমাকে আল্লাহ্ পাইয়ে

দেবেন, সে নিজে আল্লাহ্‌র পথে আছে কিনা তা দেখ। যদি দেখ সে পর্দা মানে না তাহলে সে নিজে শয়তানের পথে আছে। তোমাকে আল্লাহ্ পাইয়ে দিবে কিভাবে? যদি দেখ যে নিজে নামায পড়ে না, নিজেই গান-বাজনা করে, নিজেই পর্দা পালন করে না, সে নিজেই আছে শয়তাদের পথে। তোমারে সাথে নিলে আল্লাহ্ পাবে কোথায়। শয়তান পাইয়ে দেবে। এ কারণে পীর ধরে আল্লাহ্ পাওয়ার প্রথম শর্ত হল, যে পীরের কাছে মুরীদ হতে চাইবে, তুমি আগে যাচাই করে দেখ সে নিজে আল্লাহ্‌র পথে আছে কি না। যদি সে আল্লাহ্‌র পথে না থাকে তাহলে সে নিজেও যাবে জাহান্নামে, তোমাকেও নিয়ে যাবে জাহান্নামে।

আর যদি দেখা যায় পীর নিজে আল্লাহ্‌র পথে আছে, হালাল পথে আছে, হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ্‌র হুকুম নবীর তরীকা মতে জীবন যাপন করে, তাহলে পীর যখন আল্লাহ্‌র পথে আছেন তখন দুই নম্বর শর্ত, পালন করো। তোমার অন্তরটা যাচাই করো তাঁর প্রতি তোমার অন্তরে ভাবমূর্তি কেমন আছে। দুই নম্বর শর্ত, অন্তর যাচাই করা। কিভাবে? ভাবমূর্তির ক্ষেত্রে দেখো। পীর ধরে আল্লাহ্ পাবার শর্ত কয়টা? ৪টা।

প্রথম নম্বর- পীর যাচাই করা। পীর আল্লাহ্‌র পথে আছে কি না।

দুই নম্বর- মন যাচাই কর তোমার মনে ভাবমূর্তি আছে কি না। যদি দেখা যায় পীরও আল্লাহ্ পথে আর আমার মনেও ভাবমূর্তি আছে। তখন দুই শর্ত পাওয়া গেলে মুরীদ হয়ে যাও। মুরীদ হওয়ার পর বসে থাকলে চলবে না।

আরো দু'টি শর্ত পালন করতে হবে। প্রথম শর্ত হচ্ছে- কোন গুণাহের মজা তুমি ছাড়তে পারছ না সেটা পীরকে বলো। যদি শরমে না বল- কোন রোগী যখন তার রোগের কথা ডাক্তারকে বলে না এবং চিকিৎসা করায় না। ঠিক তেমনিভাবে যে মুরীদ পীর ধরে কোন গুণাহ ছাড়তে পারে না সেটা পীরের কাছে বলে না সে মুরীদ ভাল পীর পেয়েও আল্লাহ্‌কে পাবে না।

কাজেই **তিন নাম্বার** শর্ত হচ্ছে, তুমি কোন গোনাহ ছাড়তে পারছ না সেটা পীরকে বলো। বলার পর পীর তোমাকে একটা ব্যবস্থা দেবেন।

চার নাম্বার শর্ত হল, পীরের দেওয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করো। যেমনভাবে ডাক্তারের কাছে রোগের কথা বললে ডাক্তার ঔষধ দেবে। এ ডোজ

খাওয়ার পর দেখে তিতা লাগে। আর ঔষধ খায় না। ডাক্তার বড় ভালো ছিল। ঔষধও মূল্যবান। তিতা লাগার কারণে খায় না। রোগ সারবে কি? না। ডাক্তারের দোষে ? না। ঔষধের দোষে? না। রোগীর দোষে। ঠিক তেমনিভাবে পীর ভাল ছিল, অন্তরে ভাবমূর্তি ছিল। পীরের কাছে নিজের রূহানী রোগের কথা বলল এবং পীর ব্যবস্থাও দিয়েছেন। ব্যবস্থা পালন করতে কষ্ট হয়। যে কারণে ব্যবস্থা পালন করে না। এ লোক পীর ধরে তিন শর্ত পালন করেছে কিন্তু চার নম্বর শর্ত পালন না করার কারণে ভালো পীর পেয়ে ব্যবস্থা পেয়েও সে আল্লাহ্কে পাবে না। আল্লাহ্র মারিফত হাসিল করতে পারবে না।

আল্লাহ্কে পাওয়ার শর্ত চারটি

তাহলে পীর ধরে আল্লাহ্কে পাওয়ার শর্ত চারটি।

এক নম্বর- পীর যাচাই করো সে নিজে আল্লাহ্র পথে আছে কি?

দুই নম্বর মন যাচাই করো মনে ভাবভক্তি আছে কি?

তিন নম্বর- কোন গুনাহ ছাড়তে পার না সেটা পীরের কাছে বল।

চার নম্বর- পীরের দেওয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করো।

আমাদের দেশের বেশির ভাগ জনসাধারণ মুসলমান প্রথম নাম্বার শর্ত ভঙ্গ করে ভণ্ডপীরের কাছে মুরীদ হয়। প্রথম নম্বর শর্ত পীর যাচাই করো। পীর আল্লাহ্র হুকুম নবীর তরীকা মতো জীবন যাপন করে কি না, না লা-শরা বে-শরা গান বাজনা দাইয়ূসী ভণ্ডামী করে জীবন যাপন করে, সেটা যাচাই করো। এটা যাচাই করার আগেই অন্তর যাচাই করে ফেলে। ভণ্ডপীরের প্রতি ভাবভক্তি দেয় নিজের জীবন ধ্বংস করে ফেলে।

এ সমস্ত মুরীদ আর পীর উভয়ই ধ্বংসের পথে। তারা পরস্পর পিরিত করে। আর বলে আমার পীর আমাকে সুখ দিতে পারেন। পীর আমাকে শান্তি দিতে পারেন। পীর আমাকে ধন-সম্পদ দিতে পারেন। আল্লাহ্পাক বলেন, এই সমস্ত ভণ্ডপীর আর মুরীদের দল একসাথে জাহান্নামে যাবে। তারা জাহান্নামে ঢুকবার পথে আছে। বের হবার পথে নেই। ভণ্ডপীরের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য এ কয়েকটা কথা বললাম। এবার আমরা মূল আলোচনার দিকে ফিরে যাই। আল্লাহ্ পাক বলেন,

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ، سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى (الاعلى/٩-١٢)

"হে রাসূলে কারীম! মুনাফিক আপনার ওয়াজ শুনে নি গ্রহণ করে নি, এই কারণে ওয়াজ বন্ধ করবেন না। ওয়াজ একজন গ্রহণ করে নি অপরজন গ্রহণ করবে। আল্লাহ্ পাক বলেন, ওয়াজ গ্রহণ করবে কে, আর গ্রহণ করবে না কে- যারা আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় পায়, কোন কাজ করলে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন তা জানে না, জানলে আর এই কাজ করবে না –এই রকম মনোভাব নিয়ে যারা ওয়াজ শোনে আল্লাহ্ পাক বলেন, ওয়াজ তাদের হিদায়াত হয়ে যায়।

আমার কথা বুঝে থাকলে আপনারা এখানে যারা বসে আছেন কার ওয়াজে হিদায়াত হবে আর কার ওয়াজে হিদায়াত হবে না নিজে নিজেই ফয়সালা করতে পারবেন। মনকে জিজ্ঞেস করে যে সমস্ত কাজ করলে আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন কুরআনে উল্লেখ আছে সে সমস্ত কাজ করলে আল্লাহ্র দরবারে সাজা হবে, এ সমস্ত কাজ করবে কি না বলো। মন যদি বলে- আমি এই সমস্ত কাজ মজার লোভে ছাড়তে পারছি না, এ সমস্ত কাজ ছাড়তে পারব না, বরং করব, আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন, তুমি ভাল ওয়াজীর ওয়াজ শুনতে পার কিন্তু হিদায়াত তোমার নসীব হবে না।

যেমন- ধরেন নামায না পড়লে যে জাহান্নামে যাবে, এই ওয়াজ আজকে হয়েছে কি? হয়েছে। এখন যদি একজন মনে মনে বলে, নামায না পড়লে জাহান্নামে যাবে আল্লাহ্র রাসূল হাদীসে বলেছেন, এ কারণে আমি নামায পড়ে ফেলবো, এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সারা রাত ওয়াজ শুনতে পারবে কিন্তু কাজ হবে না। যারা পাপের মজার লোভ ছাড়তে পারে না। যে কারণে সাজার ভয় অন্তরে ঢুকতে পারে না বলে ওয়াজ গ্রহণ করতে পারে না।

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন ফরমান, এদেরকে জাহান্নামের বড় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে। তখন আগুনে জ্বলার শাস্তি ভোগ করবে, এমতাবস্থায় মরার মতো মরতেও পারবে না, বাঁচার মতো বাঁচতেও পারবে না। বছরের পর বছর আগুনে জ্বলতে থাকবে প্রাণ বের হবে না।

তাই মরার মতো মরতেও পারবে না আগুনের জ্বালা থেকে রক্ষাও পাবে না। আর বাঁচার মত বাঁচতেও পারবে না। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন, কুরআন হাদীসের নসীহত যারা শোনল কিন্তু পাপের মজা ছাড়তে পারে না বলে নসীহত গ্রহণ করতে পারে না, তাদেরকে জাহান্নামের বড় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে।

সফল জীবন

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. যখন দেখলেন, মুনাফিক বলে এক-দু'টা খেজুর যতই কম হোক এটা নগদ আর বেহেশতের ফলের মূল্য যতই বেশি হোক এটা বাকি। বাকির আশায় নগদ ছাড়তে রাজী নয়। তখন আবু বকর সিদ্দিক রাযি. এই মুনাফিককে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ভিটাসহ খেজুর গাছের দাম কত বলো। সে যত দাম চেয়েছে সেই দাম দিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. খেজুর গাছ ভিটাসহ কিনে যে মুনিনের সন্তানরা কুড়িয়ে খেয়ে ফেলত তাকে দান করে দিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন বলেন–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى (الاعلى/١٤، ١٥)

যে ব্যক্তি এই একজন মুমিনের বিরুদ্ধে যার বাড়ীতে খেজুর গাছ নেই, পাশের বাড়ীর গাছের ঝরা খেজুর তার সন্তানরা খেয়েছিল বলে রাসূলের কাছে বিচার প্রার্থী হল। রাসূল নিজে নসীহত করলেন, তোমার গাছের একটা-দু'টা ঝরা খেজুর তোমার ভাইয়ের সন্তানরা খেয়েছে, তুমি যদি মাফ করে দাও, তো আল্লাহ্ তোমাকে এর বিনিময়ে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। সে বলে বেহেশতের ফল বাকী। আমি বাকী মানি না নগদের বদলে। যেই কারণে হযরত আবু বরক সিদ্দিক রাযি. একজন মুমিন গরীব মানুষের প্রতি সদয় হয়ে নগদ টাকা দিয়ে ওর খেজুর গাছ ভিটাসহ খরিদ করে পাশের বাড়ীর মুমিনকে দান করে দিলেন। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন সেই প্রসঙ্গে বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

"যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ নিজের নগদ টাকা দিয়ে খরিদ করে নিজের গরীব মুসলমান ভাইকে দান করে দিল আল্লাহ্ বলেন, তার জীবন সফল হয়ে গেল।"

এরপরে সবগুলো কথাকে সামনে নিয়ে একটা মূলনীতিস্বরূপ আল্লাহ্ শেষের দিকে বলছেন–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ، اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ، صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى

"তোমরা যারা দুনিয়া পেয়ে পরকাল ভুলে যাও তোমরা ভাল করে স্মরণ রেখো দুনিয়ার ভোগ বিলাস আর পরকালের ভোগ বিলাসে দু'টা পার্থক্য আছে। এক নম্বর পার্থক্য দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বড়ই নিম্নমানের আর পরকালের ভোগ বিলাস অনেক উন্নত মানের। দুই নম্বর পার্থক্য দুনিয়ার নিম্নমানের ভোগ-বিলাস ক্ষণস্থায়ী আর পরকালের উন্নতমানের ভোগ-বিলাস চিরস্থায়ী। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিম্নমানের ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাস পেয়ে পরকালের উন্নত মানের চিরস্থায়ী ভোগ-বিলাসের কথা ভুলে যায়, তার মতো বোকা, তার মতো বেয়াকুফ তার মত মূর্খ জগতে আর কেউই হতে পারে না। দুনিয়ার নিম্নমানের ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের নেশায় পড়ে আমরা যেন পরকালের উন্নতমানের চিরন্তন সুখ-শান্তি ভোগ বিলাসের কথা ভুলে না যাই।

আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে আমাদের অন্তরে যেন পরকালের কথা জাগ্রত হয়ে উঠে। সেই শুভবুদ্ধি যেন জাগ্রত হয়। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন সেই তাওফিক যেন আমাদেরকে দেন। সবাই বলুন আমীন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

মাওয়ায়েজে হাসানাহ

খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,

তরজমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত

মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান—১

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক পরিচয়

স্থান ঃ নানুপুর বাজার—ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ . ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - الانعام : ١٥٢

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَفَرَّقَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِيْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلاَّ مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا مَا هِيَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি. সম্মানিত উপস্থিতি,
এলাকার পর্দানিশিন মা-বোনেরা!

আমরা মুসলমান হিসেবে প্রত্যেকেই বিশ্বাস করি আল্লাহ পাক আমাদেরকে একটা ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্যে এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এ দুনিয়া কারও চিরস্থায়ী ঠিকানা নয়। তিনি এখানে পাঠালেন কেন? আল্লাহ পাক আমাদেরকে এখানে একটা বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই দায়িত্বটা আমরা পালন করি কি-না, এই পরীক্ষাটা করার জন্যই পাঠিয়েছেন। কি দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন ? আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় কুরআনে বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

"মানব-দানবকে একমাত্র আমার এবাদত করার জন্যে সৃষ্টি করেছি।"

আর ইবাদত করার সময় হিসেবে আল্লাহ আমাদের দুনিয়ার জীবনকে নির্বাচন করেছেন। অন্য আয়াতে বলেন–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

"দুনিয়াতে তোমাদেরকে একটা সীমিত জীবন দিয়ে এবং জীনব শেষে মৃত্যুকে অবধারিত করে রেখেছি। এখানে পাঠিয়েছি তোমাদের আমল পরীক্ষা করার জন্যে।" (সূরা মুল্‌ক ঃ ২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন–

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

"হে মানুষ তোমাদের দলে দলে পাঠাচ্ছি তোমাদের আমল পরীক্ষা করার জন্যে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১২৯)

সারমর্ম, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর ইবাদত করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। সেই ইবাদত করি কি-না তা পরীক্ষা করার জন্যে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যারা আল্লাহর ইবাদত সঠিকভাবে করবে, দুনিয়ার জীবন শেষে আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ করেছে সাব্যস্ত হবে, পরকালে চিরস্থায়ী জীবনে তার ঠিকানা হবে জান্নাত। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করবে না, আল্লাহর পরীক্ষায় অকৃতকার্য সাব্যস্ত হবে, পরকালের জীবনে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আমার এই কয়েকটা কথার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন– আল্লাহ আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠালেন কেন? ইবাদতের দায়িত্ব দিয়ে তা করি কিনা তা পরীক্ষা করবেন। ইবাদত করলে তাঁর পরীক্ষায় পাশ করব আর চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাতে যাব। আর এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে যাব।

এছাড়া তিনি নবী-রাসূল পাঠালেন কেন? আদম আ. থেকে নিয়ে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত লাখো নবী-রাসূল আল্লাহ তা'আলাএই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূল পাঠাবার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ মানুষ পাঠালেন ইবাদতের জন্যে– কোনটা ইবাদত আর কোনটা ইবাদত নয়, ইবাদত করার কি নিয়ম-পদ্ধতি আছে তা বুঝানোর জন্যে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। সুতরাং নবী-রাসূল ছাড়া সমস্ত মানুষের দায়িত্ব হল, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা এবং নবী-রাসূলগণের শিক্ষা দেওয়া পদ্ধতি মতে করা, আর মানুষ হিসেবে সমস্ত নবী-রাসূলগণের

দায়িত্ব হল, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা, আর রাসূল বা নবী হিসেবে দায়িত্ব হল, দুনিয়াবাসীকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া। তাহলে সাধারণ মানুষের দায়িত্ব হল, শুধু ইবাদত করা আর নবী-রাসূলগণের দায়িত্ব ইবাদত করার সাথে সাথে মানুষকে ইবাদতের নিয়ম শিক্ষা দেওয়া।

যারা ইবাদত করবে না, তারা যেমন আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে, তেমনিভাবে যারা ইবাদত করবে কিন্তু নবী-রাসূলগণের নিয়ম-পদ্ধতি মতে করবে না, মনগড়াভাবে করবে, তারাও ব্যর্থ হবে। কথাগুলো পরিস্কারভাবে বুঝার জন্যে আপনাদেরকে দু'টো উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন আপনার একটা কাপড়ের দোকান আছে। সেই দোকানে বেচা-কেনার জন্য আপনি দু'জন কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন। আপনার বেতনভোগী নিয়োজিত কর্মচারীদের একজন মাল কেনা-বেচা করে না। তাকে কি আপনি বেতন দিতে রাজি হবেন ? কেন বেতন দেবেন না ? কারণ, আপনি যে কাজের জন্যে রেখেছেন, সে সেই কাজ করে না।

আরেকজন কর্মচারী বেচা-কেনা করে কিন্তু কেনার সময় বেশি দামে কেনে, আর বেচার সময় কম দামে বিক্রি করে। তাকে বেতন দিবেন? এই লোকটাকেও বেতন দেবেন না; কেন? সে তো কাজ করে! প্রথম লোকটিকে বেতন দিলেন না সে কাজ করে না বলে। কিন্তু দ্বিতীয় কর্মচারীকে বেতন দিবেন না কেন? সে কি কাজ করে না? আপনারা বলুন, দ্বিতীয় কর্মচারী কি কাজ করে না? তাহলে বেতন না দেওয়ার একমাত্র কারণ সে নিয়মছাড়া কাজ করে। প্রথম লোকটি কাজ না করার দরুন যেমন বেতন পাবে না, তেমনিভাবে দ্বিতীয় লোকটি কাজ করেও বেতন পাবে না নিয়মছাড়া করার কারণে।

ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়াতে আসার পরে যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে না, তারা আল্লাহর পুরস্কার জান্নাত পাবে না; জাহান্নামে যাবে। যারা ইবাদত করে কিন্তু নিয়ম মতে করে না, মনগড়াভাবে করে, তাদের ইবাদত কি আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? আপনার দোকানের কর্মচারী যে কাজ করে না, সে যেমন বেতন পাওয়ার যোগ্য নয় বরং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তেমনিভাবে আল্লাহর জগতে যারা আল্লাহর ইবাদত করে কিন্তু নবীর শিক্ষা দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী করে না, তারাও আল্লাহর কাছে পুরস্কার

পাবে না; আল্লাহর কাছে জাহান্নামের শাস্তি পাবে। তারা শাস্তি পাবে নবীর শিক্ষা দেওয়া নিয়ম ছাড়া ইবাদত করার কারণে। কাজেই এই দুনিয়াতে কোন কোন মানুষ আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ করবে– যারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং নবীর শিক্ষা দেওয়া নিয়ম মতে করবে। ইবাদত না করলেও আল্লাহর পরীক্ষায় ব্যর্থ-অকৃতকার্য। ইবাদত মনগড়া মতে করলেও আল্লাহর পরীক্ষায় অকৃতকার্য। যারা ইবাদত করবে মনগড়াভাবে নয়, নবীর তরীকামতো করবে, তারা আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সারা দুনিয়ার মানুষকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। একদল মানুষ দুনিয়াতে আসল আর ইচ্ছেমতো দুনিয়ার রঙ-তামাশা ও ভোগ-বিলাসে মত্ত রইল; আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করল না এবং একদিন সে মারা গেল, সে আল্লাহর পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে জাহান্নামী হল। আরেকদল মানুষ দুনিয়াতে আসলো, ইবাদত-বন্দেগী করল কিন্তু নবীর দেওয়া শিক্ষামতো করল না, মনগড়াভাবে করল, তারাও দুনিয়ার জীবনে পরীক্ষায় ব্যর্থ-নিষ্ফল হল, জাহান্নামী হল। আরেক দল দুনিয়াতে আসার পর আল্লাহর ইবাদত করল, মনগড়াভাবে নয়; নবীর তরীকামতো করল, একমাত্র তারাই আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ করল।

এখানে আমরা কি এসেছি চিরকাল থাকার জন্যে, না কিছুকালের জন্য কোনো মহা দায়িত্ব নিয়ে? দায়িত্বটা কি? আল্লাহর ইবাদত করা। কিভাবে করতে হবে? নবীর দেওয়া শিক্ষা-তরিকা মতে করতে হবে। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সারা দুনিয়ার মানুষের আদি পিতা হযরত আদম আ.-ও সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের আদি মাতা বিবি হাওয়াকে দুনিয়াতে পাঠানোর সময় বলে দিলেন–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ (البقرة/٣٨)

"আল্লাহ বলেন, তোমরা সবাই বেহেশত থেকে নেমে দুনিয়াতে চলে যাও। 'সবাই' কাকে বললেন? আরবী ব্যাকরণের একটি সূত্র জানা থাকলে এই প্রশ্নের জবাব বুঝতে সহজ হবে। সাধারণত বচন দু'প্রকার হয়। একবচন ও বহুবচন। ইংরেজীতে এটাকে Nambar বলা হয়। Singular Number ও Plural Number। কিন্তু আরবী ভাষায় বচন তিন প্রকার।

একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। অন্যান্য ভাষায় এককের বেলায় একবচন ব্যবহার করা হয় আর এককের বেশির বেলায় বহুবচন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আরবী ভাষায় এককের জন্য একবচন, দু'য়ের জন্য দ্বিবচন আর দু'য়ের অধিকের জন্য বহুবচন ব্যবহার করা হয়। সেই হিসেবে اُهْبِطْ শব্দটা একবচন, اُهْبِطَا শব্দটা দ্বিবচন, اُهْبِطُوْا শব্দটা বহুবচন। আল্লাহ বলেন, আমি বললাম– اُهْبِطُوْا তোমরা বেহেশত হতে নিচে নেমে যাও, দুনিয়াতে চলে যাও। তিনি এখানে কোন্ বচন ব্যবহার করলেন? বহুবচন। কয়জনকে বের করলেন? দু'জনকে। কিন্তু শব্দ ব্যবহার করলেন বহুবচনের। দু'য়ের জন্য বহুবচন হয়, না দু'য়ের বেশির জন্য বহুবচন ব্যবহার হয়? এখানে দু'জনকে বহুবচন বললেন কেন? এই প্রশ্নের ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কিরাম একাধিক জবাব দিয়েছেন। একটি জবাব হল;

এখানে আল্লাহ বাহ্যত আদম ও হাওয়া দু'জনকে সম্বোধন করলেন কিন্তু পরোক্ষভাবে সম্বোধন করলেন সমস্ত আদম সন্তানকে। প্রত্যক্ষ্য সম্বোধন দু'জনকে করলেও পরোক্ষভাবে সম্বোধন করেছেন পৃথিবীর সমস্ত আদম সন্তানকে। এ কারণে দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহার না করে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। বলেছেন, হে আদম ও হাওয়া তোমরা সরাসরি এবং হে আদম সন্তান তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার মাধ্যমে দুনিয়াতে চলে যাও।

এখান থেকে দুনিয়াতে যাওয়ার পর আমি আবার তোমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করব– দুনিয়া থেকে ফিরে আবার জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছার। সেই পথ যারা অনুসরণ করবে, তারা আবারও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষ করে চিরকালের জন্য জান্নাতে ফিরে আসতে পারবে, আর যারা আমার পথনির্দেশনা লঙ্ঘন করবে, তারা বেহেশত থেকে বের হয়ে দুনিয়াতে যাওয়ার পর আর জান্নাতে ফিরে আসতে পারবে না। চিরকালের জন্যে জাহান্নামে চলে যাবে।

অতএব আমরা পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে কোত্থেকে এসেছি? জান্নাত থেকে। আবার দুনিয়ার জীবন শেষে কোথায় ফিরে যাব? জান্নাতে। দু'টো পদ্ধতিতে আল্লাহ দুনিয়াবাসীকে জান্নাতে আবার ফিরে যাওয়ার পথনির্দেশ দিয়েছেন। একটা হল, আসমানী কিতাব নাজিলের মাধ্যমে। আরেকটা

হল, নবী-রাসূলগণ প্রেরণের মাধ্যমে। আসমানী কিতাবে সেই পথের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকত আর নবী-রাসূলগণ হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। এই দু'পদ্ধতিতে আল্লাহ পাক সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে কোন পথে জীবন-যাপন করলে জান্নাতে ফিরে যেতে পারবে, সেই পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। দুনিয়ার মানুষ যে পথে জীবন-যাপন করলে আবারও জান্নাতে ফিরে যেতে পারবে সেই পথটাকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়– ছিরাতে মুস্তাকীম। যে পথে চলে আবারো জান্নাতে ফিরে যেতে পারবে, সেই পথের নাম ছিরাতে মুস্তাকিম। ছিরাতে মুস্তাকীম কথার বাংলা সরল অর্থ কি? এর অর্থ, সোজা পথ। ছিরাতে মুস্তা

আপনারা যদি আমার এতক্ষণের কথা বুঝে থাকেন তাহলে বলুন, সিরাতে মুস্তাকীম যে সোজা পথ– এই পথ কার জন্য? কোথেকে কোথায় যাওয়ার পথ? বলুন, কে যাওয়ার পথ? দুনিয়ার মানুষ যাওয়ার পথ। কোথেকে যাওয়ার পথ? দুনিয়া থেকে যাওয়ার পথ। কোথায় যাওয়ার পথ? জান্নাতে যাওয়ার পথ। কুরআনের ভাষায় সেই সিরাতে মুস্তাকীম এর বাংলা অর্থ সোজা পথ। এই সোজা পথে কে, কোথেকে এবং কোথায় যাওয়ার পথ? আশা করি এই তিন প্রশ্নের জবাব বুঝে এসেছে। এই গেল কুরআনের ভাষায় সিরাতে মুস্তাকীম বলার সরল অর্থ। কিন্তু মুফাসসিরীনে কিরাম এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন সাতভাবে।

সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যাখ্যা মুফাসসিরিনে কিরাম কতভাবে করেছেন? সাতভাবে। সিরাতে মুস্তাকীম কথার প্রথম ব্যাখ্যা কুরআনের বর্ণিত পথ। সিরাতে মুস্তাকীম বা সোজা পথের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ইসলাম ধর্মের পথ। সিরাতে মুস্তাকীম বা সোজা পথের তৃতীয় ব্যাখ্যা নবীগণের পথ। চতুর্থ ব্যাখ্যা ছিদ্দিকগণের পথ। পঞ্চম ব্যাখ্যা শহীদগণের পথ। ষষ্ঠ ব্যাখ্যা সালেহগণের পথ। সপ্তম ব্যাখ্যা আহলে সুন্নাহের পথ। বুঝে থাকলে একটু বলুন তো, সিরাতে মুস্তাকীমের অর্থ কি? সোজা পথ। ব্যাখ্যা কয়টা? সাতটা।

এবার বুঝার ব্যাপার হল, এই মাইকের যে স্ট্যানটা আছে, মঞ্চ থেকে প্যাণ্ডেলের সর্বশেষ খুঁটি পর্যন্ত সুই এর মত সোজা করে রেখা টানলে কয়টা রেখা হতে পারে? একটা। তাহলে পথিকের অবস্থান থেকে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত

সোজা পথ কয়টা হতে পারে? একটা। তাহলে ব্যাখ্যা সাতটা কেন হল, পথ যদি একটা হয় তাহলে ব্যাখ্যা ৭টা কেন হল? যেন এমন কোনো ভুল বুঝাবোঝি না হয় যে, দুনিয়াবাসী জান্নাতে পৌছার ৭টা পথ। ৭টা পথ কোনো দিন সোজা হতে পারে না। একস্থান থেকে অন্যস্থান পর্যন্ত একেবারে সুই এর মত সোজা একটা পথ হতে পারে। একটা সোজা পথের পর ভিন্ন কোন পথ করতে গেলে সোজা থাকবে না, বাঁকা হয়ে যাবে। কথা বুঝতে পারছেন আপনারা! দুনিয়াবাসী মানুষের জান্নাতে পৌছার সোজা পথ কয়টা? একটা। ব্যাখ্যা সাতটা হল কেন? পথের ভিন্নতার কারণে ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন নয়; ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে বুঝানোর সুবিধার্থে ব্যাখ্যা সাতটা হয়েছে।

পথের ভিন্নতার কারণে ব্যাখ্যা ৭টা হয়েছে, নাকি বুঝানোর পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে ব্যাখ্যা সাতটি হয়েছে? একই পথ বিভিন্ন পদ্ধতিতে বুঝানো হয়েছে। যেমন ধরুন– সিরাতে মুস্তাকীমের প্রথম ব্যাখ্যা ছিল কুরআনের বর্ণিত পথ। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ছিল, ইসলাম ধর্মের পথ। আপনারা কি মনে করেন কুরআনের বর্ণিত পথ একটা, আর ইসলাম ধর্মের পথ অন্যটা? না। কুরআনে বর্ণিত পথই ইসলামের পথ। কুরআনের পথ বললে যারা সহজে বুঝে, তাদের জন্যে কুরআনের পথ বলাই যথেষ্ট। যারা ইসলামের পথ বললে সহজে বুঝে তাদের জন্য ইসলামের পথ বলাই যথেষ্ট। যারা নবীগণের পথ বললে সহজে বুঝে তাদের জন্য নবীগণের পথ বলাই যথেষ্ট। যারা আহলে সুন্নাহর পথ বললে সহজে বুঝে তাদের জন্য আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পথ বলাই যথেষ্ট।

এই সাত ব্যাখ্যার মাঝে আমার আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সাত নম্বর। সিরাতে মুস্তাকীমের সর্বমোট ৭টা ব্যাখ্যা। ৭ নম্বর ব্যাখ্যাটা কি? আহলে সুন্নাহ ওয়ালজামাতের পথ। সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যাখ্যায় কুরআনের পথ আমার আজকের আলোচ্য বিষয় নয়। সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যাখ্যায় ইসলামের পথ আমার আজকের আলোচ্য বিষয় নয়। সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যাখ্যায় আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত আমার অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

আপনারা আমার আলোচ্য বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন? আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার সোজা পথ সিরাতে মুস্তাকীমের সাত নাম্বার

ব্যাখ্যা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পথ। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত কাকে বলে? সিরাতে মুস্তাকীম জান্নাতে যাওয়ার সোজা পথ কিভাবে হল? এই মর্মে আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কুরআন থেকে যেই আয়াত তিলাওয়াত করেছি, সেই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুফাসসিরীনে কিরাম লেখেন হযরত রাসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরাতে মুস্তাকীমের ব্যাখ্যা দু'ভাবে করেছেন। একটা হল, মৌখিক বিবরণের মাধ্যমে। আরেকটা হল, নকশা অঙ্কনের মাধ্যমে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটা কি? নকশা অঙ্কন। আমি প্রথমে আপনাদের সামনে তিলাওয়াতকৃত আয়াতের মৌখিক বিবরণ পেশ করেছি। ইনশাআল্লাহ নকশা অঙ্কনের মাধ্যমে কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যা করেছেন, তা আমি আপনাদের সামনে পেশ করব।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতের এ ব্যাখ্যাটি পেশ করলেই আপনারা অতি সহজভাবে পরিষ্কার ভাষায় বুঝতে পারবেন, সিরাতে মুস্তাকীম বেহেশতে যাওয়ার সোজা পথ কিভাবে হল। হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান–

تَفَرَّقَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً

এই হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। তাই হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় শব্দের মাঝে সামান্য বেশকম আছে। এক হাদীসে এক শব্দে বর্ণনা হয়েছে; আরেক সূত্রে অন্য শব্দে বর্ণনা এসেছে। কিন্তু বর্ণিত সব শব্দের মর্মার্থ এক। যেমন এক বর্ণনায় আছে– تَتَفَرَّقُ أُمَّتِىْ আরেক বর্ণনায় আছে– تَفْتَرِقُ أُمَّتِىْ ; تَتَفَرَّقُ আর تَفْتَرِقُ শব্দের উচ্চারণে বেশকম থাকলেও অর্থে কোন বেশকম নেই। এক বর্ণনায় আছে ثِنْتَانِ وَ سَبْعِيْنَ فِى النَّارِ আরেক বর্ণনায় আছে كُلُّهُمْ فِى النَّارِ এখানেও অর্থে কোন বেশকম নেই। এক বর্ণনায় আছে مَا هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ আরেক বর্ণনায় আছে مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ এই مَا এবং مَنْ এর মাঝে মর্মগত কোন বেশকম নেই। কথাটা এ জন্যে বললাম যে, আপনাদের কেউ যদি হাদীসের এক বর্ণনা পেয়ে থাকেন এক শব্দের দ্বারা, আর অন্য শব্দের বর্ণনা যদি না দেখে থাকেন, তাহলে আপনার সন্দেহ জাগতে পারে, হাদীসটি এই শব্দে দেখেছি আর আপনি ভিন্ন শব্দে বললেন কেন? এই হাদীসটি একই বর্ণনায় বর্ণিত নাকি

বিভিন্ন বর্ণনায় বর্ণিত? বিভিন্ন বর্ণনায় বর্ণিত। এ জন্য বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত।

শব্দের ভিন্নতা থাকলেও অর্থগত-মর্মগত কোন পার্থক্য নেই। আমি আপনাদের সামনে এক বর্ণনা পেশ করেছি, তাতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

تَفَرَّقَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً

"বনী ইসরাঈল ধর্ম নিয়ে দলাদলি করে ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল।"

وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً

"আর আমার উম্মতেরা ৭৩ দলে বিভক্ত হবে।"

كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً

"সবাই হবে জাহান্নামী, শুধু একটি দল হবে জান্নাতী।"

قَالُوْا مَا هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالُوْا مَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؛

"সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, একটিমাত্র দল যারা জান্নাতী তারা কারা? একটিমাত্র জান্নাতী দলটার পরিচয় কী?"

জবাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান, مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ "আমার সুন্নাহ ও আমার সাহাবাগণের জামাত।" এই দু'টো আদর্শকে মাপকাঠি মেনে সেই অনুপাতে যারা ইসলাম পালন করবে তারাই হল, জান্নাতী দল। এই দলটার নাম হল, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।

এবার আমরা হাদীসের সামান্য ব্যাখ্যা শোনার চেষ্টা করি। হাদীসের প্রথমাংশে আল্লাহর রাসূল বলেন–

تَفَرَّقَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً

বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। এই বনী ইসরাঈল কারা? আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত একজন নবী ছিলেন ইবরাহীম আ.।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে তিনি দুনিয়াতে শুভাগমন করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম

আ. এর নাম আপনারা শুনেছেন কখনও? তিনি আমাদের নবীর পূর্বপুরুষগণের একজন। কত বছরের আগের পূর্বপুরুষ? প্রায় তিন হাজার বছর আগের পূর্বপুরুষ। আমাদের নবীর বংশ-তালিকা আলোচনা করতে করতে হযরত আদম আ. পর্যন্ত গেলে, ইবরাহীম পয়গম্বরকে ছুঁয়ে যেতে হয়। ইবরাহীম পয়গাম্বর ছাড়া আমাদের নবীর বংশ-তালিকা হযরত আদম আ. পর্যন্ত পৌছবে না। ইবরাহীম পয়গাম্বর হয়েই আদম আ. পর্যন্ত যেতে হবে। সেই ইবরাহীম আ.-এর প্রথম ছেলের নাম হযরত ইসমাঈল আ.।

সামনের কথাগুলো সহজে বুঝার জন্য নবীগণের সামান্য পরিচয় জানা দরকার। ইবরাহীম আ.-এর প্রথম ছেলের নাম ইসমাঈল আ. দ্বিতীয় ছেলের নাম ইসহাক আ.। ইবরাহীম পয়গাম্বরের প্রথম ছেলেও নবী ছিলেন দ্বিতীয় ছেলেও নবী ছিলেন। হযরত ইবরাহীম আ. নিজেও নবী। তাঁর প্রথম ছেলে ইসমাঈলও নবী, তাঁর দ্বিতীয় ছেলে ইসহাকও নবী। কিন্তু প্রথম ছেলে ইসমাঈল নিজে নবী ছিলেন আর তাঁর আওলাদের মাঝে তিন হাজার বছরের মধ্যে আর কেউ নবী হননি। আর ইসহাক আ. দ্বিতীয় ছেলে তিনি নিজে তো নবী ছিলেনই এবং তার ছেলে ইয়াকুব আ.ও নবী। ইয়াকুব আ.-এর ছেলে হযরত ইউসুফ আ.ও নবী।

এইভাবে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত কয়েক হাজার বছরের ভেতরে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন হযরত ইবরাহীম আ.-এর দ্বিতীয় ছেলে ইসহাক আ.-এর আওলাদের মাঝে পাঠিয়েছেন। প্রথম ছেলে ইসমাঈল আ. এর আওলাদের মাঝে পাঠাননি। সামনের কথাগুলো বুঝার জন্যে এখনকার কথাগুলো স্মরণ রাখা দরকার। ইবরাহীম পয়গাম্বরের প্রথম ছেলে হযরত ইসমাঈল আ. নিজে নবী ছিলেন। কিন্তু তিন হাজার বছরের মাঝে তাঁর আওলাদের মধ্যে কেউ নবী হননি। ইবরাহীম পয়গাম্বরের দ্বিতীয় ছেলে হযরত ইসহাক আ. নিজে নবী ছিলেন এবং পরবর্তী কয়েক হাজার বছরের মাঝে তাঁর বংশধরের মধ্যে হাজার হাজার নবী হয়েছেন।

ইসহাক আ.-এর এক ছেলের নাম হযরত ইয়াকুব আ.। তাদের মাতৃভাষা ছিল হিব্রু ভাষা। কোন ভাষা? হিব্রু ভাষা। হিব্রু ভাষায়, মাতৃভাষায় ইয়াকুব আ.-এর আরেক নাম ছিল ইসরাঈল। ইসরাঈল আরবী শব্দ নয়, হিব্রু শব্দ। এর অর্থ হল, আল্লাহর বান্দা। ইসরাইল কোন ভাষার

শব্দ, হিব্রু ভাষার শব্দ। অর্থ কী? আল্লাহর বান্দা। এই জন্য কুরআনের ভাষায় ইয়াকুব আ.-এর পরবর্তী বংশধরকে বলা হয় বনী ইসরাঈল।

বনী ইসরাঈল অর্থ হল, ইয়াকুবের আওলাদ, ইয়াকুবের বংশধর। এই বনী ইসরাঈলেরা পরবর্তীকালে ধর্মীয়ভাবে দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল হযরত মূসা আ.-এর উম্মত হওয়ার দাবীদার, আরেক দল হযরত ঈসা আ.-এর উম্মত হওয়ার দাবীদার। বর্তমান যুগে যে সমস্ত লোক হযরত মূসা আ.-এর উম্মত হওয়ার দাবীদার তারা ইয়াহুদী নামে পরিচিত। আর বর্তমান দুনিয়ার যে সমস্ত লোকেরা হযরত ঈসা আ.-এর উম্মত হওয়ার দাবীদার তারা খ্রিষ্টান নামে পরিচিত।

বনী ইসরাঈলেরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কতভাগে বিভক্ত। দু'ভাগে বিভক্ত। একদল ইয়াহুদী, আরেকদল খ্রিষ্টান। ইয়াহুদীরা হযরত মূসা আ.-এর উম্মত হওয়ার দাবীদার আর খ্রিষ্টানেরা হযরত ঈসা আ.-এর উম্মত হওয়ার দাবীদার। আনুসঙ্গিকভাবে আমাদের আরও স্মরণ রাখা দরকার– বর্তমান দুনিয়ার ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানেরা যে মূসা এবং ঈসা নবীর উম্মত হওয়ার দাবী করে তাদের সেই দাবীটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেন মিথ্যা? আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন হযরত মূসা আ.-এর কাছে তাওরাত কিতাব নাজিল করেছিলেন আর ঈসা আ.-এর কাছে ইঞ্জিল নাজিল করেছিলেন।

ঈসা আ. দুনিয়া থেকে বিদায় হবার ৪শ বছর পর চার পণ্ডিত এই দুই কিতাবের বিকৃত এডিশনকে একত্রিত করে এক নতুন এডিশন তৈরী করে। তাদের তৈরী করা নতুন এডিশনের নাম বাইবেল। তাহলে বাইবেল এক কিতাবের নাম, না দুই কিতাবের এডিশনের নাম? কোন দুই কিতাবের? মূসা আ.-এর উপর নাজিলকৃত তাওরাত আর ঈসা আ.-এর উপর নাজিলকৃত ইঞ্জিল। এই দুই কিতাবের সমন্বিত এডিশনের নাম বাইবেল। এরপরে আমাদের বুঝার দরকার, স্মরণ রাখা দরকার, ঈসা আ. দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার চারশ বছর পর যে চার পণ্ডিতের সমন্বিত এডিশন বাইবেল নামে তৈরী করল, সেটা কি অবিকৃত তাওরাত-ইঞ্জিল, না বিকৃত তাওরাত-ইঞ্জিল? বিকৃত তাওরাত-ইঞ্জিল। অবিকৃত তাওরাত নয়, অবিকৃত ইঞ্জিল নয়; বরং ইয়াহুদীরা তাদের মনগড়াভাবে তাওরাতে বিকৃতি সাধন করেছে, খ্রিষ্টানরা তাদের মনগড়াভাবে ইঞ্জিলে বিকৃত সাধন করেছে। সেই বিকৃত তাওরাত ও বিকৃত ইঞ্জিলের সমন্বিত এডিশনের নাম হল বাইবেল।

অবিকৃত তাওরাত যা আল্লাহ মূসা আ.-এর উপর নাজিল করেছিলেন, অবিকৃত ইঞ্জিল যা আল্লাহ ঈসা আ.-এর উপর নাজিল করেছিলেন, সেই তাওরাত ও ইঞ্জিল উভয় কিতাবে উল্লেখ ছিল, শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল ধর্মের মেয়াদ রহিত হয়ে যাবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের মাধ্যমে মূসা আ.-এর ধর্মের মেয়াদ শেষ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শুভাগমনের মাধ্যমে ঈসা আ.-এর প্রচারিত ধর্মের মেয়াদ শেষ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শুভাগমনের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হবে ইসলাম।

কাজেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরও যারা বলে আমরা মূসা আ.-এর উপর নাজিলকৃত তাওরাত কিতাবের অনুসারী, তারা কি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? যারা বলে আমরা ঈসা আ.-এর উপর নাজিলকৃত ইঞ্জিল কিতাবের অনুসারী, তারা সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এ জন্য বলেছি, বর্তমান দুনিয়ার যারা ইয়াহুদী তারা মূসা আ.-এর উম্মত হওয়ার মিথ্যা দাবীদার। আর খ্রিষ্টানেরা ঈসা আ.-এর উম্মত হওয়ার মিথ্যা দাবীদার।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এবং বলেছেন– তিনি শেষ নবী, তিনি হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তার শুভাগমনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী প্রচারিত সকল ধর্ম রহিত করা হল। পিতার পক্ষে যেমন পুত্রকে চিনতে কোন অসুবিধা হয় না, ঠিক তেমনিভাবে ইয়াহুদীরা তাদের তাওরাত কিতাবের বিবরণ মতে, খ্রিষ্টানরা তাদের ইঞ্জিল কিতাবের বিবরণ মতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সুস্পষ্টভাবে চিনতে পারত যে তিনি ই হচ্ছেন আখেরী নবী। এরা দীর্ঘদিন যাবৎ আল্লাহর কাছে দু'আ করেছে, হে আল্লাহ! তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবের বর্ণিত আখেরী নবীকে পাঠিয়ে দাও, যেন আমরা তার সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারি।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পাঠালেন তো ঠিক কিন্তু বনী ইসরাঈলের গোষ্ঠীতে পাঠালেন না। তিন হাজার বছরের মাঝে যে বনী

ইসমাঈলের কেউ নবী হয়নি সেই ইসমাঈলের বংশধর কুরাইশ বংশে পাঠালেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের গোষ্ঠীতে না হয়ে যখন বনী ইসমাঈল বংশে জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তারা গোষ্ঠীগত জেদের বশবর্তী হয়ে মানবে না বলে বয়কট করল। না-চিনার কারণে নাকি গোষ্ঠীগত জেদের কারণে? গোষ্ঠীগত জেদের কারণে। না-চিনার কারণে নয় বরং আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآئَهُمْ

পিতার হাতে পুত্র লালিত-পালিত হলে যেমন পুত্রকে চিনতে পিতার কোন অসুবিধা হয় না, তেমনিভাবে ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টানেরা তাওরাত এবং ইঞ্জিল মতে দেখা মাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে চিনতে কোন অসুবিধা হত না। কিন্তু কেন বনী ইসরাঈলের গোষ্ঠীতে জন্ম না হয়ে বনী ইসমাঈলের বংশে জন্ম গ্রহণ করলেন, কেন কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করলেন সেই গোষ্ঠীগত জেদের কারণে তারা সিদ্ধান্ত নিল এই নবীকে তারা নবী মানবে না। কিন্তু মুসলমানগণ এই নবীকে নবী মেনে নিল।

এখান থেকেই ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানেরা মুসলমানের দুশমনে পরিণত হল। আমরা যাকে বয়কট করলাম, নবী মানব না; তোমাদের কেউ যদি নবী না মানতে, তাহলে আমাদের বয়কট সফল হত। হে দুনিয়ার মুসলমানেরা! যে মুহাম্মাদকে আমরা বয়কট করেছি, নবী মানব না; তোমরা সেই বয়কট না-মানার কারণে আমাদের বয়কট সফল হল না। এই কারণে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান মুসলমানদের চির দুশমন। একটা আনুসঙ্গিক কথা বললাম; ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান মুসলমানের দুশমন কেন? আল্লাহ কুরআনের বহু আয়াতে বলে দিয়েছেন, ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান তোমাদের বন্ধু নয় বরং তোমাদের চির শত্রু। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ (المائدة/ ٥١)

"হে ঈমানদারগণ! ইয়াহুদীকে বন্ধু মনে করো না, খ্রিষ্টানকে বন্ধু মনে করো না। এরা তোমাদের বন্ধু নয়। এরা তোমাদের চির শত্রু। তারা তাদের বন্ধু তোমাদের বন্ধু নয়।"

আল্লাহ কুরআনে কি বলেছেন– ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান মুসলমানের বন্ধু, না শত্রু? শত্রু। এই শত্রুতা কিসের কারণে? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নবী মানার কারণে। তারা নবী মানবে না গোষ্ঠীগত জেদের কারণে, আর আমাদের গোষ্ঠীগত জেদ নেই। আমরা সত্য মনে করে নবী মেনেছি; এই কারণে ওরা আমাদের চির শত্রু। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কুরআনে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানকে মুসলমানের বন্ধু বলেছেন নাকি শত্রু? শত্রু বলেছেন। এবার আনুসঙ্গিকভাবে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে দু'একটা কথা বলতে চাই।

বলুন বর্তমান বিশ্বে সারা পৃথিবীর মুসলমানেরা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের দ্বারা নির্যাতিত কি না? চরম নির্যাতিত। এর মাঝে মোড়লগিরি করছে আমরিকার প্রেসিডেন্ট ডাব্লিউ বুশ। এই ডাব্লিউ বুশ সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে যখন আফগানিস্তানের মুসলমানদের উপর সন্ত্রাসী হামলা করল, দুনিয়ার মুসলমানেরা আফগানিস্তানের মজলুম মুসলমানের বন্ধু হওয়ার পরিচয় দিয়েছিল, না ইয়াহুদী-খ্রিস্টান বাহিনীর নেতা বুশের বন্ধু হওয়ার পরিচয় দিয়েছিল? বুশের বন্ধু হওয়ার পরিচয় দিয়েছিল।

এইমাত্র কিছুদিন আগে এই আমেরিকার বুশ সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে যখন ইরাকের মজলুম মুসলমানের উপর হামলা চালাল, আশপাশের সকল মুসলিম দেশের সরকারেরা মজলুম মুসলমানের বন্ধু হওয়ার পরিচয় দিল– না ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের নেতা বুশের বন্ধু হওয়ার পরিচয় দিল? বুশের বন্ধুত্বের পরিচয় দিল। তাহলে বর্তমান দুনিয়ার নেতৃস্থানীয় মুসলমানেরা বিশেষ করে মুসলিম দেশের সরকারেরা মুসলমানদেরকে বন্ধু মনে করে, না ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানকে বন্ধু মনে করে? ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানকে বন্ধু মনে করে। এই জন্য ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের হাতে বর্তমান মুসলমানেরা পরাজিত। এই হল পরাজয়ের কারণ।

সমস্ত মুসলমান আল্লাহর কুরআনের নির্দেশমতো যদি ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানকে শত্রু মনে করে, মুমিন-মুসলমানকে বন্ধু মনে করে এক কাতারে দাঁড়াতে পারত, তাহলে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান মুসলমানকে কোন দিন পরাজিত করতে পারত না। আনুসঙ্গিক একটা জরুরী কথা বললাম, এবার মূল আলোচনায় যাই।

ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের ধর্মীয় পরিচয়ে একদল ইয়াহুদী আর আরেক দল খ্রিষ্টান। আর উভয় দলের গোষ্ঠীগত পরিচয় বনী ইসরাঈল।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

تَفَرَّقَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً

"বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল।"

এবার চিনেছেন বনী ইসরাঈল কারা? ইয়াহুদী আর খ্রিস্টান ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার মুসলমান উম্মতেরা ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। মুসলমান হবে কত দল? ৭৩ দল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত আবার দু'প্রকার।

এক প্রকার উম্মতকে বলা হয় উম্মতে দাওয়াত। আরেক প্রকারের উম্মতকে বলা হয় উম্মতে ইজাবত। যেহেতু সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ পাঠিয়েছেন, তাই সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতে দাওয়াত। বর্তমান দুনিয়ার ছয়শ কোটি মানুষ মুহাম্মদ সসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত। কথা বুঝতে পারছেন? বাংলাদেশের জনগণ এবং সরকার যেমনভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত, পাকিস্তানের সরকার এবং জনগণ যেমনভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত, সৌদি আরবের সরকার এবং জনগণ যেমনভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত, ঠিক তেমনিভাবে আমেরিকার সরকার ও জনগণও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত।

কোন প্রকারের উম্মত? উম্মতে দাওয়াত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াত শুধু মুসলমানের জন্য, না সারা বিশ্ববাসীর জন্য? সারা বিশ্ববাসীর জন্য। যাদের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াত, তারা সবাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতে দাওয়াত। আর এই দাওয়াতের ইজাবত যারা গ্রহণ করেছে, এই দাওয়াত যারা কবুল করেছে, তারা হল

মুসলমান। এদেরকে বলা হয়, উম্মতে ইজাবত। মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতে দাওয়াত আর মুসলমানগণ উম্মতে ইজাবত। হাদীস শরীফে যে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, আমার মুসলমান উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, এখানে উম্মত বলতে মুসলমান উম্মত বুঝানো হয়েছে। হাদীসের মর্ম হচ্ছে মুসলমানেরা ৭৩ দলে বিভক্ত হবে।

এবার প্রশ্ন জাগে সারা দুনিয়ার মুসলমানের আল্লাহ কতজন? সারা দুনিয়ার মুসলমানের নবী কতজন? সারা দুনিয়ার মুসলমানের কেবলা কয়টা? সারা দুনিয়ার মুসলমানের কালেমা কয়টা? সারা দুনিয়ার মুসলমানের কুরআন কয়টা? তাহলে একই আল্লাহয় বিশ্বাসী সমস্ত মুসলমান, একই রাসূলে বিশ্বাসী সমস্ত মুসলমান, একই কালেমাতে বিশ্বাসী সমস্ত মুসলমান, একই কেবলায় বিশ্বাসী সমস্ত মুসলমান, একই কুরআনে বিশ্বাসী সমস্ত মুসলমান, তো দল ৭৩টি হবে কেন? সমস্ত মুসলমান কত আল্লাহ এ বিশ্বাসী? তাহলে দল ৭৩টি হবে কেন? একই রাসূলে বিশ্বাসী হয়ে দল ৭৩ টি হবে কেন? একই কালেমায় বিশ্বাসী হয়ে দল ৭৩টি হবে কেন? একই কেবলায় বিশ্বাসী হয়ে দল ৭৩টি হবে কেন?

একই কুরআনে বিশ্বাসী হলে দল ৭৩টি হবে কেন? অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হাদীসে বলেছেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে– সেই হাদীসে তার কারণও বলে দিয়েছেন, একই আল্লা-তে বিশ্বাসীরা এত দলে বিভক্ত হবে কেন? কারণটা সহজে বুঝার জন্য আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমার জানা মতে বাংলাদেশে একদল মুসলমান আছে, যারা নামাযী আর একদল মুসলমান আছে বে-নামাযী। এখানে কত দল হল? দু'দল। নামাযী মুসলমান আর বে-নামাযী মুসলমানদের একই কুরআন, না ভিন্ন কুরআন? একই কুরআন। তাহলে দল দু'টা হল কেন? এই প্রশ্নের যেই জবাব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হাদীসে বলেছেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে– সেখানেও একই জবাব।

আমার জানা মতে একদল মুসলমান রোযাদার, আরেক দল মুসলমান বে-রোযাদার। রমযান মাসে কি কোনো বে-রোযাদার মুসলমান পাওয়া

যায়? তাহলে বে-রোযাদার মুসলমানের কি কেবলা ভিন্ন, না একই কেবলা? তাহলে দল এতটি কেন? নিশ্চয়ই তার পেছনে কারণ আছে। আমাদের বাংলাদেশের একদল মুসলমান হালাল ব্যবসা করে আরেকদল মুসলমান সুদের কারবার করে। এখানে দল কয়টা? ২'টা। এখানে আবার ভিন্ন দল হল কেন? একদল মুসলমান পর্দা পালন করে আরেকদল মুসলমান পর্দা পালন করে না। এদের নবী কত জন? একজন। তাহলে এখানে আবার ভিন্ন দল হল কেন? সবগুলো প্রশ্নের একই জবাব।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি জবাব দিয়েছেন, সেই জবাব পেশ করার আগে একই আল্লা-তে বিশ্বাসী, একই কুরআনে বিশ্বাসী, একই কেবলায় বিশ্বাসী, একই কালেমায় বিশ্বাসী, একই রাসূলে বিশ্বাসী মুসলমানদের এত দল হবে কেন? এই প্রশ্ন যাদের মনে জাগে, আগে ঠিক করতে হবে প্রশ্নটি আমার কথার বেলায়, না নবীর কথার বেলায়? তাহলে প্রশ্ন কি করবেন প্রতিবাদের জন্য, না বুঝার জন্য? যদি কারও মনে প্রতিবাদের প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমার জানা মতে বাংলাদেশে এমন হাজার হাজার মানুষ আছে, যাদের মনে প্রতিবাদী প্রশ্ন আছে। মুসলমানের এত দল কেন-এর প্রতিবাদ তারা করে। মুসলমানের মাঝে এত দলাদলি কেন?

কেন মুসলমান একদল হয় না? এ রকম প্রতিবাদের স্বরে যারা প্রশ্ন করে আমি তাদেরকে বলব, আমি এই প্রশ্নের জবাবদানে দায়ী নই, মুসলমান ৭৩ দলে বিভক্ত হবে আমি বলিনি; আমার নবী, তোমার নবী, সমস্ত মুসলমানের নবী বলেছেন। প্রশ্ন করলে নবী রওজা শরীফে জিন্দা আছেন, সেখানে গিয়ে প্রশ্ন করুন। এবার আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি একই আল্লায় বিশ্বাসী, একই নবীতে বিশ্বাসী, একই কুরআনে বিশ্বাসী, একই কেবলায় বিশ্বাসী মুসলমানের এত দল কেন? এই প্রশ্ন কি আপনাদের প্রতিবাদী প্রশ্ন, না বুঝার জন্য প্রশ্ন? প্রতিবাদী প্রশ্ন হলে আমি জবাবের জন্য দায়ী নই। যে নবী বলেছেন সেই নবী জিন্দা আছেন রওজা শরীফে, সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ করুন।

আর যদি প্রতিবাদী প্রশ্ন না হয়ে বুঝার জন্য প্রশ্ন হয়, আল্লাহর রাসূল যে হাদীসে বলেছেন আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, সেই হাদীসে এর কারণও বলে দিয়েছেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

কারণ বলেছেন- একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলেছেন। উদাহরণটা হল, একটা রোগ আছে, এই রোগটাকে আরবী ভাষায় বলে 'কালাব'। বাংলা ভাষায় বলে জলাতঙ্ক। রোগটা মূলত কুকুরের হয়। যে কুকুর জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত, ওই কুকুর যখন কোন মানুষকে কামড় দেয়, সেই কামড়ের বিষ এই মানুষের সমস্ত রক্তে কণিকায় মিশে যায় এবং এই মানুষটা জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়। জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ হল, পানি পিপাসায় কলিজা ফেঁটে মারা যাবে কিন্তু পানি দেখলে পান করা তো দূরের কথা পানির কাছে যেতেও ভয় পাবে। এই হল জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদাহরণ দিয়ে বলেন, জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত মানুষটার সমস্ত রক্তে যেমনিভাবে কুকুরের কামড়ের বিষ মিশে যায়, ঠিক তেমনিভাবে আমার ৭৩ দল মুসলমান উম্মতের মাঝে ৭২ দল মুসলমানের রক্তে দুনিয়ার লোভ-লালসা মিশে যাবে। এরা ভিন্ন ভিন্ন কুরআন মানার কারণে ভিন্ন দল হবে না; দুনিয়ার লোভ-লালসার কারণে ভিন্ন ভিন্ন দল হবে। সব দলই এক কুরআন মানার দাবী করবে, সব দল এক রাসূল মানার দাবী করবে, সব দলই এক আল্লাহকে মানার দাবী করবে, সব দলই এক কেবলা মানার দাবী করবে; কিন্তু দুনিয়ার লোভ-লালসা ৭২ দলের মুসলমানের রক্তে মিশে যাবে। শুধু ১টি দলের লোক- যাদের মাঝে দুনিয়ার লোভ-লালসা থাকবে না।

ইসলাম ধর্ম পালন করবে, সিরাতে মুস্তাকীমের পথ ধরে জান্নাতে পৌঁছার জন্য। একদল মুসলমান ইসলাম ধর্ম পালন করবে সোজা পথে বেহেশতে যাওয়ার আশায় আর ৭২ দল মুসলমান ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করবে দুনিয়ার স্বার্থ চরিতার্থ করার লালসায়। ৭৩ দলের মুসলমানদের মাঝে মাত্র একদল মুসলমান ইসলাম ধর্ম পালন করবে দুনিয়ার লোভ-লালসায়, নাকি সোজা পথে বেহেশতে যাওয়ার আশায়? সোজা পথে বেহেশতে যাওয়ার আশায়। বাকী ৭২ দল মুসলমানই ইসলাম ধর্মের নাম ব্যবহার করবে বেহেশতে যাওয়ার আশায়, নাকি দুনিয়ার লোভ চরিতার্থ করার লালসায়? দুনিয়ার স্বার্থ চরিতার্থ করার লালসায়।

যারা দুনিয়ার স্বার্থের জন্যে ইসলামকে ব্যবহার করে তারাও বলে ইসলাম, যারা সোজা পথে বেহেশতে যাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্ম পালন করে তারাও বলে ইসলাম। যারা দুনিয়ার স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ইসলামের

নাম ব্যবহার করে তারাও বলে আল্লাহ, তারাও বলে কুরআন, তারাও বলে নবী, তারাও বলে কেবলা, তারাও বলে কালিমা, যারা সোজা পথে বেহেশতে যাওয়ার জন্য ইসলামকে পালন করে তারাও বলে আল্লাহ, তারাও বলে রাসূল, তারাও বলে কুরআন, তারাও বলে কেবলা, তারাও বলে কালিমা, তাহলে কি বলার মাঝে ব্যবধান, না অন্তরে? ব্যবধান অন্তরে।

এবার উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, مَا هِيَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ। ওগো আল্লাহর রাসূল! ৭৩ দল মুসলমানের মধ্যে একটিমাত্র দল জান্নাতী হবে, ওঁদের পরিচয়টা কি? কারণ, ৭২ দল মুসলমানের অন্তরে থাকবে দুনিয়ার লোভ-লালসা আর একদল মুসলমানের অন্তরে থাকবে সোজা পথে বেহেশতে যাওয়ার আশা। দুনিয়ার লালসাও থাকে অন্তরে, আর বেহেশতের আশাও থাকে অন্তরে। কার অন্তরে দুনিয়ার লালসা আছে, আর কার অন্তরে বেহেশতে যাওয়ার আশা আছে, তা আমাদের তো জানার উপায় নেই, আমরা চিনব কেমন করে? কোন কোন দলের মুসলমানের অন্তরে দুনিয়ার লালসা আছে, মুসলমানদের কোন দলটার অন্তরে বেহেশতে যাওয়ার আশা আছে- আমরা চিনব কেমন করে? প্রশ্ন করে সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন-

هِيَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالُوْا مَنْ هِيَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

ওহে আল্লাহর রাসূল! একটিমাত্র দল, যাদের অন্তরে সোজা পথে বেহেশতে যাওয়ার আশা, ওঁদেরকে আমরা চিনব কেমন করে? প্রশ্নের জবাব বুঝার আগে এখানে আরও একটি আনুসঙ্গিক প্রশ্ন আছে। তা হচ্ছে এই হাদীসখানা স্পষ্ট প্রমাণ করছে, সাহাবায়ে কিরাম রাযি. সরাসরি রাসূলের দরবারে স্বয়ং রাসূলকে يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ বলে সম্বোধন করেছেন। قَالُوْا مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ হাদীসের এই শব্দ শুনে থাকলে আপনারা বলুন! সাহাবায়ে কিরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ বলেছেন? তাই প্রশ্ন জাগে রাসূলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ছাত্ররা يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ বলতে পারেন, তাহলে দেড় হাজার বছরের পরের মুসলমান আমরা রাসূলকে কেন يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ বলতে পারব না?

এবার জবাব বুঝানোর জন্যে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, সাহাবায়ে কিরাম রাযি. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে يَا رَسُوْلَ اللّٰه বলেছিলেন, রাসূল হাজির মনে করে, না নিজেরা রাসূলের দরবারে সশরীরে হাজির হয়ে? সাহাবায়ে কিরাম রাসূলকে يَا رَسُوْلَ اللّٰه বলেছিলেন, নিজেরা রাসূলের দরবারে স্বশরীরে হাজির হয়ে, আর আমাদের সমাজে যারা ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে, তারা নিজেরা রাসূলের দরবারে স্বশরীরে হাজির হয়ে নয়। সাহাবায়ে কিরামের يَا رَسُوْلَ اللّٰه বলা আর এদের يَا رَسُوْلَ اللّٰه বলার মাঝে কি কোনো পার্থক্য আছে? সামান্য ব্যবধান, না আকাশ-পাতাল ব্যবধান? আকাশ-পাতাল ব্যবধান। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, মনসুর হাল্লাজ اَنَا الْحَقُّ বলেছিলেন। اَنَا الْحَقُّ কথার সহজ অর্থ হল, আমি খোদা। আর ফেরাউনও اَنَا الرَّبُّ বলেছিল এবং اَنَا الرَّبُّ এর অর্থও আমি খোদা। তাহলে মনসুর হাল্লাজও 'আমি খোদা' বলেছিল। উভয়ের 'আমি খোদা' শব্দ নিয়ে পৃথিবীর বিখ্যাত ওলী আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী রহ. মসনবী শরীফে লিখেন,

گفت منصورے انا الحق گشت مست

گفت فرعونے انا الحق گشت پست

ایں انا را رحمت اللہ دروفا + آں انارا لعنت اللہ درقفا

ایں انا گفت از خدی زاد شود + آں انا گفت خدی برباد شود

জালাল উদ্দীন রুমী রহ. মসনবী শরীফে লিখেন, মনসুর হাল্লাজও 'আমি খোদা' বললেন, ফেরাউনও 'আমি খোদা' বলল। মনসুর হাল্লাজের 'আমি খোদার' উপর আল্লাহর হাজার বার রহমত, ফেরাউনের 'আমি খোদা' শব্দের উপর আল্লাহর হাজার বার লা'নত। মনসুর হাল্লাজের আমি খোদা বলার উপর আল্লাহর রহমত আর ফেরাউনের আমি খোদা বলার উপর লা'নত। ব্যবধান কি? ব্যবধান বর্ণনা করে আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী বলেন–

این انا را گفت از خدی زاد شود + آں انا گفت با خدی برباد شود

মনসুর হাল্লাজ আমি খোদা বলেছিলেন, খোদার সামনে আমিত্বকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য।

- এই কথাটা ব্যাখ্যা ছাড়া বুঝা যাবে না। খোদার সামনে আমিত্বকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আমি খোদা বললেন। এ কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে, একবার মনসুর হাল্লাজ তার এক বন্ধুর কাছে চিঠি লিখলেন। চিঠির শিরোনাম লিখলেন–

مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِلٰى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

রাহমানুর রহীমের লেখা চিঠি অমুকের পুত্র অমুকের কাছে।

কার লেখা চিঠি? রাহমানুর রাহীম এর। রাহমানুর রাহীম কে? আল্লাহ। তাহলে চিঠির ভাষায় বুঝায় এটা আল্লাহর লেখা চিঠি। ঘটনাক্রমে চিঠিখানা জনৈক সরকারী লোকের হাতে পড়ল। ব্যাস, চিঠি আদালতে দাখিল করে মনসুর হাল্লাজের বিরুদ্ধে মামলা হয়ে গেল। মনসুর হাল্লাজকে আদালত তলব করল। বিচারপতি মনসুরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ চিঠিটা কার লিখা? মনসুর বললেন, আমার লেখা। তখন আদালতের বিচারপতি বললেন, তুমি বলেছ এ চিঠি তোমার লিখা। কিন্তু এতে তো তুমি লিখেছ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। রাহমানুর রাহীম তো আল্লাহ। তোমার লেখা হয়ে থাকলে مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। কিভাবে হল? আর রাহমানুর রাহীমের লেখা হয়ে থাকলে তুমি কিভাবে হলে?

জবাবে মনসুর হাল্লাজ বলেন, আমি যখন اَنَا বলি (বাংলাতে বলে আমি) আল্লাহ ক্ষমতা না দিলে, 'আ' বলার পর 'মি' কোন দিন হবে না। সুতরাং 'আমি' বলতে কিছুই নেই। 'আমি' বলার ক্ষমতা যিনি দেন, তিনিই আল্লাহ। সেই ব্যাখ্যায় বলছি 'আমি আল্লাহ' এর মানে আল্লাহ ছাড়া আর কোন লোকের আমি বলার ক্ষমতাই নেই। আমরা যখন 'আমি' বলি, তখন 'আমি' বলার ক্ষমতা দেন আল্লাহ। মনসুর হাল্লাজের 'আমি খোদা'র ব্যাখ্যা হল, আমি বলার ক্ষমতা যিনি দেন, তিনিই খোদা। আমার তো কিছুই নেই। আমার তো আমি উচ্চারণ করারও ক্ষমতা নেই। আমি উচ্চারণের ক্ষমতা যার আছে তিনি খোদা। এই হল মনসুর হাল্লাজের 'আমি খোদার' ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা বুঝে থাকলে বলুন, মনসুর হাল্লাজ 'আমি খোদা' বলেছিলেন 'আমি' বলার জন্য, না আমিত্বকে মিটানোর জন্য? আমিত্বকে মিটানোর জন্য। এই শব্দটার উপর লা'নত হওয়া দরকার, না রহমত হওয়া দরকার? রহমত হওয়া দরকার।

প্রশ্ন আসে তবে কেন তাকে ফাঁসি দেওয়া হল? ফাঁসি দেওয়ার কারণ হল, সাধারণ মানুষ এই ব্যাখ্যা বুঝবে না। সাধারণ মানুষ দলীল বানাবে এক ওলী যদি 'আমি খোদা' বলতে পারে, তাহলে আমাদের 'আমি খোদা' বললে দোষ কি? লাখো মানুষের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। লাখো মুসলমানের ঈমান রক্ষার্থে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। তার কথার অপব্যাখ্যার কারণে নয়। এবার আসুন ফেরাউনের 'আমি খোদার' ব্যাখ্যায়। আল্লাহ কুরআনে বলেন,

اذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى . فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى . وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى . فَاَرَاهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى . فَكَذَّبَ وَعَصٰى . ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى . فَحَشَرَ فَنَادٰى . فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (النازعات/١٧-٢٤)

আল্লাহ মূসা আ.-কে বললেন, যাও ফেরাউনের কাছে গিয়ে দাওয়াত দাও। হযরত মূসা আ. ফিরাউনের কাছে গেলেন এবং যখন আল্লাহর দাওয়াত দিলেন তখন ফেরাউন বলল, মূসা! তোমার খোদা মানি না, আমি খোদা। অতি সংক্ষেপে বললাম ফেরাউনের আমি খোদার ব্যাখ্যা। বুঝে থাকলে বলুন, ফেরাউন আমি খোদা বলেছিল কি নিজের আমিত্বকে মিটানোর জন্য, না নিজের সামনে খোদার অস্তিত্ব মিটানোর জন্য? খোদার অস্তিত্ব মিটানোর জন্য। মনসুর হাল্লাজ আমি খোদা বলেছিল খোদার সামনে আমিত্ব দেখানোর জন্য, না খোদার সামনে নিজের অস্তিত্ব মিটানোর জন্য? নিজের অস্তিত্ব মিটানোর জন্য। এ জন্যে আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী বলেন,

ایں انا را رحمت الله دروفا + آں انا را لعنت الله درقفا

ایں انا گفت از خدی زاد شود + وانا گفت باخدی برباد شود

মনসুর হাল্লাজের আমি খোদার উপর আল্লাহর হাজার বার রহমত। ফেরাউনের আমি খোদা বলার উপর আল্লাহর হাজার বার লা'নত। বেশকম কি? ব্যবধান কি? আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী বলেন, মনসুর হাল্লাজ 'আমি খোদা' বলেছিল নিজের আমিত্বকে মিটানোর জন্য, আর ফেরাউন আমি খোদা বলেছিল, নিজের আমিত্বের সামনে খোদাকে মিটানোর জন্য। মনসুর হাল্লাজ আর ফেরাউনের 'আমি খোদা' বলার যেই ব্যবধান, সাহাবায়ে

কিরামের يَا رَسُوْلَ اللّٰه বলা এবং ওদের يَا رَسُوْلَ اللّٰه বলার সেই ব্যবধান। সাহাবারা يَا رَسُوْلَ اللّٰه বলেছিলেন নিজেরা রাসূলের দরবারে হাজিরা দিয়ে আর ওরা يَا رَسُوْلَ اللّٰه বলে নবীকে নিজের দরবারে হাজির বলে। সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন পরম আদবরক্ষাকারী আর ওরা চরম বেআদব। আনুসঙ্গিক প্রশ্নের জবাব দিলাম, যেহেতু হাদীসে يَا رَسُوْلَ اللّٰه এসেছে।

كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَا هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰه

এখন আল্লাহর রাসূল বলেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। ৭২ দল হবে জাহান্নামী আর একটিমাত্র দল হবে জান্নাতী। সাহাবায়ে কিরাম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখানে সাহাবায়ে কিরাম 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলেছিলেন আপন আপন ঘরে বসে, না রাসূলের দরবারে হাজির হয়ে? রাসূলের দরবারে হাজির হয়ে। আর ওরা কি ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে নিজেরা রাসূলের দরবারে হাজির হয়ে, নাকি নিজেদের দরবারে রাসূলকে হাজির বলে? নিজেদের দরবারে হাজির বলে।

যারা রাসূলকে নিজেদের দরবারে হাজির মনে করে তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি, আপনারা হয়ত জানেন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রাত্রে মেরাজে গিয়েছিলেন, মিরাজের রাতে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন হযরত জিবরাঈল আ.-কে পাঠালেন। মক্কা শরীফ থেকে বুরাকে আরোহণ করিয়ে মদীনা শরীফ হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে গেলেন। এ দিকে আল্লাহ পাক অন্যান্য নবী-রাসূলগণকেও বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত করলেন। এই বায়তুল মুকাদ্দাস শুধু আমাদের নবী গিয়েছিলেন, না কি সমস্ত নবী-রাসূল গিয়েছিলেন? সমস্ত নবী-রাসূল গিয়েছিলেন।

সেখানে সমস্ত নবী-রাসূল উপস্থিত হওয়ার পর জামাতের সাথে নামাযের জন্য কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন। কে ইমামতি করবেন? একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। কেউ সাহস করছেন না ইমামতি করার। জিবরাঈল ফিরিশতা আমাদের নবীর হাত ধরে সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে ইমামতি করার অধিকার আপনি ছাড়া কারও নেই। সমস্ত নবী-রাসূল হবে মুক্তাদি আপনি হবেন ইমামুল মুরসালীন। ঘটনা

বুঝে থাকলে বলুন, যেখানে আমাদের নবী উপস্থিত, সেখানে কি কোন পয়গাম্বরের ইমামতি করার অধিকার থাকে? তাহলে আমাদের দেশে যারা নবীকে উপস্থিত বলে, তাদের দরবারে হাজির বলে, তারা কোন সাহসে ইমামতি করে?

মেরাজের ঘটনায় আপনারা জানেন যেখানে আমাদের নবী উপস্থিত-হাজির সেখানে কি কোন পয়গাম্বরের ইমামতি করার অধিকার ছিল? না। তাহলে যারা নবীকে হাজির বলে আবার ইমামতিও করে এদের চেয়ে জঘন্যতম বেআদব কি আর হতে পারে? না। হয়ত বে-আদবী ছাড়, ইমামতি ছাড়, নয় তো নবী হাজির আছে, এই বেআদবী কথা ছাড়। দুটির একটি আবশ্যক; তৃতীয় কোন পথ নেই। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়ে বসে ছিলেন, না আরও সামনে গেলেন? গেলেন। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে প্রথম আসমানে ছিলেন, না আরও সামনে গেলেন? গেলেন। সেখান থেকে দ্বিতীয় আসমানে গিয়ে বসে ছিলেন, না আর সামনে গেলেন? গেলেন।

তৃতীয় আসমানে? গেলেন। চতুর্থ আসমানে? গেলেন। পঞ্চম আসমানে? গেলেন। ষষ্ঠ আসমানে? গেলেন। সপ্তম আসমানে? গেলেন। ছিদরাতুল মুনতাহায়? গেলেন। আরশে? গেলেন। বেহেশকত-দোযখ পরিদর্শনে? গেলেন। গিয়ে রইলেন? না ফিরে আসলেন? ফিরে আসলেন। হাজির-নাজির হয়ে থাকলে গেলেন কিভাবে? আসলেন কিভাবে? হাজির-নাজির ছিলেন কিভাবে? আর আসলেন কিভাবে? হাজির-নাজিরের অর্থ কি? যান-আসেন? না কি সর্বত্র আছেন? সর্বত্র আছেন। সর্বত্র যিনি আছেন তিনি যাবেন কোথায় আর আসবেন কোথায়? আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ কোথায় নেই? সর্বত্রই আছেন। সা.

এ জন্যে কোন বেয়াকুফেও বলে না আল্লাহ আগামীকাল চট্টগ্রাম যাবেন। আল্লাহ পরের দিন ঢাকা যাবেন। তার পরের দিন আল্লাহ মক্কা শরীফ যাবেন। তার পরের দিন আল্লাহ আমেরিকা যাবেন। তার পরের দিন আল্লাহ বাংলাদেশে ফিরে আসবেন। কেউ বলে? না। যিনি সব সময় সব জায়গায় হাজির-নাজির আছেন তিনি আসবেন কোথায় আর যাবেন কোথায়? হাজির-নাজিরের আসা-যাওয়া নেই। আর আসা-যাওয়া যার

আছে তিনি হাজির-নাজির নন। আল্লাহ হাজির-নাজির হওয়ার কারণে তার আসা-যাওয়া নেই, আর নবীর আসা-যাওয়া চলার কারণে নবীকে হাজির-নাজির বলা যায় না।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় ছিলেন, তখন কি বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত, না অনুপস্থিত? অনুপস্থিত। অনুপস্থিত ছিলেন বলেই সেখানে গেলেন। বায়তুল মুকাদ্দাসে ছিলেন বলেই প্রথম আসমানে গেলেন। প্রথম আসমানে ছিলেন বলেই দ্বিতীয় আসমানে গেলেন। দ্বিতীয় আসমানে যখন ছিলেন তখন কি তৃতীয় আসমানে ছিলেন? ছিলেন না বলেই তো গেলেন। মেরাজে যখন গেলেন তখন কি মক্কায় ছিলেন? ছিলেন না বলেই তো আবার ফিরে এলেন। সারা দুনিয়ার খাঁটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা আল্লাহ হাজির-নাজির। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহ সর্বদর্শী, আল্লাহ সর্বশ্রোতা। যেহেতু আল্লাহ সর্বত্রই আছেন, সেহেতু আল্লাহ যান না, আসেন না। কোথায় আসবেন আর কোথায় যাবেন, সর্বত্রই তো তিনি আছেন।

একটা গল্প বলি। এক ভণ্ডপীর গেল মুরীদের বাড়ী। আমাদের দেশের অনেক আছেন যারা ভণ্ডপীর আর কামেল পীর বুঝেন না। ভণ্ডপীর আর কামেল পীর বুঝার জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আপনাদের এলাকায় কোনও এম. বি. বি. এস ডাক্তার আছেন? আছেন। এই ডাক্তার সারা দেশে কত জায়গায় ওয়াল রাইটিং করেছেন যে, আমি একজন ভাল ডাক্তার? করেন নি। আর হাতুড়ে ডাক্তার আছে? আছে। এরা কি করে? এরা হাঁটে-ঘাটে, রিক্সায়, রেলগাড়ীতে দাড়িয়ে লেকচার দেয় আমি ভাল ডাক্তার, আমি ভাল ডাক্তার। যারা পথে-ঘাটে নিজের ডাক্তারী প্রচার করে তারা কি সত্যিকারের ডাক্তার না ভণ্ড ডাক্তার? ভণ্ড ডাক্তার।

যারা সত্যিকারের ডাক্তার তারা কি প্রচার করে আমি ভাল ডাক্তার, নাকি বসে বসে প্রেসক্রিপশন দেয়? বসে বসে প্রেসক্রিপশন দেয়। ঠিক তেমনিভাবে সত্যিকারের পীরেরা বসে বসে মুরিদানের আত্মশুদ্ধির কাজ করেন। তারা ঢাক-ঢোল পিটায় না, ব্যানার লটকায় না, গেট সাজায় না, প্রচার করে না, ওয়াল রাইটিং করে না। যারা ভণ্ডপীর, যাদের কাছে মাল

নেই, তারা গেট সাজায়, ওয়াল রাইটিং করে, পোষ্টারিং করে, প্রচার করে শুধু প্রচার আর প্রচার। এক কথায় সত্যিকারের ডাক্তার কর্মসর্বস্ব, ভণ্ড ডাক্তার প্রচার সর্বস্ব। কামিল পীর কর্ম সর্বস্ব, ভণ্ডপীর প্রচার সর্বস্ব।

ভণ্ডপীর আর কামেল পীরের মাঝে যত পার্থক্য আছে, এর মাঝে এটা একটা। এবার বুঝে থাকলে বলুন! বাংলাদেশে ভণ্ডপীর আছে? এমন ভণ্ডপীর গেল মুরিদের বাড়ী বেড়াতে। মুরিদ মনে করে পীর সাব আমাকে পার করে নেবেন হাশরের মাঠে। ভণ্ডপীরের মুরিদানের আকীদা হল, আমি ভজনা করব পীরকে দুনিয়াতে, আর পীর পার করে নেবেন আখেরাতে। আর কামেল পীরের মুরিদানের আকীদা হল, আমি অনুসরণ করব আমার পীরকে, আর আমার পীর আমাকে আল্লাহ পাওয়ার পথে চালিয়ে নেবেন দুনিয়াতে। কামেল পীরের কাজ আখেরাতে না কি দুনিয়াতে? দুনিয়াতে। কি করবেন? পার করে দেবেন, নাকি আল্লাহ পাওয়ার পথে চালিয়ে দেবেন? আল্লাহর পথে পরিচালিত করবেন।

পার করে নেওয়া পীরের কাজ নয়। উদ্ধার করা পীরের কাজ নয়। যদি উদ্ধার করা পীরের কাজ হয়, তাহলে পীরকে উদ্ধার করবে কে? পীরের কাজ তরিয়ে নেওয়া নয়, উদ্ধার করা নয়; পীরের কাজ পথ দেখিয়ে দেওয়া। ছীরাতে মুস্তাকীমের পথ দেখিয়ে দেওয়া, আল্লাহর পথ দেখিয়ে দেওয়া, জান্নাতে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেওয়া। আখেরাতে না দুনিয়াতে?

কামেল পীরের মুরিদানেরা মনে করেন আমার পীর আমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন দুনিয়াতে, আর ভণ্ডপীরের মুরিদানেরা বিশ্বাস করে আমার পীর আমাকে উদ্ধার করে নেবেন আখেরাতে। দেখেন দুই পীরের মুরিদানের মাঝে ব্যবধান আছে কি নেই? যেহেতু ভণ্ডপীরের মুরিদানেরা মনে করে পীর আমাকে তারিয়ে নেবেন আখেরাতে আর আমি পীরকে শিন্নী, দান, ছদকা যা কিছু আছে দান করব দুনিয়াতে। এজন্য কামেল পীর আর ভণ্ডপীরের আরেক লক্ষণ হচ্ছে কামেল পীর মুরিদ করে আল্লাহর পথে পরিচালনার জন্য, আর ভণ্ডপীর মুরিদ করে মুরিদ থেকে ধন-সম্পদ নেওয়ার জন্য। কামেল পীর মুরিদ করে দেওয়ার জন্য, আর ভণ্ডপীর মুরিদ করে নেওয়ার জন্য।

কামেল পীর মুরিদ করে আল্লাহর পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য, আর ভণ্ডপীর মুরিদ করে মুরিদ থেকে ধন-সম্পদ নেওয়ার জন্য। নেওয়ার যত প্রসেস আছে, নেওয়ার যত অপকৌশল আছে এর মাঝে সবচেয়ে বড় কৌশল হচ্ছে 'মহা পবিত্র ওরশ মোবারক'।

আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি মহা পবিত্র ওরশগুলোতে যারা যায়, এদের বেশীর ভাগ নামাযী, না বেনামাযী? বেনামাযী। বেশীর ভাগ শরা'ওয়ালা, নাকি বে-শরা'? বে-শরা'। বেশীর ভাগ পর্দানশিন, না বেপর্দা? বেপর্দা। বেশীর ভাগ কুরআন তিলাওয়াতকারী, না গান-বাদ্যে অভ্যস্থ? গান-বাদ্যে অভ্যস্থ। নামাযী পাক, না বেনামাযী পাক? নামাযী। শরা'ওয়ালা পাক, না বেশরা' লোক পাক? শরা'ওয়ালা। শরা'ওয়ালা নাপাক, না বেশরা লোক নাপাক? বেশরা' লোক। পর্দানশীনরা নাপাক, না বেপর্দাওয়ালা নাপাক? বেপর্দাওয়ালা। কুরআন তিলাওয়াতকারীরা নাপাক, না গান-বাজনাকারী নাপাক? গান-বাজনাকারীরা। তাহলে মহা পবিত্র ওরশগুলো পাক, নাকি নাপাক? নাপাক।

কর্মকাণ্ড নাপাক কিন্তু লেবেল 'মহা পবিত্র'। কর্মকাণ্ড কি? নাপাক। কর্মকাণ্ড অপবিত্র আর লেবেল 'মহা পবিত্র'। আমি আপনাদেরকে বলি একটি শিশির মাঝে দুর্গন্ধ পানি ঢুকিয়ে লেবেল লাগিয়ে দিলেন 'সুগন্ধী আতর'। এই শিশির মুখ খোলে যখন আপনার নাকে ঢেলে দেওয়া হবে, তখন কি সুগন্ধি লাগবে? না, কখনো না। কেন 'সুগন্ধি আতর' লেখা নেই? সুগন্ধি কি লেবেলের দ্বারা হয়, না জিনিসের দ্বারা হয়? জিনিসের দ্বারা। মহা পবিত্র কি পোষ্টারিং এর দ্বারা হয়, না কি কর্মকাণ্ডের দ্বারা হয়? কর্মকাণ্ড অপবিত্র আর পোষ্টারিং মহা পবিত্র।

এটা হল ভণ্ডপীরের আরেক আলামত। এরকম এক ভণ্ডপীর গেল তার জনৈক মুরিদের বাড়ীতে। মুরিদ ইচ্ছামতো পীরের খেদমত করছে। কারণ মুরিদের আকীদা হল, এই পীর আমাকে তরাবে, তাই দুনিয়াতে যা দিতে পারি। মুরিদের খেদমত পেয়ে পীর তো আর মুরিদের বাড়ী ছাড়ে না। একদিন গেল, দুদিন গেল, তিন দিন গেল, চার দিন গেল, পাঁচ দিন গেল। মুরিদের বিতৃষ্ণা হল। মুরিদ কিভাবে বলবে, হুজুর আপনি চলে যান! তাই সুকৌশলে বলল, হুজুর আমার বাড়ীতে আর কোন দিন আসবেন না?

ভণ্ডপীর বলল, তুমি যে আদর কর, তোমার বাড়ীতে না আসলে আসব কোথায়? তখন মুরিদ বলল, হুজুর আপনি তো যানই না, না গেলে আসবেন কিভাবে? গল্প বলেছি এজন্য যে, এখানে আসা-যাওয়া আছে। আপনারা বলুন, নবীর জীবনে আসা-যাওয়া ছিল কি না? নবী সর্বত্র বিরাজমান থাকার কারণে আসা-যাওয়া ছিল, না সর্বত্র না থাকার কারণে তার আসা-যাওয়া ছিল? যার আসা-যাওয়া আছে তিনি হাজির-নাজির? না যার আসা-যাওয়া নেই তিনি হাজির-নাজির? আসা-যাওয়া নেই কার? আল্লাহর। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া হাজির-নাজির আর কেউ নেই। সারা দুনিয়ার সত্যিকারের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা একমাত্র আল্লাহ হাজির-নাজির। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হাজির-নাজির নন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস শরীফে বলেন, আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর আমাকে যখন রওজা শরীফে দাফন করা হবে, দাফন করার সাথে সাথে আল্লাহ আমাকে জিন্দা করে দেবেন। জিন্দা করে দেওয়ার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জিন্দা অবস্থায় শুয়ে থাকব। আল্লাহর রাসূল জিন্দা হয়ে কোথায় কোথায় যাবেন বলেছেন? যাবেন না কোথাও। থাকবেন কোথায়? রওজা শরীফে। তাহলে চট্টগ্রামে হাজির-নাজির হলেন কিভাবে? এবার জিজ্ঞেস করি, আপনাদের চট্টগ্রামের নানুপুরে যদি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আসেন, জিসমানীভাবে, না রুহানীভাবে? স্বশরীরে আসবেন না আত্মিকভাবে আসবেন? যদি বলেন, স্বশরীরে আসবেন, তাহলে নবী বলেন আমি কিয়ামত পর্যন্ত রওজা শরীফে থাকবো।

আপনি বলেন নবীর শরীর মুবারক নানুপুরে, আর নবী বলেন রওজা শরীফে। নবীর কথা মানব, না আপনার কথা মানব? আর যদি বলেন, না; স্বশরীরে আসবেন না– শরীর থাকবে রওজা শরীফে আর রূহ মুবারক আসবে নানুপুরে। তাহলে জিজ্ঞেস করি, যার রূহ নানুপুরে আর শরীর রওজা শরীফে, তো রওজা শরীফের দেহটা কি জিন্দা থাকবে না মুর্দা হয়ে যাবে? যদি বল নবী রূহানীভাবে আসেন তাহলে তোমরা নবীকে মুর্দা বানিয়েছ, যদি বল স্বশরীফে আসেন, তাহলে রওজা খালি করেছ। أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَازِمٌ। মাদরাসার ছাত্ররা বুঝবে অর্থাৎ দুই বিপদের এক বিপদ।

স্বশরীরে আসেন বললে রওজা খালি, আর রূহানীভাবে আসেন বললে শরীর মুর্দা। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা নবী জিন্দা রওজা শরীফে আছেন। তাহলে আসল আহলে সুন্নাতুল জামাত কোনটা? আর আহলে সুন্নাতুল জামাতের নামে প্রতারণা কোনটা? আমার কথা বুঝে থাকলে বলুন! বাংলাদেশে যারা যারা নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত দাবী করে তাদের সবাই কি আহলে সুন্নাতুল জামাত? না আহলে সুন্নাতুল জামাত নামে ধোঁকাবাজ? নিশ্চয় আহলে সুন্নাতুল জামাত নামে ধোঁকাবাজ। এ জন্যই হয়তো আজকে আমার আলোচনাটা "আহলে সুন্নাহ এর পরিচিতি" দেওয়া হয়েছে। সিরাতে মুস্তাকীমের সপ্তম ব্যাখ্যা। এর মাঝে ৭নং ব্যাখ্যা আহলে সুন্নাতুল জামাতের পথ তথা বেহেশতে যাওয়ার সোজা পথ। এটাকে কুরআনের ভাষায় সিরাতে মুস্তাকীম বলা হয়েছে।

যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার উম্মত মুসলমানেরা ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। ৭২ দল উম্মত জাহান্নামী হবে দুনিয়ার লোভ-লালসার কারণে। একদল মুসলমান উম্মত জান্নাতী হবে সোজা পথে বেহেশতে যাওয়ার আশায় ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে। তাহলে ৭২ দল মুসলমানের মুখে যে আহলে সুন্নাত– এটা কি ধোঁকাবাজীর আহলে সুন্নাত, না কি খাঁটি আহলে সুন্নাত? তারা সমাজে ধোঁকাবাজ। একমাত্র একটি দল যাদের মুখে আহলে সুন্নাত আছে সোজা পথে বেহেশতে যাওয়ার আশায়। আর ৭২ দল মুসলমানের মুখে ইসলাম আছে দুনিয়ার লোভ-লালসার আশায়। ৭২ দলের অন্তরে দুনিয়ার লোভ-লালসা আর এক দলের অন্তরে বেহেশতে যাওয়ার আশা।

দুনিয়ার লোভ-লালসাও থাকে অন্তরে, বেহেশতে যাওয়ার আশাও থাকে অন্তরে, এ জন্য সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ। ও হে আল্লাহর রাসূল! ওই একটিমাত্র দলের পরিচয় কি? জবাব শোনার আগে আরও একটা জরুরী কথা শুনে নেওয়া দরকার। হাদীস শরীফে যে রাসূল বলেছেন, ৭২ দল মুসলমান জাহান্নামী হবে দুনিয়ার লোভ-লালসার কারণে, সেই লোভ-লালসার পরিচয় কি? মুফাসসিরীনে কিরাম লিখেছেন, দুনিয়ার লোভ-লালসা ৩ প্রকার। একটা হল حب جاه দ্বিতীয়টা حب مال তৃতীয়টা حب نسوان বাংলায় পদমর্যাদার লোভ, ধনের

লোভ, অবাধ মেলামেশার লোভ। এক নম্বর দুনিয়ার লোভ হল পদমর্যাদার লোভ।

আপনাদের এলাকায় ইউপি নির্বাচন হয়? মেম্বার পদপ্রার্থী হয়? চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হয়? এক একজন মেম্বার পদপ্রার্থীর নির্বাচনে কতোশ টাকা খরচ হয়? কয়েক লক্ষ। কত বছরের জন্য? পাঁচ বছরের জন্য। পাঁচ বছরে সর্বমোট বেতন কত? সর্বমোট ধরুন ২০ হাজার টাকা। নির্বাচনে খরচ হল কত লক্ষ টাকা? এই লোক পাঁচ বছরে মাত্র পাবে ২০ হাজার টাকা। নির্বাচনে পাশ করবে কি না এখনো জানা নেই তবুও খরচ করল (ধরুন) পাঁচ লক্ষ টাকা। বলুন তো কিসের লোভে? পদমর্যাদার লোভে। ধনের লোভ থাকলে এই ধন খরচ করত না। সে খরচ করল ধনের লোভে, না মানের লোভে? মানের লোভে।

কোন কোন মেম্বার-চেয়ারম্যান আবার ধনের লোভেও খরচ করে। পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে যদি মেম্বার হতে পারে পরবর্তী পাঁচ বছরে জনসেবার জন্য সরকারী যত বরাদ্দ হবে সবগুলোর বার আনা মেরে দিলে ২০ লক্ষ পাওয়া যাবে। এ রকম অসৎ উদ্দেশ্যে যারা নির্বাচন করে এদের অন্তরে আছে ধনের লোভ, না মালের লোভ? মালের লোভ। দুনিয়ার লোভ কত প্রকার? তিন প্রকার। এক নম্বর মানের লোভ, দুই নম্বর ধনের লোভ, তিন নাম্বার অবাধ মেলামেশার লোভ। তিন নম্বর কিসের লোভ? অবাধ মেলামেশার লোভ।

'মহা পবিত্র ওরশ শরীফে' অবাধ নারী-পুরুষ যায় কি না? যায়। পৃথক পৃথক না একত্রে? একত্রে। পর্দা করে না বেপর্দায়? বেপর্দায়। কিসের লোভ? অবাধ মেলামেশার লোভ। মহা পবিত্র ওরশ যারা জমায়, যারা আয়োজন করে ধনের লোভে। কারণ ওরশে যত লক্ষ মানুষ যাবে তারা এক টাকা করে দিলে তত লক্ষ টাকা ইনকাম হবে। এটা হল ওরশ উদ্যোক্তাদের ধনের লোভ। আর নারী-পুরুষ যারা অবাধে যায় তাদের কিসের লোভ? অবাধ মেলামেশার লোভ। দুনিয়ার লোভ কত প্রকার? তিন প্রকার মালের লোভ, ধনের লোভ, অবাধ মেলামেশার লোভ। এই তিন প্রকার লোভে পড়ে আল্লাহর রাসূল বলেন, উম্মতের ৭২ দল লোক জাহান্নামী হবে। কত দল লোক জাহান্নামী হবে? একটিমাত্র দল জান্নাতী হবে। এখানে একটা প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার। এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল বলেন,

مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْاِيْمَانِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

ঈমানের লেশমাত্র যাদের অন্তরে থাকবে, তারা জান্নাতে যাবে।

তাহলে ৭২ দল মুসলমানের অন্তরে কি ঈমানের লেশমাত্র নেই? তাহলে জাহান্নামে যাবে কথার মর্ম কি? মর্ম হচ্ছে ৭২ দল লোক যারা দুনিয়ার লোভে পড়ে জাহান্নামী হবে বলা হয়েছে, এদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলা হয়নি। চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। আর সরিষার বরাবর পরিমাণও ঈমান যাদের নেই, এরা খণ্ডকালীন জাহান্নামী নয়, চিরস্থায়ী জাহান্নামী। যাদের অন্তরে ঈমানের লেশমাত্র নেই তারাও জাহান্নামী। ৭২ দল মুসলমানও জাহান্নামী। তাহলে বেঈমান জাহান্নামী আর মুসলমান জাহান্নামীর ব্যবধান কোথায়?

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে বেঈমান জাহান্নামী– চিরস্থায়ী জাহান্নামী। নমরূদ ঈমানদার না বেঈমান? বেঈমান। ফেরাউন? কারুন? হামান? সাদ্দাদ? আবু জেহেল? আবূ লাহাব? জান্নাতী না জাহান্নামী? কত দিনের? চির দিনের। ৭২ দল মুসলমান কি ওদের মত, নাকি ভিন্ন রকম? ভিন্ন রকম। তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী আর ৭২ দল মুসলমান দীর্ঘমেয়াদী জাহান্নামী। একটিমাত্র মুসলমানের দল জাহান্নামী হবে না।

সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, এই দলটার পরিচয় কি? যেহেতু যারা দুনিয়ার লোভে ইসলাম পালন করে আর বেহেশতের আশায় যারা ইসলাম পালন করে উভয়ের আশাই থাকে অন্তরে। এই অন্তরের খবর জানব কিভাবে? যারা দুনিয়ার লোভে নয়; সোজা পথে বেহেশতে যাওয়ার জন্য ইসলাম পালন করে তাদের নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আহলে সুন্নাত অর্থ সে নিজেই সুন্নাত নয় তার আদর্শ হবে নবীর সুন্নাত। আমি আহলে সুন্নাত বললে আমি নিজেই সুন্নাত, না আমার আদর্শ হবে নবীর সুন্নাত? ঠিক তেমনিভাবে ওয়াল জামাত বলতে আমি নিজেই জামাত নই। আমার আদর্শ হবে সাহাবাদের জামাত। এই জন্য এই দলটার নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।

যে দল ইসলাম ধর্মকে বিশুদ্ধভাবে পালন করার জন্য নবীর সুন্নাতকে আদর্শের মাপকাঠি বানাবে আর সাহাবাগণের জামাতকে নিজের আদর্শের মাপকাঠি বানাবে– সেই দল প্রমাণ করল দুনিয়ার লোভে ধর্ম ব্যবহার করে

না; সোজা পথে বেহেশতে যাওয়ার জন্য ধর্ম পালন করে। সেই দলই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। এবার বলুন; যারা নবীর সুন্নাতকে আদর্শের মাপকাঠি না বানিয়ে মনগড়াভাবে ধর্ম পালন করে, এরা যদি দাবী করে– আমরা আহলে সুন্নাত; তারা সত্যিকারের আহলে সুন্নাত না ধোঁকাবাজের আহলে সুন্নাহ? ধোঁকাবাজের আহলে সুন্নাহ। ধোঁকাবাজীর দু'একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একটা ধোঁকা হচ্ছে হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি সপ্তাহের সোমবারে রোযা রাখতেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি প্রতি সপ্তাহের সোমবারে নফল রোযা রাখেন কেন? রাসূল বললেন, দুই কারণে।

(এক) আমার কাছে সর্বপ্রথম যেদিন ওহী নাজিল হয়েছিল সেদিন ছিল সোমবার। তাই আমি সপ্তাহের সোমবারে নফল রোযা রেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি।

(দুই) আমি যেদিন জন্মগ্রহণ করেছিলাম, সেদিন ছিল সোমবার। তাই আমি এদিন নফল রোযা রেখে জন্মের শুকরিয়া আদায় করি। এ হাদীসটি মুসলিম শরীফের হাদীস। মুসলিম শরীফের হাদীস কি সহীহ? সহীহ। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম উপলক্ষে কি করতেন? রোযা রাখতেন।

নবীর জন্মকে আরবী ভাষায় বলে 'মীলাদুন্নবী'। বাংলা ভাষায় নবীর জন্ম। মীলাদুন্নবী উপলক্ষে নবী কি করতেন? রোযা রাখতেন। আর ওরা মিলাদুন্নবী উপলক্ষে কি করে? ঈদ। মিলাদুন্নবী উপলক্ষে নবী রোযা রাখতেন আর ওরা করে ঈদ। এর নাম কি নবীর তরীকা, না মনগড়া তরিকা? মনগড়া তরিকা। কাজ করে মনগড়া তরিকায় আর দাবী করে আহলে সুন্নাত– এরা কি আহলে সুন্নাত, না ধোঁকাবাজ? ধোঁকাবাজ। আমি আবারও বলি সহীহ সুমলিম শরীফের হাদীস দ্বারা আমরা কি বুঝেছি। মিলাদুন্নবী উপলক্ষে নবী কোন আমল করেছেন কি? আমলটার নাম ঈদ, না রোযা? রোজা। এরা নবীর মুহাব্বত বেশী দেখায়। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি একজন আরেকজনকে আন্তরিকভাবে মুহাব্বত করলে ঢাক ঢোল পেটায়, না কাজে কর্মে প্রমাণ দেয়? কাজে-কর্মে প্রমাণ দেয়। আর যারা কাজ করে না মুখের দ্বারা ঢাকঢোল পেটায়?

একটা মেয়ের জন্য তার স্বামীকে মুহাব্বতের প্রচারের প্রয়োজন হয়? না স্বামীর কথা পালনের মাধ্যমে হয়? স্বামীর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে। যে নারী স্বামীর নির্দেশ পালন করে সেই নারীর প্রচার করতে হয় না যে, আমি আমার স্বামীকে মুহাব্বত করি। ঠিক তেমনিভাবে যে উম্মত নবীকে মুহাব্বত করে তাদের বলতে হয় না, আমি নবীকে মুহাব্বত করি; বরং এটা নবীর তরীকা পালনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। যে নারী স্বামীকে মুহাব্বত করে না সেই নারী মুখে মুখে প্রচার করে কেন? এই প্রচার কি বাস্তব, না ধোঁকা? তেমনিভাবে যে উম্মত নবীর তরীকা পালন করে, না আর নবীকে মুহাব্বত করার প্রচার করে, সেটা কেন। সেটাও ধোঁকা। ওরা সত্যিকারের আহলে সুন্নাত, না কি আহলে সুন্নাত নামে ধোঁকাবাজ? আহলে সুন্নাত লেবেলে ধোঁকাবাজ।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিলাদুন্নবী উপলক্ষে কোন আমল করেছেন? আমলটার নাম ঈদ না রোযা? আর ওরা রোযা করে না ঈদ করে? ঈদ। নবী পালন করতেন রোযা আর ওরা করে ঈদ– এর মাঝে কতগুলো রহস্য আছে। এর মাঝে একটা হল রোযা হয় না খেয়ে, না নানুপুরে রোযা হয় খেয়ে? না খেয়ে। আর ঈদ হয় মিষ্টি খাওয়ার ধুমধাম করে। ওরা না খেয়ে মুহাব্বতে নেই; মিষ্টি খেয়ে মুহাব্বতে আছে। কাজেই ওদের মুহাব্বত আর খাঁটি মুহাব্বতে ব্যবধান আছে। ওরা যদি দাবী করে আমরা সত্যিকারের আহলে সুন্নাত, তাহলে আহলে সুন্নাত নামের ধোঁকাবাজ।

আরেকটা রহস্য নবী মিলাদুন্নবী উপলক্ষে নফল রোযা রাখতেন বছরে এক দিন? শুধু ১২ই রবিউল আওয়ালে? না কি প্রতি সোমবারে। প্রতি সোমবারে। তাহলে প্রতি সোমবারে রোযা রাখলে বছরে কতটা হয়? নবী যে আমল করেছেন, সেই আমল করতে হলে বছরে ৫২ দিন উপোস থাকতে হয়। এই মুহাব্বতে ওরা নেই। এর বিপরীতে বছরে একবার ১২ই রবিউল আওয়ালে মিষ্টি খাওয়ার ধুমধাম করা যায়। এরা কষ্টের মুহাব্বতে, না মিষ্টির মুহাব্বতে? ওরা রোযার মুহাব্বতে, না ঈদের মুহাব্বতে? এরা না খাওয়ার মুহাব্বতে, না খাওয়ার মুহাব্বতে? এই হচ্ছে ওদের মুহাব্বতের আসল পরিচয়।

মুহাব্বত কিসের দ্বারা হয়? ঢাক-ঢোল পেটানোর দ্বারা, না কি কাজের দ্বারা? কাজের দ্বারা মুহাব্বত হয়, ঢাকঢোল পিটিয়ে মুহাব্বত হয় না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্ম উপলক্ষে উম্মতকে কি শিক্ষা দিয়েছেন? মিলাদুন্নবী উপলক্ষে যদি কোন আমল করতে চাও, তাহলে বছরে বায়ান্ন দিন রোযা রেখ। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন ঈদে মিলাদুন্নবী নয়, ছাওমে মিলাদুন্নবী। নবী কোন পথে আর ওরা কোন পথে? এরপরও ওরা আশেকে রাসূল! আশেকে রাসূল নামে ধোঁকাবাজ।

আরেকটা কথা শুনুন– হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফ গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন মদীনার আনসার সাহাবায়ে কিরাম বছরে দু'দিন আমোদ-প্রমোদ করে। জিজ্ঞেস করলেন, বছরে দু'দিন আমোদ-প্রমোদ কর কেন? ওহে আল্লাহর রাসূল! আমরা মুসলমান হওয়ার আগেই ঈদ করার জন্য বছরের দু'টি দিন ধার্য করেছি। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, তা হতে পারে না। মুসলমান কোন দিন নিজের ঈদ নিজে ধার্য করতে পারে না। মুসলমানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বছরে দু'টি ঈদ ধার্য করে দেওয়া আছে। এখানে মুসলমানরা নিজেরা ঈদ ধার্য করতে পারে না বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে ধার্য করা আছে। একটা হচ্ছে নবীর পাক জবান দ্বারা বলেছেন, ঈদুল ফিত্‌র আরেকটা ঈদের নাম ঈদুল আযহা।

এখন কথা বুঝে থাকলে বলুন, নবী মুসলমানদের ঈদের সংখ্যা কয়টা বলেছেন? দুইটা। একটার নাম ঈদুল ফিত্‌র আরেকটার নাম ঈদুল আযহা। তাহলে ১২ই রবিউল আওয়ালের ঈদের সিরিয়াল নম্বর কত? সিরিয়াল নম্বরটা পেলেন কোথায়? যারা ১২ই রবিউল আওয়ালে ঈদ পালন করে তাদের ঈদের সিরিয়াল নম্বর কত? তিন। সিরিয়াল নম্বরটা পেলেন কোথায়? এটা নবীর তরীকা, না মনগড়া তরীকা? মনগড়া তরীকা পালন করলে সুন্নী হয়, না বিদ'আতী হয়? বিদ'আতী। এক নাম্বারের বেদ'আতীরা নিজেদের সুন্নী বলে প্রচার করে। এক নাম্বারের সুন্নী কারা? আর এক নাম্বারের ওহাবী কারা? হ্যাঁ কোনো কোনো ব্যাখ্যায় ওহাবী বলা যায়। یہاں بھی وہاں بھی এখানেও সফল, সেখানেও সফল। দুনিয়াতেও সফল

আখেরাতেও সফল। یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں তোমরা এখানেও না সেখানেও না। তোমরা এখানেও ব্যর্থ সেখানেও ব্যর্থ। কারণ, তোমরা বেদ'আতী আর নাম ধারণ করেছ সুন্নী। যারা সুন্নী তাদেরকে অপবাদ দিয়েছ ওহাবী। মনগড়া ধর্ম পালন করলে সুন্নী হয়, না বেদ'আতী হয়? নবীর সুন্নাতমতো ধর্ম পালন করলে ওহাবী হয়, না আহলে সুন্নাত হয়? এবার বলুন আহলে সুন্নাত কে? বেদ'আতকারীরা কি আহলে সুন্নাত? না, কখনো নয়।

হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান:

اِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتُ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ (السنن الكبرى للنسائى)

আমার উম্মত মুসলমানেরা সাবধান! ধর্মের কাজ মনগড়াভাবে করবে না। ধর্মের কাজ নবীর তরীকা মতে করবে। নবীর তরীকা মতে ধর্মের কাজ করা নবীর সুন্নাত। মনগড়াভাবে ধর্মের কাজ করলে আল্লাহর রাসূল বলেন, তার নাম বেদ'আত। এরা করে বেদ'আত, নাম দেয় সুন্নাত।

এটা আনারস আর বেদানার মত। দানায় ভরা ফলকে বলে বেদানা। আসলে দানায় ভরা নাকি বে-দানা? বেদানা। সুন্নাতে ভরা দলকে বলে ওহাবী। আসলে ওহাবী নয়, আহলে সুন্নাত। বেদ'আতে ভরা দলকে বলে সুন্নী। আসলে সুন্নী না বেদ'আতী? বেদ'আতী। কি নামে বেদ'আতী? সুন্নী নামে বেদ'আতী। সরল বেদ'আতী নয় ধোঁকাবাজ বেদ'আতী। যদি বেদ'আতী নামে বেদ'আতী হত, তাহলে সরল জনগণ ধোঁকায় পড়ত না। সুন্নী নামে বেদ'আতী হওয়ায় জনগণ ধোঁকায় পড়েছে। এই জন্য সত্যিকারের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় বর্ণনা করা প্রয়োজন হয়েছে।

সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করেন, قَالُوْا مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه ওহে আল্লাহর রাসূল! একটিমাত্র দল মুসলমানের জান্নাতী হবে আমরা চিনব কেমন করে? জবাবে রাসূল বলেন, مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ আমি রাসূলের সুন্নাত আমার সাহাবাগণের জামাত দু'টা জিনিসকে আদর্শের মাপকাঠি বানিয়ে যারা ইসলাম ধর্ম পালন করবে, তারাই হবে জান্নাতী দল। তাদের নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।

কথা বুঝে থাকলে বলুন, ধর্মের কাজ মনগড়াভাবে করে সাহাবাদের আদর্শমতো না করে কি আহলে সুন্নাত হয়? হয় না। মূলত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামের ধোঁকাবাজ হয়। আমার তিলাওয়াতকৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাচনিকভাবে যা বলেছেন (যা আমি আপনাদের সামনে পেশ করেছি এর মাঝে আপনারা যা বুঝেছেন) তা হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয় হল, ধর্মের কাজ যারা মনগড়াভাবে করে, নাকি নবীর সুন্নাত মতে করে? ধর্মের কাজ তারা নিজের ইচ্ছেমতো করে, নাকি সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ মতো করে? সাহাবাদের আদর্শমতো। এই জন্য এই দলটার নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।

আহলে সুন্নাত অর্থ নবীর সুন্নাত ওয়ালা। জামাত অর্থ সাহাবায়ে কিরামের জামাত ওয়ালা। আমার আদর্শ হবে নবীর সুন্নাত, আমার আদর্শ হবে সাহাবায়ে কিরামের জামাত। নবীর সুন্নাত বর্জন করে সুন্নী নামধারণ করা যেমন ধোঁকা; সাহাবায়ে কিরামকে নিজের আদর্শের মাপকাঠি না মেনে জামাত নাম ধারণ করা তেমনি ধোঁকা। বিভিন্নভাবে ধোঁকাবাজ আমাদের সমাজে আছে। কেউ সুন্নী নামে ধোঁকাবাজ, কেউ জামাত নামে ধোঁকাবাজ।

এই জন্য বলেছি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অর্থ বুঝতে হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতু নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতি। বুঝার সুবিধার্থে বলছি, আমি আহলে সুন্নাত এর মানে কি আমি নিজেই সুন্নাত, না কি আমার আদর্শ হবে মহানবীর সুন্নাত? মহানবীর সুন্নাত। তেমনিভাবে আমি ওয়াল জামাত মানে কি আমি নিজেই জামাত, না কি আমার আদর্শ হবে সাহাবাগণের জামাত? সাহাবাদের আদর্শ।

সুতরাং নবীর সুন্নাতকে যারা আদর্শ মানে না– তাদের যেমনি সুন্নী নামধারণ ধোঁকাবাজী, তেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরামকে আদর্শের মাপকাঠি মানে না, ওদের জামাত নামধারণ করা ধোঁকাবাজী। কাজেই আহলে সুন্নাত আর জামাত নাম দেখে ধোঁকায় পড়বেন না।

কারণ, আহলে সুন্নাত মানে আমি নিজেই সুন্নাত নয়; নবীর সুন্নাত। ওয়াল জামাত অর্থ আমি নিজেই জামাত নয়; আমার আদর্শ হবে

সাহাবাগণের জামাত। নবীর সুন্নাত আর সাহাবাদের আদর্শ মনে করে যারা ইসলাম ধর্ম পালন করবে, তাদের নাম হবে সত্যিকারের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।

এবার শুনুন! রেখা অঙ্কনের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের ব্যাখ্যা কিভাবে করেছেন। আমার তিলাওয়াতকৃত আয়াতের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতভাবে করেছেন বলেছিলাম? দু'ভাবে। একটা মৌখিকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যা এতক্ষণ আমি আপনাদের সামনে বলছিলাম। আরেকটা রেখা অঙ্কনের দ্বারা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতে কাঠি নিয়ে মাটিতে একটা সোজা রেখা টানলেন। আগে বলেছিলাম, এখন থেকে ওখান পর্যন্ত সুইয়ের মত রেখা টানলে কয়টা রেখা টানা যাবে? একটা।

আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন–

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا

আমার বর্ণিত পথ জান্নাতে যাওয়ার সোজা পথ।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঠি দিয়ে মাটিতে সোজা রেখা টেনে বললেন, এই আল্লাহর বর্ণিত সোজা পথের উদাহরণ। তারপর সেই রেখা থেকে ডান দিকে বাম দিকে বাঁকা করে আরও ছয়টা রেখা টানলেন। মুফাসসিরীনে কিরাম তাফসীরের কিতাবে লিখেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাঁকা ছয়টা রেখা টেনে ৭২ দলের মূল ছয়দলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৭২ দল পথভ্রষ্ট মুসলমানদের মূল দল ছয়টা। এই ছয় দল নবীর সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে, সাহাবাদের আদর্শ ত্যাগ করে নিজের মনগড়া ইসলাম পালন করে যায়। এই ছয় দলের একদলের নাম 'শিয়া'। ছয় দলের এক দলেন নাম 'কাদরিয়া'। ছয় দলের এক দলেন নাম 'জাবরিয়া'। 'শিয়া'দের ১২টা উপদল আছে। কোনো কোনো বর্ণনামতে প্রত্যেকটা মূল দলের ১২টা করে উপদল আছে। কাদরিয়াদের ১২টা উপদল আছে, জাবরিয়াদের ১২টা উপদল আছে। এভাবে ৬ দলের সব ক'টিরই ১২টা করে উপদল আছে। তাহলে ৬ দলের প্রতিটি ১২টা উপদল হলে মোট দল কয়টা? ৭২টা। এই ৬ দলের বাঁকা রেখা টেনে ৭২ দলের উদাহরণ দিয়ে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যে বলেছেন وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا এর উদাহরণ হল, আমার অঙ্কিত রেখা সোজা পথ। যারা আমার সুন্নাত ও সাহাবাদেরকে আদর্শ মেনে ইসলাম পালন করবে তাদের উদারহণ হল, এ রকম সোজাভাবে বেহেশতে যাওয়া। আর যারা আমার সুন্নাতকে ধর্ম পালনে আদর্শের মাপকাঠি মানবে না; যারা আমার সাহাবাকে ধর্ম পালনে আদর্শের মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করবে না, তারা এই সোজা বেহেশতের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ডানে-বামে এদিক-সেদিক চলে যাবে আর ৭২ দলে বিভক্ত হয়ে জাহান্নামী হবে।

তাহলে আল্লাহর রাসূল তিলাওয়াতকৃত আয়াতের ব্যাখ্যা কতভাবে করলেন? দুইভাবে। একটা মৌখিক বিবরণের দ্বারা আরেকটা রেখা অঙ্কনের দ্বারা। এ দু'টো ব্যাখ্যার সারমর্ম কি ভিন্ন ভিন্ন না একটা? একটা। মৌখিকভাবেও বললেন, বেহেশতে যাওয়ার পথ একটা এবং রেখা অঙ্কনের মধ্যদিয়েও বুঝিয়ে দিলেন বেহেশতে যাওয়ার পথ একটা। আর বাঁকা পথে মুসলমান জাহান্নামে যাওয়ার পথ ৭২টি। আল্লাহ তা'আলা বলছেন–

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

বেহেশতে যাওয়ার সোজা পথ– চাই তোমরা কুরআনের পথ বলে ব্যাখ্যা কর, চাই তোমরা ইসলামের পথ বলে ব্যাখ্যা কর, চাই তোমরা নবীগণের পথ বলে ব্যাখ্যা কর, চাই তোমরা সিদ্দিকগণের পথ বলে ব্যাখ্যা কর, চাই তোমরা শহীদগণের পথ বলে ব্যাখ্যা কর, চাই তোমরা ছালেহগণের পথ বলে ব্যাখ্যা কর, চাই তোমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলে ব্যাখ্যা কর– ব্যাখ্যা যেভাবেই কর না কেন, বেহেশতে যাওয়ার সোজা পথ একটা। এই সোজা পথ বাদ দিয়ে, সুন্নাতে রাসূলকে আদর্শের মাপকাঠি রূপে গ্রহণ করা বাদ দিয়ে, সাহাবাগণের জামাতকে আদর্শের মাপকাঠি রূপে গ্রহণ করা বাদ দিয়ে যারাই ধর্ম পালন করে– তারাই ৭২ দলে বিভক্ত হয়ে জাহান্নামে যাবে। বেহেশতে যাওয়ার সোজা পথ কতটা? একটা। আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য মাযহাব বর্তমানে কয়টা? চারটা।

এখন প্রশ্ন হল, মাজহাব চারটা কেন? সোজা পথ যদি একটা হয়ে থাকে, তাহলে মাযহাব চারটা হল কেন? মাযহাব চারটা যদি সঠিক হয়ে

থাকে, তাহলে সোজা পথ একটা হবে কেন? কথা আমার শেষ। শুধু এই আনুসঙ্গিক প্রশ্নের জবাব দিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করে দেব।

মুফাসসিরীনে কিরাম লিখেছেন, পথের ভিন্নতার কারণে মাযহাবের ভিন্নতা নয়, চলার গতির ব্যবধানের কারণে মাযহাবের ব্যবধান। হানাফী মাযহাবও সোজা পথে বেহেশতে চলেছে। শাফিঈ মাযহাবও সোজা পথে বেহেশতে চলেছে। মালিকী মাযহাবও সোজা পথে বেহেশতে চলেছে, হাম্বলী মাযহাবও সোজা পথে বেহেশতে চলেছে। চার জনই কয় পথে চলেছে? একপথে। তাহলে মাযহাব চারটা হল কেন? পথের ভিন্নতার কারণে নয়; চলার গতির ভিন্নতার কারণে।

কথাটা সহজভাবে বুঝার জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এই নানুপুর থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার কোনো পথ আছে? আছে। এই পথে একদল গেল বাসে চড়ে, একদল গেল টেম্পুতে চড়ে, একদল গেল রিক্সায় চড়ে, আরেক দল গেল পায়ে হেঁটে। এখানে কত দল? ৪টা। কত পথে গেল? একটা। সবাই একসাথে পৌঁছবে? না। বেশকম হবে। এই পথচারীদের চার দল হল কেন? পথের ভিন্নতা হওয়ার কারণে না কি গতি ভিন্ন হওয়ার কারণে? চলার গতির বেশকমের কারণে। এই জন্য মুফাসসিরীনে কিরাম লিখেছেন, হানাফী মাযহাবও সিরাতে মুস্তাকীমের পথিক, শাফিঈ মাযহাবও সিরাতে মুস্তাকীমের পথিক, মালেকী মাযহাবও সিরাতে মুস্তাকীমের পথিক, হাম্বলী মাযহাবও সিরাতে মুস্তাকীমের পথের পথিক। এ ভিন্নতা পথের ভিন্নতার কারণে নয়, চলার গতির ভিন্নতার কারণে। এর মাঝে সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন হানাফী মাযহাব। হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ او كما قال عليه الصلوة والسلام

আমার সাহাবার যুগ অর্থাৎ আমার যুগের মানুষের যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ, সাহাবাগণের পরে তাবেঈন সর্বশ্রেষ্ঠ, তাবেঈনদের পরে তাবে-তাবেঈন হল সর্বশ্রেষ্ঠ।

আর চার মাযহাবের চার ইমামগণের মাঝে একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত। বাকী তিন ইমাম একজনও

তাবেঈনদের অন্তরর্ভুক্ত নন। বাকী সবাই তাবে-তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং চার ইমামের মাঝে ইমাম আবূ হানীফা সবার আগে বেহেশতে যাবে আর তাঁর অনুসারী যারা তারাও সবার আগে বেহেশতে যাবে। তাই হানাফী মাযহাব দ্রুতগতি সম্পন্ন।

কথা বুঝে থাকলে বলুন, এই চার মাযহাবও কি ৭২ দলের পথের পথিক নাকি একই দলের সোজা পথের পথিক? একই দলের সোজা পথের পথিক। এ জন্য চার মাযহাবকে ভিন্ন ভিন্ন দল বলা যাবে না, চার মাযহাবের এক দল। চলার গতির ব্যবধানের কারণে কিছু আগে আর কিছু পেছনে হয়েছে। তাহলে হানাফী মাযহাব আহলে সুন্নাতুল জামাত, শাফিঈ মাযহাবও আহলে সুন্নাতুল জামাত, মালেকী মাযহাবও আহলে সুন্নাতুল জামাত আর হাম্বলী মাযহাবও আহলে সুন্নাতুল জামাত।

আর বর্তমান জামানায় যারা হানাফী মাযহাবও মানে না, শাফিঈ মাযহাবও মানে না, মালেকী মাজহাবও মানে না, হাম্বলী মাযহাবও মানে না– তারা সোজা পথে আছে না বাঁকা পথে আছে? বাঁকা পথে আছে। আল্লাহ বলেন, সাবধান! আমার বর্ণিত জান্নাতে যাওয়ার সোজা পথ একমাত্র একটা। তোমরা এই পথ অনুসরণ কর, চাই হানাফী মাযহাবের মাধ্যমে হোক, চাই শাফিঈ মাযহাবের মাধ্যমে হোক, চাই মালেকী মাযহাবের মাধ্যমে হোক, চাই হাম্বলী মাযহাবের মাধ্যমে হোক।

জান্নাতে যাওয়ার সোজা পথ কেবলমাত্র একটা আর তোমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য এই পথের অনুসরণ কর, ভিন্ন ভিন্ন বাঁকা পথগুলোর অনুসরণ করো না। ধর্মকে মনগড়াভাবে বাঁকা পথে তোমরা অনুসরণ করো না, ইসলামী আকিদা মনগড়াভাবে পোষণ করো না, এটা তোমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। আল্লাহ বললেন, আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে এই উপদেশ দিলাম, ওসীয়ত করলাম, নছিহত করলাম; যেন তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পার।

আল্লাহ পাক এ সকল বাঁকা পথ থেকে আমাদেরকে আত্মরক্ষা করে জান্নাতে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। সবাই বলুন আমীন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

মাওয়ায়েজে হাসানাহ

খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,

তরজমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত

মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান—১

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্থান ঃ দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম

হাটহাজারী চট্টগ্রাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . اَمَّا بَعْدُ

فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَدَأَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

মহতারাম হযরত উলামায়ে কেরাম,
সম্মানিত সুধী সমাজ, আমার প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা ও
সর্বস্তরের মুসলমান ভাইসব!

বাংলাদেশের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্‌রাসার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আমরা এই মহাসমাবেশে সমবেত হয়েছি। তাই আমার ইচ্ছা ছিল মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আরয করার। আমার যা মনে পড়ে, গত বছর আপনাদের সামনে মাদ্‌রাসা শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। এর আগের বছরও মাদ্‌রাসা শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা ছিল এবং এবছরও মাদ্‌রাসা শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ থেকে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে। কাজেই আমি আমার ইচ্ছা ত্যাগ করে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করতে চাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বর্তমান প্রেক্ষাপট কি এবং এই প্রেক্ষাপটে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব কর্তব্য কি? এই দু'টি প্রশ্নের জবাব আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلاَّ بِاللّٰهِ

এক আদম শুমারী মতে বর্তমান দুনিয়ায় সর্বমোট ছয়শত কোটি মানুষ

বাস করে। এর এক-চতুর্থাংশ মুসলমান। ছয়শ' কোটি মানুষের মাঝে দেড়শ' কোটি মানুষ মুসলমান। অতীতের ইতিহাসে এত বিপুল পরিমাণ মুসলমানের সংখ্যা পাওয়া যায় নি। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বিপুল পরিমাণ মুসলমান ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু যেমনিভাবে বর্তমানে মুসলমানদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তেমনিভাবে বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানগণ বেঈমান কাফির সন্ত্রাসী এবং মুনাফিকদের হাতে লাঞ্ছিতও সবচেয়ে বেশি। বেশি মুসলমানের দুনিয়ায় মুসলমান বেশি লাঞ্ছিত কেন?

এই প্রশ্নের জবাব হাদীস শরীফে পরিষ্কার উল্লেখ আছে। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– এমন একটা দুর্যোগ আমার উম্মতের মাঝে আসবে, যখন বেঈমান কাফিররা পরস্পরকে আহবান করবে মুসলমানকে খেয়ে ফেলার জন্য, মুসলামনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য। যেভাবে দস্তরখানায় খানার ভক্ষণকারী পরস্পরকে ডাকে খানা খাওয়ার জন্য। সেই সময়ের মুসলমানেরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না; যেমনিভাবে প্রবাহিত পানির মাঝে খড়কুটা ভেসে যায়, তেমনিভাবে বেঈমান কাফিরদের সন্ত্রাসী হামলায় মুসলমানদের অস্তিত্ব ভেসে যাবে।

ছাহাবায়ে কেরাম রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, ওহে আল্লাহ্‌র রাসূল! যে যুগের কথা আপনি বলছেন, মুসলমানরা সেই সময় চরম লাঞ্ছিত হবে, চরম দুর্দিন হবে। সেই সময় কি মুসলমানদের সংখ্যা খুব কম হবে? জবাবে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– না, বরং তোমরা যে পরিমাণ মুসলমান দুনিয়াতে আছ, তোমাদের চেয়ে বহুগুণে বেশি মুসলমান হবে তখন। এ কথা আল্লাহ্‌র রাসূল যখন বলছিলেন, তখন সারা দুনিয়াতে মাত্র কয়েক লাখ মুসলমান ছিল। আমি আগেই বলেছিলাম– কয়েক লাখ নয়, কয়েক কোটি নয়, দেড়শ কোটি মুসলমান বর্তমান বিশ্বে। আমার মনে হয়, হাদীসে বর্তমান এই পৃথিবীর কথাই বলা হয়েছে।

হে আমার ছাহাবারা! তোমরা সংখ্যায় যে পরিমাণ আছ বর্তমান পৃথিবীতে, তোমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি মুসলমান হবে তখনকার দুনিয়াতে, যখনকার দুনিয়ার মুসলমানদেরকে নিষ্পেষিত করার জন্য বেঈমান কাফেররা পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করতে থাকবে। তখন

ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ওহে আল্লাহ্‌র রাসূল! যে দুনিয়াতে এত বিপুল পরিমাণ মুসলমান থাকবে, সেই দুনিয়ায় মুসলমানেরা বেঈমান কাফির সন্ত্রাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হবে কেন? জবাবে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, দুই কারণে। মুসলমান সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও সন্ত্রাসীদের হাতে, বেঈমানদের হাতে, কাফেরদের হাতে এমন চরমভাবে লাঞ্ছিত হবে কেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন দুই কারণে।

এক কারণ হল, দুনিয়ার লোভ। দুনিয়ার লোভ-লালসা।

দ্বিতীয় কারণ হল, মৃত্যুর ভয়।

মুসলমানদের অন্তর থেকে জান্নাতের আশা দূরিভূত হতে থাকবে, আর দুনিয়ার লোভ-লালসা অন্তরে প্রবেশ করতে থাকবে।

আপনারা কী মনে করেন? বর্তমান দেড়শত কোটি মুসলমানের মাঝে জান্নাতের আশাই বেশি, না দুনিয়ার লালসাটাই বেশি? দ্বিতীয় কারণ আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছিলেন, মৃত্যুর ভয়। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হাদীসবিশারদগণ লিখেছেন, মরণের ভয় বলতে ওরা বেঈমান কাফের ও সন্ত্রাসীদের মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিবে না, ওরা নতজানু হয়ে চলবে। মোকাবেলা করলে যদি যুদ্ধের মধ্যে শাহাদাৎ বরণ করে– এই ভয়ে কাফেরদের সাথে আপসকামী হয়ে চলবে। এই হচ্ছে মুসলমানদের লাঞ্ছিত-বঞ্চিত হওয়ার কারণ। আপনারা সময় সচেতন ব্যক্তিরা কি জানেন না যে, বর্তমান মুসলামানেরা কি বেঈমান কাফের সন্ত্রাসীদের মোকাবিলায় রুখে দাঁড়ানোর সাহস রাখে, না নতজানু? নতজানু! কেন নতজানু? রুখে দাঁড়ানোর সাহস নেই কেন? রুখে দাঁড়ালে যদি মরে যাই। আমি রুখে দাঁড়ালে যদি আমাকে মেরে ফেলা হয় এই ভয়ে।

আফগানিস্তানের মুসলামানদের উপর আমেরিকান সন্ত্রাসী বাহিনী হামলা করার সময় পাকিস্তান মজলুম মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল, সন্ত্রাসী আমেরিকানদের মোকাবিলা করেছিল, নাকি জালেমদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল? বুঝে থাকলে বলুন, কিসের ভয়ে? মরণের ভয়ে। নির্দোষ ইরাকবাসীর উপর বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ংকর সন্ত্রাসী বাহিনী বুশ বাহিনী হামলা করার সময় আরববিশ্বের মুসলিম দেশগুলো কার পক্ষাবলম্বন

করেছিল? মজলুম মুসলামনদের পক্ষাবলম্বন করেছিল, নাকি জালেমদের পক্ষাবল্বন করেছিল? বুঝে থাকলে বুলন, কিসের ভয়ে? মরণের ভয়ে। এই হাদীসে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, তখন বিপুল পরিমাণ মুসলমান যে দুনিয়ায় থাকবে, সেই দুনিয়ায় মুসলমান কাফেরদের হাতে লাঞ্ছিত হবে কেন? আল্লাহ্‌র রাসূল বলেন,

(১) দুনিয়ার মহব্বত (২) মৃত্যুর ভয়ে। এই পরিস্থিতির সম্মুখীন আমরা বর্তমান দুনিয়ার দেড়শত কোটি মুসলমান হয়েছি কি না বলুন? এবার লাঞ্ছনার পরিসংখ্যান শুনুন, আমরা কি পরিমাণ লাঞ্ছনার শিকার হয়েছি। সরাসরি কাফেরদের হাতে আজ এককভাবে লাঞ্ছনার শিকার মুসলমান। আর এই কাফেরদের একদল দালাল আছে, মুসলমান সমাজের ভেতরে। ওরা মুসলমান নামেই পরিচিত। এই কাফেরদের দালালেরা আবার অনেক সময় বামপন্থী হিসেবে পরিচিত হয়। এই দালালদের হাতে আজ আমরা তথ্য সন্ত্রাসের শিকার। কাফেরদের হাতে বর্তমান দেড়শত কোটি অস্ত্রের সন্ত্রাসের শিকারে পরিণত। আর কাফেরের দালাল নামধারী বামপন্থী মুসলামনদের হাতে বর্তমান দুনিয়ার দেড়শ কোটি মুসলমান তথ্য-সন্ত্রাসের শিকারে পরিণত।

কাফিররা চালাচ্ছে অস্ত্র-সন্ত্রাস আর বামপন্থীরা চালাচ্ছে তথ্য-সন্ত্রাস। তথ্য-সন্ত্রাস কি? এই কিছু দিন আগে, মনে হয় গত সপ্তাহের যায় যায় দিন পত্রিকায় দেখলাম –এক মুসলমানের বাচ্চা মুসলমান লিখেছে, মাদ্‌রাসায় যারা লেখাপড়া করে তারা হয় কুশিক্ষিত ধর্মান্ধ। এই তথ্যটা কি সঠিক নাকি সন্ত্রাস? সন্ত্রাস। অস্ত্রের সন্ত্রাস না কলমের সন্ত্রাস? কলমের সন্ত্রাস। আমেরিকান বেঈমান কাফের বাহিনী সারা দুনিয়ায় চালিয়ে যাচ্ছে অস্ত্রের সন্ত্রাস আর এই আমেরিকান কাফেরদের দালাল নামধারী মুসলমান বামপন্থীরা মুসলমানের সমাজে চালিয়ে যাচ্ছে তথ্য-সন্ত্রাস।

ডানপন্থী হিসেবে যারা পরিচিত এদের মধ্যে কেউ ছাহাবায়ে কেরামের সমালোচক। এরা কাফেরও নয়; বামপন্থীও নয়। আপনারা আমার বিষয়বস্তু দিয়েছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রেক্ষাপট তো বুঝতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপট কি? সারা দুনিয়ার

সমস্ত কাফিররা সারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের উপর চালিয়ে যাচ্ছে অস্ত্র সন্ত্রাস, মুকসলমানদের মাঝে যারা বামপন্থী– ওরা চালিয়ে যাচ্ছে তথ্যসন্ত্রাস আর মুসলামনদের মাঝে যারা ডানপন্থী হিসাবে পরিচিত, এদের একদল ছাহাবায়ে কেরামের সমালোচনায় লিপ্ত। এরা কাফের? বামপন্থী? ডানপন্থী? ডানপন্থীদের একদল। তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ আছে,

اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِىْ فَقُلْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ

হে আমার উম্মত মুসলমানেরা! তোমরা যখন ঐ সমস্ত লোকদের দেখতে পাবে, যারা আমার ছাহাবাগণের সমালোচনা করে– তখন তাদেরকে বলে দেবে, 'ছাহাবা সমালোচকদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।"

এরা রহমতপ্রাপ্ত ডানপন্থী, নাকি লা'নতপ্রাপ্ত ডানপন্থী? লানতপ্রাপ্ত ডানপন্থী। এরা যে সমস্ত ছাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে হযরত মুয়াবিয়া রাযি. এর। তাই আমি আপনাদের ইসলামের স্বর্ণযুগের হযরত মুয়াবিয়া রাযি. এর একটি ঘটনা শোনাতে চাই। এক সময় রাষ্ট্র পরিচালনা নিয়ে হযরত আলী রাযি.-এর সাথে হযরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর একটি মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। বিচার-শাসন বিভাগের কিছু দায়িত্ব নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল।

এমতাবস্থায় রোম দেশের খ্রিষ্টান শাসক হযরত মুয়াবিয়ার কাছে সংবাদ পাঠাল, আমি জানতে পেরেছি যে, আলীর সাথে আপনার মতবিরোধ চলছে। কাজেই আমি অস্ত্র দিয়ে এবং সেনাবাহিনী দিয়ে আলীর বিরুদ্ধে আপনাকে সাহায্য করতে চাই। এই পত্র সংবাদের জবাবে হযরত মুয়াবিয়া রাযি. রোমের বাদশার নিকট লিখলেন, হে রোমের কুকুর! আলী রাযি. একজন মুসলমান, আমিও একজন মুসলমান; আলী রাযি. এর সাথে আমার যতই মতরিবোধ থাকুক না কেন, এটা নিতান্তই মুসলমানদের ঘরোয়া ব্যাপার।

মুসলমানদের কোনো ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে দুনিয়ার কোনো লাল কুকুরের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। তুই যদি আলীর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাস, তুই যদি আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র পাঠাস, তাহলে তোর বিরুদ্ধে আলীর পক্ষ হয়ে সর্বপ্রথম যে তরবারী উত্তোলিত হবে সেটা হবে আমি মুয়াবিয়ার। এই সেই মুয়াবিয়া, ছাহাবা সমালোচকরা যার সবচেয়ে বেশি সমালোচনা

করে। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ (الفتح/٢٩)

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ এবং তার সঙ্গী সাথীগণ" মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর "সঙ্গী-সাথীগণ" কারা? যারা বলে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য যথেষ্ট, সাহাবার দরকার নেই।"

তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলার পরে আল্লাহ্ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ বললেন কেন? "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সত্যের মাপকাঠির জন্য যথেষ্ট, ছাহাবায়ে কেরাম কে সত্যের মাপকাঠি মানার দরকার নেই।" মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার জীবনের সবক্ষেত্রে সত্যের মাপকাঠি? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একত্রে ৯ স্ত্রী রেখেছেন, এ ক্ষেত্রে কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাপকাঠি না ছাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি?

আল্লাহ্ বলেন- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী সাথীগণের চরিত্র হল নিজেদের বেলায় সদয়; বেঈমান কাফের সন্ত্রাসীদের মোকাবিলায় শক্ত। বলুন! তো আল্লাহ্র কুরআনের এই আয়াতটি হযরত মুয়াবিয়ার ক্ষেত্রে শতকরা কত ভাগ কম পাওয়া গেল? না কি শতকরা একশত ভাগ পাওয়া গেল? হযরত মুয়াবিয়া রোমের খৃষ্টান বাদশাহর পত্রের জবাবে যে কথা বলেছিলেন, বর্তমান দুনিয়ার সবগুলো মুসলিম সরকার শুধু মুয়াবিয়ার স্বরে সুর মিলিয়ে যদি সেই কথাটি বলতো, তাহলে দেড়শ কোটি মুসলমান লাল কুকুরদের হাতে নিগৃহিত-নিষ্পেষিত হত না। এই গেল একদল ডানপন্থীর কথা।

আরেকদল ডানপন্থী আছে, যারা নিজেদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী বলে পরিচয় দেয়। এটা তাদের ষোলআনা ধোঁকা। আল্লাহ্র কসম! এরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নয়। এর সামান্য প্রমাণ দিচ্ছি। আপনাদের জানা মতে ইমাম আবু হানীফা রহ. কোন ওহাবী দলের ইমাম ছিলেন, নাকি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম ছিলেন? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। হযরত ইমাম

আজম আবু হানীফা রহ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা সংক্রান্ত কিতাব লিখেছেন। কিতাবের নাম 'ফিকহে আকবর'। সারা দুনিয়ার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভাষ্যকার আল্লামা মোল্লা আলী কারী এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখেছেন 'শরহে ফেক্হে আকবর" নামে। সেই কিতাবে পরিষ্কার লিখা আছে-

قَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِتَكْفِيْرِ مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِمُعَارَضَةِ قَوْلِهِ تَعَالٰى قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ (النمل/٦٥)

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনের সূরায়ে নামালে বলেছেন, "হে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্! আপনি পরিষ্কার ঘোষণা করে দিন, আসমান জমিনের কোন বাসিন্দাই গাইব জানে না একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া। কার ঘোষণা? আল্লাহ্র! কোথায় দিলেন? কুরআনে। কোন সূরায়? নামালে। 'শরহে ফেক্হে আকবর' নামক কিতাবে লিখা আছে, যেহেতু আল্লাহ্ কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, আসমান-জমিনের কোন বাসীন্দাই গাইব জানে না একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া। সুতরাং যারা বলবে 'নবী গাইব জানেন', তারা মুসলমান নয়। আমি জিজ্ঞেস করি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কিতাবে আছে : যারা বলে নবী গাইব জানেন, তারা মুসলমান নয়। যারা মুসলমান নয়, তারা কিসের সুন্নী। যারা বলে নবী গাইব জানেন, তারা কুরআন মানে না- যারা কুরাআন মানে না তাদের আবার সুন্নী কিসের আর ওহাবী কিসের। এই হল আরেক দল ডানপন্থীদের স্বরূপ।

আমাকে আপনারা বিষয় দিয়েছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দুই অপরাধে দেড়শত কোটি মুসলমান কাফিরদের হাতে নির্যাতিত-নিপীড়িত। এক নম্বর দুনিয়ার লোভ, দুই নম্বর মৃত্যুর ভয়। এই হল বর্তমান প্রেক্ষাপটের এক অংশ। দ্বিতীয় অংশ বেঈমান কাফেরদের হাতে কিভাবে নির্যাতিত -এর চিত্র আমি বর্তমান বুশের বাহিনীর দখলকৃত ইরাকের আবু গারিব কারাগারের একটি চিঠি পড়ে শুনাব একটু পরে ইনশাআল্লাহ্। এই চিঠিটা শুনলেই বুঝতে পারবেন বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানরা কাফেরদের হাতে কি পরিমাণ

নির্যাতিত। ওরা চালিয়ে যাচ্ছে মুসলমানদের উপর অস্ত্রের সন্ত্রাস। আরেক দল নামধারী বামপন্থী মুসলমান মুসলমানদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছে তথ্য-সন্ত্রাস। আর ডানপন্থী বলে পরিচিত একদল মুসলমান ছাহাবায়ে কেরামের সমালোচনায় লিপ্ত। ডানপন্থী বলে পরিচিত আরেকদল মুসলমান নবী গাইব জানেন বলে সুন্নী দাবী করে। বর্তমান প্রেক্ষাপট হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন। সুন্নী হোক, ওহাবী হোক আর শিয়াই হোক, ওরা কি কাফেরের দল নাকি মুসলমানের দল? আহলে সুন্নাতের কিতাবে লিখা আছে : যারা বলে নবী গাইব জানেন, তারা মুসলমানই নয়। তারা কিসের সুন্নী, কিসের ওহাবী?

আপনাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে– কবরে সুওয়াল জওয়াব হবে তিনটি। এটা নবী বলেছেন কি না? হাশরের মাঝে প্রশ্ন হবে ৫টি। নবী বলেছিলেন কি না? পুলসিরাত আছে নবী বলেছিলেন কি না? বেহেশত-দোজখ আছে নবী বলেছেন কি না? গাইব না জানলে নবী কেমন করে বললেন? এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেই ওরা আমাদের সামনে কুফুরী ও শিরকী আকীদা উপস্থাপন করছে। আমি জবাব দেওয়ার আগে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, 'কবরে সুওয়াল জওয়াব হবে তিনটি" –এ কথাটি আপনারাও জানেন কি না? 'হাশরের মাঠে প্রশ্ন করা হবে ৫টি।' এ কথা আপনারাও জানেন কি না? 'পুলসিরাত' একটা আছে আপনারাও জানেন কি না? বেহেশত আছে, দোজখ আছে আপনারাও জানেন কিনা? (প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ-বাচক)

এগুলো জানেন– যদি নবী আলিমুল গাইব হন তাহলে 'ইলমুল গাইব' এর সংজ্ঞা কি? সবাই যদি আলিমুল গাইব হন আর নবীও আলিমুল গাইব হন, তাহলে নবীকে কি কোনো মর্যাদা দেওয়া হল, নাকি সবার সমান বানানো হল? নবীকে অন্যদের সমান বানানো কুফুরী। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সবার সমান মর্যাদা দেননি বরং সমস্ত মাখলুকের উর্ধ্বে মর্যাদা দিয়েছেন। এটা হল, الزامى جواب (উল্টো আপত্তিমূলক জবাব)।

বাস্তব জবাব হল, বর্তমানে দুই ধরনের মাদ্‌রাসা শিক্ষা বাংলাদেশে চালু আছে। একটা হচ্ছে, কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা আরেকটি হল, আলিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা। দু'ধারার মাদ্‌রাসায়ই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের

একটা আকীদার কিতাব পড়ানো হয়। এর নাম হল, শরহে আকাঈদুন নসফী। শরহে আকাঈদুন নসফীর একটা ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে, তার নাম হল, নিবরাস। নিবরাসে লিখা আছে: গাইব এর কোনো অবস্থা যদি কোনো মাধ্যমে জানা হয়, সেই জ্ঞানীকে গাইবের জ্ঞানী বলে না। গাইব এর অবস্থা যিনি মাধ্যম ছাড়া সরাসরি বলেন, তিনিই গাইব এর জ্ঞানী। এবার বলুন! কবরে প্রশ্ন হবে তিনটি। এটা আপনারা জেনেছেন সরাসরি না নবীর মাধ্যমে? হাশরের মাঠে প্রশ্ন হবে ৫টি, তা আপনারা জেনেছেন সরাসরি না নবীর মাধ্যমে? নবীর মাধ্যমে। গাইব এর খবর কোনো কিছুর মাধ্যমে জানলে আলিমুল গাইব হয়? কবরে সুওয়াল জওয়াবের খবর এবং বেহেশত দোজখের খবর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেনেছেন সরাসরি না ওহীর মাধ্যমে? ওহীর মাধ্যমে।

গাইব এর খরব ওহীর মাধ্যমে জানলে কি আলিমুল গাইব হয়? যে কারণে আপনারা এগুলো জানার পরেও আলিমুল গাইব নন, সেই একই কারণে নবীও এগুলো জানা সত্ত্বেও আলিমুল গাইব নন। এবার বলুন! এগুলো আল্লাহ্ কিভাবে জানেন কিসের মাধ্যমে জানেন? কবরে সুওয়াল জওয়াব হবে তিনটি– আল্লাহ্ জানেন কি না? জানেন। কিসের মাধ্যমে? কোনো মাধ্যমে নয়; সরাসরি। হাশরের মাঠে প্রশ্ন হবে ৫টি– আল্লাহ্ জানেন কি না? জানেন। কিসের মাধ্যমে? মাধ্যম লাগে না মাধ্যম ছাড়াই যিনি জানেন, তিনিই আলিমুল গাইব। ওটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। কোন কিছুর মাধ্যমে জানলে আলিমুল গাইব হয় না, ওটাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে আলিমুল গাইব বলা সুন্নী আকীদা নয়; কুফুরী আকীদা। আর কুফুরী আকীদা পোষণ করে নাম ধরে সুন্নী, আর পরিচয় দেয় ডানপন্থী। আবার বলে, 'নবী মানুষ নয়'। অথচ আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন–

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّى هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا (الاسراء/٩٣)

"হে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্! আমার আল্লাহ্ শিরক থেকে পবিত্র আমি মানুষ রাসূল ছাড়া আর কিছু নই। কে বলেছেন? আল্লাহ্। কোথায়? কুরআনে। কুরআনে আল্লাহ্ নবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, আপনি ঘোষণা করে দিন! আমি মানুষ রাসূল ছাড়া আর কিছু নই। এরপর যদি বলে, নবী

মানুষ নন। তাহলে কি ওরা কুরআন মানে? কুরআন না মানলে কি সুন্নী হয়? বুঝে থাকলে বলুন, এই তথাকথিত সুন্নীরা যে আকীদা প্রচার করে বেড়াচ্ছে এগুলো কি আদৌ সুন্নী আকীদা না কুফুরী আকীদা? এই হল, তথাকথিত আরেক দল ডানপন্থী দলের অবস্থা, বর্তমান প্রেক্ষাপট।

আমি একদিন এমন এক ডানপন্থীকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ যে কুরআনে বললেন– بَشَرًا رَسُوْلًا

মানুষ রাসূল এর অর্থ কি? উত্তর দেয়, بشر অর্থ মানুষ নয়; চামড়া। আমি বললাম, মর্ম কি বল। রাসূল মানুষ নয়, রাসূলের চামড়াটা মানুষের। আমি বললাম, ভাল কথা। চামড়ার ভেতরে যা আছে, সেগুলো কি? বলল, সেগুলো 'খোদার জাত'। তাহলে তাদের খোদাকে মানুষের চামড়া দিয়ে প্যাকেট করা যায়, সত্যিকারের মুসলমানের খোদাকে মানুষের চামড়া দিয়ে প্যাকেট করা যায় না। এটা তো গেল এর যৌক্তিক জবাব। এবার শুনুন, এর নকলী জবাব।

বাংলাদেশের উভয় প্রকার মাদ্রাসায় আকাইদের যে কিতাবটি পড়ানো হয়, সেই কিতাবের নাম হল শরহে আকাঈদে নসফী। তাতে লিখা আছে– اَلنَّبِىُّ اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ কুরআনের যে আয়াতে আল্লাহ্ নবীকে بشر বলেছেন আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কিতাবে লিখা আছে; النبى انسان। তা হলে 'ইনসান' এর তরজমা কি করবেন? চামড়া না পশম? ইনসান কাকে বলে? মানুষের চামড়াকে বলে না আপাদমস্তক মানুষকে? আপাদমস্তক মানুষকে। তাহলে আহলে সুন্নাতের কিতাবে লিখা আছে নবী আপাদমস্তক মানুষ। এরপরও বলে নবী মানুষ নয়। এরা সুন্নী, না আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দুশমন? আবার বলে, নবী হাজির-নাজির। আল্লাহ্ অগণিত আয়াতে বলে দিয়েছেন, নবী হাজির-নাজির নন। সবগুলো আয়াত তিলাওয়াত করে শুনানোর সময়ও আমার হাতে নেই। এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ (ال عمران/٤٤)

হে রাসূলে কারীম! ঈসা আ. এর মা মরিয়াম যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন কে হবে তার অভিভাবক- সাব্যস্ত করার জন্য যে লটারী

দেওয়া হয়েছিল, যদি আপনি হাজির-নাজির হতেন, ঘটনা নিজেই জানতেন, আপনি হাজির-নাজির না হওয়ার কারণে- সেখানে উপস্থিতও ছিলেন না, দেখেনও নি। তাই আমি আপনার নিকট সূরায়ে আলে ইমরান নামক সূরা নাজিল করে আপনাকে ঘটনা জানিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ কি বলেছেন? নবী হাজির নাজির থাকলে কুরআন নাজিল করে জানাতে হত, না নিজেই জানতে পারতেন? সূরায়ে ইউসুফের এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ (يوسف/١٠٢)

"হে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্! ইউসুফ আ. এর বড় দশ ভাই ইউসুফকে কূয়ায় নিক্ষেপ করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক মিটিং করেছিল। যদি আপনি হাজির-নাজির হতেন, ঘটনা নিজেই দেখতেন, নিজেই জানতেন, আপনি হাজির-নাজির না হওয়ার কারণে ঘটনা আপনি দেখেন নি, আপনাকে আমার কুরআন নাজিল করে জানাতে হল। এ সমস্ত আয়াতে কি আল্লাহ্ নবীকে হাজির-নাজির বলেছেন, না হাজির-নাজির 'না' বলেছেন? হাজির-নাজির 'না' বলেছেন।

আমাদের সিলেটের এক পণ্ডিত (?) 'নবী হাজির-নাজির' নামক বই লিখেছে। এই বইয়ে যুক্তি দিয়েছে, নাজির হতে গেলে চক্ষু লাগে। চক্ষু ছাড়া নাজির হয় না। আর আল্লাহ্ যে দেখেন, চক্ষু দিয়ে নয়– চক্ষু ছাড়াই দেখেন। সুতরাং নাজির আল্লাহ্ হতে পারেন না– হাজির-নাজির একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুরূপভাবে পাকিস্তানের এক তথাকথিত সুন্নী নামধারী ধোঁকাবাজ جَاءَ الْحَقُّ নামে বই লিখেছে। আমি বলি 'জাল' হক। সেই বইয়ে লিখেছে 'আল্লাহ্কে যারা হাজির-নাজির বলবে তারা বদদ্বীন। হাজির নাজির একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান।" অথচ হাদীস শরীফে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

"হে মানুষেরা! তোমাদেরকে দলে দলে আল্লাহ্ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ নাজির। আল্লাহ্ দেখছেন তোমরা কেমন আমল কর।"

(মুসনাদে আমহদ ঃ ৩/৭)

এই হাদীসে আল্লাহ্‌কে নাজির বলা হয়েছে। আর সুন্নী নামধারী বলে আল্লাহ্‌কে নাজির বলা যাবে না, যেহেতু আল্লাহ্‌র চক্ষু নাই। তোমাদের কথা মানব নাকি নবীর হাদীস মানব? এভাবে বললে যারা বুঝেন না, তাদেরকে অন্যভাবে বলি। আল্লাহ্ হাটহাজারি আসবেন কবে? সিলেটে যাবেন কবে? মক্কা শরীফে যাবেন কবে? আমেরিকা যাবেন কবে? এমন কথা কোন বে-আক্কেলও বলে না। যেহেতু আল্লাহ্ হাজির-নাজির সবসময় সবখানেই আছেন। তিনি আসবেন কোথায় আর যাবেন কোথায়? এই জন্য আল্লাহ্‌র কোনো আসা-যাওয়া নেই। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ রূহের জগত থেকে পিতা আব্দুল্লাহ্‌র ঔরশে এসে ছিলেন কি না? আব্দুল্লাহ্‌র ঔরশ থেকে মায়ের গর্ভে গিয়েছিলেন কিনা? মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়ে মক্কা নগরীতে গিয়েছিলেন কিনা? মক্কা নগরী থেকে মদীনা শরীফে হিজরত করে গিয়েছিলেন কিনা?

হিজরতের আগের বছর মে'রাজে গিয়েছিলেন কিনা? প্রথম আসমানে, দ্বিতীয় আসমানে, তৃতীয় আসমানে, সপ্তম আসমানে, সিদরাতুল মুনতাহায়, আল্লাহ্‌র আরশে, বেহেশত-দোজখ পরিদর্শনে 'ছিলেন' না 'গেলেন'? গিয়ে রইলেন, না আবার ফিরে এলেন? হে বে-আক্কেলের দল! হাজির-নাজির গেলেন কিভাবে আর এলেন কিভাবে? হাজির-নাজির যায় আসে? হাজির-নাজির সবসময় সবখানে আছেন, সবকিছু দেখেন। যাবেন কোথায় আর আসবেন কোথায়? যেহেতু আল্লাহ্ হাজির-নাজির, তাই তার আসা-যাওয়া নেই। আর যেহেতু নবীর আসা-যাওয়া আছে, তাই নবী হাজির-নাযির নন। এবার বলুন! এসব আকীদা কি সুন্নী আকীদা না কুফরী আকীদা? কুফরী আকীদা। এই গেল একদল ডানপন্থী সুন্নী নামধারীদের বর্তমান প্রেক্ষাপট।

এবার শুনুন! বেঈমান কাফিররা যে মুসলমানদের উপর অস্ত্র-সন্ত্রাস চালাচ্ছে, তার বিবরণ। এ ব্যাপারে আমি বাংলাদেশে প্রকাশিত একটি পত্রিকা পড়ে শোনাব। সন্ত্রাসী বুশের বাহিনীর দখলকৃত ইরাকের আবু গারিব কারাগারে হায়েনারা নারীদের বন্দী করে রেখেছে– এমন একটা নারী অত্যন্ত কষ্ট করে একটি চিঠি ইরাকী গেরিলা বাহিনীর কাছে পাঠিয়েছিল। সেই চিঠিটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় প্রচার করা হয়েছে আর

বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার ঐত্যহ্যবাহী পত্রিকা মাসিক হেফাজতে ইসলামের ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ইং সংখ্যায় ঐ চিঠিটার বাংলা অনুবাদ ছাপা হয়েছে। আমি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

নির্যাতিতা ফাতিমা বহুকষ্টে একটি চিঠি পাঠাতে সক্ষম হয় ইরাকি যোদ্ধাদের কাছে। আর এর ফলেই তারা দুঃসাহসিক হামলা চালায় আবু গারিব কারাগারে। ফাতিমাসহ অন্যান্য বন্দী ইরাকিদের উদ্ধার করাই ছিল হামলার উদ্দেশ্য। কি ছিল ঐ চিঠিতে তা এখন জানতে চাইছে সবাই। ফাতিমার চিঠির বাংলা অনুবাদ এখানে তুলে ধরা হল ঃ

"মহান করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি"। বল আল্লাহ্ এক, তিনি সবকিছুর একমাত্র সত্বাধিকারী, তিনি কারো কাছ থেকে জন্ম নেননি, কাউকে জন্মও দেননি। তার সঙ্গে তুলনীয় কেউ নেই, কিছুই নেই। কখনও তার সমকক্ষ কেউ হবে না। (সূরা আল-ইখলাস)

প্রিয় ইরাকি মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা, আমি শুরুতে সূরা ইখলাসের উদ্ধৃতি দিলাম। কারণ, এই সূরা আমার কাছে মহান আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় তুলে ধরতে সবচেয়ে ভাল বলে মনে হয়। মুমিনের অন্তরে এই সূরাটি গেঁথে আছে সুদৃঢ়ভাবে।

হে আল্লাহ্‌র পথে লড়াইকারী প্রিয় মুজাহিদীন ভাইয়েরা! আপনাদের বলার আর কি আছে আমার! শুধু এতটুকু বলি! আমার মত অসংখ্য ইরাকি বোনকে আটকে রাখা হয়েছে এবং মার্কিন সৈন্যরা তাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। আমাদের পেটে এখন মার্কিন সৈন্যরূপ পশুদের বাচ্চা। প্রিয় ভাইয়েরা! আমি আপনাদের ধর্মীয় সম্পর্কের বোন। আমাকে একদিন ৯ বার শ্লীলতাহানীর শিকার হতে হয়েছে। ধারণা করতে পারেন!

আচ্ছা কল্পনা করুন তো, আপনার আপন বোনকে যদি এভাবে শ্লীলতাহানীর শিকার করা হত! কেমন লাগত আপনার! আমাকে কেন আপন বোন ভাবতে পারছেন না। আমার মতো ১৩টি মেয়ে রয়েছে কারাগারের এই প্রকোষ্ঠে। সকলেই অবিবাহিতা। মার্কিন পশুরা আমাদের শরীর থেকে পোশাক কেড়ে নিয়ে গেছে। তারা আমাদের পোশাক পড়তে দেয় না। সকলের সামনেই ওরা আমাদের শ্লীলতাহানী করে। এই হচ্ছে আমাদের এখনকার দিনলিপি। এভাবে বেঁচে থাকাটা কার কাম্য হতে

পারে? আমাদের এখানকার একটি মেয়ে নির্যাতন সইতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এক মার্কিন সৈন্য তার শ্লীলতাহানীর পর তার বুক ও উরুতে প্রচণ্ড আঘাত করে। তাকে যে অত্যাচার করা হয়, তা কল্পনাও করতে পারবেন না। এরপর মেয়েটি দেয়ালের সাথে মাথা ঠুকে ঠুকে আত্মহত্যা করে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। মহান আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা রাখি। কারণ, তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

আমরা ইরাকি মেয়েরা যা কখনো কল্পনা করতে পারিনি, অথচ সে রকম ভয়াবহ নিষ্ঠুর নিপীড়ন, অপমান আর লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত হয়েছি। এর চেয়ে মর্মান্তিক কিছু হতে পারে না। আর এ যন্ত্রনা কেউ কখনো ভাষায় প্রকাশ করতেও পারে না। কারাগারে প্রতিরাতেই আমাদের ওপর নির্মম নিপীড়ন চালানো হয়। মার্কিন সৈন্য নামধারী পশুগুলোর নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে আমরা লাঞ্ছিত হচ্ছি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত। পশুগুলো এসেই আমাদের শরীরের ওপর লাফিয়ে পড়ে। ছিড়ে খুঁড়ে খেতে চায় আমাদের। পশুগুলোর অত্যাচার থেকে একটি রাতও মুক্তি পাই না আমরা।

আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা আবু গারিব কারাগারে হামলা করুন। আমাদেরসহ তাদের ধ্বংস করুন। হত্যা করুন। আমাদেরকে এখানে ফেলে রাখবেন না। অনুগ্রহ করে আমাদেরসহ তাদের ধূলোয় মিশিয়ে দিন। ট্যাংক আর জঙ্গি বিমানকে পরোয়া না করে ছুটে আসুন, আবু গারিব কারাগারে। আমাদের প্রতি মায়া রাখবেন না। প্লিজ আমাদের বাঁচিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। আমাদেরসহ ওদের মেরে ফেলুন।

আমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে আমাদের যে সতীত্ব রক্ষা করে চলি আজন্ম, সেই সতীত্ব এই পশুদের হাতে খুইয়ে ফেলেছি আমরা। এখন আর বেঁচে থাকার কোন সাধ আমাদের নেই। আমরা যে কুরআন গলায় ঝুলিয়ে রাখি, সেই কুরআন ওরা ছিঁড়ে ফেলেছে। আমাদের চারপাশে তারা পবিত্র কুরআনের পাতা ছিড়ে ফেলে রাখছে।

প্রিয় ভাইয়েরা, আমি আবারো অনুরোধ করছি। বারবার অনুরোধ করছি, তাদের হত্যা করুন। তাদের ধ্বংস করুন। আর আপনাদের হামলার ফলে আমরাও যদি নিহত হই তাতেও শান্তি পাব। আমরা মৃত্যুর

মাধ্যমেই হোক– তবু মুক্তি পেতে চাই এই জাহান্নামের বিভীষিকা থেকে। সাহায্য করুন! সাহায্য করুন!! সাহায্য করুন!!!

সূত্র : মাসিক হেফাজতে ইসলাম
ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ইং সংখ্যা

যে চিঠি আপনাদেরকে আমি পড়ে শুনিয়েছি, আপনারা কি ধারণা করেন বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানরা বেঈমান কাফিরদের হাতে কি পরিমাণ লাঞ্ছিত বেইজ্জতি ও অপমানিত হতে পারে। বর্তমান দুনিয়ার দেড়শ কোটি মুসলমানের কাছে আমি জানতে চাই– সেই ইরাকী নির্যাতিতা বোনের পক্ষ হয়ে ইরাকের উপর এই লাল কুকুরের বাহিনী ঝাপিয়ে পড়ল ইরাকীদের কোন অপরাধে? কী অপরাধ ছিল ইরাকীদের? আমেরিকা কি আদৌ কোনো অপরাধ প্রমাণ করতে পেরেছে? পারেনি।

এভাবে পশুর মত নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে মুসলমানদের ওপর। সেদিকে যেন কোনো মুসলমানদের দৃষ্টি না যায়; দৃষ্টিকে ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে আত্মঘাতি কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। একদল দালাল দিয়ে, যেমনি মিরজাফর দিয়ে নবাব সিরাজ উদ দৌলাকে পরাজিত করিয়ে ছিল এ দেশে। যেমন মির সাদিককে দিয়ে টিপু সুলতানকে পরাজিত করিয়ে ছিল এদেশে ইংরেজরা।

ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেকটি মুসলিম দেশে লাল কুকুরের দলের একদল দালাল মুসলমানদের ঘরে জন্ম নিয়েও আলেমদেরকে জঙ্গিবাদী বলে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচার করছে। ইরাকের অবস্থা বুঝে থাকলে বলুন! তো মুসলমান জঙ্গিবাদী না ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের লাল কুকুর বাহিনী জঙ্গিবাদী? কেন আলেমদের বিরুদ্ধে এত অপবাদ রটাচ্ছে। যেন ওদের নির্যাতনের দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি না যায়। যেন ওদের পৈশাচিক কর্মকাণ্ড ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়ে যায়।

একটু আগে শিরক-বিদাতে লিপ্ত একদল তথাকথিত সুন্নীদের কথা বলেছিলাম। ওরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে; যেন কওমী মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়। কি ব্যাপার? এরা-ই জঙ্গিবাদী! কওমী মাদ্সারা ওয়ালারা জঙ্গিবাদী? আপনারা পত্র-পত্রিকায় দেখেছেন, ড. গালিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে জঙ্গি অভিযোগে। সে কোনো কওমী মাদ্রাসায় পড়েছিল? যে ড. গালিবকে এরেস্ট করেছে জঙ্গি অভিযোগে, সে কোনো

কওমী মাদ্‌রাসায় পড়েছিল? হে সুন্নী নামধারী বেদয়াতীরা! তোমরা যদি জঙ্গিবাদের অভিযোগে কওমী মাদ্‌রাসা বন্ধের দাবী করে থাক, যা তোমরা প্রমাণ করতে পার নি আর আলিয়া মাদ্‌রাসায় পড়ুয়া ড. গালিব প্রমাণ করে দিয়েছে বাংলাদেশে যদি জঙ্গিবাদ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আমেরিকার কেউ দালালী করে থাকে, তাহলে তোমাদের সেই ড. গালিব করেছে। আলিয়া মাদ্‌রাসায় পড়ে ড. গালিব আহলে হাদীসের নেতা হয়েছে। কোন মাদ্‌রাসায় পড়ে? জঙ্গি অভিযোগে ধরা পড়েছে কি না? যদি প্রমাণ হয় তাহলে তোমাদের দাবী মতে আলীয়া মাদ্‌রাসা বন্ধ করে দেওয়ার দরকার। কিন্তু আমরা উগ্রপন্থী নই। আমরা যেমন কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়া মাত্রই বিচার চাই না, অভিযোগের প্রমাণ চাই। অভিযোগ দেওয়া মাত্রই কি বিচার চাই, না প্রমাণ চাই?

যদি গোপনে কোনো মানুষকে হত্যা করার অভিযোগ, গোপনে দেশের সম্পদ নষ্ট করার অভিযোগ কারো বিরুদ্ধে আদালতে প্রমাণিত হয়– আমি পরিষ্কার ভাষায় হক্কানী উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে ঘোষণা করতে চাই; গোপনে সম্পদ বিনষ্ট করার বিধান ইসলামে নেই। গোপনে মানুষ হত্যা করার বিধান ইসলামে নেই। বিধি সম্মতভাবে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার আগ পর্যন্ত গোপনে হত্যা করা হারাম। গোপনে বোমাবাজী করা হারাম। গোপনে হামলা করা হারাম। সুতরাং এই গোপন হামলা, গোপন হত্যা, গোপনে ধ্বংসযজ্ঞ যারা চালিয়ে যাচ্ছে– ওরা ইসলামের কেউ নয়, মুসলমানদের কেউ নয়, ওরা কওমী মাদ্‌রাসার কেউ নয়, এরা আমেরিকার দালাল।

যেমনিভাবে নবাব সিরাজ উদ. দৌলার সেনা-প্রধান মিরজাফরকে দালাল বানিয়েছিল। মির সাদেককে দালাল বানিয়েছিল, টিপু সুলতানকে পরাজিত করার জন্য। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে দালাল বানিয়েছিল উপমহাদেশের জিহাদকে ঠেকাবার জন্য। বেরলভী জেলার আহমদ রেজাকে দালাল বানিয়েছিল ইসলামের আকীদা ধ্বংস করার জন্য, ঠিক তেমনিভাবে এই আমেরিকার লাল কুত্তার দল প্রত্যেকটি মুসলিম দেশে এই গোপন হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, এটা প্রমাণ করার জন্য যে তোমরা জঙ্গিবাদী, এ জন্য তোমাদেরকে মারি। আসলে এ ঘটনা ঘটানোর আগেই এরা সন্ত্রাসী

কর্মকাণ্ড সারা দুনিয়ার মুসলমানের উপর চালিয়েছে। আমি আশা করি, আমার এ কয়েকটা কথার দ্বারা বর্তমান প্রেক্ষাপট বুঝতে পেরেছেন। এবার শুনুন, আমাদের করণীয় কি? কারণ, আপনারা আমার বিষয় দিয়েছিলেন 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব-কর্তব্য।'

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস শরীফে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, এ ধরনের পরিস্থিতি যখন দেখা দিবে, যখন হক্কানীরা নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হবে, যখন হক কথা বলার মত মানুষ থাকবে না, যখন সবাই বাতিলের বন্যায় ভেসে যাবে, তখন হক্কানী উলামায়ে কেরামের কি দায়িত্ব হবে? কি কর্তব্য হবে? কি সুসংবাদ হবে? আল্লাহ্‌র রাসূল হাদীস শরীফে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন সেই হাদীসের সামান্য ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি লেখা লিখেছিলাম কিছু দিন আগে প্রকাশ হয়েছে। বইয়ের নাম নূরে মদীনা।

সেই বইয়ের একটি প্রবন্ধ যেখানে করণীয় সম্পর্কে হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা পড়ে শুনিয়ে দিলেই আপনারা সুস্পষ্ট বুঝতে পারবেন। যেহেতু বর্তমান প্রেক্ষাপট বুঝতে পেরেছেন, তাই করণীয় কি– তাও বুঝতে পারবেন। আমি খুৎবার শেষে একটি ছোট্ট হাদীস পড়েছিলাম। হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম শরীফসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে আছে। আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بَدَأَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ

আমি তরজমা ও ব্যাখ্যা বলবো না। যেহেতু এই লেখার মাঝে ব্যাখ্যা শিরোনাম ছিল 'তু'বা লিল গুরাবা'। ওই শিরোনামের ব্যাখ্যাটি এক হাদীসের শেষাংশ। এর অর্থ হচ্ছে, গরীবদের জন্য সুসংবাদ। আমাদের সমাজে অভাবগস্তদেরকে গরীব বলা হয়। কিন্তু হাদীসে এ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি। হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম শরীফসহ বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ হাদীসটি হচ্ছে, ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেছিল গরীব অবস্থায় আর এ অবস্থাতেই পুনরায় ফিরে যাবে। সুতরাং গরীবদের জন্য সুসংবাদ। সহীহ্ মুসলিম শরীফের অন্য একটি হাদীসে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমার উম্মত সম্পদের অভাবে পতিত হবে– এ আশঙ্কা আমি করি না; বরং তারা সম্পদের প্রাচুর্যের

কারণে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাবে, এখানেই হচ্ছে আমার আশঙ্কা।'

তাহলে বুঝা যাচ্ছে, পূর্বোক্ত হাদীসের 'গুরাবা' শব্দটি সম্পদের অভাবগ্রস্তের অর্থে ব্যবহৃত নয়, তাহলে হাদীসের গুরাবা শব্দের অর্থ কি তা নিম্নোক্ত বিবরণে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইবনে মাজা শরীফের বর্ণিত এক হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরাবা শব্দটি উল্লেখ করেছিলেন– গুরাবা গরীব শব্দের বহুবচন। তখন লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! গুরাবা কারা? উত্তরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা স্বগোত্রীয়দের অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হয়। যাদেরকে নিজের আপনজন ঘৃণা করবে, তাদেরকে এই হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরাবা বলেছেন। আপনাদের আপনজন ইসলামী শিক্ষিতদেরকে অবজ্ঞা করে কি না? করে। এই রকম অবজ্ঞার শিকারে যারা পরিণত হবে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে গরীব বা গুরাবা বলেছেন। একবচনে গরীব বহুবচনে গুরাবা। এ ধরনের ৫টি হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসের অর্থ আমি শুনাচ্ছি।

অন্য বর্ণনায় উল্লেখ আছে লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! গুরাবা কারা? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যারা বিপথগামী মানুষকে পথের সন্ধান দিবে। যারা বিপথগামী মানুষকে পথের সন্ধান দিবেন তারাই এই হাদীসের গুরাবা শব্দের অর্থ। অন্যত্র গুরাবা শব্দের ব্যাখ্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা ইসলাম বিরোধী পরিবেশে নিজের দ্বীন ও ঈমান রক্ষার্থে অন্যত্র পালিয়ে যাবেন, তাদেরকে হাদীসে বলা হয়েছে গরীব বা গুরাবা। আরেক বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন মানুষ ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হবে, তখনও যে সকল মুষ্টিমেয় লোক অনুকূল পরিবেশে ইসলামের অনুশাসন পালনে অটল থাকবেন, তাদেরকেই হাদীসে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

আহমদ ও তাবারানীতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে; সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! গুরাবা কারা? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বিপুল সংখ্যাক অসৎ লোকের

পরিবেশে অবস্থানকারী অতি অল্পসংখ্যক সৎলোক যাদের অনুসারীদের তুলনায় বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যা হবে অনেক বেশি। বলুন, আপনারা যারা হক পথে আছেন, তাদের সংখ্যা বেশি– না বিরুদ্ধবাদীদের সংখ্যা বেশি? এরকম লোকদেরকেই মুসলিম শরীফের হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল গরীব শব্দ দিয়ে বুঝিয়েছেন। উপরোক্ত বর্ণনাসমূহে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরাবা কারা তাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

ইসলামের অনুশাসন পালনে এমন কিছু নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানকে আল্লাহ্র রাসূল গুরাবা বলেছেন, যাদের সংখ্যা হবে সমাজে এত-ই নগণ্য যে, তাদের অনুসারীর সংখ্যা হবে বিরুদ্ধবাদীদের তুলনায় অতি অল্প। তারা এমনই সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন যে, শুধু সমাজের কাছেই অবহেলিত হবেন না; বরং স্বগোত্রীয়দের কাছেও অবজ্ঞার পাত্র হবেন। প্রয়োজনে তারা ইসলাম বিরোধী সমাজ ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু ইসলামের অনুশাসন ত্যাগ করবেন না। আমেরিকার ভয়ে পক্ষাবলম্বন করে ফেললে এই হাদীসের সুসংবাদের মাঝে হবেন? আমেরিকার ভয়ে ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করলে, ইসলামের অনুশাসন ছেড়ে দিলে এই হাদীসের সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন? কখনো নয়।

এবার বুঝা দরকার আমাদের করণীয় কি? বর্তমান প্রেক্ষাপটে লাল কুত্তার দলের চোখরাঙ্গানোর ভয়ে নবীর তরীকা ছেড়ে দিলেন, আল্লাহ্র বিধান ছেড়ে দিলেন, এই হাদীসের বর্ণিত সুসংবাদ পাওয়া যাবে না। এমন সংকটময় পরিস্থিতিতেও তারা ২ টি মহান দায়িত্ব পালন করে যাবেন। সুতরাং আমাদের করণীয় দায়িত্ব দু'টি। হাদীস শরীফে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি দায়িত্বভার দিয়েছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের দায়িত্ব কয়টা? দু'টা।

(১) নিজেরা ইসলামের অনুশাসন পালনে অটল থাকা।

(২) ইহ-পরকালের শান্তি ও মুক্তির জন্য ইসলামের অনুশাসন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এ মর্মে সমাজের প্রতি দাওয়াত অব্যাহত রাখা।

দায়িত্ব কর্তব্য বুঝতে পেরেছেন? ইসলামের অনুশাসন পালনে অটল থাকা এক দায়িত্ব। ইহ-পরকালে-নবীর তরীকা ছাড়া ইসলামের বিধান অনুসরণ ছাড়া দুনিয়াতে শান্তি আসার যেমন বিকল্প ব্যবস্থা নেই,

আখেরাতেও এছাড়া শান্তির ও মুক্তির বিকল্প ব্যবস্থা নেই। সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য কয়টি সাব্যস্ত হল? দু'টি।

ইসলামের কথা বললে যদি মৌলবাদী বলে, ইসলামের কথা বললে যদি সাম্প্রদায়িক বলে, ইসলামের কথা বললে যদি মূর্খান্ধ বলে, ইসলামের কথা বললে যদি ধর্মান্ধ বলে, ইসলামের কথা বললে যদি কুশিক্ষিত বলে, তাহলে ওদের তথ্য-সন্ত্রাস, অস্ত্র-সন্ত্রাস, কাফের অস্ত্র সন্ত্রাসের আর মুনাফেকদের তথ্য-সন্ত্রাসের ভয়ে ইসলামের অনুশাসন ছেড়ে দেওয়া দায়িত্ব-কর্তব্য, নাকি পালনে অটল থাকা দায়িত্ব-কর্তব্য? এক নম্বর দায়িত্ব-কর্তব্য হল, নিজে ইসলামে অটল থাকা আর দুই নম্বর দায়িত্ব-কর্তব্য হল, এ পথে অপরকেও আহ্বান করা, আর একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তির আর কোন পথ নেই।

কাফেরদের পথ শান্তির পথ নয়, মুনাফেকদের পথ শান্তির পথ নয়, সন্ত্রাসীদের পথ শান্তির পথ নয়। শান্তির একমাত্র পথ ইসলাম। আপনারা যদি আমার কথা বুঝে থাকেন, তাহলে বলুন! বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের যে দায়িত্ব– সেই দায়িত্ব কওমী মাদ্‌রাসা বন্ধ করে দিলে কি পালন করা যাবে, না চালু থাকলে দায়িত্ব পালন করা যাবে? কওমী মাদ্‌রাসা চালু থাকলে। তাহলে কওমী মাদ্‌রাসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকী আসছে কেন? মাদ্‌রাসায় নাকি জঙ্গিবাদ শিক্ষা দেওয়া হয়? আমি জিজ্ঞেস করি, মেজর মতিউর রহমান কয়েক বছর আগে যে জঙ্গি-তৎপরতা চালিয়ে ছিলেন আর সেনাবাহিনী দিয়ে সরকার দমন করে ছিল, এই মেজর মতিউর রহমান কি কোনো মাদ্‌রাসায় পড়ে ছিলেন? তারা যখন জঙ্গি-তৎপরতা চালায়, তখন তাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার প্রশ্ন আসে না।

স্কুল-কলেজে যখন বোমাবাজি হয়, তখন স্কুল-কলেজ বন্ধ করার প্রশ্ন আসে না। আলিয়া মাদ্‌রাসার ড. গালিব যখন ধরা পড়ে, তখন আলিয়া মাদ্‌রাসা বন্ধ করার প্রশ্ন আসে না। কওমী মাদ্‌রাসার ছাত্ররা কুরআন হাদীস পড়ে, আরবী গ্রামার পড়ে, আরবী সাহিত্য পড়ে, ইসলামের ইতিহাস পড়ে। বোমা বানানো বা শিক্ষা করার জন্য কোনো বই-ই পড়ানো হয় না, তাদেরকে বলে বোমাবাজ, তাই কওমী মাদ্‌রাসা বন্ধ করে দাও, এর মানেই হল 'যাকে দেখতে নারী তার চলন বাঁকা।" কওমী মাদ্‌রাসার

ছাত্ররা কি বোমা বানানোর কোন বিজ্ঞান পড়ে? কি বলেন, কওমী মাদ্‌রাসায় কি বোমা বানানোর কোন বিজ্ঞান পড়ানো হয়? হয় না। আপনারা জেনে থাকলে বলুন! বিজ্ঞান কোথায় পড়ানো হয়? আধুনিক বিজ্ঞান কোথায় পড়ানো হয়? মুঈনুল ইসলাম (হাটহাজারী) মাদ্‌রাসায় আধুনিক বিজ্ঞান পড়ানো হয়? পটিয়া মাদ্‌রাসায় আধুনিক বিজ্ঞান পড়ানো হয়? জিরি মাদ্‌রাসায় আধুনিক বিজ্ঞান পড়ানো হয়? নাজিরহাট মাদ্‌রাসায় আধুনিক বিজ্ঞান পড়ানো হয়? ঢাকার কোনো কওমী মাদ্‌রাসায় আধুনিক বিজ্ঞান পড়ানো হয়? সিলেটের কোনো কওমী মাদ্‌রাসায় আধুনিক বিজ্ঞান পড়ানো হয়? আধুনিক বিজ্ঞান কিছুটা হলে আলিয়া মাদ্‌রাসায় পড়ানো হয়? পুরোটা হলে স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ানো হয়। যারা বোমা বানানো জানেই না, তারা জঙ্গিবাদ আর যারা বোমা বানাল, তারা খালাস পেয়ে গেল। এই অত্যাচার কেন? কেন এই তথ্য-সন্ত্রাস? সুতরাং রুখে দাঁড়াতে হবে অস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে, রুখে দাঁড়াতে হবে দেড়শত কোটি মুসলমানের সমস্ত তথ্য-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে।

যেমনিভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে আমেরিকান বেঈমান কাফের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে, ঠিন তেমনিভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে মুসলমান সমাজের ভেতরে মুসলাম নামধারী মুনাফেক, মীর জাফর আর তথ্য সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে। যদি রুখে দাঁড়াতে পারি, যদি ইসলামের বিধান পালনে অটল থাকতে পারি, ইসলাম ছাড়া শান্তি নেই যদি বুঝতে পারি, তবেই আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় হবে। মহান আল্লাহ্‌ আপনাদের আমাদের সবাইকে কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গোটা দুনিয়ার মুসলমানের আমল সংশোধনের মাধ্যমে এই মহা বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করার সৌভাগ্য দান করুন। সবাই বলুন আমীন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সংকলন কাল ঃ ১২ জুন ২০০৯ ঈসায়ী।

মাওয়ায়েজে হাসানাহ
খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,
তরজমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত
মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান—১

বিষয় ঃ দাওয়াত ও তাবলীগ

স্থান
আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন
জামিয়াতুল ফালাহ্ ময়দান, চট্টগ্রাম।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

মুহতারাম হাজিরীন!

আমরা শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, সমস্ত নবী-রাসূলের মাঝে আমাদের নবীকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করেছেন। আর সমস্ত নবীর উম্মতের মাঝে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ভাষায় এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলেছেন। এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে।

কল্যাণ সাধনের পদ্ধতি–

تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমরা মানুষকে সৎ কাজে আদেশ দেবে অসৎ কাজে বাঁধা দেবে।

হাদীস শরীফে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান, কোনো নবী ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি বেহেশতে প্রবেশ করব না। আর কোনো নবীর উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মত মুসলমানেরা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। এই হাদীস এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ, আমাদের নবী সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর এই নবীর মুসলমান উম্মত সকল নবীর উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? বিভিন্ন কারণে আমাদের নবী অন্যান্য নবীগণ থেকে শ্রেষ্ঠ, অনুরূপভাবে এই নবীর উম্মত অন্য নবীর উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ। যে সমস্ত কারণে আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ এর মাঝে একটি হল, তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন। যার আবির্ভাবের পর দুনিয়ার জন্য আর কোনো নবীর আবির্ভাবের দরকার থাকে না।

পূর্ববর্তী সকল নবীর আবির্ভাবের পরও দুনিয়ার জন্য নবুওয়াতের দরকার বাকি ছিল। একমাত্র আমাদের নবী খাতামুন নাবিয়্যিন, যার আবির্ভাবের পরে দুনিয়াবাসীর জন্য আর কোনো নবীর আবির্ভাবের দরকার নেই। যে ডাক্তারের চিকিৎসার পরে আরো ডাক্তারের দরকার থাকে, তিনি ডাক্তার হতে পারেন কিন্তু শ্রেষ্ঠ ডাক্তার হতে পারেন না। কিন্তু যে ডাক্তারের চিকিৎসার পর আর কোনো ডাক্তারের চিকিৎসার প্রয়োজন বাকি থাকে না- তিনি একদিকে শেষ ডাক্তার অপরদিকে শ্রেষ্ঠ ডাক্তারও। এজন্য আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী রহ. তাফসীরে কবীরে লিখেছেন– শেষ নবীর জন্য শ্রেষ্ঠ নবী হওয়া অপরিহার্য আর শ্রেষ্ঠ নবীর জন্য শেষ নবী হওয়া অপরিহার্য। যিনি শেষ নবী হবেন না, তিনি শ্রেষ্ঠ নবী হতে পারেন না। আর যিনি শ্রেষ্ঠ নবী হবেন না, তিনি শেষ নবী হতে পারেন না।

বিষয়টি হুবহু চিকিৎকদের মত। যিনি শেষ ডাক্তার তিনিই শ্রেষ্ঠ ডাক্তার। যিনি শ্রেষ্ঠ ডাক্তার তিনিই শেষ চিকিৎসক। অনুরূপভাবে যিনিই শেষ নবী তিনিই শ্রেষ্ঠ নবী, যিনি শ্রেষ্ঠ নবী তিনিই শেষ নবী। সুতরাং আমাদের নবী সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠনবী– এর প্রধান কারণ তিনি শেষ নবী। ডাক্তাররা মানুষের শারীরিক রোগের চিকিৎসক হয়ে থাকেন আর সমস্ত নবী হলেন মানুষের রূহানী রোগের চিকিৎসক। মানুষের কোন রোগ হলে চিকিৎসা করেন ডাক্তারগণ। মানুষের আত্মার মাঝে কোন রোগ হলে

চিকিৎসা করেন নবীগণ। কাজেই শারীরিক চিকিৎসকদের মাঝে শেষ যিনি তিনিই শ্রেষ্ঠ, আর রূহানী চিকিৎসকদের মাঝে যিনি শেষ তিনি শ্রেষ্ঠ। তাই যেমনভাবে শেষ ডাক্তারই শ্রেষ্ঠ ডাক্তার তেমনিভাবে শেষ নবীই শ্রেষ্ঠ নবী।

আমাদের নবী অন্য সকল নবী থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার যত কারণ আছে, এর মাঝে প্রধান কারণ তিনি শেষ নবী। হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান–

سَيَكُوْنُ فِىْ أُمَّتِى كَذَّابُوْنَ ثَلاَثُوْنَ ، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِىٌّ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ، لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ . جامع الاصول : رقم : ٨٨٧٩

আমার আবির্ভাবের পরে যারা নবুওয়াত প্রাপ্তির দাবী করবে, প্রত্যেকেই হবে মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। এর কারণ আল্লাহর রাসূল বলেন, أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ। আমি শেষ নবী। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, আমি শেষ নবী। আবার তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ সহীহ মুসলিম শরীফের একটা রেওয়ায়েতে আছে لاَ نُبُوَّةَ بَعْدِىْ আমার পরে আর কোন নবী নেই। 'নবী নেই' কথার ব্যাখ্যায় আল্লাহর রাসূল নিজেই বলেছেন আমার পরে আর কেউ নবুওয়াত পাবে না। এখানে হাদীসের তরজমা করতে আমরা একটা ভুল করে থাকি। যে কারণে সমাজে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। যে ভুলকে কেন্দ্র করে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী সাজানোর সুযোগ হয়। হাদীসের তরজমায় যে ভুলটা করে থাকি– আল্লাহর রাসূল لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ আমার পরে আর কোন নবী নেই বলেছেন। আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না বলেননি। لاَ نَبِىَّ এখানে لا টা لانفى جنس আর نبى তার ইসম; ফে'ল নয়। কোনো নবী আসবে না– এর তরজমা হয় না। لا نبى بعدى এর অর্থ হল, আমার পর আর কোন নবী নেই।

যেহেতু ঈসা নবী কিয়ামতের আগে আবারও আসবেন, তাই "আমার পরে নবী নেই" কথাটার ব্যাখ্যা জানা দরকার। এজন্য মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আল্লাহর রাসূল ব্যাখ্যা দিয়েছেন, لا نبوة بعدى আমার পরে কোনো নবী নেই একথার ব্যাখ্যা হল, আমার পরে যারা জন্মগ্রহণ করে দুনিয়াতে আসবে– তারা কেউ নবুওয়াত পাবে না। কাজেই সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসে আছে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান, কিয়ামতের আগে হযরত ঈসা আ. আবারো আসবেন। এর সাথে

لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ এর কোনো বিরোধ নেই। কিয়ামতের আগে ঈসা নবী আবারও আসবেন এক কথা, আর আমার পরে যারা জন্ম নেবে, তারা কেউ নবী হবে না– ভিন্ন কথা। আমার আবির্ভাবের পরে যাদের জন্ম হবে, তারা নবী হবে না।

যেহেতু ঈসা নবী দুনিয়াতে আগেই একবার এসেছিলেন– কিয়ামতের আগে আবারও আসবেন– সেটা ভিন্ন কথা। হাদীসের তরজমায় সামান্য অবহেলার কারণে হাদীসের তরজমায় শব্দের সামান্য হেরফের হওয়ার কারণে আকাশ-পাতাল ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে যায়। لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ এর তরজমায় যদি বলেন, "আমার পরে আর কোন নবী আসবেন না" তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন দাঁড়ায় সহীহ বুখারী শরীফের হাদীস ঈসা নবী আবারো আসবেন, তাহলে আসবেন না কেমন করে? আর এই ভুল তরজমাকে কেন্দ্র করে কাদিয়ানীরা প্রশ্ন করে তোমরাই বল, তোমাদের নবীর পর আর কোনো নবী আসবেন না। আবার বল ঈসা নবী আসবেন, তাহলে পরস্পর বিরোধী কথা বল কেন? এসব ভ্রান্তির মূল কেন্দ্রবিন্দু হল, হাদীসের ভুল তরজমা।

হাদীস শরীফে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান,

سَيَكُوْنُ فِيْ اُمَّتِيْ كَذَّابُوْنَ ثَلَاثُوْنَ ، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ ، وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ، لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ

আমার আবির্ভাবের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের জন্ম হবে– তাদের কেউ যদি নবুওয়াত প্রাপ্তির দাবী করে, সে হবে মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। কারণ, আমি খাতামুন্নাবিয়্যীন। খাতামুন্নাবিয়্যীনের ব্যাখ্যা আমার পরে আর কোনো নবী নেই। 'নবী নেই' কথার ব্যাখ্যা আমার পরে যারা জন্ম নেবে তারা কেউ নবুওয়াত পাবে না। কাজেই 'কিয়ামতের আগে আবারও ঈসা নবী আসবেন' হাদীসের সাথে এই কথার কোন বিরোধ নেই। কিন্তু প্রশ্ন আরেকটা বাকী থাকে। যে ডাক্তারের চিকিৎসার পর আর কোন ডাক্তার নেই, সেই ডাক্তার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার। যে নবীর আবির্ভাবের পরে আর কোন নবীর আবির্ভাবের দরকার নেই, সেই নবী যদি শ্রেষ্ঠ হলেন, তাহলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে আসার পর হযরত ঈসা নবীর আসার কি দরকার? এটা হল প্রশ্ন। আমি

আবারও বলছি, শেষ নবী হওয়াটা শ্রেষ্ঠত্বের আলামত হল কেন? এর একমাত্র কারণ শেষ নবীর পরে দুনিয়াবাসীর জন্য আর কোনো নবীর আবির্ভাবের দরকার বাকী থাকে না। যেভাবে শেষ চিকিৎসকের চিকিৎসার পরে দরকার বাকী থাকে না, তেমনিভাবে শেষ নবীর আবির্ভাবের কারণে আর কোনো নবী আবির্ভাবের দরকার বাকী থাকে না। আমাদের নবী শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ যদি হয়, তিনি শেষ নবী, কাজেই তিনি শ্রেষ্ঠ নবী– তাহলে কেন হযরত ঈসা নবী দুনিয়াতে আবারও আসবেন? ঈসা নবী আবার দুনিয়াতে আসবেন দুনিয়ার দরকারে নয় নিজের দরকারে।

যে ডাক্তারের দ্বারা প্রথমে আপনার চিকিৎসা করালেন সে ডাক্তার আপনার চিকিৎসার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি নিয়ে আপনার ঘরে গিয়েছিলেন, চিকিৎসা সমাপ্ত করে যখন চলে গেলেন তখন ভুলবশত বা কোনো কারণবশত চিকিৎসা যন্ত্রপাতি আপনার ঘরে ফেলে গেলেন। এরপর সর্বশেষ যে ডাক্তার দিয়ে আপনার চিকিৎসা করালেন তার চিকিৎসার পর আপনি সুস্থ হয়ে গেলেন। এই ডাক্তার চিকিৎসা করে চলে যাওয়ার পর চিকিৎসার জন্য আপনার ঘরে আর কোন ডাক্তার আসার দরকার বাকি নেই যেহেতু তিনি শেষ ডাক্তার।

কিন্তু যেহেতু প্রথম ডাক্তার আপনার ঘরে কিছু জিনিস ফেলে গেছেন, তা নেওয়ার জন্য যদি তিনি আবারও আপনার ঘরে আসেন, এ জন্য কি শেষ ডাক্তার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার থাকবেন না? তিনি তো শেষ ডাক্তার ঠিকই আছেন, তার পরে আর কোনো চিকিৎসা লাগে না। আবারও প্রথম ডাক্তার রোগীর ঘরে গেলেন কেন? চিকিৎসার জন্য তিনি রোগীর ঘরে যাননি, নিজের দরকারে তিনি রোগীর ঘরে গিয়েছেন। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের পর আর কোন নবীর আবির্ভাবের দরকার নেই। কিন্তু ঈসা নবী এই দুনিয়াতে এসেছিলেন আর কিছু দরকার বাকী রেখে চলে গিয়েছেন।

দুনিয়াতে তাঁর কিছু দরকার বাকী রয়েছে। সেই দরকার সমাপ্ত করার জন্য আবারও আখেরী জামানায় আসবেন। দুনিয়াবাসীর জন্য নবুয়াতের দরকার সেই হিসেবে নয়, ঈসা নবীর ব্যক্তিগত কিছু দরকার বাকী রয়েছে, সেটা সম্পন্ন করার জন্য তিনি আসবেন। তার ব্যক্তিগত কি দরকার ছিল? এই মর্মে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন–

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ (ال عمران/ ٥٥)

স্মরণ করো! সেই দিনের ইতিহাস, যে দিন ইয়াহুদী নেতারা ঈসা আ.-কে হত্যা করার জন্য তার ঘর ঘেরাও করেছিল। এমতাবস্থায় আমি হযরত ঈসা আ. কে হত্যা করার সুযোগ না দিয়ে স্বশরীরে জিন্দা অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিলাম। আর বলেছিলাম, হে ঈসা! আমি তোমাকে স্বশরীরে জিন্দা অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এই মুহূর্তে তোমার মরণ হবে না। তোমার মৃত্যু বাকি রইল। ভবিষ্যতে আবারো দুনিয়াতে পাঠাব মৃত্যুর কাজটা সম্পন্ন করার জন্য। কথা বুঝে থাকলে অথবা আপনাদের আগে থেকে জানা থাকলে একটু দয়া করে বলবেন, হযরত ঈসা নবীর মৃত্যু হয়েছিল নাকি বাকি ছিল? মরণ বাকি ছিল।

মরণের জায়গা আসমানে না দুনিয়াতে? দুনিয়াতে। এই কাজটা সম্পন্ন করার জন্য তিনি আবারো দুনিয়াতে আসবেন। তিনি নিজের দরকারে দুনিয়াতে আসবেন। দুনিয়াবাসীর নবুওয়াতের দরকার বলে নয়। দুনিয়াবাসীর আর নবুওয়াতের দরকার নেই। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতের দ্বারা দুনিয়াবাসীর নবুওয়াতের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে। আরো বিভিন্ন কারণ আছে, যে সব কারণে হযরত ঈসা আ. আবার দুনিয়াতে আসবেন। এটা দুনিয়াবাসীর নবুওয়াতের দরকার রয়েছে, সেই হিসেবে নয়। যাই হোক! আনুসঙ্গিক কয়েকটি কথা বললাম। যেগুলো আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় বর্তমান সময়ে মুসলমানদের জন্য জরুরী ছিল।

একটা আনুসঙ্গিক কথা ছিল হযরত ঈসা আ. আবারো দুনিয়াতে আসছেন, তাহলে আমাদের নবী কিভাবে শেষ নবী হলেন? আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই প্রশ্নের জবাব প্রত্যেক মুসলমানের জানা থাকা জরুরী। তা না হলে কাদিয়ানীরা ঈসা নবীর আগমনের ঘটনার বিবরণ দিয়ে আমাদেরকে কাদিয়ানী বানানোর সুযোগ পাবে। এই ছিদ্র, এই চোরাপথ কাদিয়ানীদের জন্য যেন বাকী না থাকে, সেইজন্য আমার এই আনুষঙ্গিক কথাটি বলার দরকার ছিল। যদিও আমার আলোচ্য বিষয়ের বর্হিভূত। এই জন্য বলে দিলাম ঈসা আ. আবারো আসবেন। তো আমাদের নবী কিভাবে শেষ নবী হলেন। আরেকটি আনুষঙ্গিক কথা আমার বলার দরকার ছিল,

ঈসা নবী কেন আবারো দুনিয়াতে আসবেন যেহেতু দুনিয়াতে আর নবুওয়াতের দরকার নেই। দুনিয়াবাসীর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতই যথেষ্ট। তাহলে ঈসা নবী আবার কেন আসবেন? এই প্রশ্নের জবাব, দুনিয়াবাসীর জন্য আবারো নবুওয়াতের দরকার সেই জন্য আসবেন না, দুনিয়াতে তার নিজস্ব ব্যক্তিগত দরকার বাকী রয়েছে সেটা সম্পন্ন করার জন্য আসবেন। হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান–

سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلَاثُوْنَ ، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ ، وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ، لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ . جامع الاصول : رقم : ٨٨٧٩

আমার আবির্ভাবের পরে যারা নবুওয়াতের দাবী করবে তারা মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। রাসূলের হাদীসের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করলে দেখা যায় আল্লাহ্‌র রাসূল তিন প্রকার মানুষকে দাজ্জাল বলেছেন। ওটাও একটা আনুষঙ্গিক কথা কিন্তু জরুরী। পরিষ্কারভাবে জানা না-থাকার কারণে অনেকের দ্বিধা-সন্দেহ সৃষ্টি হয়। বিভ্রান্ত হয়, সেই বিভ্রান্তি যেন চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় সেই জন্য আমার আলোচ্য বিষয়ের বর্হিভূত হওয়া সত্ত্বেও আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি। রাসূলের হাদীসের ভাণ্ডার অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, তিন প্রকার মানুষকে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল বলেছেন। তিন শ্রেণীর দাজ্জাল হবে দুনিয়াতে।

একটা দাজ্জালকে সবাই চিনে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আলেম-আওয়াম নির্বিশেষে সমস্ত মুসলমান জানে এবং সেই দাজ্জালকে চিনে। এ দাজ্জালের কথা সহীহ্ বুখারী শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে যুগে ঈসা আ. দুনিয়াতে আসবেন– সে যুগে একটা দাজ্জালও আসবে দুনিয়াতে। সে হবে খোদায়ী দাবীদার। সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করবে। তার ডান চোখ হবে অন্ধ। তার সাথে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষ গান-বাজনা থাকবে। তাকে আল্লাহ্ অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দান করবেন। এ সবের মাধ্যমে সে দুনিয়াবাসীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেকে খোদা বলে দাবী করবে। গান-বাজনার আকর্ষণে তার দাপটে আর প্রভাবে এবং অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দুনিয়াবাসীর কাছ থেকে তার খোদায়ীর স্বীকৃতি আদায় করবে। হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি

কোটি মানুষ এ সমস্ত অবস্থা দেখে তাকে খোদা মানবে। এটা হল প্রথম শ্রেণীর দাজ্জাল। এক চোখ অন্ধকে কানা বলা হয়। যেহেতু এই দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে, এজন্য সর্বসাধারণ একে কানা দাজ্জাল বলে। এই দাজ্জালের কথা সহীহ্ বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে। এটা হল প্রথম শ্রেণীর দাজ্জাল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দাজ্জালের বিবরণ দিয়ে হাদীস শরীফে আল্লাহ্র রাসূল বলেন, আমার আবির্ভাব থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যাদের জন্ম হবে– এদের কেউ যদি নবুওয়াত দাবী করে, সে হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর দাজ্জাল। প্রথম শ্রেণীর দাজ্জাল হল, খোদা হওয়ার দাবীদার। দ্বিতীয় শ্রেণীর দাজ্জাল নবী হওয়ার দাবীদার। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের পর থেকে যাদের জন্ম হবে আর এদের কেউ যদি নবী হওয়ার দাবী করে তাহলে সে দ্বিতীয় শ্রেণীর দাজ্জাল। এরা খোদা হওয়ার দাবীদার নয়, নবী হওয়ার দাবীদার।

স্মরণ রাখতে হবে হযরত ঈসা আ. আমাদের নবীর আবির্ভাবের পর জন্মগ্রহণ করেন নি। তিনি আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি আবারো আসলে এই হাদীসের আওতায় পড়বেন না। যে হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন, আমার আবির্ভাবের পরে যারা জন্মগ্রহণ করবে এবং নবী দাবী করবে সে মিথ্যাবাদী দাজ্জাল হবে। এদের আওতায় হযরত ঈসা নবী পড়েন না। কেননা ঈসা নবীর জন্ম আমাদের নবীর পরে নয়, ঈসা নবীর জন্ম আমাদের নবীর আবির্ভাবের আগেই হয়েছিল। সুতরাং আমাদের নবীর আবির্ভাবের পরে যাদের জন্ম হবে আর নবুওয়াতের দাবী করবে এদেরকে আল্লাহ্র রাসূল আরেক শ্রেণীর দাজ্জাল বলেছেন। তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণীর দাজ্জাল নবুওয়াতের দাবী করবে এবং সরাসরি নবী হওয়ার দাবী করবে। সহীহ্ মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে; রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করমান,

يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلَا آبَائُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ

আখেরি জামানায় আরেক শ্রেণীর মিথ্যাবাদী দাজ্জালদের আবির্ভাব হবে। এরা তৃতীয় শ্রেণীর দাজ্জাল। এরা কারা? আল্লাহ্র রাসূল বলেন,

يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلَا آبَائُكُمْ

যে সমস্ত কথাবার্তাকে ইসলাম ধর্মের কথাবার্তা বল– যা তোমাদের যুগে তোমাদের পূর্ববর্তীদের যুগে ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃতি লাভ করে নি, এক কথায় যে সমস্ত কথাবার্তা ইসলাম ধর্মের নয়– এমন নয়া নয়া মনগড়া কথা বানিয়ে ইসলামের নামে চালিয়ে দিবে অর্থাৎ বেদআতী। মুফাসসিরীনে কেরাম তাফসীরের কিতাবে লিখেছেন, গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী প্রত্যক্ষ নবীর দাবীদার আর বেদআতীরা পরোক্ষ নবুওয়াতের দাবীদার।

খোদায়ী দাবীদার প্রথম শ্রেণীর দাজ্জাল। প্রত্যক্ষ নবুওয়াতের দাবীদার দ্বিতীয় শ্রেণীর দাজ্জাল। বেদআতীরা তৃতীয় শ্রেণীর দাজ্জাল।

সহীহ্ মুসলিম শরীফের হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত বিদআতীরা তৃতীয় শ্রেণীর দাজ্জাল। এমন নয়া নয়া মনগড়া কথা বানায়, যেগুলো ইসলামের কথা নয়। যেগুলো শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। নিছক মনগড়াভাবে বানিয়ে ইসলামের নামে চালিয়ে দিবে- এদেরকে আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন, তৃতীয় শ্রেণীর দাজ্জাল বেদআতী। বেদআতী সম্পর্কে সতর্ক করে এই হাদীসের শেষের দিকে আল্লাহ্র রাসূল বলেন–

إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ

সাবধান! আমার উম্মত মুসলমানেরা সাবধান!! তোমরাও তাদের কাছে যেও না। তাদেরকেও তোমাদের কাছে আসতে দিও না। যদি তোমরা তাদের কাছে যাও অথবা তাদেরকে তোমাদের কাছে আসতে দাও তাহলে তারা ইসলাম ধর্মের নামে মনগড়া নয়া কথা তোমাদের মাঝে চালু করে দিয়ে তোমাদেরকে নবীর তরীকা থেকে সরিয়ে জাহান্নামের পথে নিক্ষেপ করবে। আশা করি বুঝতে পারছেন।

রাসূলের হাদীসের ভাষায় দাজ্জালের শ্রেণী কয়টি? তিনটি। প্রথম শ্রেণীর দাজ্জাল খোদা হওয়ার দাবিদার, দ্বিতীয় শ্রেণীর দাজ্জাল প্রত্যক্ষ নবী হওয়ার দাবীদার, আর তৃতীয় শ্রেণীর দাজ্জাল বেদআতের প্রচলন করে পরোক্ষ নবী হওয়ার দাবীদার। পরোক্ষ নবী হওয়ার দাবীদার সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন– তারা সরাসরি বলে না আমি নবী, তবে

ধর্মের নামে নয়া কথা বলা নবীর কাজ। এক নবী অতিবাহিত হয়েছেন, এরপরে এই নবীর ধর্মের নামে অন্য কোন কথা বলতে হলে আরেক নবী লাগবে। অথচ নবী নয় কিন্তু ধর্মের নামে কথা বলে। সে পরিষ্কার ভাষায় বলে না আমি নবী কিন্তু কাজে-কর্মে প্রমাণ করছে আমি নবী। তারা পরোক্ষ নবুওয়াতের দাবীদার। প্রত্যক্ষ নবুওয়াতের দাবীদার হল দ্বিতীয় শ্রেণীর দাজ্জাল আর পরোক্ষ নবুওয়াতের দাবীদার তৃতীয় শ্রেণীর দাজ্জাল।

এখন আমি আমার মূল আলোচনার দিকে এগুতে চাই। আগে বলেছিলাম– আমাদের নবী যতক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো নবী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেন না। আর আমার উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করবে না। এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল, আমাদের নবী সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর এই নবীর মুসলমান উম্মত অন্য নবীর সকল উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ। আমাদের নবীর শ্রেষ্ঠত্বের যত কারণ আছে, এর মাঝে প্রধান কারণ তিনি শেষ নবী; এ কারণে তিনি শ্রেষ্ঠ নবী। এই পয়েন্টের উপর এতক্ষণ আলোচনা হল।

এখন আমরা আলোচনা করব, এই নবীর উম্মত কেন সকল নবীর উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠ? এই কারণের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ নিজেই বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

হে মহানবীর উম্মতেরা তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদের মতো শ্রেষ্ঠ উম্মত আর কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। একমাত্র তোমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র উম্মতেরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। শ্রেষ্ঠত্বের কারণের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ বলেন– اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ তোমাদেরকে শুধু সৎপথে চলার জন্য, জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথে চলার জন্য, জান্নাত লাভের পথে চলার জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়নি। তোমরা আখেরী জামানার নবীর উম্মত গোটা মানবজাতিকে সৎপথে চালানোর জন্য, জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর পথে চালানোর জন্য, জান্নাতের পথপ্রদর্শন করার জন্য তোমাদের প্রেরণ করা হয়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক যত নবী-রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, সমস্ত নবী-রাসূলের দাওয়াতের মূল

কেন্দ্র ছিল ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া পেয়ে তোমরা চিরস্থায়ী জগৎ পরকালকে ভুলে যেও না। সকল নবীর দাওয়াতের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল এটা। এই মর্মে আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন–

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى (الاعلى/١٦-١٩)

যারা দুনিয়া পেয়ে পরকাল ভুলে যাও– ভালো করে স্মরণ রেখো, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে আর পরকালের ভোগ-বিলাসের মাঝে বিরাট পার্থক্য আছে। একটি পার্থক্য হল, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নিম্নমানের আর পরকালের ভোগ-বিলাস উন্নতমানের। আরেকটি পার্থক্য হল, দুনিয়ার নিম্নমানের ভোগ-বিলাস একদিন ফুরিয়ে যায়, আর পরকালের উন্নতমানের ভোগ-বিলাস কোনো দিন ফুরায় না, চিরকাল থাকবে। কাজেই যারা দুনিয়ার নিম্নমানের ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাস পেয়ে পরকালের উন্নতমানের চিরস্থায়ী ভোগ-বিলাস ভুলে যায়, তাদের জীবন বিফল হয়ে যায়।

এ কথাটা বুঝানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াবাসীর কাছে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূলগণই দুনিয়াবাসীর অন্তরকে দুনিয়ার মোহ থেকে ফিরিয়ে পরকালের দিকে ধাবিত করার দায়িত্ব পালন করেছেন। নবীগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর তাদের উম্মতেরা সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেনি। সমস্ত নবীগণের উম্মতেরা নবীর এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু শেষ নবী সেহেতু এই নবীর পরে আর কেউ নবী হবে না। তাই এই নবী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পরে যদি প্রত্যেকেই মনে করে– আমি আমার জান বাঁচাই, অন্যলোক অপকর্ম করে জাহান্নামে গেলে আমার কিছু আসে যায় না। তাহলে এই গুটি কয়েক ভাল মানুষ মারা গেলে দুনিয়াবাসী একসাথে সব জাহান্নামের পথের যাত্রী হয়ে যাবে।

এই জন্য আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন অন্যান্য যুগের নবীদেরকে যেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন– কেবল নিজের জান বাঁচানোর জন্য নয়; অপরকেও পথ দেখানোর। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পরে যেহেতু আর কেউ

নবী হবে না, তাই নিজের জান বাঁচানোর সাথে সাথে অন্যকেও পথ দেখানোর দায়িত্বটা আল্লাহ্ পাক এই নবীর উম্মতের উপর অর্পণ করেছেন। এই হল এই নবীর উম্মত শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রধান কারণ। সোজা কথায় বলতে গেলে লাখেরও বেশী নবী রাসূল আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন, মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। আল্লাহ্র বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। যেহেতু এই নবী শেষ নবী, এই নবীর পরে আর কেউ নবী হবে না। মানুষকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য, মানুষের কাছে আল্লাহ্র বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য আর কেউ নবী হবে না।

সুতরাং আল্লাহ্র বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব মানুষকে, আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়ার গুরুদায়িত্ব শেষ নবীর উম্মতকেই পালন করতে হবে। এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ্ পাক এই নবীর উম্মতকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্র বাণী অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া– এই পৌঁছে দেওয়াকেই আরবী ভাষায় তাবলীগ বলা হয়। আহ্বান করা, আল্লাহ্র পথে আহ্বান করা। আহ্বানকে আরবী ভাষায় দাওয়াত বলা হয়। আল্লাহ্র বাণীকে অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়াকেই তাবলীগ বলা হয়। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অন্য যুগে একচেটিয়াভাবে নবীদের কাজ ছিল। আগেকার নবীর উম্মতেরা সেই দায়িত্ব পালন করে নি, করতে পারে নি। আমাদের নবী শেষ নবী হওয়ার কারণে তারপরে আর কেউ নবী হবেন না। সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করার জন্য যেহেতু আর কোন নবী আসবেন না। সুতরাং এই নবীর উম্মতকেই কিয়ামত পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এই জন্য এই নবীর উম্মত সকল নবীর উম্মতগণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে আমাদের নবীকে সম্বোধন করে বলেন–

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (المائدة/٦٧)

'হে রাসূল কারীম! يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ এখানে একটা আনুষঙ্গিক কথা আছে। যদিও আমার আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত, তবুও আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমাদের উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। এটা হল আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনের যত আয়াতে আমাদের নবীকে নবী

শব্দ দিয়ে সম্বোধন করেছেন অথবা রাসূল শব্দ দিয়ে সম্বোধন করেছেন সমস্ত আয়াতে يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ বলে সম্বোধন করেছেন অথবা يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ বলে সম্বোধন করেছেন। কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন একটি আয়াত অনুসন্ধান করে পাবেন না যাতে আল্লাহ্ আমাদের নবীকে يَانَبِىُّ বলে সম্বোধন করেছেন অথবা يَارَسُوْلُ বলে সম্বোধন করেছেন। একটি আয়াতেও يَانَبِىُّ বলেন নি আমার নবীকে একটি আয়াতেও يَارَسُوْلُ বলেন নি; আমাদের রাসূলকে বলেছেন, يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ ; বলেছেন, يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ ; ব্যবধান কি? يَانَبِىُّ আর يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ এ ব্যবধান কি? يَارَسُوْلُ আর يَا اَيُّهَاالرَّسُوْلُ এ ব্যবধান কি? এটা হল একটা গ্রামারগত ব্যবধান। আরবী গ্রামারের বিধান মতে يا সম্বোধনবোধক অব্যয় পদ। আর نبى একটা অনির্দিষ্ট ব্যক্তিবাচক শব্দ। একটা অনর্দিষ্ট উপাধীমূলক শব্দ।

নবী একটা উপাধী। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপাধী নয়। লাখ লাখ নবী আল্লাহ্ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, সবারই উপাধী নবী। হযরত আদম আ. এর উপাধী নবী। নূহ আ. ও নবী। ইবরাহীম আ. ও নবী। মুসা আ. ও নবী। ঈসা আ. ও নবী। এভাবে লক্ষাধিক নবী আছেন। নবী শব্দ বলতে কোন নবী তা নির্দিষ্ট হয় না। নবী বলতে অনির্দিষ্ট নবী বুঝায়। আর اَيُّهَا النَّبِىُّ বলতে সুনির্দিষ্ট নবী বুঝায়। يَانَبِىُّ বলে ডাক দিলে يَانَبِىُّ বলে সম্বোধন করলে প্রমাণ হয়– সম্বোধন যে করল, সে শুধু তাকে চিনে সম্বোধন করেছে। এর আগে, সম্বোধনের আগে তিনি অচেনা ছিলেন, অপরিচিত ছিলেন।

আরবী গ্রামার মতে يَانَبِىُّ বলে যে ব্যক্তি যাকে ডাকল, সেই ব্যক্তিই কেবল তাকে চিনে আর কেউ তাকে চিনে না। ঠিক তেমনিভাবে يَانَبِىُّ বলে কাউকে ডাকলে– যে ডাকল, সে চিনে আর কেউ চিনে না, সে অচেনা, অপরিচিত। অনির্দিষ্ট নবীকে يَانَبِىُّ বলে ডাকা হয়। আমাদের নবী যেহেতু অচেনা অনির্দিষ্ট নবী নন, আমাদের নবী সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সুপরিচিত, আমাদের নবী সমস্ত জগতবাসীর কাছে সুপরিচিত, আমাদের নবী জ্বিন, ফেরেশতা, মানব-দানব, আকাশ-বাতাস সমস্ত কীট-পতঙ্গের নিকট সুপরিচিত। সুতরাং সুপরিচিত নবীকে সম্বোধনকরার

মর্যাদাবোধক শব্দ হল يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ বা يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ সুপরিচিত নবীকে সম্বোধন করার পদ্ধতি يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ সুপরিচিত রাসূলকে সম্বোধন করার পদ্ধতি يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ আর يَانَبِىُّ বা يَارَسُوْلُ বললে সুপরিচিত নবী বুঝায় না, সুপরিচিত রাসূল বুঝায় না, সুনির্দিষ্ট নবী বুঝায় না, সুনির্দিষ্ট রাসূল বুঝায় না।

মাদ্‌রাসা ছাত্রদের মনে একটা প্রশ্ন জাগবে يا حرف ندای যা نكره এর মাঝে দাখিল হলেও معرفه হয়। সুতরাং يا حرف ندا যখন نَبِىُّ শব্দ نكره এর মাঝে দাখিল হলেও معرفه হল, তাহলে يَانَبِىُّ অপরিচিত হবে কেন? অচেনা হবে কেন? মাদ্‌রাসা ছাত্রদের এই প্রশ্নের জবাব شرح جامى নামক কিতাবে লিখা আছে। يَا رَجُلُ সম্বোধন قبل ندا (আহবানের পূর্বে) نكره আর بعد ندا (আহ্বানের পর) معرفه সুতরাং يَارَجُلُ বলে ডাক দিলে প্রমাণ হল, ডাকার পরে আমার কাছে তুমি পরিচিত হলে আর ডাকার আগে অপরিচিত ছিলে। এই হল জবাব। يَانَبِىُّ বলে ডাক দিলে তার মানে হল– আমি তোমাকে চিনি, এজন্য আমি তোমাকে يَانَبِىُّ বলে ডাকলাম। আর আমি ছাড়া আর কেউ তোমাকে চিনে না, এই জন্য তোমাকে يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ বলে ডাকলাম না।

অথচ আমাদের নবী সম্বোধন করার পরে যেমন সুপরিচিত সম্বোধন করার আগেও তেমনি সুপরিচিত। যে সম্বোধন করল তার কাছেও যেমন সুপরিচিত, যে সম্বোধন করল না, তার কাছেও সুপরিচিত। সুতরাং সুপরিচিত নবীকে অপরিচিত ভঙ্গিতে সম্বোধন করা নবীর শানে বেআদবী। এই কারণে কোনো আয়াতে আল্লাহ্ আমাদের নবীকে يَانَبِىُّ বলে ডাকেন নি, يَارَسُوْلُ বলে ডাকেন নি, يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ বলে ডেকেছেন, يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ বলে ডেকেছেন। হাদীস শরীফে আছে, সাহাবায়ে কেরাম নবীজীকে কিভাবে ডেকেছেন। হয়তো يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ বলে ডেকেছেন অথবা يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ বলে ডেকেছেন অথবা يَانَبِىَّ اللّٰهِ বলে ডেকেছেন অথবা يَارَسُوْلَ اللّٰهِ বলে ডেকেছেন। হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে চার ধরনের সম্বোধনের কথা উল্লেখ আছে।

(১) يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ (২) يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ (৩) يَانَبِىَّ اللّٰهِ (৪) يَارَسُوْلَ اللّٰهِ বলে ডেকেছেন। হয়তো اَيُّهَا শব্দ যুক্ত করা হবে অথবা اَللّٰه শব্দ যুক্ত করা হবে। اَيُّهَا শব্দ বললেও সুপরিচিত বুঝায় আর اَللّٰه শব্দ যুক্ত করে বললেও সুপরিচিত বুঝায়। আর না اَيُّهَا শব্দ যুক্ত, না اَللّٰهُ শব্দ যুক্ত করে শুধুমাত্র يَانَبِىُّ অথবা يَارَسُوْلُ বললে, না আগে দিয়ে اَيُّهَا শব্দ যুক্ত করলেন, আর না পরে اَللّٰه শব্দ যুক্ত করলেন। এ পদ্ধতি নবীর শানের খেলাফ, নবীর সাথে আদবের খেলাফ। এই কারণে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত লক্ষ হাদীস দুনিয়াতে রেখে গেছেন, একটি হাদীসেও আপনারা পাবেন না, কোনো সাহাবী আমাদের নবীকে يَانَبِىُّ বলে ডেকেছেন, يَارَسُوْلُ বলে ডেকেছেন। হয়তো يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ বলে ডেকেছেন, না হয় يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ বলে ডেকেছেন। না হয় يَانَبِىَّ اللّٰهِ বলে ডেকেছেন, না হয় يَارَسُوْلَ اللّٰهِ বলে ডেকেছেন। اَيُّهَا শব্দ যুক্ত না করে অথবা اَللّٰه শব্দ যুক্ত না করে শুধু يَانَبِىُّ অথবা يَارَسُوْلُ না কোনো হাদীসে আছে, না কুরআনের কোনো আয়াতে আছে। কুরআনে নেই হাদীসেও নেই। يَانَبِىُّ ، يَارَسُوْلُ কুরআনেও নেই হাদীসেও নেই।

তাহলে আপনাদের يَا نَبِىُّ অথবা يَا رَسُوْلُ বলতে হলে, বলবেন তা কুরআন হাদীসমতো না মনগড়াভাবে? মনগড়াভাবে যে যা বলতে চায়, সেটা তার ব্যাপার। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপার হল আপনি যদি ধর্মের নামে কোন কিছু বলতে চান, তাহলে কুরআনের দ্বারা সেটা প্রমাণিত হতে হবে, হাদীসের দ্বারা সেটা প্রমাণিত হতে হবে, ইজমায়ে উম্মত দ্বারা সেটা প্রমাণিত হতে হবে অথবা মুজতাহিদ ইমামগণের কিয়াস দ্বারা সেটা প্রমাণিত হতে হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

এ আয়াতে আল্লাহ্ يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ বলে সম্বোধন করেছেন। যারা কুরআনের সবগুলো আয়াতও জানেন না, রাসূলের হাদীসের খবর রাখেন না– তাদের জন্য আরেকটা দলীল বলি। অন্তত নামায তো পড়েন। যারা নামায পড়েন কমপক্ষে দু'রাকাত নামাযে যখন আত্তাহিয়্যাতু পড়েন, তখন কিভাবে পড়েন?

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيُّ؟

নাকি اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ আর اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ অর্থ সুপরিচিত নবী। সমস্ত জগতবাসীর কাছে সুপরিচিত নবী আর يَانَبِيُّ এ অর্থ অপরিচিত নবী। আপনাদের নবী কি অপরিচিত না সুপরিচিত? কুরআনেরও খবর নেই, হাদীসেরও খবর নেই, অন্তত আত্তাহিয়্যাতুর খবর থাকলে বুঝবে يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ না يَانَبِيُّ আরো মজার খবর আছে; মিরাজের রাতে নবী যখন আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তখন নবী বলেছিলেন– اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ আমার মৌখিক যত ইবাদত, আমার শারীরিক যত ইবাদত, আমার আর্থিক যত ইবাদত সমস্ত ইবাদত আল্লাহ্ আপনার নামে উৎসর্গ করে দিলাম। জবাবে আল্লাহ্ বলেছিলেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ আপনার প্রতি সালাম হে সুপরিচিত নবী। আগে সম্বোধন দিলেন না আগে সালাম দিলেন? اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ বললেন আগে আর اَيُّهَا النَّبِيُّ বললেন পরে।

এই পদ্ধতিতে আল্লাহ্ সালাম দিয়ে নবীর উম্মতকে আদব শিক্ষা দিলেন যে, আগে সালাম দাও। পরে ডাক দাও। আগে ডাক পরে সালাম নয়। মেরাজের রাতে আল্লাহ্ আমাদের নবীজীকে يَانَبِيُّ سَلَامٌ عَلَيْكَ বলেছিলেন, না اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ বলেছিলেন? প্রথম কথা হল, يَانَبِيُّ বলেননি اَيُّهَا النَّبِيُّ বলেছেন। দ্বিতীয় কথা হলো আগে ডাক দিয়ে পরে সালাম দেননি, আগে সালাম দিয়ে পরে ডাক দিয়েছেন। এটা হল আদব। পরিষ্কার ভাষায় আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন, اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ আগে সালাম পরে কালাম। এটা স্বাক্ষাতের সালাম আরেকটা আছে অনুমতি প্রার্থনার সালাম। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا (النور/٢٧)

"হে মুসলমানগণ তোমরা অপরের ঘরে ততক্ষণ পর্যন্ত ঢুকতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আগে অনুমতি নিয়ে সালাম করবে না।

অনুমতির সালামের ক্ষেত্রে আগে অন্য কথা আছে। কিন্তু স্বাক্ষাতের বেলায় আল্লাহ্‌র রাসূল বলেন– اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ কারো সাথে স্বাক্ষাৎ হলে আগে সালাম পরে অন্য কথা। আগে অন্য কথা পরে সালাম –এটা নবীর তরিকা নয়। আগে কথা পরে সালাম নয়। আগে অন্য কথা পরে সালাম এটা নবীর তরিকা নয়। মনগড়া তরিকা। নবী শিক্ষা দিয়েছেন اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ আগে সালাম তারপরে অন্য কথা। আমরা যারা ওয়াজ করি আমাদেরও অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। কি রকম? সেই যে আসলাম, কথা বললাম না, চুপচাপ বসে রইলাম আর মঞ্চে বসলাম, চেয়ারে বসলাম মাইক সামনে নিয়ে শ্রদ্ধেয় সভাপতি, সম্মানিত সুধী মণ্ডলী! আসসালামু আলাইকুম। এ রকম আমরা বলি। এটা কি اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ হল, না اَلْكَلَامُ قَبْلَ السَّلَامِ হল? নবী বললেন اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ আর আমি করলাম اَلْكَلَامُ قَبْلَ السَّلَامِ এগুলো সালাম নয়, এগুলো ষ্টাইল। এগুলো ফ্যাশন, এগুলো সালাম নয়।

পরিষ্কার ভাষায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন, اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ অন্যকথা বলার আগে সালাম। আনুসঙ্গিক কথায় কথায় অনেক দূরে সরে গেলাম। কিন্তু আমি দুঃখিত এজন্য যে আমার এ আনুসঙ্গিক কথা আমাদের সমাজে না বলতে না বলতে সত্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর মিথ্যা প্রসার হয়ে যাচ্ছে। সুন্নাত মিটে যাচ্ছে আর বেদআত প্রসার লাভ করছে। সেই জন্য আমি আমার আলোচ্য বিষয়ের বাইরে গিয়ে একান্ত প্রয়োজনীয় আনুসঙ্গিক কথা বলেছি।

এবার মূল আলোচনায় যাই। আল্লাহ্ বলেন,

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ

"হে রাসূল, আপনার পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে যা কিছু নাজিল করা হল, সবগুলো তাবলীগ করে দিন।"

তাবলীগ আরবী শব্দ। বাংলা অর্থ পৌঁছে দিন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার কাছে, যা কিছু নাজিল করা হল, সবগুলো তাবলীগ করে দিন। বাংলা ভাষায় তরজমা সবগুলো পৌঁছে দিন। আরবী ভাষায় তাবলীগ। বললেন بَلِّغْ তাবলীগ করুন। পৌঁছে দিন। কি পৌঁছে দেবেন? আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে সবগুলো পৌঁছে দিন। এ জন্যে

বিদায় হজ্বের ভাষণ শেষে নবম হিজরীতে জিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখে আরাফার ময়দানে আসরের নামাযের সময় জাবালে রহমতের পাদদেশে প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবায়ে কেরামের সামনে আল্লাহ্‌র রাসূল যে ভাষণ দিলেন, সেই ভাষণ ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজ্বের ভাষণ নামে পরিচিত। ভাষণ শেষে আল্লাহ্‌র রাসূল সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, هَلْ بَلَّغْتُكُمْ আমি কি তোমাদেরকে তাবলীগ করেছি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন– হ্যাঁ, আপনি তাবলীগ করেছেন। আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন, হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাকো। তুমি তো আগেই বলেছিলে আমার কাছে যা কিছু নাযিল হয়, সবগুলো তাবলীগ করে দেওয়ার জন্য, এখন তোমার বান্দারা সাক্ষ্য দিচ্ছে, আমার কাছে তুমি যা কিছু নাযিল করেছ– সবগুলো তোমার বান্দাদের কাছে তাবলীগ করে দিয়েছি।

তারপর আল্লাহ্‌র রাসূল বলেন, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ তোমরা যারা উপস্থিত আছ– আল্লাহ্ আমার কাছে যা নাযিল করে ছিলেন, আমি তা তোমাদের কাছে তাবলীগ করে দিয়েছি। কিন্তু আমি তাবলীগ করেছি তাদের সামনে, যারা আমার সামনে উপস্থিত রয়েছে। যারা আমার সামনে নেই, তাদের সামনে আমি তাবলীগ করতে পারলাম না, তোমরা যারা উপস্থিত আছ, যারা অনুপস্থিত আছে, তাদের কাছে তাবলীগ করার দায়িত্ব অর্পণ করলাম তোমাদের ওপর।

তাবলীগ করা নবীর একক দায়িত্ব ছিল, না উম্মতের কাছে দায়িত্ব অর্পন করে গেছেন? হে উপস্থিত লোকসকল! লোকদের কাছে তাবলীগ করার দায়িত্ব অর্পন করলাম।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর ব্যাখ্যা লিখেছেন, উপস্থিত আর অনুপস্থিত বলতে আল্লাহ্‌র রাসূল কাকে বুঝিয়েছেন? এর দু'টা ব্যাখ্যা। এক ব্যাখ্যা হল আজকের আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত যারা আছ, তোমরা যারা আজকে উপস্থিত হতে পারে নি, তাদের কাছে তাবলীগ করে দিও। আরেক ব্যাখ্যা হল আজকের দুনিয়াতে যারা আছ তোমরা ভবিষ্যতে যারা দুনিয়াতে আসবে তাদের কাছে তাবলীগ করে দিও।

আল্লাহ্ তাবলীগ করার দায়িত্ব দিয়ে ছিলেন রাসূলের ওপর; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আর

পরবর্তীকালে রাসূল বিদায় হয়ে গেলে আর কোনো নবী আসবেন না, আর কেউ নবী হবেন না, তখন এই তাবলীগ করার দায়িত্ব যেন বন্ধ হয়ে না যায়, তাবলীগ করার দায়িত্বটা যেন কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকে– এই জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হওয়ার আগে আগে উম্মতের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন। এই জন্য এই উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালনের জন্য এই উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। এজন্য আল্লাহ্ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত। শুধু নিজ নিজ আমলের দ্বারা নিজের জান বাঁচানোর জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয় নি; তোমাদেরকে গোটা বিশ্ব মানবতাকে কল্যাণের পথে দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে তাবলীগের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে শান্তি আর মুক্তির পথপ্রদর্শনের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িত করা হয়েছে। আমি আরেকটা আয়াত আপনাদেরকে শুনাই। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة/١٤٣)

যেভাবে তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ কেবলা নির্ধারণ করে দিলাম, তেমনিভাবে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত সাব্যস্ত করলাম। আমাদের কেবলাও অন্যদের কেবলা থেকে শ্রেষ্ঠ, আমাদের নবীও অন্য নবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমাদের আসমানী কিতাবও অন্যদের আসমানী কিতাব থেকে শ্রেষ্ঠ, আর আমরাও অন্য উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ কি? কারণ তাবলীগ, কারণ, দাওয়াত। যদি নিজে নিজে জান বাঁচানোর চেষ্টা করো, যদি নিজে নিজে ভাল হয়ে চলো, অন্যকে ভাল পথে চলার দাওয়াত না দাও, তাহলে নিজে নিজে ভাল আমল করার দ্বারা তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে রক্ষা পাবে না।

এ মর্মে হাদীস শরীফের একটা ঘটনা আপনাদের শুনাই। হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান, পূর্বেকার কোন এক নবীর উম্মতেরা অপকর্মে লিপ্ত হয়ে গেল, অল্প কিছু লোক অপকর্ম না করে নিজে নিজে ভাল আমল করে। আল্লাহ্ গজবের

ফিরিশতাকে নির্দেশ দিলেন, এই সমস্ত উম্মতকে গজব দিয়ে ধ্বংস করে দাও। ফিরিশতা আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করলেন– হে আল্লাহ্ যারা অপকর্ম করে, তাদেরকে গজব দিয়ে ধ্বংস করে দিব যুক্তিসঙ্গত কিন্তু যারা অপকর্ম করে না, ভাল আমল করে তাদেরকে কোন অপরাধে ধ্বংস করে দিব? আল্লাহ্ বললেন, ও গজবের ফিরিশতা! যারা অপকর্ম করে তাদেরকে অপকর্মের অপরাধে আর যারা ভাল কাজ করে তারা কেন অন্যদেরকে ভাল কাজের দাওয়াত দেয় না, অন্যদের কাছে তাবলীগ করে না, সেই অপরাধে তাদেরকেও গজব দিয়ে ধ্বংস করে দাও।

যে নিজে নিজে ভাল পথে চলে অন্যকে ভাল পথে চলার দাওয়াত দেয় না –এই পথে চললে তুমি ধ্বংস হবে, এই পথে চললে তুমি জাহান্নামে যাবে, এই পথে চললে তোমার শান্তি হবে না, এই পথে চললে তোমার মুক্তি হবে না, যারা মনে করে, অমুক মন্দ পথে চলে, সে জাহান্নামে যাবে আমার কি আসে যায়? আমি ভাল পথে চলি, জাহান্নামে যাবো না- এটা আত্মাওয়ালার কথা নয়, প্রশস্ত আত্মার মনোভাব নয়। এটা অপরের কল্যাণকামিতার মনোভাব নয়। অথচ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ গোটা মানবজাতির কল্যাণ কামনার জন্য তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বানানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা শুধু জান বাঁচাতে চাইলে জান বাঁচাতে পারবে না।

নিজেও ভাল পথে চলবে অপরকেও ভাল পথে চলার দাওয়াত দিতে হবে। নিজে আল্লাহ্র পথে চলবে; আর অপরকেও আল্লাহ্র পথে তাবলীগ করবে। এই উম্মত শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার প্রধান কারণই হল দাওয়াত ও তাবলীগ। কিন্তু বর্তমান সময়ে যারা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেন তাদের অনেক সমালোচনা আছে বর্তমান সামজে। উল্লেখযোগ্য হল, তারা চিল্লা পেল কোথায়? মনগড়া ছয় উসূল পেল কোথায়? এরা কেন মসজিদে থাকে-ঘুমায়? আমি এ ধরনের সমালোচনার পর্যালোচনা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। প্রথম নম্বর এরা চিল্লা পেল কোথায়? চিল্লা তো কুরআন হাদীসে নেই।

এ ব্যাপারে আমি আপনাদের একটি আয়াত শুনাচ্ছি দেখবেন, কুরআনে চিল্লার কথা আছে কি নেই। চিল্লা ফারসী শব্দ। বাংলা সমার্থক হলো চল্লিশ দিনের সাধনা। আরবীতে বলে আরবাঈন অথবা আরবাঈনা। বাংলাটা আমাদের সমাজে প্রচলিত নয়। আরবী তো আমাদের সমাজে বুঝেই না।

এই ফারসী শব্দটাই আমাদের সমাজে চালু হয়ে গেছে। চিল্লা- চল্লিশ দিনের সাধনা। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন কুরআনে বলেন-

وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوسٰى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظٰلِمُونَ (البقرة/٥١)

স্মরণ করো! সেই দিনের ইতিহাস! যে দিন আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন হযরত মূসা আ. কে দিনে রাতে চল্লিশ দিনের সাধনার জন্য তূর পাহাড়ে নিয়ে ছিলেন। কে নিয়ে ছিলেন? আল্লাহ্। কাকে নিয়ে ছিলেন? হযরত মূসা আ. কে। কোথায় নিয়ে ছিলেন? তূর পাহাড়ে। কিসের জন্য? চল্লিশ দিনের সাধনার জন্য। এই কথাটার নামই চিল্লা। কুরআনে নেই কোথায়? চোখ খুলে কুরআন দেখো না কেন? কিন্তু প্রশ্ন হল, তিনি তো নবী ছিলেন, আমরা তো নবী নই। হযতর মূসা আ.-কে চিল্লা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তূর পাহাড়ে নিয়ে গেলেন– তিনি নবী ছিলেন, আমরা তো নবী নই। আমরা কেন চিল্লা দিতে যাব?

প্রত্যেকটা মানুষ মায়ের গর্ভে যখন দেহ স্থানান্তরিত হয়; বাবার শরীরের এক বিন্দু পানি আর মায়ের শরীরের এক বিন্দু পানি একত্র হয়ে যখন মায়ের গর্ভথলিতে প্রবেশ করে, তখন থেকেই আল্লাহ্ একজন ফিরিশতা মোতায়েন করে দেন প্রতি চল্লিশ দিনের এক একটা সাধনার মাধ্যমে এক একটা পরিবর্তন ঘটানোর জন্য। প্রথম চিল্লায় পানির বিন্দু থাকে। দ্বিতীয় চিল্লায় রক্তের বিন্দুতে পরিণত হয়। তৃতীয় চিল্লায় মাংশপিণ্ডে পরিণত হয়। চতুর্থ চিল্লায় হাড় গজায়। পঞ্চম চিল্লায় রূহের সঞ্চার হয়। ষষ্ট চিল্লায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গজায়। সপ্তম চিল্লায় পৃথিবীর আলো-বাতাস সহ্য করার যোগ্য হয়। অষ্টম চিল্লা দিয়ে পৃথিবীতে বের হয়ে আসে।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

সংকলন কাল- ১৫ ই জুন ২০০৯ ইং

মাওয়ায়েজে হাসানাহ
খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,
তরজমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত
মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান—১

হিদায়াত কি? হিদায়াত কাদের জন্য?

স্থান
জামিয়াতুল আবরার কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَ اِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

হযরাত উলামায়ে কেরাম, সম্মানিত সুধী সমাজ!

আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন নাজিল করার কারণ উল্লেখ করে বলেন, هُدًى لِلنَّاس আলেমগণের তো জানাই আছে, মাদরাসার ছাত্ররাও লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ এখানে যে اُنْزِلَ বলা হয়েছে– এই اُنْزِلَ এর فعل এর مفعول له হয়েছে هُدًى لِلنَّاس অর্থাৎ কুরআন নাজিলের কারণ বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন– মানুষের হিদায়াতের জন্য" তাই আলোচনার শুরুতেই আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার হিদায়াত কি? হিদায়াত শব্দের ফারসী অর্থ হল, راه نمودن বাংলা অর্থ হল, পথপ্রদর্শন, পথ দেখানো। প্রশ্ন জাগে কিসের পথ? জবাব হল কল্যাণের পথ, শান্তির পথ, মুক্তির পথ। তাহলে মর্ম দাঁড়াল আল্লাহ কুরআন কেন নাজিল করলেন? মানুষকে কল্যাণের পথপ্রদর্শন করার জন্য।

অথচ পবিত্র কুরআনের আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

এর মমার্থ হল আসমান-জমিনের সমস্ত বাসিন্দাকেই আল্লাহ হিদায়াত করেন। চন্দ্রকে আল্লাহ হিদায়াত করেন, সূর্যকে আল্লাহ হিদায়াত করেন,

www.tolaba.com

গাছপালাকে আল্লাহ হিদায়াত করেন, জীব-জন্তুকে আল্লাহ হিদায়াত করেন, ফিরিশতাকে আল্লাহ হিদায়াত করেন, জীনকে আল্লাহ হিদায়াত করেন। এক কথায় আসমানের সমস্ত বাসিন্দাকে আল্লাহই হিদায়াত করেন, জমিনের সমস্ত বসিন্দাকেও আল্লাহই হিদায়াত করেন। তাহলে কুরআন নাজিলের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ هُدًى لِلنَّاس বললেন কেন? "মানুষের হিদায়াত করার জন্য" বলেন কেন? প্রথমে আমরা এই প্রশ্নের জবাবটা পরিষ্কার করে নিই, তাহলে পারবর্তী আলোচনা বুঝা আমাদের জন্য সহজ হবে।

আসমান জমিনের সমস্ত বাসিন্দাকে যে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন হিদায়াত করেন, কল্যাণের পথপ্রদর্শন করেন তার বহু নজির বহু প্রমাণ বহু দৃষ্টান্ত আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّلَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَااللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ

(يس/৩৮ - ٤٠)

এখানে আল্লাহ বলেন সূর্য চলে তার লক্ষস্থলের পথে। কিভাবে চলে? আল্লাহ বলেন, মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের নিয়ন্ত্রণে চলে। সূর্যকে চালায় কে? আল্লাহ। ধবংসের পথে না কল্যাণের পথে? কল্যাণের পথে। তাহলে সূর্যকে হিদায়াত করেন কে? আল্লাহ। চন্দ্র চলার জন্যও আল্লাহ তার কতোগুলো গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। চন্দ্রও তার নির্ধারিত গতিপথে চলে। কিন্তু

لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ

চন্দ্র কোন দিন সূর্যের সাথে টক্কর লাগে না। সূর্যের সাথে চন্দ্রের কখনো ঘর্ষণ হয় না। যদি হত তাহলে কল্যাণ হত না, ধ্বংস হত? ধবংস হত। তাহলে চন্দ্র সূর্যকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করে ধবংসের হাত থেকে রক্ষা করেন কে? আল্লাহ। তাহলে চন্দ্র সূর্যকে হিদায়াত করেন কে? আল্লাহ।

অবশ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন আছে। কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীরা বলেন, সূর্য চলে না; স্থির থাকে, আর পৃথিবী তার চুতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে। সব বিজ্ঞানীরা নয়। একজন বিজ্ঞানী একটা বই লিখেছেন, বইয়ের নামই দিয়েছেন "পৃথিবী নয় সূর্য ঘুরে। এই বইয়ে তিনি কী প্রমাণ করেছেন, সমস্ত বিজ্ঞানী একমত? একমত নয়। আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন বলেন, اَلشَّمْسُ تَجْرِىْ 'শামসু' অর্থ সূর্য আর 'তাজরী অর্থ চলে-চলে বললেই তো প্রশ্ন আসে যায় কোথায়? চলা বলা মাত্রই প্রশ্ন আসে-যাবে কোথায়? আল্লাহ বলেন لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا তার জন্য যে নির্ধারিত গন্তব্যস্থল আছে তার লক্ষ্যে সূর্য চলে। এবার প্রশ্ন আসে সূর্যের গন্তব্যস্থল কি? মুফাসসিরীনে কেরাম তাফসীরের কিতাবে লিখেছেন, সূর্য যে চলে তার গন্তব্যস্থলের পানে চলে সূর্যের গন্তব্যস্থল কি? এর জবাব লিখেছেন ৭টি। সূর্য্যের গন্তব্য স্থল কতোটা? ৭টা।

এই সাতটা গন্তব্যস্থলকে প্রথমত দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হল কাল কেন্দ্রিক গন্তব্যস্থল, আরেকটা স্থান কেন্দ্রিক গন্তব্যস্থল। এ সবগুলোর বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাকে আমার মূল আলোচনা থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হবে। শুধু সূর্য যে চলে– যায় কোথায় ? এর একটা জবাব হাদীস থেকে পেশ করছি। হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন সূর্য যে চলে– যায় কোথায় ? আল্লাহর আরশের নিচে যায়। এই সাতটা গন্তব্যস্থলের একটা। সূর্য যে চলে –যায় কোথায়? আল্লাহর আরশের নিচে যায়। তারপর আল্লাহর রাসূল বলেন আরশের নিচে গিয়ে সূর্য আল্লাহকে সিজদা করে।

তারপর আল্লাহর রাসূল বলেন, সূর্য আল্লাহকে সিজদা করার পর উদয় হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে অনুমতি চায়। তারপর আল্লাহর রাসূল বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর সূর্যোদয় হয়। তারপর আল্লাহর রাসূল বলেন, সূর্যোদয় হওয়ার পর আবার আরশের নিচে যায়। আবার আল্লাহকে সিজদা করে। আবার অস্ত যাওয়ার অনুমতি চায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে অস্ত যাওয়ার অনুমতি পাওয়ার পর সূর্য অস্ত যায়। তাহলে সূর্য যে চলে –যায় কোথায়? এই প্রশ্নের একটা জবাব পাওয়া গেল, আরশের নিচে যায়। কিন্তু এই কথাটা বললেও যারা আধুনিক ভূগোল সম্পর্কে সুস্পষ্ট

ধারণা রাখেন, তাদের মনে আবার প্রশ্ন জাগে সূর্যের তো মূলত উদয়– অস্ত নেই। এটাকে আরবী ভাষায় বলে امر اضافی বাংলায় বলে আপেক্ষিক ব্যাপার। বাংলাদেশের তুলনায় সূর্য যখন অস্ত যায়, পাকিস্তানের সূর্য তখন অস্ত যায় না। বাংলাদেশের তুলনায় সূর্য যখন উদয় হয়, আমেরিকার তুলনায় সূর্য্য তখন উদয় হয় না। তাহলে সুর্য্যের উদয়-অস্ত বলতে বাস্তবে কি কোন ব্যাপার আছে, না আপেক্ষিক ব্যাপার? আপেক্ষিক ব্যাপার। পৃথিবীর একাংশের তুলনায় সূর্য উদয় হয়, আরেকংশের তুলনায় অস্ত যায়। আর একাংশের তুলনায় উদয় হয়, আরেকাংশের তুলনায় অস্ত যায়, এর নাম আপেক্ষিক ব্যাপার। তাহলে মূলত তো সূর্য উদয় হল না অস্তও হল না। সদাসর্বদা আকাশে চলমান রয়েছে সূর্য। সেই সূর্য আরশের নিচে গিয়ে উদয় হওয়ার অনুমতি চাইল কখন। অনুমতি পেল কখন? আবার আরশের নিচে গেল কখন? আবার অনুমতি চাইল কখন? আবার অস্ত গেল কখন? এ প্রশ্নগুলো জাগে আধুনিক ভূগোলের দৃষ্টিতে।

সবগুলোর জবাব আমার লিখা "ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান" নামক একটি বইয়ে উল্লেখ আছে। ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান বইয়ে আমি এ সবগুলোর জবাব স্ববিস্তারে লিখেছি। এখানে সবগুলোর জবাব দিতে গেলে আমার মূল আলোচনা পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না। আমি আপনাদেরকে যে কথাটি বলতে চাচ্ছি, সেটা হল, সূর্যের উদয় অস্ত কার নিয়ন্ত্রণাধীন? আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে সূর্য উদয় হয় আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে সূর্য অস্ত যায়, এই নিয়ন্ত্রণকেই সিজদা শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। তাহলে সূর্যকে হিদায়াত করে কে? আল্লাহ। চন্দ্রকে হিদায়াত করে কে? আল্লাহ। গাছ-পালাকে হিদায়াত করে কে? আল্লাহ। জীব-জন্তুকে হিদায়াত করে কে? আল্লাহ। আমি শুধু তাফসীরের কিতাব থেকে গাছ-পালাকে যে আল্লাহ হিদায়াত করেন, এর একটা দৃষ্টান্ত পেশ করব।

জীব-জন্তুকে যে আল্লাহ হিদায়াত করেন– এর একটা দৃষ্টান্ত পেশ করব। তারপরে মূল আলোচনার দিকে ফিরে যাব। আল্লাহ যদি আসমান-জমিনের সবকিছুকেই হিদায়াত করেন, তাহলে কুরআন অবতীর্ণ করার কারণ বলতে গিয়ে শুধু "মানুষের হিদায়াতের জন্য কুরআন নাজিল করেছি।" বললেন কেন? এটা হল আমার মূল আলোচনা।

যারা কৃষি কাজ করেন অথবা কৃষি কাজ দেখেছেন অথবা কৃষি কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রাখেন তারা ভালো করে বুঝবেন, জানবেন। আমাদের দেশের কৃষকেরা যে ধানের চাষ করে ধানের বীজ বপন করে সে বীজ তৈরী করার পদ্ধতি আছে। কৃষকেরা জানে বীজ বপনের জন্য ধানের বীজ কোন পদ্ধতিতে তৈরী করতে হয়। কি বলেন কৃষকেরা জানে না? কৃষকেরা যখন বীজ বপনের জন্য ধানের বীজ তৈরী করে, সেই তৈরী করা ধানের বীজের মাঝে অঙ্কুর গজায়। অঙ্কুর গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ধানের তৈরী করা বীজ দু'দিকে দুটি অঙ্কুর গজায়। একটা চিকন লম্বা, আরেকটা মোটা-বেঁটে। চিকন অঙ্কুরটা শিকড় হয়ে মাটির নিচে যায়, আর মোটা অঙ্কুরটা গাছ হয়ে উপর দিকে যায়।

বপনের পর যখন কৃষকেরা ধানের বীজ বুনে, তখন কি হাতে ধরে বীজের চিকন অঙ্কুরটা নিচের দিকে দিয়ে বোনে? না এলোমেলো? এলোমেলো। কিন্তু বীজ বোনার পর দেখা যায় আপনা আপনি নিজে নিজেই অটোমেটিকলি চিকন অঙ্কুরটা নিচের দিকে চলে গেছে, আর মোটা অঙ্কুরটা উপর দিকে উঁকি মেরেছে। যদি চিকন অঙ্কুরটা নিচের দিকে না যেত, তাহলে মাটির রস আহরণ করার সুযোগ হতো না যদি মোটা অঙ্কুরটা উপর দিকে না যেত, তাহলে গাছ হত না। নিচের দিকে গেলে পঁচে যেত। তাহলে সে অঙ্কুরটা উপর দিকে নিয়ে গেল কে? আল্লাহ । যে অঙ্কুরটা উপর দিকে গেলে গাছ হবে, সেটাকে পরে উপর দিকে উঠাল কে? আল্লাহ। তাহলে বলুন গাছপালাকে তার মঙ্গলের পথে পরিচালনা করে কে? আল্লাহ। তাহলে গাছপালার হিদায়াতের মালিক কে? আল্লাহ, গাছ-পালাকে হিদায়াত করেন আল্লাহ।

এবার জীব-জন্তুর হিদায়াতের একটা নমুনা বুঝার চেষ্টা করি। যে সমস্ত খামারে হাস-মুরগী পালা হয় অথবা যে সমস্ত কৃষকেরা নিজের বাড়ীতে হাস-মুরগী পালেন, তারা লক্ষ করলে দেখবেন, মুরগী যখন তার ডিম পাড়া শেষ করে, শেষ করার পর থেকেই ডিমগুলো ফেলে কোথাও চলে যায়? না ডিমে বসে থাকে তাপ দেওয়ার জন্য? ডিমে বসে থাকে। ডিমে বসে বসে তাপ দেয় প্রায় তিন সপ্তাহ। তিন সপ্তাহ তাপ দেওয়ার পর ডিমের ভিতরে মুরগীর বাচ্চা হয়। ঐ ডিমের ভিতরে সৃষ্টি হওয়া বাচ্চাগুলো এত দুর্বল,

এত শক্তিহীন থাকে যে, নিজের শক্তিতে ডিমের ছোলা ভেঙ্গে বের হতে পারে না। আপনারা কি মনে করেন ডিমের ভিতরে তৈরী হওয়া বাচ্চা নিজের শক্তিতে ছোলা ভাঙ্গতে পারে? পারে না । তখন মুরগী করে কী নিজের ঠোঁট দ্বারা আঘাত করে ডিমের ছোলা ভেঙ্গে দেয়। তারপর ডিমের ভিতর থেকে বাচ্চা বের হয়ে আসে। যদি বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগেই ডিমের ছোলা ভাঙ্গে? তাহলে বাচ্চা নষ্ট হবে কি না? নষ্ট হবে। আর ডিমের ভিতরে বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পরও যদি ডিমের ছোলা ভাঙ্গতে দেরী করে তাহলে ডিমের ভিতরে বাচ্চাটা মরে যাবে কি না? এজন্য লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ডিমের ভিতরে বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার আগেও মুরগী- ডিমের ছোলা ভাঙ্গে না, আর পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পরেও ডিমের ছোলা ভাঙ্গতে দেরী করে না।

ঠিক সময়ে এ ডিমের ভিতরে বাচ্চাটা যখন পূর্ণাঙ্গ হয়, সেই সময় মুরগী তার ডিমের ছোলা ঠোঁটের আঘাতে ভেঙ্গে দেয়। কিভাবে জানল মুরগী কোন ডিমের ভিতরে বাচ্চাটা পূর্ণাঙ্গ হল? মুরগীর কাছে কি কোনো এক্সরে মেশিন আছে? না। তাহলে কিভাবে জানল? মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন আল্লাহর হিদায়াতের কারণে জানল। সুবহানাল্লাহ। উদাহণের দ্বারা আমরা কি বুঝলাম জীব-জন্তুকে হিদায়াত করে কে? আল্লাহ। আমি আশা করি এই কয়েকটা উদাহরণের দ্বারা বুঝতে পেরেছি, সূর্যকে হিদায়াত করেন আল্লাহ, চন্দ্রকে হিদায়াত করেন আল্লাহ, গাছ-পালাকে হিদায়াত করেন আল্লাহ, জীব-জন্তুকে হিদায়াত করেন আল্লাহ। এই কয়েকটা উদাহরণের দ্বারা আমরা আল্লাহর সেই আয়াতের মর্ম পরিস্কারভাবে বুঝে ফেলব, যে আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, اللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানের বাসিন্দাদের হিদায়াত করেন আল্লাহ, জমিনের বাসিন্দাদের হিদায়াত করেন আল্লাহ।

কিন্তু কুরআন নাজিলের কারণ বর্ণনা করে বলেন কি, সূর্যের হিদায়াতের জন্য কুরআন নাজিল করেছি, চন্দ্রের হিদায়াতের জন্য কুরআন নাজিল করেছি, গাছ-পালার হিদায়াতের জন্য কুরআন নাজিল করেছি, কুরআন নাযিল করেছি জীব-জন্তর হিদায়াতের জন্য? তা বলেননি; বলেছেন, মানুষের হেদায়াতের জন্য। এখানে আমাদের দুটি কথা পরিস্কার হয়ে গেল। একটা হল আল্লাহ সমস্ত জাগতবাসীকেই হিদায়াত করেন

সমস্ত জগতবাসীকেই কল্যাণের পথে পরিচালনা করেন। কিন্তু কুরআন নাজিলের কারণ বলতে গিয়ে আর কিছুর হিদায়াতের জন্য কুরআন নাজিলের কথা বলেন নি। বলেছেন শুধু "মানুষের হিদায়াতের জন্য কুরআন নাজিল করেছি, কেন বললেন? তার কারণ হল, মানুষের হিদায়াত আর চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, গাছ-পালা, জীব-জন্তুর হিদায়াতে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবধান আছে। সেই ব্যবধানটার প্রতি আল্লাহ ইঙ্গিত করতে চান। কি ব্যবধান ? সূর্যকে আল্লাহ যে কল্যাণের পথ দেখান, সেই পথে আল্লাহ সূর্যকে চলতে বাধ্য করে দেন, বিপরীত পথে চলার কোন ক্ষমতাই তাকে দেন না।

চন্দ্রকে আল্লাহ যে পথপ্রদর্শন করেন, সেই পথে চলতে আল্লাহ চন্দ্রকে বাধ্য করে দেন, ভিন্ন পথে চলার ক্ষমতাই তার নেই। গাছ-পালাকে আল্লাহ যে পথ দেখান, সে পথে চলতে বাধ্য করে দেন, ভিন্ন পথে চলার ক্ষমতাই তার নেই। জীব-জন্তুকে আল্লাহ যে পথপ্রদর্শন করেন, সেই পথে আল্লাহ নিজের কুদরতী হাতে পরিচালনা করেন, ভিন্ন পথে চলার কোন ক্ষমতাই তাকে দেন না। ব্যতিক্রম মানুষের বেলায়। মানুষকে আল্লাহ কল্যাণের যে পথপ্রদর্শন করেন, মানুষের ঘাড়ে ধরে সেই পথে পরিচালনা করেন না; বরং কল্যাণের পথপ্রদর্শন করে মানুষকে বলেন- ইচ্ছে হলে তুমি কল্যাণের পথে চলো আমি কুরআনের মাধ্যমে তোমাকে পথপ্রদর্শন করলাম। ইচ্ছে না হলে তুমি ভিন্ন পথে চলো, সেই পথে চলার ক্ষমতাও আমি তোমাকে দেব।

বুঝে থাকলে বলুন তো! আসমান-জমিনের সমস্ত বাসিন্দার হিদায়াতের পদ্ধতি আর মানুষের হিদায়াতের পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে কি না? আছে। অন্যান্যদের যে হিদায়াত আল্লাহ করেন সে হিদায়াতে আল্লাহ চলতে বাধ্য করেন। মানুষকে আল্লাহ যে হিদায়াত করেন, মানুষকে আল্লাহ যে পথপ্রদর্শন করেন সে পথে চলতে বাধ্য করেন না; বরং তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেন। ইচ্ছে হলে হিদায়াতের পথে চলো, ইচ্ছে না হলে হিদায়াতের পথে না চলো। এমর্মে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এক আয়াতে বলেন, مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ যার মন চায় ঈমান এনো। وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ যার মন চায় কুফুরী করো।

তাহলে কুরআনে আল্লাহ্ মানুষকে ঈমান আনার পথ দেখালেন কিনা? দেখালেন। ঈমান আনতে বাধ্য করে দিয়েছেন, না তার ইচ্ছাধীন দিয়েছেন? ইচ্ছাধীন। এই কারণে ফেরাউন কুফুরী করার সুযোগ পেল। এ কারণে নমরুদ কুফুরী করার সুযোগ পেল। এই কারণে শাদ্দাদ কুফুরী করার সুযোগ পেল। এ কারণে হামান কুফুরী করার সুযোগ পেল। এ কারণে কারুন কুফুরী করার সুযোগ পেল। এই কারণে আবু জেহেল কুফুরী করার সুযোগ পেল। এ কারণে আবু লাহাব কুফুরী করার সুযোগ পেল। এ কারণে তসলিমা নাসরীন কুফুরী করার সুযোগ পেল। এ কারণে ড. আহমদ শরীফ কুফুরী করার সুযোগ পেল। সুযোগটা দিল কে? আল্লাহ্। কুফুরী করার সুযোগ দিলেন কেন? এটা বুঝতে হবে। হিদায়াতের হাকীকত বুঝতে হলে এটা বুঝতে হবে।

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন নমরুদকে কুফুরী করার সুযোগ দিলেন কেন? হিদায়াতের পথ দেখানোর পর আল্লাহ্ কুফুরী করার ক্ষমতা দিলেন কেন? নমরুদকে হিদায়াতের পথ দেখানোর পর আবার কুফুরী করার সুযোগ দিলেন কেন? আবু জেহেল আবু লাহাবকে হিদায়াতের পথ দেখানোর পর আবার কুফুরী করার ক্ষমতা দিলেন কেন? আহমদ শরীফ আর তাসলিমা নাসরীনকে হিদায়াতের পথ দেখানোর পর আবার কুফুরী করার সুযোগ দিলেন কেন? এটা একটা উদাহরণের মাধ্যমে অতি সহজে আমরা বুঝতে পারি। যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যখন পরীক্ষা চলতে থাকে, পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী ছাত্ররা যখন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বসে। তাদের বসার ব্যবস্থা, লেখার ব্যবস্থা প্রশ্নপত্র বিতরণের ব্যবস্থা,উত্তর পত্র গ্রহণের ব্যবস্থার জন্য কিছু কর্মচারীও থাকে? থাকে।

কর্মচারীদের ডিউটি আর পরীক্ষার্থীদের ডিউটির মাঝে যেভাবে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে আসমান-জমিনের সমস্ত বাসিন্দাকে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্য কর্মচারী বানিয়েছেন। শুধু মানুষকে পরীক্ষার্থী বানিয়েছেন, আর এই দুনিয়াটাকে আল্লাহ্ পরীক্ষার হল বানিয়েছেন। পরীক্ষার হলে বর্মচারীদেরকে যে ডিউটি দেওয়া হয়, সেই ডিউটির ব্যতিক্রম করার অধিকার দেওয়া হয়, কখনো নয়। যদি বর্মচারীরা পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের সেবার ডিউটি পালনে অবহেলা করে, ব্যতিক্রম করে তাহলে পরক্ষীর্থীরা সাধীনভাবে পরীক্ষা দিতে পারবে? না। তাহলে মানুষকে বানিয়েছেন পরীক্ষার্থী, সূর্যকে বানিয়েছেন কর্মচারী, চন্দ্রকে বানিয়েছেন কর্মচারী, গ্রহ-নক্ষত্রকে বানিয়েছেন কর্মচারী, গাছ-পালাকে বানিয়েছেন কর্মচারী, জীব-জন্তুকে বানিয়েছেন কর্মচারী, আসমান জমিনের সমস্ত বাসিন্দাকে বানিয়েছেন কর্মচারী, এরা ডিউটি পালনে যেন ব্যতিক্রম করতে না পারে এই জন্য এদেরকে সেই পথপ্রদর্শন করেন, সেই পথে চলতে বাধ্য করে দেন। আর শুধু মানুষকে বানিয়েছেন পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার হলের মাঝে পরীক্ষার্থীদের দায়িত্ব হল প্রশ্নের ভুল জবাব দেওয়া? না সঠিক জবাব দেওয়া? সঠিক জবাব দেওয়া। যদি কোনো ছাত্র, কোনো পরীক্ষার্থী প্রশ্নের জবাব ভুল লিখে, তাহলে তাকে লেখার সুযোগ দেওয়া হয়, না বাধা দেওয়া হয়? সুযোগ দেওয়া হয়।

বাধা দেওয়া হয়? না, তোমার দায়িত্ব হল প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া। সঠিক জবাব দিতে চাইলে সেই সুযোগও তোমাকে দেওয়া হবে। তোমার দায়িত্ব হল প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া, ভুল জবাব লিখলেও তোমাকে লেখার সুযোগ দেওয়া হবে। কেন? ওরা কর্মচারী। ওরা পরীক্ষার্থী নয়। ওদের ডিউটি ঠিকমত পালন করতে হবে। তুমি কর্মচারী নয় তুমি পরীক্ষার্থী। তোমাকে সঠিক জবাব দিলেও, সঠিক জবাব লিখলেও সাধীনতা দেওয়া হবে, ভুল জবাব লিখলেও সাধীনতা দেওয়া হবে। কর্মচারী আর পরীক্ষার্থীর যেই ব্যবধান আসমান-জমিনের সমস্ত বাসিন্দা আর মানুষের সেই ব্যবধান।

এজন্য আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন মানুষকে যে হিদায়াত করেন- এর অর্থ মঙ্গলের পথ দেখানো। হিদায়াত করেন অর্থ? মঙ্গলের পথ দেখানো। সেই পথে চলতে বাধ্য করেন না। আমি কি বিষয়টা বুঝাতে পারলাম? জ্বী । সেই পথে চলতে বাধ্য করেন না। বলুন তো! পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদেরকে যদি একমাত্র সঠিক জবাব লিখতে বাধ্য করা হয়, ভুল জবাব দিলে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে সেটা পরীক্ষা থাকে? না। ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীর বাসিন্দা মানুষকে যদি আল্লাহর হিদায়াতে চলতে বাধ্য করা হয়, ভুল পথে চলার ক্ষমতাই না দেওয়া হয়, তাহলে দুনিয়াতে মানুষ পাঠানোর কোনো স্বার্থকতা থাকে না। এজন্য আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন

সূর্যকে যেই পথ দেখান, সেই পথে চলতে বাধ্য করে দেন, কারণ সূর্য মানুষের কর্মচারী। চন্দ্রকে যেই পথ দেখান সেই পথে চলতে বাধ্য করে দেন; কারণ চন্দ্র মানুষের কর্মচারী। গাছ-পালাকে যেই পথ দেখান সেই পথে চলতে বাধ্য করেন, গাছপালা মানুষের কর্মচারী। জীব-জন্তুকে যে পথ দেখান সেই পথে চলতে বাধ্য করেন–গাছপালা মানুষের কর্মচারী। ফিরিশতাকে যে পথ দেখান, সেপথে চলতে বাধ্য করে দেন, ফিরিশতা মানুষের কর্মচারী। কিন্তু মানুষকে যে পথ দেখান সেই পথে চলতে বাধ্য করেন না। ভিন্নপথে চলতে ক্ষমতা দেন। কারণ, দুনিয়াতে কর্মচারী নও তুমি, তুমি পরীক্ষার্থী।

বলুন তো! আসমান-জমিনের সমস্ত বাসিন্দার হিদায়াত আর মানুষের হিদায়াতে ব্যবধান আছে? আছে। এবার বলুন যাকে যেই পথ দেখানো হল সেই পথে যদি পথ প্রদর্শক নিজের দায়িত্বে চালান, তাহলে তাকে সেই পথ দেখানোর জন্য কুরআন নাজিলের দরকার হত? না দেখানেওয়ালা নিজের দায়িত্বেই চালান? পথ দেখানেওয়ালা নিজের দায়িত্বেই চালান। কিন্তু মানুষ যেহেতু কর্মচারী নয়, মানুষ যেহেতু পরীক্ষার্থী –এজন্য আল্লাহ পাক মানুষকে ঘাড়ে ধরে এনে হিদায়াতের পথে চলতে বাধ্য করেন না।

আল্লাহ কুদরতী হাতে মানুষের ঘাড় ধরে সুদ ছাড়তে বাধ্য করেন না, ঘুষ ছাড়তে বাধ্য করেন না, মদ ছাড়তে বাধ্য করেন না, গাঁজা ছাড়তে বাধ্য করেন না, তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন– আমি তোমাকে পথ প্রদর্শন করলাম, যদি জান্নাতের চাবি পেতে চাও, নামাযী হয়ে যাও। যদি জাহান্নাম থেকে বাঁচার হাতিয়ার চাও –রোযাদার হয়ে যাও। যদি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাও, সুদ বর্জন করো, যদি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাও, ঘুষ বর্জন করো, যদি জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাও, মদ বর্জন করো, যদি জাহান্নাম থেকে বাচতে চাও, গাজা বর্জন করো। যদি জান্নাতে যেতে চাও, আমার হিদায়াতের পথ অবলম্বন করো। তো তা করবে কি না, তাতে আমি তোমাকে বলপ্রয়োগ করব না, কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করব না, তোমার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলাম।

সেই তথ্যের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজিদ অবতীর্ণের কারণ বর্ণনা করে বলেন, هُدًى لِّلنَّاسِ মানুষকে শান্তি ও

মুক্তির পথ দেখানোর জন্য কুরআন নাজিল করেছি। এই কুরআন থেকে শিখে নেবে– কোন পথে চললে তোমার মঙ্গল হবে, কোন পথে চললে তোমার অমঙ্গল হবে। কোন পথে চলবে বা চলবে না– সেটা তোমার ব্যাপার, আর পথ প্রদর্শন করা হল আমার ব্যাপার। একথা জগতের আর কোনো জন্তুর বেলায় আর কোনো বস্তর বেলায় চলে না। একমাত্র মানুষের বেলায় চলে। এজন্য আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন মানুষের হিদায়াতের জন্য কুরআন নাজিল করেছি বলেছেন।

আরেকটা প্রশ্ন আছে আনুষঙ্গিক। সেটা হল –যেমনভাবে কুরআনের এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন– মানুষের হিদায়াতের জন্য কুরআন নাজিল করেছি, তেমনিভাবে আরেক আয়াতে বলেছেন, هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ খোদাভীরুদের হিদায়াতের জন্য কুরআন নাজিল করেছি। এক আয়াতে বললেন সমস্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য কুরআন নাজিল করেছি, আরেক আয়াতে বললেন, শুধু খোদাভীরুদের হিদায়াতের জন্য কুরআন নাজিল করেছি। এখন একই প্রশ্নের জবাব দু'আয়াতে দুভাবে বললেন কেন? এই প্রশ্নের জবাবটাও একেবারে সহজ নয়। তাই আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে জবাবটা সহজে অনুধাবন করতে পারি।

ধরুন একটা ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার তাকে ব্যবস্থাপত্র দিল। ডাক্তার ব্যবস্থা পত্রের নিচে লিখে দিল ঔষধগুলো ঠিকমত ব্যবহার করতে হবে। সাথে সাথে যতদিন তুমি রোগে আক্রান্ত আছ ততদিন পর্যন্ত ঘি খাওয়া যাবে না। ততোদিন পর্যন্ত দুধ পান করা যাবে না, ততোদিন পর্যন্ত ডিম খাওয়া যাবে না, ততোদিন পর্যন্ত গোশত খাওয়া যাবে না, ততোদিন পর্যন্ত তেঁতুল খাওয়া যাবে না। রোগী অহরহ ডিম খায় গোশত খায়, তেতুল খায়, দুধ পান করে। ডাক্তার বারবার নিষেধ করে রোগী বারবার খায়। এবার ডাক্তার বলে দিল 'চিকিৎসা তোমার জন্য নয়'। চিকিৎসা যে তার জন্য নয় সেটা চিকিৎসার অযোগ্যতার কারণে, না রোগীর দোষের কারণে? রোগীর দোষের কারণে।

ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন বলেছেন, هُدًى لِّلنَّاسِ কুরআনের হিদায়াত সমস্ত মানুষের জন্য। কিন্তু যে সমস্ত মানুষ কুরআনের হিদায়াত বুঝার পরও বারবার তাকে কুরআন প্রদর্শিত পথ দেখানোর

পরও, কুরআনের বর্ণিত শান্তি ও মুক্তির পথ দেখানোর পরও বারবার যারা ভিন্নপথে চলে, জেনে-শোনেই, বুঝে-শোনেই যারা কুরআনের পথে না চলে ভিন্ন পথে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছে– আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন বলেন, কুরআন নাজিল করেছিলাম সমস্ত মানুষের হিদায়াতের জন্য কিন্তু তোমার মত হঠকারী কুরআনের হিদায়াত গ্রহণ করতে পারবে না, শুধু খোদাভীরু যারা তারাই কুরআনের হিদায়াত গ্রহণ করতে পারবে।

এজন্য আল্লাহ এক আয়াতে বলেছেন, هُدًى لِّلنَّاس আরেক আয়াতে বলেন, هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ –একই প্রশ্নের জবাব দু আয়াতে দুভাবে দেওয়ার এই হল কারণ। সুতরাং কুরআনের প্রদর্শিত হিদায়াতের পথ যারা গ্রহণ করে, তাদেরকে কুরআনের ভাষায় মুত্তাকীন বলে। মুত্তাকীন – মুত্তাকী শব্দের বহুবচন। এর ফারসী তরজমা হল পরহেজগার। উর্দু–বাংলায়ও পরহেজগার শব্দ ব্যবহার হয়। শুধু বাংলায় বলে খোদাভীরু আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় বলে আল্লাহওয়ালা'। কুরআনের হিদায়াতের পথ যারা অবলম্বন করে তারা আল্লাহওয়ালা, তারা খোদাভীরু তারা পরহেজগার তারা মুত্তাকীন।

এ হিদায়াত সম্পর্কে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন বলেন,

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত করতে চান, যেই লোকটাকে আল্লাহ হিদায়াত করতে চান – আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তার অন্তরটাকে ইসলামের জন্য খুলে দেই। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করতে চান, তার অন্তরকে হিদায়াতের জন্য খুলে দেন। প্রশ্ন জাগে কি না? জাগে। কি প্রশ্ন ? আমার অন্তর যদি আল্লাহ খুলে দেন না, তাহলে তো আমি কুরআনের হিদায়াত গ্রহণ করতে পারবো না– আমার কি দোষ? যেহেতু আল্লাহ কুরআনে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

যাকে আল্লাহ চান হিদায়াত করতে তার অন্তরটাকে ইসলামের জন্য খুলে দেন।

ইসলামের জন্য খুলে দেন কথার ব্যাখ্যা কি? এক হাদীসে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ যাকে হিদায়াত

করতে চান, তার অন্তরকে আল্লাহ ইসলামের জন্য খুলে দেন। কথার ব্যাখ্যা হল– আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অন্তরের মাঝে একটা নূর আসে, নূর। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অন্তরে একটা কি আসে? 'নূর' আসে। নূর কি জিনিস? নূর শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'আলো' নূর শব্দের পারিভাষিক অর্থ হল– হিদায়াত। ইসলামের পারিভাষিক অর্থে নূর অর্থ কি? হিদায়াত। আল্লাহ যে আয়াতে বলেন,

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

আসমানের বাসিন্দাদের হিদায়াত আল্লাহর হাতে, জমিনের বাসিন্দাদের হিদায়াত আল্লাহর হাতে – এখানে নূর শব্দের পারিভাষিক অর্থটাকে মূল অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

আল্লাহ্ আসমানের বাসিন্দাদের হিদায়েত করেন। আল্লাহ্ জমিনের বাসিন্দাদের হিদায়াত করেন, আল্লাহ্ ফিরিশতাদেরকে হিদায়াত করেন, আল্লাহ্ মানুষকে হিদায়াত করেন, এজন্য আল্লাহ্কে আসমান-জমিনের নূর বলা হয়েছে। সমস্ত আসমান জমিনের বাসিন্দাদের হিদায়াত করার মালিক হলেন আল্লাহ্। আবার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেও কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ও রাসূলের বিভিন্ন হাদীসে নূর বলা হয়েছে। আবার কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে কুআনকেও নূর বলা হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন জাগে হিদায়াতের মালিক যদি একমাত্র আল্লাহ্ হয়ে থাকেন, এই অর্থেই যদি আল্লাহ্কে নূর বলা হয়ে থাকে, তো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ হিদায়াতের মালিক নয়, তাকে কেন নূর বলা হল? কুরআন তো হিদায়াতের মালিক নয়, তাকে কেন নূর বলা হল? এই প্রশ্নের জবাব হল হিদায়াতের মালিক যে আল্লাহ্ সেই হিসাবে আল্লাহ্কে নূর বলা হয়েছে মূল অর্থে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন হিদায়াতের মাধ্যম, কুরআন হল হিদায়াতের মাধ্যম। সুতরাং কুরআনকে এবং রাসূলকে নূর বলা হয়েছে, মূল অর্থে নয়, রূপক অর্থে।

যারা মাদরাসা পড়ুয়া নন, যারা মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত নন যারা মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষার্থী নন, তাদের ভাষায় বললাম। যারা মাদরাসা পড়ুয়া, যারা মাদরাসার ছাত্র এদেরকে খুব সহজে বলা যাবে। আল্লাহ্কে যদি নূর বলা হয় তাহলে হিদায়াত মালিক অর্থে ব্যবহার হয়। এই নূর

শব্দকে হাকীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়। রাসূলকে যদি নূর বলা হয় হিদায়াতের মালিক অর্থে নয়, হিদায়াতের মাধ্যম অর্থে। হাকীকী অর্থে নয়, মাজাযী অর্থে। কুরআনকে যদি নূর বলা হয় حقيقى অর্থে নয়, مجازى অর্থে। আল্লাহ্ কে নূর বলা হয় হাকীকী অর্থে। বিষয়টা কি বুঝাতে পারলাম ?

তাহলে সারমর্ম দাঁড়ালো হিদায়াতের মালিকানা আল্লাহ্র হাতে। রাসূল হলেন মাধ্যম। কুরআন হল মাধ্যম। সুতরাং হিদায়াতের মালিক বুঝাতে হলে আল্লাহ্কে নূর বলা হয়, হিদায়াতের মাধ্যম বুঝাতে হলে রাসূলকে নূর বলা হয়, হিদায়াতের মাধ্যম বুঝাতে হলে কুরআনকে নূর বলা হয়, হিদায়াতের মাধ্যম বুঝাতে হলে ইসলামকে নূর বলা হয়। বিষয়টা কি বুঝতে পারলেন? তাহলে আল্লাহ্ যে আয়াতে বলেছেন, আমি যাকে হিদায়াত করতে চাই, তার অন্তরটাকে ইসলামের জন্য খুলে দিই। একথার ব্যাখ্যায় হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান, তার অন্তরটাকে যে আল্লাহ্ ইসলামের জন্য খুলে দেন, এর ব্যাখ্যা হল আল্লাহ্ তার অন্তরে একটা নূর দান করেন।

আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান তার অন্তরে একটা নূর দান করেন। এই নূরটা কি? ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান, তার অন্তরে আল্লাহ্ যে একটা নূর দান করেন, সেই নূর কার অন্তরে আল্লাহ্ দান করলেন আর কার অন্তরে দান করলেন না, সেটা জানার বুঝার কোনো লক্ষণ আছে কি? কোনো আলামত আছে কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আছে। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, আলামত কয়টা? রাসূল বলেন, ৩টা। এ তিনটা আলামত বুঝলেই আপনারা যারা উপস্থিত আছেন তারা বুঝে ফেলবেন হিদায়াতের নূর আল্লাহ্ আপনার অন্তরে দান করলেন কি? এই তিনটা আলামত বুঝলেই যারা উপস্থিত আছেন, তারা টের পাবেন আল্লাহ্ হিদায়াতের নূর আপনার অন্তরে দান করলেন কি না, আপনার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দিলেন কি না।

তিনটা আলামত পেলে বুঝা যাবে, আল্লাহ্ আমার অন্তরকে হিদায়াতের জন্য খুলে দিয়েছেন, আর তিনটা আলামত যার কাছে নেই, প্রমাণ হবে

আল্লাহ্ তার অন্তরে নূর দান করেন নি। আল্লাহ্র রাসূল বলেন, এই তিনটা আলামতের প্রথম আলামত হল, সে দুনিয়ামুখী না, পরকালমুখী। দুনিয়া দেখে বিমুখ হবে। এটা হল আল্লাহ আমার অন্তরে নূর দিলেন কি না, এর প্রথম আলামত। দুনিয়া বিমুখ হবে। অর্থাৎ দুনিয়ার জন্য পাগল হবে না, হারাম উপায়ে, অবৈধ উপায়ে, অন্যায়ভাবে, জালিয়াতির মাধ্যমে, দুর্নীতির মাধ্যমে দুনিয়া হাসিল করার চেষ্টা করবে না। আমার কথা বুঝে থাকলে বলুন, যারা অন্যায়ভাবে দুনিয়ার যশ, মান-মর্যাদা, ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা অর্জন করতে চায় সেটা আলামত হল আল্লাহ্ তার অন্তরে নূর দিয়েছেন (!), না দেন নি? টের পাচ্ছেন কি না? টের পাচ্ছেন কি না, কার অন্তরে আল্লাহ্ নূর দিলেন, আর কার অন্তরে নূর দিলেন না? জ্বী হ্যাঁ। (শ্রোতাদের)

বাকী রয়েছে, কতগুলো কঠিন কঠিন প্রশ্ন। আল্লাহ্ যদি আমার অন্তরে হিদায়াতের নূর না দিয়ে থাকেন, তাহলে তো আমি অন্যায়ভাবে দুনিয়া কামাই করবোই, তাহলে তো আমি অন্যায়ভাবে দুনিয়ার ধন-সম্পদ অর্জন করবোই, তাহলে তো আমি লুঠ-তরাজ করবোই, তাহলে তো আমি চুরি-ডাকাতি করবোই, তাহলে তো আমি জালিয়াতি করবোই, তাহলে তো আমি দুর্নীতি করবোই, আমার কি দোষ, আমার অন্তরে আল্লাহ্ নূর দিলেন না কেন? কঠিন প্রশ্ন। হাসার কথা নয়। (শ্রোতাদের হাসির পর) ইনশাআল্লাহ্ পরে জবাব দেওয়া হবে।

আগে তিনটা আলামত বুঝে নিই। আল্লাহ্ যে আয়াতে বলেছেন, আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন। ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলের কাছে, এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। রাসূল বললেন, এর ব্যাখ্যা হল আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান, তার অন্তরে আল্লাহ্ একটা নূর দান করেন। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেন কার অন্তরে আল্লাহ্ নূর দান করলেন আর কার অন্তরে আল্লাহ্ নূর দান করলেন না, বুঝার জন্য কোনো আলামত আছে কি? রাসূল বললেন, তিনটা আলামত আছে। এর মাঝে প্রথম আলামত দুনিয়া বিমুখতা। সে দুনিয়ামুখী হবে না। দুনিয়ামুখী হবে না কথার ব্যাখ্যা, অন্যায়ভাবে দুনিয়ার ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা অর্জন করতে যাবে না। হারাম উপায়ে দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করতে যাবে না। অপরাধের পথে অগ্রসর হবে না দুনিয়ার

মান-মর্যাদা কামাই করার জন্য। এর অর্থ হল সে দুনিয়ামুখী হবে না। এটা হল আল্লাহ্ আমার অন্তরে হিদায়াতের নূর দিলেন কি না, এর প্রথম লক্ষণ।

দুই নম্বর লক্ষণ হল, সে পরকালমুখী হবে। দুই নম্বর লক্ষণ কি? পরকালমুখী। প্রথম নম্বর লক্ষণ হল দুনিয়ামুখী হবে না। দুই নম্বর লক্ষণ হল আখেরাতমুখী হবে। 'দুনিয়ামুখী হবে না' কথার ব্যাখ্যা বুঝলেন ? চুরি করবে না, ডাকাতি করবে না, জালিয়াতি করবে না, জবরদখল করবে না, হাইজ্যাক করবে না, ছিনতাই করবে না, যিনা করবে না, ব্যভিচার করবে না, সুদ খাবে না, ঘুষ খাবে না, মদ খাবে না, গাঁজা খাবে না, এর অর্থ হলো সে দুনিয়ামুখী নয়। আল্লাহ্ আমার অন্তরে হিদায়াতের নূর দিলেন কিনা এর প্রথম লক্ষণ। টের পাওয়া যায় কিনা কার অন্তরে আল্লাহ্ হিদায়াতের নূর দিলেন আর কার অন্তরে দিলেন না ? জ্বী! (শ্রোতাদের)। অবশ্যই কথা বুঝলে টের পাওয়ার কথা।

দুই নম্বর লক্ষণ সে পরকালমুখী হবে। পরকালমুখী কিভাবে হবে ? যে কাজগুলো করলে জান্নাতে যাবে সে কাজগুলো সে করবে। এর অর্থ হলো পরকালমুখী হবে। বুঝলেন কি পরকালমুখীতার ব্যাখ্যা ? যে কাজ করলে পরকালে শান্তি পাওয়া যায়, যে কাজ করলে পরকালে মুক্তি পাওয় যায়, সেই কাজগুলো করবে। নামায পড়লে, রোযা রাখলে, ইবাদত করলে, বন্দেগী করলে, নবীর সুন্নাত মত আমল করলে, নবীর সুন্নাত তরীকা পালন করলে পরকালে শান্তি পাওয়া যায়, পরকালে মুক্তি পাওয়া যায়, এ কাজগুলো করবে, এর অর্থ হল সে পরকালমুখী হবে।

দুই নম্বর আলামত বুঝে থাকলে বলুন, আমরা কি টের পেতে পারি যে, আল্লাহ্ আমার অন্তরে হিদয়াতের নূর দিলেন কি না? জ্বী! কত নম্বর লক্ষণ গেল? দুই নম্বর। প্রথম লক্ষণ হল, সে দুনিয়ামুখী হবে না। দ্বিতীয় লক্ষণ হল, সে পরকালমুখী হবে। তিন নম্বর লক্ষণ হল সে সদা সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকবে। সদা সর্বদা সে মৃত্যুর জন্য (?) প্রস্তুত থাকবে। কিভাবে ? গুনাহর বোঝা বহন করে বেপরওয়াভাবে চলতে থাকবে না। ভুল বশত সে যদি কখনো কোনো গুনাহ করে থাকে, সাথে সাথে তাওবা করে গুনাহ মাফ করিয়ে রাখবে, যেন এই মুহূর্তে আজ্রাইল যদি আমাকে নিয়ে যায়, যেন আমি বেগুনাহ অবস্থায় আল্লাহ্র দরবারে হাজিরা দিতে পারি। সুবহানাল্লাহ্।

এটা কত নম্বর লক্ষণ? তিন নম্বর লক্ষণ। এই তিনটা লক্ষণ যার মাঝে আছে আল্লাহ্র রাসূল বলেন, আল্লাহ্ তার অন্তরে হিদায়াতের নূর দান করেছেন। এই মর্মে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন,

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান তার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন।

আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান তার অন্তরকে ইসলামের জন্য (?) খুলে দেন। 'খুলে দেন' কথার অর্থ তার অন্তরে নূর দান করেন। নূর দান করার আলামত (?) ৩টি। এক নম্বর দুনিয়ামুখী হবে না, দুই নম্বর পরকালমুখী হবে, তিন নম্বর মৃত্যুর জন্য সর্বদা পস্তুত থাকবে। তিন নম্বর মৃত্যুর জন্য সর্বদা (?) প্রস্তুত থাকবে। কথাগুলো বুঝলে এবার আমরা বঝতে পারি না যে, আল্লাহ্ হিদায়াতের নূর কাকে দান করেছেন আর কাকে নয় ? জ্বী! (শ্রোতাদের)

এবার প্রশ্ন আল্লাহ্ যদি আমার অন্তরে হিদায়াতের নূর দান না করে থাকেন তাহলে তো আমি দুনিয়ামুখী হব। আল্লাহ্ যদি আমার অন্তরে হিদায়াতের নূর দান না করে থাকেন, তাহলে তো আমি পরকালমুখী হবই না, আল্লাহ্ যদি আমার অন্তরে হিদায়াতের নূর দান না করে থাকেন তাহলে তো আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবই না, তাহলে এ সমস্ত অপরাধের জন্য এই সমস্ত দোষের জন্য আমার কি দায়িত্ব আছে, আমার কি অপরাধ? দুনিয়ামুখী হওয়া কি আমার অপরাধ? আল্লাহ্ আমাকে হিদায়াতের নূর দিলেন না, এজন্য আমি দুনিয়ামুখী হয়েছি। পরকালমুখী না হওয়ার জন্য আমার কি অপরাধ? আল্লাহ্ আমাকে হিদায়াতের নূর দিলেন না, এজন্য আমি আখিরাতমুখী হতে পারি নি। আল্লাহ্ আমার অন্তরে হিদায়াতের নূর দিলেন না, এ জন্য আমি মৃত্যুর জন্য তৈরী হতে পারি নি। আমার কি অপরাধ?

প্রশ্নটা বুঝতে পারলেন? এবার এই প্রশ্নের জবাব। অন্য আয়াতে আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (عنكبوت - ٦٩)

নিশ্চয় যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় আমার পথ পাওয়ার জন্য, আমার পথ চিনার জন্য, আমার পথে চলার জন্য, আমি আল্লাহ্পাক রাব্বুল

আলামীন তাদেরকেই আমার পথের হিদায়াত করি।" (আনকাবূত ঃ ৬৯) তাহলে আল্লাহ্ আমার অন্তরে হিদায়াতের নূর দিলেন না, আল্লাহ্র দোষে, না আমার দোষে? আমি হিদায়াতের পথে প্রচেষ্টা চালালাম না। আমি আল্লাহ্র পথ চিনার জন্য, আল্লাহ্র পথ জানার জন্য, আল্লাহ্র পথে চলার জন্য কোনো চেষ্টা করলাম না। এই জন্য আল্লাহ্ আমার অন্তরে নূর দিলেন না। সুতরাং হিদায়াতের নূর না দেওয়াটা দায়ী, না আমার সচেষ্ট না হওয়াটা দায়ী ? আমার সচেষ্ট না হওয়াটা (?) দায়ী।

কথাটা সহজে বুঝার জন্য দু'টা উদাহরণ পেশ করি। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুটা দুশমন ছিল খুব বড়। একটা দুশমনের নাম ছিল ওমর। আরেকটা দুশমনের নাম ছিল আবু জাহ্ল। উমর ছিল এক নম্বর দুশমন, আবু জাহ্ল ছিল দুই নম্বর দুশমন। বুঝে থাকলে বলুন, আবু জাহ্ল রাসূলের বড় দুশমন ছিল, না উমর বড় দুশমন ছিল? উমর বড় দুশমন ছিল। তাই হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র কাছে দু'আ করলেন, এই দুইটা দুশমনের কোনো একটা দুশমনকে হিদায়াত করো যেন তার মাধ্যমে তার উছিলায় মুসলমানেরা শক্তি অর্জন করতে পারে।

মুসলমানেরা সামাজিকভাবে শক্তি অর্জন করতে পারে। উভয়ের জন্যই আল্লাহ্র রাসূল দু'আ করলেন কি না ? দু'জনই আল্লাহ্র রাসূলের দুশমন ছিলেন কি না ? ছিলেন। উভয়ের জন্যই আল্লাহ্র রাসূল দোয়া করলেন কি না ? করলেন। বেশকম, না সমান সমান দু'আ? সমান সমান দু'আ। কিন্তু আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন রাসূলের সেই দু'আটা আবু জাহ্লের বেলায় কবুল করলেন না। করলেন উমরের বেলায়। ঘটনা কি? উমর রাযি.-এর চেষ্টা ছিল আল্লাহ্র পথ চিনার। উমর রাযি. এর চেষ্টা ছিলো আল্লাহ্র পথ জানার। উমরের চেষ্টা ছিল আল্লাহ্র পথ পাওয়ার পরে সেই পথে চলার।

আবু জাহ্লের আল্লাহ্র পথ পাওয়ার চেষ্টা ছিল না। আল্লাহ্র পথ বুঝার চেষ্টা ছিল না, বুঝে আসলেও সেই পথ গ্রহণ করার ইচ্ছে ছিল না। বুঝে আসলেও সেই পথে চলার (?) ইচ্ছা ছিল না। উমরের চেষ্টা ছিল আল্লাহ্র পথ চিনার, উমরেরর ইচ্ছা ছিল আল্লাহ্র পথে চলার। তার

প্রমাণও আমাদের বুঝতে হবে। আবু জাহ্লের চেষ্টাও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না, তার প্রমাণও আমাদের বুঝতে হবে।

একটা পরামর্শ সভায় সিদ্ধান্ত হল মুহাম্মদকে দমন করতে হলে তাকে হত্যা করা ছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা নেই। সেই পরামর্শ সভায় উমরও ছিল আবু জাহলও ছিল। আবু জাহ্লও এই প্রস্তাবে সম্মত যে মুহাম্মদকে হত্যা করতে হবে। উমরও সেই প্রস্তাবে সম্মত যে মুহাম্মদকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু হত্যা করার জন্য যাবে কে? আবু জাহ্ল সাহস করেনি? উমর নাঙ্গা তরবারী হাতে নিয়ে বললেন, মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্য আমি উমর যথেষ্ট। বুঝে থাকলে বলুন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হত্যা করার জন্য আবু জাহ্ল সাহস করল, না উমর সাহস করল? উমর। বড় দুশমন কে? উমর। এই দু'জনের মাঝে বড় দুশমন কে? উমর। নাঙ্গা তরবারী হাতে নিয়ে উমর রওয়ানা হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হত্যা করবেন।

রাস্তায় এক লোক উমরকে পেল। জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার! উমর বললেন, আজ মুহাম্মদকে হত্যা না করে রেহাই নেই। লোকটা জিজ্ঞেস করল, কেন? উমর বললেন, মুহাম্মদ কেন বলে তার কাছে আল্লাহ্র কুরআন নাজিল হয়। মিছামিছি। আসলে তার কাছে কুরআন নাজিল হয় না। সে মনগড়াভাবে কতোগুলো কথা বানায় আর আল্লাহ্র কুরআন নামে সমাজে চালায়। এই মিথ্যুকের কথা কেন মানব? এই মিথ্যুক আল্লাহ্র কুরআন নাজিল হওয়ার মিথ্যা কথা বলে কেন মানুষকে বিভ্রান্ত করে এই জন্য তাকে হত্যা করা ছাড়া মানুষকে সমাজের বিভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর উপায় নেই।" পথের লোকটা বলল, কুরআনের কথা বলার অপরাধে যদি মুহাম্মদকে হত্যা করতে হয় তোমার বোন আর তোমার ভগ্নিপতি কুরআন গ্রহণ করেছে, তা কি জানো উমর ? উমর বললেন, না তো। ঐ লোকটা বলে হ্যাঁ, তোমার বোনও সেই কুরআন গ্রহণ করে ফেলেছে, তোমার ভগ্নিপতিও সেই কুরআন গ্রহণ করে ফেলেছে।

এবার উমর বলেন, তাহলে মুহাম্মদকে হত্যা করার আগে বোনকে আর ভগ্নীপতিকে হত্যা করব, তারপর মুহাম্মদকে হত্যা করবো। এবার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র সন্ধান ছেড়ে দিয়ে বোনের বাড়ীর পথে রওয়ানা

হলেন। বোনের বাড়ীতে গিয়ে হাতে নাতে পেলেন বোন আর ভগ্নিপতি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করছে। উমরের কাছে হাতে নাতে দু'জন আসামী ধরা পড়ল কি না? পড়ল। উমরের আগমন টের পেয়ে ভগ্নিপতি লুকিয়ে গেলেন। বোন লুকাবেন কোথায়? বোনকে হাতে নাতে ধরে ফেললেন হযরত উমর। কুরআন তিলাওয়াত করার অপরাধে বোনকে মারপিঠ করতে লাগলেন। মারতে মারতে বোনের শরীর জখম করে রক্তাক্ত করে ফেললেন। আপন বোন নিজের হাতে মার খেয়ে জখম হয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে।

এই অবস্থা দেখে উমরের একটু দয়া-মায়া হল। উমর বললেন তুমি কি পড়ছিলে, আমার হাতে দাও তো দেখি! বোন বলেন, তুমি মুশরিক, তুমি নাপাক। আল্লাহ্র পবিত্র কালাম মুশরিকের মত নাপাক ব্যক্তির হাতে দেওয়া যায় না।" উমর জিজ্ঞেস করলেন বোনকে, তাহলে আমি কি করলে পাক হতে পারি? বোন বললেন, গোছল করে এসো। হযরত উমর ফারুক রাযি. গোছল করে আসলেন। বোন কুরআনের যে অংশ হাতে নিয়ে তিলাওয়াত করছিলেন, সেই অংশটা উমরের হাতে দিলেন। জীবনে এই প্রথম বারের মত উমর কুরআনের অংশ হাতে নিয়ে কুরআনের সত্যতা বুঝতে এর আগ পর্যন্ত এত গভীরভাবে কুরআনের সত্যতা যাচাই এর সুযোগ তিনি পাননি। তিনি শুধু শুনে-শুনে বলতেন, মুহাম্মদ মনগড়া বানায় আর আল্লাহ্র কুরআন নামে চালায়। হাতে নিয়ে পড়ার পর তিনি বললেন এত সুন্দর কালাম মুহাম্মদ এর মনগড়া হতে পারে না।

সত্য বুঝতে পারলেন ? পারলেন। এতদিন বুঝেছিলেন, না বোনের বাড়ীতে এসে বুঝলেন? বোনের বাড়ীতে এসে কুরআনের সত্যতা আর হিদায়াত বুঝতে পারলেন। সাথে সাথে দরবারে যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্কে হত্যা করার জন্য রওয়ানা হয়েছিলেন, সেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র দরবারে গিয়ে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। কেন ? বুঝার চেষ্টা করেছেন, এবং সত্য বুঝার পরে গ্রহণ করার প্রস্তুতি নিয়েছেন। তাহলে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন কার অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন ? যে আল্লাহ্কে পাওয়ার পথ চিনার জন্য চেষ্টা করে এবং সেই পথ পাওয়ার পর গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে, আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন তাকে কুরআনের

হিদায়াত দান করেন। তার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন। সুতরাং হযরত উমর ফারুক রাযি. আল্লাহ্র পথ চিনার জন্য চেষ্টা করেছেন, যখন চিনতে পেরেছেন আল্লাহ্র পথে চলতে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন হযরত উমর ফারুক রাযি. এর অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন।

এবার আসুন আবু জেহ্লের বিষয়ে। আবু জাহ্লকে আবু জাহ্লের এক বন্ধু একবার নিরিবিলি এক ঘরের মধ্যে জিজ্ঞেস করে, বন্ধু! আজ তোমাকে একটা প্রশ্ন করব। আগে কথা দাও, আমাকে সত্য জবাব দেবে কি না ? আবু জেহ্ল বলল, কথা দিলাম বন্ধু! তুমি বন্ধু হিসেবে আমাকে যে প্রশ্ন করবে সেই প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবো। তখন আবু জেহ্লের বন্ধু আবু জাহ্লকে জিজ্ঞেস করে "মুহাম্মদ যে সমস্ত কথাবার্তা বলে সেগুলো সত্য বলে, না মিথ্যা বলে ?" এটাই প্রশ্ন। সত্য বলে, না মিথ্যা বলে? আবু জেহেল বলে বন্ধু! মুহাম্মদ আল আমীন, মুহাম্মদ পরম সত্যবাদী।

মুহাম্মাদের জীবনে যত কথা বলে, সবগুলো কড়ায় গণ্ডায় সত্য কথা বলে। মুহাম্মদ জীবনে কোনো দিন একটি মিথ্যা কথাও বলেনি।" হিদায়াত বুঝতে পেরেছিল? বুঝতে পেরেছে। এবার আবু জেহ্লের বন্ধু আবু জাহ্লকে জিজ্ঞেস করে। তাহলে যেই সত্য আমার কাছে গোপনে স্বীকার করেছ, সেই সত্য গ্রহণ করো না কেন ? সমাজের মানুষের কাছে ঘোষণা দাও না কেন ?" তখন সে বলে "দেখো বন্ধু! তুমি বন্ধু হিসেবে আগেই আমি কথা দিয়েছি তোমাকে সত্য জবাব দেব। এজন্য তোমাকে সত্য কথা বলেছি। কিন্তু বন্ধু হিসেবে গোপনে তোমার কাছে যে সত্য স্বীকার করেছি, সেই সত্য যদি আমি সমাজের কাছে স্বীকার করি, সেই সত্য যদি আমি গ্রহণ করে নিই, তাহলে এই সমাজের কোনো মানুষ আমার দলে থাকবে না। সবগুলো মানুষ আমার দল ভেঙ্গে মুহাম্মদের দলে চলে যাবে।"

যেই সত্য স্বীকার করলে নিজের দল থাকে না, সেই সত্য স্বীকার করার কোনো স্বার্থকতা নেই। আবু জেহলের জবাবে কি বুঝলেন ? আবু জেহেল আল্লাহ্র পথ না চিনেই বর্জন করেছিল, না জেনে শোনেই বর্জন করেছিল ? জেনে-শোনেই বর্জন করেছিলো। যারা আল্লাহ্র পথ চিনার পরও বর্জন করে আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন তার অন্তরকে ইসলামের

জন্য খুলে দেন না। এই জন্য আবু জেহেলের জন্য আল্লাহ্র রাসূল দু'আ করেছিলেন, উমরের জন্যও দু'আ করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আ আবু জেহেলের বেলায় কবুল হল না কেন ? আবু জেহেল আল্লাহ্র পথ চিনার পর তা গ্রহণ করতে রাজী নয়। উমরের বেলায় কবুল হল কেন ? উমর আল্লাহ্র পথ চিনার পরে তা গ্রহণ করতে রাজী। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন, যারা আমার পথ চিনার পরে গ্রহণ করতে রাজি আমি ইসলামের জন্য তার অন্তরকে খুলে দেই। সুবহানাল্লাহ্। তাহলে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলআমীন যে আয়াতে বললেন,

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান তার অন্তরকে হিদায়াতের জন্য খুলে দেন। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে আল্লাহ্ যদি আমার অন্তরকে হিদায়াতের জন্য খুলে দেন না, রাসূলের ব্যাখ্যা মতে আল্লাহ্ যদি আমার অন্তরে নূর দান করেন না, তাহলে তো আমি দুনিয়ামুখী হবই, তাহলে তো আমি পরকালমুখী হবই না, তাহলে তো আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেবই না, আমার কি দোষ, আল্লাহ্ কেন নূর দিলেন না ? জবাব, আল্লাহ্র দোষে নূর দান করেন নি তা নয়, তোমার দোষে তোমার অন্তরে আল্লাহ্ নূর দান করেন নি। কেন তুমি আল্লাহ্র পথ চিনার পরও গ্রহণ করতে রাজি হও নি? এজন্য আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন তোমার অন্তরে নূর দান করেন নি।

আরেকটা উদাহরণ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আপন এক চাচার নাম ছিল আবু তালিব। আপন চাচার নাম ? আবু তালিব। আবু তালিবের মরণকালে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু তালিবকে বললেন, সম্মানিত চাচা আবু তালিব সারা জীবনভর সুখে-দুখে বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় আপনি আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন, সর্বাবস্থায় আপনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন, সর্বাবস্থায় আপনি আমার প্রতিরক্ষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছেন, কিন্তু মরণকালে যদি হিদায়াত গ্রহণ না করে মরেন, তাহলে পরকালে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করার কোনো অধিকার আমি পাব

না। সুতরাং একটি বার বলুন হিদায়াত গ্রহণ করেছেন, আমি হাশরের মাঠে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করব, যেন আপনাকে আমার সাথে জান্নাতে দেন।

কাকে বললেন ? আপন চাচা আবু তালিবকে। আবু তালিব বলে "ভাতিজা মুহাম্মদ" তোমার প্রদর্শিত পথ গ্রহণ না করলে যে পরকালের জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না, সে কথাটা আমার বুঝার বাকী নেই।" কি বলে? বুঝার? বাকী নেই। কিন্তু ঘটনা হল আমি যদি মরণকালে তোমার পথ গ্রহণ করে মরি, মরণের পরে সারা জীবনভর আমার গোষ্ঠীর লোকেরা বলবে, আমার বংশের লোকেরা বলবে, গোষ্ঠী সরদার কোরেশ সরদার আবু তালিব মরণকালে বাপ-দাদার পথ ছেড়ে ছিল, মরণকালে ভাতিজার পথ গ্রহণ করে মরল ধিক্কার সরদারের নামে। এই কলঙ্কের ভয়ে আমি সেই পরম সত্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও গ্রহণ করতে রাজি নই।" এই জবাবে আল্লাহ্র রাসূল অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। অত্যন্ত পেরেশান হলেন। আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন সেই প্রেক্ষিতে আয়াত নাজিল করে বলেন,

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ (قصص/٥٦)

হে রাসূল কারীম! আবু তালিব আপনার বড় মহব্বতের চাচা। তাই বলে আপনি তাকে হিদায়াত করতে পারবেন না। রাসূল হিদায়াতের মালিক(!) হওয়ার কারণে, না মাধ্যম? মাধ্যম। আগেই বলেছি, হিদায়াতের মালিক একমাত্র? আল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন হিদায়াতের মাধ্যম। কুরআন হল হিদায়াতের মাধ্যম। তাই আল্লাহ্কে যদি নূর বলা হয় এর অর্থ হল হিদায়াতের মালিক। রাসূলকে যদি নূর বলা হয় এর অর্থ হল, হিদায়াতের মাধ্যম। কুরআনকে যদি নূর বলা হয়, এর অর্থ হল, হিদায়াতের মাধ্যম। ইসলামকে যদি নূর বলা হয় এর অর্থ হল, হিদায়াতের মাধ্যম। আর আরল্লাহ্কে যখন নূর বলা হয় ? তখন মালিক।

এজন্য আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন আবু তালিব প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেন, اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ আপনার মহব্বতের চাচা আবু তালিবকে হিদায়াত করতে পারবেন না। কেন? আল্লাহ্ বলেন, وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ আমি আল্লাহ্ যাকে চাই তাকে হিদায়াত করব। এতক্ষণের কথা বুঝে থাকলে বলুন, হিদায়াত

পাওয়া না পাওয়াটা রাসূলের চেষ্টার উপর চূড়ান্ত? কুরআন বুঝার উপরই চূড়ান্ত? না আল্লাহ্র ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে? আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আর আল্লাহ্র ইচ্ছা অনিচ্ছাটা নিছক খামখেয়ালী? না বান্দার চেষ্টা-প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল করে ? চেষ্টার উপর নির্ভরশীল। তুমি যদি আল্লাহ্র পথ পাওয়ার চেষ্টা করো, আল্লাহ্র পথ চিনার পরে তা গ্রহণ করতে রাজি থাকো আল্লাহ্ বলেন, হিদায়াতের মালিক আমি। আমি তোমাকে হিদায়াত দান করে দিব। তুমি যদি বুঝার চেষ্টা না করো অথবা বুঝার পরও গ্রহণ করতে রাজি না থাকো, রাসূল হিদায়াতের মালিক নন, রাসূল তোমাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না। কুরআন হিদায়াতের মালিক নয়।

তুমি কুরআন পড়তে পার, তুমি কুরআন বুঝতে পার কিন্তু তুমি কুরআনের হিদায়াত গ্রহণ করতে পারবে না। কেন? আমি আল্লাহ্ই হিদায়াতের মালিক, আমি তোমার অন্তরকে খুলে দিব না। কেন দিব না? তোমার ইচ্ছা নেই হিদায়াতের পথে চলার। এ পর্যন্ত বুঝলে এবার আরেকটা জটিল প্রশ্ন জাগে। ইনশাআল্লাহ্ এই তৃতীয় প্রশ্নের জবাবের মাধ্যমেই আজকের আলোচনা শেষ করব। তা হলে বান্দার চেষ্টা-প্রচেষ্টা আগে, না আল্লাহ্র ইচ্ছা-অনিচ্ছাটা আগে? বান্দাহর চেষ্টা-প্রচেষ্টা আগে। তাহলে কি আল্লাহ্র ইচ্ছা বান্দার চেষ্টার অধীন ? আহলে সুন্নাতের আকীদা হল আল্লাহ্র ইচ্ছা বান্দার চেষ্টার অধীন নয় বরং বান্দার চেষ্টা আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীনে হয়।

এবার আবার জটিলতা আসল। এতক্ষণে তো মোটামুটি একটা নিরসনের পথে গিয়ে ছিল। কিন্তু আবার জটিলতা এল। শেষ কথার দ্বারা প্রমাণ হল যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা বান্দার চেষ্টার অধীন নয় বরং বান্দার চেষ্টা আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীন। তাহলে আবার সেই প্রশ্নগুলো আসবে আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করে আমাকে হিদায়াত দেওয়ার তবেই আমি চেষ্টা করব। আর আমি চেষ্টা করার পরে আল্লাহ্ আমার অন্তরে নূর দান করবেন, আর আল্লাহ্ আমার অন্তরে নূর দান করলে আমি হিদায়াত গ্রহণ করব। আমার হিদায়াত গ্রহণ করা আর না করা নির্ভর করে আল্লাহ্ আমার অন্তরে দেওয়া না-দেওয়ার উপর। আল্লাহ্র নূর দেওয়া না-দেওয়া নির্ভর করে আমার

চেষ্টা করা–না করার উপর, আর আমার চেষ্টা করা না করা আবার নির্ভর করে আল্লাহ্র ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। তাহলে জটিলতা এল কি না ? সেই জটিলতার নিরসন করে আল্লহ্ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন, وَهُوَاَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ যদিও তোমার চেষ্টাটা আমার ইচ্ছার অধীন, আমার ইচ্ছাটা আমার ইলমের অধীন। আমার ইচ্ছাটা আমার ? ইলমের অধীন। অত্যন্ত কঠিন কথা। কঠিন কথাগুলো সহজ উদাহরণের মাধ্যমেই সহজ হয়। এজন্য আমরা পরীক্ষার হলের উদাহরণের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করি।

একজন উস্তাদ সারা বছর একশজন ছাত্রকে পড়ালেন। ধরুন এর মাঝে একটা ছাত্রের কোনো দিন লেখা-পড়ায় মনোযোগ নেই। কোনো দিন মনোযোগ দিয়ে লেখা-পড়া করে নি। কোনো দিন মনোযোগ দিয়ে উস্তাদের কথা শোনে নি। কোনো দিন পড়া শিখার চেষ্টা করে নি। কোনো দিন প্রশ্নের জবাব দিতে পারে নি। খামোখা ক্লাসে আসে আর বসে আর খামখেয়ালি করে। পড়া শিখল না। পরীক্ষার নিয়ম রক্ষার জন্য ঐ ছেলেটাকেও পরীক্ষার হলে ঢুকতে দেওয়া হয় কি না? দেওয়া হয়।

পরীক্ষার নিয়ম হল যদি জবাব দিতে পার, তাহলে পাশ করবে, যদি জবাব দিতে না পার তাহলে ফেল করবে, এটা হল পরীক্ষার নিয়ম। কিন্তু উস্তাদের ইচ্ছা হল তুই যেহেতু কোনো দিন পড়া শিখলি না, তুই যেহেতু কোনো দিন মনোযোগ দিয়ে লেখা-পড়া করিসনি, এজন্য তোর ফেল করা দরকার। কেন দরকার ? যে লেখা-পড়া করল না, সে যদি পাশ করে, সে যদি কোনো উপায়ে পাশ করতে পারে, তাহলে বানরের হাতে কুড়াল যাবে কি না? বানরের হাতে কুড়াল (?) যাবে কি না? এজন্য পরীক্ষার নিয়ম রক্ষার্থে যদিও পরীক্ষক বলেছেন যারাই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে তারাই পাশ করবে। কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা আছে যে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া কোনো দিন শিখেনি সে যেন পাশ না করে।

কারণ, সে যদি কোনো উপায়ে পাশ করতে পারে, তা হলে বানরের হাতে কুড়াল যাবে। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানোর আগেই জানতেন যদি তোমার হাতে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহলে তুমি হিদায়াতের পথ গ্রহণ করবে, নাকি গোমরাহীর পথ গ্রহণ করবে, আমি আল্লাহ্ আগে থেকেই জানি। কি বলেন

আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন কি না ? জানেন। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন আগে থেকেই জানেন ফেরাউনকে যদি আসমান সমান ক্ষমতা দেওয়া হয়, ফেরাউন কোন পথ অবলম্বন করবে। নমরুদ হিদায়াতের পথে চলবে, না গোমরাহীর পথে চলবে। সেই ব্যাপারে যদি পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে সে কোন পথে চলবে আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন। আবু জেহেলকে যদি পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে সে কোন পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন। আবু লাহাবকে যদি পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে কোন পথে চলবে আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন। তাসলিমা নাসরীন কে যদি পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে সে কোন পথে চলবে আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন।

ড. আহম্মদ শরীফকে যদি পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে সে কোন পথে চলবে আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন। এজন্য যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ আগে থেকেই জানেন পূর্ণ ক্ষমতা দিলে তুমি ক্ষমতাটাকে হিদায়াতের পথে ব্যবহার না করে গোমরাহীর পথে ব্যবহার করবে, তোমাদের ব্যাপারে আমি আল্লাহ্ আগেই ইচ্ছা করেছি, তোমাদের অন্তরকে প্রশস্ত করে দেব না, তোমরা চেষ্টা করবে না, হিদায়াতের পথ পেলেও তোমরা সেই পথ গ্রহণ করবে না। এটাই আমার ইচ্ছা। এজন্য আমি যাকে চাই হিদায়াত করতে আমি তার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেই।

তাহলে আমি হিদায়াতের পথে চলব কি, চলব না, সেটা নির্ভর করে আল্লাহ্ আমার অন্তরে নূর দেবেন কি দেবেন না, তার ওপর। আল্লাহ্ আমার অন্তরে নূর দেবেন কি-দেবেন না, সেটা নির্ভর করে আমি হিদায়াতের পথে চলব কি চলব না, তার ইচ্ছার উপর। আমি হিদায়াতের পথে চলব কি-চলব না সেটা নির্ভর করে আল্লাহ্র ইলমের উপর। আল্লাহ্ যে অগ্রিম থেকে জানতেন, আগের থেকেই জানাটা কি আল্লাহ্র দোষ? আগে থেকেই জানাটা কি আল্লাহ্র দোষ, না গুণ? গুণ।

উদাহরণটা আরেকটু পরিষ্কার করি। যেই ছেলেটা সারাটা বছর উস্তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনল না, যেই ছাত্রটা সারা বৎসর কোনো দিন মনোযোগ দিয়ে লেখা-পড়া করল না, সেই ছেলেটাকে, সেই ছাত্রটাকে পরীক্ষার আগেই বলে দিলেন তুই পাশ করবি না। কিন্তু পরীক্ষার হলে

তাকে প্রবেশ করানো হল, লেখার স্বাধীনতা দেওয়া হল। দেখা গেল, সে প্রশ্নের জবাব সঠিকভাবে দিতে পারে নি। সে ফেল করল। শিক্ষক আগেই বলেছিলেন তোর ফেল করা দরকার। আগে ফেল করল, না আগেই বলেছিলেন ? আগেই বলেছিলেন। ফেল করল আগে না তোর ফেল করা দরকার বলল আগে ? বলল আগে। তাহলে ফেল করার দোষ– না বলার দোষ ? না চলার দোষ ? চলার দোষ। যেমনভাবে তার চলার দ্বারা তার শিক্ষক আগে থেকেই জানতেন তোর মধ্যে পাশ করার যোগ্যতা নেই, এ জন্য তোর ফেল করা দরকার। এ ছাত্রের সারা বছরের চলার অভিজ্ঞতার আলোকে উস্তাদ জানতেন।

আর আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীনকে কোনো অভিজ্ঞতার আলোকে জানতে হয় না। আল্লাহ্ হলেন عَلَّامُ الْغُيُوْبِ আল্লাহ্ হলেন عَالِمُ الْغَيْبِ যাদেরকে ইচ্ছা শক্তি দিলে, যাদেরকে হিদায়াত দিলে গ্রহণ করবে কি করবে না আল্লাহ্ আগে থেকে জানেন। আল্লাহ্ আগে থেকে যাদের ব্যাপারে হিদায়াতের যোগ্যতা নেই জানেন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন না। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন না, তাদের অন্তরকে আল্লাহ্ খুলে দেন না। যাদের অন্তরকে আল্লাহ্ খুলে দেন না, সে হিদায়াত চিনার পরেও, বুঝার পরেও হিদায়াত গ্রহণ করে না। সুতরাং আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন অন্তর খুলে না-দেওয়ার জন্যও তার আমলই দায়ী, তার চেষ্টা প্রচেষ্টাই দায়ী, হিদায়াত না-পাওয়ার জন্য সে নিজেই দায়ী। তার অন্তরে আল্লাহ্ হিদায়াতের নূর না-দেওয়ার জন্য সে নিজেই দায়ী।

উদাহরণটা আরো পরিষ্কার করি। শিক্ষক বলে দিলেন তুই ফেল করবি। তার পরে সে ফেল করল। তিনি বলে দিয়েছিলেন ফেল করবি, একারণে ফেল করল নাকি সে ফেল করবে জানেন বিধায় বলে দিয়েছিলেন ? জানেন বিধায়। তাহলে শিক্ষকের বলার দোষ, নাকি ছাত্রের চলার দোষ ? ছাত্রের চলার দোষ। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন আগে থেকেই জানেন কে ফেল করবে। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন তখন থেকেই তার ব্যাপারে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তুমি ফেল করবে, তুমি হিদায়াতের পথ পেলেও তুমি তা গ্রহণ করবে না, তুমি দুনিয়ামুখী হবে, তুমি পরকালমুখী হবে না, তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবে না, আমি

আল্লাহ্ জানি। সুতরাং আমি আল্লাহ্ আগে থেকেই বলে দিলাম।

আগে থেকেই যে কথাটা আল্লাহ্ জানেন, সেই কথাটাকেই ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় তাকদীর। ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় ? তাকদীর। তাকদীরের বাংলা হল ভাগ্য। তাকদীরের বাংলা হল? ভাগ্য। এবার যে ছাত্রটা ফেল করল সেই ছাত্রটা বলে, ফেল করা আমার ভাগ্যে ছিল। ভাগ্যের দোষ, না সারা বছর লেখা-পড়া না করার দোষ ? লেখা-পড়া না করার দোষ। কিন্তু শিক্ষক আগেই বলে দিয়েছিলেন তুমি ফেল করবে। পরে ফেল করল। তাহলে শিক্ষকের বলার দোষ, না ছাত্রের চলার দোষ ? চলার দোষ। আল্লাহ্ আগেই ভাগ্যে লেখেছেন তুমি ফেল করবে, পরে সে ফেল করল। আল্লাহ্‌র বলার দোষ, না বান্দার চলার দোষ? বান্দার চলার দোষ।

সব কথার সার কথা হল, বান্দা তার আমলের জন্য দায়ী। বান্দা তার অপরাধের জন্য দায়ী। বান্দা তার কার্যকলাপের জন্য দায়ী। আল্লাহ্ তাকদীরে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন, আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন, আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছেন, এর জন্য আল্লাহ্ দায়ী নন, বান্দা জেনে শোনেই গোমরাহীর পথ অবলম্বন করবে, বান্দা জেনে শোনেই পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করবে, এজন্য বান্দা দায়ী। এজন্য যে বান্দা আল্লাহ্‌র হিদায়াত জেনে-শোনেই গ্রহণ করল না, তাই আল্লাহ্ তার শাস্তির জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর আল্লাহ্‌র হিদায়াত যেই বান্দা গ্রহণ করবে তার পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ্ জান্নাত নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র হিদায়াত সঠিকভাবে চিনার সঠিকভাবে বুঝার হিদায়াত গ্রহণ করার ইচ্ছা রাখার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র হিদায়াতের পথে চলার সৌভাগ্য দান করুন। সবাই বলুন আমীন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

মাওয়ায়েজে হাসানাহ
খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,
তরজমানে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত
মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান—১

ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের রূপরেখা

স্থান ঃ জমিয়তুল ফালাহ ময়দান, চট্টগ্রাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْداً بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

হযরত উলামায়ে কেরাম, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী!

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে অদ্যকার এই বিশাল সমাবেশে আমি আপনাদের সামনে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের পবিত্র কালামের ২৬ পারার সূরায়ে ফাতাহ্ এর শেষের দিকের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। এই আয়াত তিলাওয়াত করার উদ্দেশ্য, এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, আখেরী জামানার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন দু'টি জিনিস দিয়ে। একটি হল, সত্য ধর্ম ইসলাম। দ্বিতীয়টি হল, ধর্মগ্রন্থ কুরআন। কেন পাঠালেন? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ বলেন,

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

ইসলাম ধর্মকে দুনিয়ার সমস্ত বাতিল ধর্মের উপর বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে।

ইসলাম ধর্ম যেন সারা দুনিয়ায় বিজয়ী হয়; যত বাতিল ধর্ম আছে, সমস্ত বাতিল ধর্ম যেন পরাজিত হয়, এই জন্য আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সত্য ধর্ম ইসলাম দিয়ে ধর্মগ্রন্থ কুরআন দিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এই

আয়াতের যে সংক্ষিপ্ত তরজমা আমি পেশ করলাম, সেটা বুঝে থাকলে বলুন! আমরা যখন বর্তমান বিশ্বে চোখ খুলে তাকাই, তখন দেখি, বিশ্বের সামগ্রিক অবস্থা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের অনুসারী শুধু পরাজিতই নয়; লাঞ্ছিত বঞ্চিত অপদস্ত। পক্ষান্তরে যেসব ধর্মাবলম্বীর হাতে মুসলমানেরা লাঞ্ছিত বঞ্চিত হচ্ছে, তাদেরকে আমরা বর্তমান দুনিয়ার বিজয়ী বেশে দেখতে পাই। তাহলে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বললেন– মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ পাঠিয়েছেন ইসলাম ধর্মকে বিজয়ী করার জন্য আর আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উপর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বিজয়ী। বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বিজয়ী আর আল্লাহ বলছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পাঠিয়েছেন ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য। তাহলে আল্লাহর এই কথাটা বাস্তবপরিপন্থী? নাউযুবিল্লাহ!!

যদি বাস্তব পরিপন্থী না হয়ে থাকে, তাহলে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের রূপরেখা কি? কোন মর্মে আল্লাহ বলেছেন ইসলাম হবে বিশ্ব বিজয়ী ধর্ম? এই মর্মটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্যই এই আয়াত তিলাওয়াত করেছি। আজই কথা শেষ হয়ে যাবে না। আজ আপনাদের সামনে মোটামুটিভাবে শুধু ভূমিকা তুলে ধরব আর সারমর্ম আগামীকাল পেশ করব ইনশা-আল্লাহ। আজকের এবং আগামীকালের সম্পূর্ণ বক্তব্য আগাগোড়া শোনলে আমি আশা করি, আপনারা বুঝতে পারবেন বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানরা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের হাতে লাঞ্ছিত বঞ্চিত নির্যাতিত কেন, আর ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের ব্াস্তবতা কোথায়? ইসলামকে আল্লাহ বিশ্ব বিজয়ী কোন মর্মে বললেন, কখন বিশ্ব বিজয়ী হবে ইসলাম, কখন হবে এবং কার হাতে হবে– এই সবগুলো প্রশ্নের সমাধান ইনশাআল্লাহ আমার দু'দিনের বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰه

আমি যে আয়াত আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি এই আয়াত সূরায়ে ফাত্‌হের ২৮ নম্বর আয়াত। যে সূরার আয়াত তিলাওয়াত করেছি সেই সূরার নাম সূরায়ে ফাত্‌হ; ফাতেহা নয়। সূরায়ে ফাতেহা হল, পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা। ফাতেহা হল উদ্বোধনী সূরা। এই সূরার মাধ্যমে

কুরআনকে উদ্বোধন করা হল। আর আমি আপনাদের সামনে যে সূরার আয়াত তিলাওয়াত করেছি, সেই সূরার নাম হচ্ছে সূরায়ে ফাত্‌হ। ফাত্‌হ মানে, বিজয়। কেন আল্লাহ এই সূরাকে সূরাতুল ফাত্‌হ বলে নাম রাখলেন। তার কারণ হল, এই সূরা আল্লাহ নাযিল করেছিলেন ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধিকে কেন্দ্র করে।

ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ঘটনা। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এই সূরা নাযিল করেছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিটা ছিল মক্কা বিজয়ের ভূমিকা। যে সময় সন্ধি হয়েছিল কুরাইশ বংশের মূর্তিপূজারীদের সাথে। ইসলামের নবীর সাথে যে সময় তাদের ওই সন্ধি হয়েছিল, সেই সময় মুসলমান ছিল মক্কা থেকে নির্বাসিত। মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। ইসলামের নবী স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সেই সময় এক স্বপ্নের ভিত্তিতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে বিতাড়িত তাঁর অনুসারী মুসলমানদের নিয়ে উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে যাত্রা করে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছা মাত্রই মক্কাবাসী মুশরিকদের কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেন। যখন মক্কা ছিল মুসলমানদের সম্পূর্ণ বেদখল, যখন পবিত্র খানায়ে কা'বা মূর্তিপূজারীদের সম্পূর্ণ দখলে, যখন কা'বা শরীফের ভেতরে শত শত দেব-দেবী ঢুকিয়ে রেখেছিল মূর্তিপূজার জন্য, যখন মুসলমানরা মক্কা শরীফে বসবাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

যখন মুসলমানরা নিরিহ অবস্থায় মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমান এবং মুসলমানের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীর সাথে এক সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছিলেন। সেই সন্ধি-চুক্তিকে ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি বলা হয়। হুদায়বিয়া একটা স্থানের নাম। মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ যাওয়ার পথে প্রায় ১৯ মাইল দূরে। ১৯ মাইল দূরের এই স্থানের নাম হুদায়বিয়া। যেহেতু এই স্থানে এই সন্ধি-চুক্তি সম্পন্ন

হয়েছিল, তাই বুঝানোর জন্য এই স্থানের নামে হুদায়বিয়ার সন্ধি বলে নামকরণ করা হয়।

এই চুক্তিটা ছিল মূলত মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের একটা ভূমিকা। মুসলমানদের অবস্থান তখন কি ছিল –এ ব্যাপারে যাদের পরিষ্কার ধারণা নেই তাদেরকে 'হুদায়বিয়ার সন্ধিটা ছিল মক্কা বিজয়ের ভূমিকা' কথাটা বুঝানো মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য এতক্ষণ বললাম, তখন মুসলমানগণ মক্কা থেকে বিতাড়িত ছিল, মক্কায় কোনো মুসলমানের বাস করার অধিকার বাকী ছিল না, মক্কাবাসী মুসলমান যে শুধু তাই নয়, মুসলমানদের নবীকে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য করেছিল। এই অবস্থায় যে সন্ধিটা হয়, সেই সন্ধিটা ছিল মক্কা থেকে বিতাড়িত মুসলমানদের জন্য মক্কা বিজয়ের একটা ভূমিকা।

যেহেতু হুদায়বিয়ার সন্ধি মক্কা বিজয়ের একটা ভূমিকা ছিল, এই সন্ধির মাধ্যমে মক্কা বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানের মক্কা বিজয়ের দ্বার খুলে যায়। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানের মক্কা বিজয়ের পথ প্রশস্ত হয়। এই জন্য হুদায়বিয়ার সন্ধিকে মুসলমানের মক্কা বিজয়ের ভূমিকা বলা হয়। আল্লাহ পাক যেহেতু এই সূরার মাঝে ওই ঘটনা স্ববিস্তারে বলেছেন, তাই আল্লাহ এই সূরার নামকরণ করেছেন সূরায়ে ফাত্‌হ বা বিজয়ের সূরা।

এই সূরার ভেতরে হুদায়বিয়ার ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেটাই হল, মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের ভূমিকা। শুধু তাই নয়, যেমনভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল মদীনাবাসী মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের ভূমিকা, তেমনিভাবে মুসলমানদের মক্কা বিজয় ছিল সারা দুনিয়ায় ইসলামের বিজয় সাধিত হওয়ার ভূমিকা। প্রথমতঃ হুদায়বিয়ার সন্ধি হল, মুসলমানের মক্কা বিজয়ের ভূমিকা। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানের মক্কা বিজয় হল, সারা দুনিয়াতে মুসলমানদের বিজয়ী হওয়ার ভূমিকা।

এজন্য যে আয়াতে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন ইসলাম ধর্মকে বিশ্ববিজয়ী ধর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেই আয়াত আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি।

আল্লাহ আয়াতে বলেন–

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى

وَدِيْنِ الْحَقِّ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন সত্য ধর্ম ইসলাম দিয়ে সত্য ধর্ম ইসলাম দিয়ে। কেন?

لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

ইসলাম ধর্মকে বাকী সকল বাতিল ধর্মের উপর বিজয়ী করাবার জন্য। তাহলে এই আয়াতে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন মদীনার মুসলমানরা মক্কা বিজয়ী হবে –শুধু তাই বলেননি; রবং ইসলাম ধর্মকে সারা দুনিয়ার সমস্ত বাতিল ধর্মের উপর বিজয়ী করাবার কথা বলেছেন। তাই আল্লাহ এই সূরার নামকরণ করেছেন সূরায়ে ফাত্‌হ বা বিজয়ের সূরা।

সারমর্ম এই সূরায় একদিকে হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মক্কা বিজয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে মক্কা বিজয়ের মাধ্যম সারা দুনিয়ায় ইসলাম বিজয়ী হওয়ার ব্যবস্থা বলে দেওয়া হয়েছে। এই জন্য আল্লাহ এই সূরার নামকরণ করেছেন সূরায়ে ফাত্‌হ বা বিজয়ের সূরা। এই সূরা কোন অবস্থায় নাযিল হয়েছিল, সেই অবস্থাটাকে তাফসীরের পরিভাষায় শানে নুযূল বলা হয়।

তাফসীরুল কুরআনের পরিভাষায় কোন সূরা বা কোন আয়াত যদি কোন বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়, তাহলে সেই অবস্থাকে নাযিলকৃত আয়াত অথবা নাযিলকৃত সূরার শানে নুযূল বলা হয়। এই সূরা সূরাতুল ফাত্‌হকে আল্লাহ একটা বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল করেছিলেন। সেই অবস্থাটা হল হুদায়বিয়ার সন্ধিকরণ। এই জন্য ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনাই হল এই সূরার শানে নুযূল। তাই সূরার মূল বিষয় ইসলামের বিশ্ব বিজয় বুঝার জন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে এই সূরার শানে নুযূল বুঝা দরকার– কোন অবস্থায় আল্লাহ এই সূরা নাযিল করেছিলেন। অর্থাৎ ঐতিহাসিক হুদায়িবয়ার সন্ধির ঘটনা স্ববিস্তারে না হলেও অন্তত সংক্ষিপ্ত আগা-গোড়া বুঝা দরকার।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মের পর থেকে দীর্ঘ ৪০টি বছর পর্যন্ত মক্কাবাসীর কাছে অত্যন্ত সমাদৃত ছিলেন। অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। অত্যন্ত মর্যাদার পাত্র ছিলেন। মক্কাবাসী তাঁর আচার-আচরণে, কথা-বার্তায়, চলাফেরায় সন্তুষ্ট হত। তাঁর লেনদেনে সন্তুষ্ট হয়ে

সমস্ত মক্কাবাসী একযোগে তাঁকে উপাধী দিয়েছিল, 'আল আমীন' বা জগতশ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত, জগতশ্রেষ্ঠ মহা আমানতদাররূপে। এভাবে মক্কাবাসী তাঁকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেছিল।

চল্লিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম ওয়াহী প্রাপ্ত হন, কুরআন প্রাপ্ত হন, যখন মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন থেকেই তারা দুশমনে পরিণত হল। দীর্ঘ ৪০ বছর পর্যন্ত তারা তাঁকে সম্মান করল কেন? ইসলামের দাওয়াত না দেওয়ার কারণে। আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ আসেনি। তাই চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি দাওয়াত দেননি। তাই মক্কাবাসীর কোন মূর্তিপূজা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুশমনি করেনি। চল্লিশ বছর পর যখন আল্লাহ ওয়াহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوْنَ

হে মানুষ সকল! তোমরা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ স্বীকার কর, সফল হবে। এখান থেকে তারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুশমনে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে আমি বিষয়টা অতি সহজে অনুধাবনের জন্য একটি মজার ঘটনা শোনাচ্ছি। আবু জেহেল ছিল কুরাইশ বংশের মূর্তিপূজারীদের নেতা। এই নেতা আবু জেহেলকে একবার মুনাফেকদের এক নেতা আখনাস প্রশ্ন করেছিল, মুহাম্মাদ যে কথা বলে তা সত্য না মিথ্যা? এটা কুরআন নাযিল শুরু হওয়ার পরের ঘটনা।

আবু জেহেল চিন্তা করে দেখল যদি আখনাসের প্রশ্নের জবাবে বলি 'মুহাম্মদ মিথ্যা বলে', তাহলে প্রশ্ন আসবে এই লোকটাকে দীর্ঘ ৪০ বছর আল আমীন বলেছিলে কেন? প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। আর যদি আখনাসের প্রশ্নের জবাবে বলি 'মুহাম্মাদ সত্য বলে' তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসবে যদি মুহাম্মাদ সত্য বলে, তাহলে সেই সত্য গ্রহণ করো না কেন? তাই আখনাসের প্রশ্নে আবু জেহেল এমন বিপাকে পড়ল, 'মুহাম্মদ সত্য বলে' বললে পাল্টা প্রশ্ন আসে এই প্রশ্ন কঠিন। আর 'মুহাম্মদ মিথ্যা বলে' বললে প্রশ্ন আসে এই প্রশ্নটাও কঠিন।

আখনাসের প্রশ্নের এই সংকট এড়াবার জন্য আবু জেহেল পাশ কাটিয়ে

একটা জবাব দিল। আবু জেহেল জবাবে বলল, যত দিন পর্যন্ত মুহাম্মাদ নিজের পক্ষ থেকে কথা বলেছিল ততদিন পর্যন্ত সত্য বলেছিল, যে দিন থেকে তাঁর কাছে আল্লাহর কালাম নাযিলের কথা বলে, সে দিন থেকে মিথ্যা বলে। এই জন্য আমরা দীর্ঘ ৪০ বছর তাঁকে আল-আমীন বলেছি। কেননা তখন সে নিজের পক্ষ থেকে বলেছে; আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেনি। এখন কতগুলো মনগড়া কথা বানিয়ে আল্লাহ তাঁর উপর নাযিল করেছে বলতে থাকে। এজন্য এখন সে আর সত্য বলে না। তাই আমরা তাঁকে মানতে পারছি না। আবু জেহেলের এই জবাবের প্রতিবাদে আল্লাহ পাক সূরায়ে আন-আমের ৩৩ নং আয়াত নাযিল করলেন। আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ (الانعام/٣٣)

'হে রাসূলে কারীম! মুশরিকদের যে সমস্ত কথায় আপনি আন্তরিকভাবে ব্যথিত হন, আমি তাদের সেই সব কথা জানি। আপনার লক্ষ্য করার ব্যাপার হল, মুশরিকরা আপনার কথাকে মিথ্যা বলেছে, না আমার কালামকে মিথ্যা বলেছে। (আবু জেহেলের বক্তব্যে আপনারা কি পেলেন? সে কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথাকে মিথ্যা বলেছে, না আল্লাহর কালামকে মিথ্যা বলেছে? আল্লাহর কালামকে মিথ্যা বলেছে।) তাহলে তো আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনার কথাকে সত্য বলেছে আর আমার কালামকে মিথ্যা বলেছে। দুশমন হলে তো আপনার দুশমন নয়, আমার দুশমন। এই হল অবস্থা।

আমি আশা করি আবু জেহেলের বক্তব্য এবং এই বক্তব্যের প্রতিবাদে আল্লাহ যে আয়াত নাযিল করলেন– তা থেকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, ৪০ বছর পর্যন্ত মক্কার কুরাইশরা কেন তাঁকে এত সম্মান করল আর ৪০ বছর পর কেন তারা দুশমন হল। একমাত্র কারণ ৪০ বছর পর্যন্ত তিনি কুরআনের কথা বলেননি, ইসলাম ধর্মের কথা বলেননি। ৪০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর যখন তার কাছে কুরআন নাযিল শুরু হল, ইসলাম ধর্মের কথা বলা শুরু করলেন, তখন থেকে তারা দুশমনে পরিণত হল।

এ ঘটনা থেকে বর্তমান সমাজে কিছু শিখার মতো বিষয় আছে। মক্কা

নগরীর কুরাইশরা ছিল মুশরিক মূর্তিপূজারী। আমাদের সমাজে বর্তমানে বেশ কিছু নামধারী মুসলমান আছে, যাদেরকে কোন আলেম যতক্ষণ কুরআনের কথা বলেন না, ইসলামের অনুশাসনের বিধি-বিধান পালন করার কথা বলেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আলেম এই সমাজে বড় সমাদৃত। যখন কোন আলেম এই মুসলমান সমাজে কুরআনের কথা বলেন, ইসলামের অনুশাসন পালন করার কথা বলেন, তখন সেই আলেম হয়তো হয়ে যায় মৌলবাদী, আর না হয় হয়ে যায় ফতোয়াবাজ আর না হয় হয়ে যায় ধর্মান্ধ।

আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহলে সেই জাহেলী যুগের মূর্তিপূজারী আর বর্তমান সভ্য যুগের মানুষের মাঝে ব্যবধান রইল কোথায়? যখন থেকে শত্রুতা শুরু করল ১৩ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন জুলুম-নির্যাতন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর চালিয়ে গেল। ওয়াহী প্রাপ্ত হলেন ৪০ বছরে। এরপর আরও ১৩ বছর অতিবাহিত হল, ৪০ বছর সম্মান দিল। ১৩ বছর নির্যাতন করল।

আপনারা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন– আমার ধারণা মতে যখন কোন আলেম কুরআনের কথা বলবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আলেম ইসলামের বিধি-বিধান পালনের কথা বলবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আলেমকে ভক্তি, সম্মান, মর্যাদা দেখাবে আর যখন বলবে কুরআনের বিধান তোমাকে পালন করতে হবে, যখন বলবে ইসলামের বিধি-বিধান তোমাকে পালন করতে হবে, তখন সেই আলেমের বিরুদ্ধে হয়ে যাবে। (শ্রোতাদের .... ঠিক।) ঠিক বলার কোন সার্থকতা নেই।

আমি আপনাদেরকে যে কথাটা বুঝাতে চাই, আপনাদের সুস্পষ্ট জবাব বের করতে হবে– সেই যুগের কুরাইশ বংশের মূর্তিপূজারী আর এই আধুনিক যুগের এই জাতীয় মুসলমানের মাঝে ব্যবধান কোথায়। এই প্রশ্নের জবাব আপনাদেরকে বের করতে হবে। সেই যুগের মূর্তিপূজারী আর এই যুগের মুসলমানের মাঝে ব্যবধান কোথায়? দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত নির্যাতিত হওয়ার পর ওয়াহী পাওয়ার আগে গেল ৪০ বছর আর ওয়াহী পাওয়ার পর ১৩ বছর মোট ৫৩ বছর বয়সে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নির্দেশক্রমে মক্কা শরীফ থেকে

হিজরত করে মদীনা শরীফ গেলেন।

তখন মদীনা শরীফের নাম মদীনা শরীফ ছিল না। তখন মদীনা শরীফ একটা শহর ছিল না। তখন এটা একটা পল্লী ছিল। নাম ছিল 'ইয়াসরিব'। ইয়াসরিবে দু'বংশের লোকের বাস ছিল। আউস এবং খাযরাজ বংশের। এই কথাটা স্মরণ রাখলে আজকের বাকী কথা এবং আগামীকালের কথা বুঝতে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের ধীরস্থির এবং শান্ত দেখে আমিও খুব আস্তে আস্তে সহজে উপস্থাপন করছি। যখন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফ চলে যান, তখন ঐ জায়গার নাম মদীনা শরীফ ছিল না। ছিল একটি পল্লী এবং নাম ছিল ইয়াসরিব। এটা মক্কা শরীফ থেকে সুদীর্ঘ ৫০০ কিঃ মিঃ উত্তরে। বর্তমান মদীনা শরীফের প্রাচীনকালে কি নাম ছিল? ইয়াসরিব। শহর ছিল না পল্লী ছিল? পল্লী ছিল। যখন নবী হিজরত করে সে দিকে যান, তখন সেটা শহর ছিল না; ছিল একটি পল্লী এবং তখন সেটা মদীনা শরীফ ছিল না; নাম ছিল ইয়াসরিব।

ইয়াসরিব পল্লীর বাসিন্দা ছিল দুই জাতি। এক বংশের নাম ছিল আউস, আরেক বংশের নাম ছিল খাযরাজ। এটা স্মরণ রাখলে তিলাওয়াতকৃত আয়াতের ব্যাখ্যা বুঝা সহজ হবে। এটা খুব কঠিন কথা নয়।

মক্কা শরীফ থেকে যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনা শরীফে যান, তখন সেটা শহর ছিল না; পল্লী ছিল। সেই পল্লীর নাম ছিল ইয়াসরিব। এই ইয়াসরিব পল্লীতে দু'বংশের লোক বাস করত। যখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াসরিবে গেলেন তখন আউস এবং খাযরাজ বংশের লোকেরা সম্মিলিতভাবে এই ইয়াসরিব পল্লীর নাম দিল 'মদীনাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'। এর অর্থ হচ্ছে রাসূলের শহর। কেন এই নাম দিল? যেহেতু রাসূলের শুভাগমন উপলক্ষে এটাকে শহর বানানো হয়েছে এই জন্য এই শহরের নাম দেওয়া হয়েছে মদীনাতুর রাসূল বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শহর। এরপর থেকে আমরা সংক্ষেপে মদীনা শরীফ বলি।

এখন যে কোন শহরকে মদীনা শরীফ বলে না। আরব দেশের

লোকেরা বিভিন্ন শহরকে মদীনা বলে। কিন্তু মদীনা শরীফ বলে না, মদীনাতুল মুনাওয়ারা বলে না। শুধুমাত্র রাসূলের শহরকেই আমরা বলি মদীনা শরীফ আর আরবীরা বলে 'আল মদীনাতুল মুনাওয়ারা'– নূরে নূরান্বিত শহর, আলোয় আলোকিত শহর। এভাবে দুনিয়ার আর কোন শহরকে বলা হয় না। একমাত্র রাসূলের শহরকে আমরা মদীনা শরীফ আর আরবীরা বলে আল মদীনাতুল মুনাওয়ারা। এই হল মদীনা শরীফের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫৩ বছর বয়সে সেখানে হিজরত করার পর আরো দীর্ঘ ৬টি বছর অতিবাহিত হয়। দীর্ঘ ৬ বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর একদা এটকা স্বপ্ন দেখলেন। হিজরত করেছিলেন কত বছর বয়সে? ৫৩ বছর বয়সে। স্বপ্ন দেখলেন হিজরতের আরও ৬ বছর পর। তাহলে এই স্বপ্ন দেখার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স ৫৯ বছর।

হিজরী ৬ষ্ঠ সনে ৫৯ বছর বয়সে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটা কি? মক্কা থেকে বিতাড়িত মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদে সম্পূর্ণ বাধা বিঘ্নহীনভাবে মুক্তভাবে কা'বা ঘরের তাওয়াফ-যিয়ারত করছেন। উমরা হজ্ব পালন করছেন এবং মাথা মুণ্ডানোর মাধ্যমে এই উমরা হজ্বের ইহরামের সমাপ্তি ঘটাচ্ছেন। এই স্বপ্নটা রাসূল দেখেছেন ৫৯ বছর বয়সে হিজরী ৬ষ্ঠ সনে। এর পরবর্তী কথা বুঝার জন্য স্বপ্ন সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতি জানা দরকার। অন্যথায় সামনের বিষয়গুলো বুঝতে কঠিন হবে।

প্রথম মূলনীতি হচ্ছে নবীগণের স্বপ্ন শতকরা ১০০% ভাগ সত্য। আর উম্মতের স্বপ্ন সত্য না মিথ্যা, আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখল, না শয়তান দেখাল, না কল্পনাপ্রসূত দেখল এর জন্য বিভিন্ন মাপকাঠি আছে। বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে সত্য মিথ্যা যাচাই হবে। আমাদের আলোচনা যেহেতু নবীর স্বপ্ন নিয়ে– উম্মতের স্বপ্ন নিয়ে নয়, তাই উম্মতের স্বপ্নের আলোচনায় যাচ্ছি না।

আমরা শুধু এতটুকু স্মরণ রাখি যে, উম্মতের স্বপ্ন তিন প্রকার হয়। এক প্রকার স্বপ্নকে বলে রাহমানী, এক প্রকার স্বপ্নকে শয়তানী, আরেক প্রকার স্বপ্নকে বলে খেয়ালী। আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি কোনো উম্মতকে স্বপ্ন

দেখানো হয়, সেই স্বপ্নের উদ্দেশ্য থাকে, হয়তো কোনো সুসংবাদের ইঙ্গিত দেওয়া, আর না-হয় কোনো সতর্কতার ইঙ্গিত দেওয়া। এই দুই উদ্দেশ্যে কোনো উম্মতকে যদি স্বপ্ন দেখানো হয়, সেই স্বপ্নকে রাহমানী বলা হয়। আর শয়তানের পক্ষ থেকে যদি কোনো উম্মতকে স্বপ্ন দেখানো হয় তার উদ্দেশ্য হয়, হয়তো তাকে বিভ্রান্ত করা, আর না হয় তাকে পেরেশান করা। এই দুই উদ্দেশ্যে শয়তান মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়ে থাকে। এই স্বপ্নকে বলা হয় শয়তানী। আর কোনো কোনো সময় সমাজে যা দেখে অথবা সর্বদা যা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে, যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এটাই আবার স্বপ্নের মাধ্যমে দেখে। এ রকম স্বপ্নকে বলে খেয়ালী। এই হল উম্মতের তিন প্রকার স্বপ্ন।

কিন্তু নবীগণের স্বপ্ন শতকরা ১০০% ভাগ রাহমানী। কোনো নবীকে শয়তান জীবনে কোনোদিন প্রবঞ্চনা করার জন্য, বিভ্রান্ত করার জন্য, পেরেশান করার জন্য স্বপ্ন দেখাতে পারে না। নবীগণের স্বপ্ন সম্পর্কে এই মূলনীতি বুঝার পর আপনারা কি মনে করেন ৬ষ্ঠ হিজরীতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্বপ্নটা দেখলেন– এই স্বপ্নটা কি বাস্তব ছিল, না অবাস্তব? বাস্তব। এ কথাটা ভালো করে স্মরণ রাখবেন, তাহলে সামনের বিষয় বুঝতে সহজ হবে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরেকটা অভ্যাস ছিল, যখন ফজরের নামায ইমাম হয়ে পড়াতেন, তখন সালাম ফিরিয়ে মুসল্লীদের দিকে বসতেন। জিজ্ঞেস করতেন মুসল্লীদেরকে গতরাতে কোনও স্বপ্ন দেখেছ কি? তারপর তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতেন। তারপর নিজে যদি কোন স্বপ্ন দেখতেন, সেই স্বপ্নের কথা বলতেন। আমাদের সমাজে এমনও মানুষ আছে, যারা স্বপ্নে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখতে পান। যারা এখন পর্যন্ত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখেন নি তারা এ ব্যাপারে হতাশ হবেন না যে, হায়রে আমি স্বপ্নে দেখলাম না। কারণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখাটাই সৌভাগ্যের মাপকাঠি নয়। অবস্থা বিশ্লেষণে বুঝা যাবে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখল, সেটা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য। অবস্থা

বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেটা প্রমাণিত হবে।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬ষ্ঠ হিজরীতে স্বপ্নে দেখলেন, উমরা হজ্ব পালন করছেন সাহাবায়ে কিরামকে সঙ্গে নিয়ে। আমি স্বপ্নের বিষয়ে এ জন্য বললাম, এই কথাটা যেন আপনারা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্বপ্নটা দেখলেন নিরাপদে উমরা হজ্ব পালন করেছেন, রাসূলের স্বপ্নটা সত্য না মিথ্যা। সত্য। কেমন করে বুঝলেন আপনারা রাসূলের স্বপ্নটা সত্য? কারণ, নবীগণের স্বপ্ন শতকরা একশভাগ সত্য।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের স্বপ্নটা যখন নিজের পবিত্র কাশ্‌ফ মোতাবেক সাহাবায়ে কিরামের সামনে ব্যক্ত করলেন, সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনার স্বপ্ন তো একশ ভাগ সত্য। সুতরাং আপনি যে স্বপ্নটা দেখেছেন, আমাদেরকে নিয়ে নিরাপদে উমরা হজ্ব পালন করছেন; মুশরিক কাফেরদের কোন বাধা বিঘ্ন নেই, মুশরিক মূর্তিপূজারীদের প্রতিবন্ধকতা নেই, কুরাইশ বংশের রুখে দাঁড়ানোর কোনও পরিবেশ নেই, তাহলে আপনার সত্য স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য, উমরা পালনের জন্য মক্কার পথে রওয়ানা হব না কেন?

সাহাবায়ে কিরাম নবীর দরবারে আবদার রাখলেন, আপনার সত্য স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা উমরা পালন করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আবদার রক্ষা করলেন। প্রায় দেড় হাজার সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরা হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। মদীনা থেকে মক্কার প্রায় ১৯ মাইল দূরে থাকা অবস্থায় যে স্থানটা পাওয়া যায়, তার নাম হচ্ছে হুদায়বিয়া। হুদায়বিয়া স্থান পর্যন্ত যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌছলেন, কিছু অলৌকিক ঘটনাও ঘটল। সে ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর সামনে যেতে রাজী হলেন না। এখানে কিছু ঘটনা ঘটল অলৌকিক আর কিছু ঘটনা ঘটল মৌখিক। অলৌকিক ঘটনাবলীর মাঝে একটা ঘটনা বলি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে উটনীর উপর আরোহী

ছিলেন, সেই বাহন, সেই উটনি এখানে মাটিতে বসে গেল আর সামনে অগ্রসর হতে চায় না। এটা হল অলৌকিক। আর মৌখিক যে সমস্ত ঘটনা ঘটল এর মাঝে সবচেয়ে প্রধান ঘটনা হল, মক্কাবাসীরা যখন সংবাদ পেল, যে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করে দিয়েছি, যেই মুসলমানদেরকে আমরা জুলুম নির্যাতন করেছি, যেই মুসলমানদেরকে আমরা ভিটেহারা করেছি, সর্বস্বহারা করেছি, সেই মুসলমান শক্তি সঞ্চয় করে মক্কায় আসছে। তখন তাদের আশঙ্কা হল, সকল অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিশোধ নিবে নিশ্চয়ই যদি মুসলমানগণ মক্কায় প্রবেশ করে। আমাদের সিলেটে বলে, যে চোর –সে পুলিশ দেখলে ভয় পায়। যে চোর নয়, পুলিশ দেখলে তার ভয় পাওয়ার কথা নয়। তবে এই প্রবাদ এ যুগের নয়, অনেক পুরাতন। বর্তমান সমাজে চোর পুলিশ দেখলে ভয় পায় কি না আমার সন্দেহ।

আমার এ সন্দেহ বিভিন্ন অবস্থা থেকে। এর মাঝে একটি হল, রেলগাড়ীতে দেখবেন বি আর টি পুলিশ থাকে। টিকেট চেক করে। আপনি যদি টিকেট করেন আপনার কাছে আসে না। যারা টিকেট করে না, যাদের কাছে মাল পায়– শুধু তাদের কাছে যায়। এই পুলিশ যাত্রীদের সাথে গোপনে আপস করে টিকেট ছাড়া গন্তব্যে পৌছে দেওয়ার যে সমস্ত টি টি পুলিশ যাত্রীদের সাথে এমন করে তাদেরকে ভয় পাওয়ার কথা নয়; তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক হওয়ার কথা। এই জন্যেই বলেছি, যে চোর সে পুলিশ দেখলে ভয় পায়– এটা বর্তমান সমাজের কথা নয়, প্রাচীনকালের কথা। বর্তমান সমাজে অবস্থা পাল্টে গেছে। বর্তমানে যে চোর সে পুলিশ দেখলে আরও বেপরওয়া হয়ে যায়।

মক্কাবাসীর তো জানা আছে, আমরা মুসলমানদেরকে কি নির্যাতন করেছি, অত্যাচার করেছি, অন্যায় অবিচার করেছি, দেশান্তর করেছি, ভিটেহারা করেছি। সুতরাং ওরা যখন আসছে, ভয় পাওয়ারই কথা। তাদের মনে মনে আশঙ্কা জাগল তারা আমাদের প্রতিশোধ নেবে। আপনারা কি বুঝলেন– মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেড় হাজার সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় আসছেন প্রতিশোধ নেবেন? না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসছেন এক মহান কাজ উমরা পালনের জন্য আর তাদের মনে মনে আশঙ্কা জাগলো প্রতিশোধ নিবেন।

এই জন্য মৌখিক যত ঘটনা ঘটল এর মাঝে তাদের আশঙ্কা

হুদায়বিয়ার স্থানে বাধা হয়ে দাঁড়াল। আর তোমাদেরকে অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না। হে মদীনাবাসী মুসলমানেরা! তোমাদেরকে আর এক বিন্দুমাত্রও অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ না হও। এখানে যখন বাধা হয়ে দাঁড়াল তখন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসমান রাযি.-কে দূত হিসেবে পাঠালেন মক্কার নেতাদের কাছে। যাও উসমান! মক্কার সরদারদেরকে বল, আমরা কোনও প্রতিশোধ নিতে আসি নি। আমরা শুধু উমরা হজ্ব পালন করে যেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে এসেছি, সেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে যাব। কাজেই তোমরা খামোখা সন্দেহ করে বাধা দিও না। আমরা প্রতিশোধ নেব না, তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসি নি, আমাদের ছেড়ে দেওয়া বাড়ি-ঘর দখল করতে আসি নি। আমরা শুধু উমরা পালন করতে এসেছি। আমাদের উমরা পালনের সুযোগ দিয়ে দাও। যেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে এসেছি, সেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে যাব।

এই প্রস্তাব পেয়ে হযরত উসমান রাযি. দূত হয়ে মক্কার কুরাইশ নেতাদের কাছে পৌছলেন। এখান থেকে মক্কার ব্যবধান ১৯ মাইল। এই ১৯ মাইলের ব্যবধানের সুযোগে কে বা কারা রটিয়ে দিল যে, মক্কাবাসী হযরত উসমান গনী রাযি.-কে শহীদ করে ফেলেছে। আসলে কথাটা গুজব ছিল; বাস্তব নয়। এই গুজব যখন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছল, তখন বাস্তব অবস্থা জানা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। সারা দুনিয়ার আইন হচ্ছে, দূতকে হত্যা করা যায় না।

দূত হত্যা দুনিয়ার আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। কোনও জাতি কোনো জাতির দূতকে হত্যা করতে পারবে না। দূতের মাধ্যমে শুধু প্রস্তাব পেশ করা হয়। দূতকে হত্যা করা জঘণ্যতম অপরাধ। এমন অপরাধ যদি মক্কাবাসী করে থাকে, তাহলে আমার সাথে আজ যারা এসেছ, তোমরা আমার হাতে শপথ করো মক্কাবাসী যদি আমার উসমানকে হত্যা করে থাকে, তার প্রতিশোধ নেওয়ার আগ পর্যন্ত মদীনায় আর ফিরে যাব না। হয়তো মক্কার মাটিতে তার বিচার হবে আর না হয় মক্কার মাটিতে শহীদ হয়ে যাব। এখানে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম-এর সাথে যারা এসেছিলেন, তারা তার হাত ধরে শপথ গ্রহণ করলেন –এই সূরার ভেতরে প্রথমে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا (الفتح/١٠)

"হে রাসূলে কারীম! যারা আপনার হাতে বায়'আত হয়, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর হাতে বায়'আত হয়। তাদের হাতের উপর আল্লাহর কুদরতী হাত রয়েছে। যে ব্যক্তি এই বায়'আত ভঙ্গ করল সে যেন নিজের সাথে বায়'আত ভঙ্গ করল, আর যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পূর্ণ করল তার ব্যাপারে আল্লাহর অঙ্গিকার হচ্ছে, অচিরেই তার বড় প্রতিদান দিবেন।"

আরবী ভাষায় বায়'আত, ফার্সী ভাষায় মুরিদ, বাংলা ভাষায় শপথ। বায়'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, বেচা-কেনা করা। এই মুরিদ হওয়াকে আল্লাহ বেচা-কেনা কেন বললেন? শপথ গ্রহণকে বেচা-কেনা কেন বললেন? এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ বিভিন্ন আয়াতে দিয়েছেন। আমি একটি আয়াত তিলাওয়াত করছি–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (التوبة/١١١)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কিনে নিয়েছেন সমস্ত মুমিনের জান এবং মাল বিনিময়ে আল্লাহ তাদের কাছে জান্নাত বিক্রি করে দিয়েছেন।"

সমস্ত মুমিনগণ আল্লাহর কাছে জান-মাল বিক্রি করে বিনিময়ে আল্লাহর জান্নাত কিনে নিয়েছে। তাহলে জান্নাতের বেচা-কেনা হয়। জান্নাত একমাত্র কিনেই নিতে হয়। কেউ কিনে না নিলে পরকালে জান্নাত পাবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে জান্নাত কিনতে পারল না, সে কখনও জান্নাতে যাবে না। যেহেতু হযরত আদম আ. জান্নাতে যাওয়ার আগে জান্নাত কিনে নেননি, কিনে নেওয়ার সুযোগ পাননি; বরং কিনার আগেই জান্নাতে গিয়েছিলেন। কিনার পরে গিয়েছিলেন না কিনার আগে? কিনার আগে।

কিনার আগে যদি কেউ জান্নাতে যায়, তাহলে থাকতে পারবে না জান্নাতে। আগে জান্নাত কিনতে হবে তারপর চিরকালের জন্য জান্নাতে

যাবে। এই জন্য আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন হযরত আদম আ.-কে চিরকাল থাকতে দেননি। জান্নাত এমনিতেই পাওয়া যায় না কিনে নিতে হয়? কিনে নিতে হয়। কে বিক্রি করবে? আল্লাহ।

জান্নাতের বিক্রেতা হল আল্লাহ। খরিদদার যে কোন বান্দা নয় বরং একমাত্র ঈমানদার বান্দারা। জান্নাতের খরিদদার একমাত্র ঈমানদার বান্দারা। জান্নাত বেচা-কেনা হয়। বিক্রেতা হলেন আল্লাহ, আর খরিদদার হলেন ঈমানদার বান্দারা এবং জান্নাত কেনার একমাত্র বাজার হল দুনিয়া। এজন্যই হযরত আদম আ.-কে বাজারে পাঠালেন –জান্নাত কিনে নিয়ে এখানে এসো। এই বাজারে আসার পরে কেনার আগেই যদি বাজার থেকে বিদায় হয়ে যায়, তাহলে অনন্তকাল পর্যন্ত আর জান্নাত কিনতে পারবে না। যেমন ফেরাউন বিদায় হয়েছে। পারবে আর কখনও জান্নাত কিনতে? না। নমরূদ বিদায় হয়েছে। পারবে আর কখনও জান্নাত কিনতে? না।

আবু জেহেল জান্নাত কেনার বাজার থেকে জান্নাত না কিনেই বিদায় হয়েছে। আবু লাহাব জান্নাত কেনার বাজার থেকে জান্নাত কেনার আগেই বিদায় হয়েছে। আহমদ শরীফও বিদায় হয়েছে কিনে? নাকি কিনার আগে? তারা আর কখনও জান্নাত কিনতে পারবে না। চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে। তসলিমা নাসরীনও জান্নাত কিনবে না বলে শপথ করেছে। তারপরও যদি মরণের আগে শপথ ভঙ্গ করে জান্নাত কিনে, তাহলে রেহাই পাবে। আর শপথে অটল থাকলে আবু জেহেল আর আবু লাহাব যেখানে থাকবে, নমরূদ ফেরাউন যেখানে থাকবে, আলী আসগর, তাসলিমা আর আহমদ শরীফকেও সেখানে চিরকালের জন্য তাদের ঠিকানা জাহান্নামে থাকতে হবে।

আমি আপনাদেরকে যে কথাটা বুঝাতে চাচ্ছি, সেটা বলছি– জান্নাত বিনামূল্যে পুরস্কার পাওয়ার জিনিস, না খরিদের জিনিস? খরিদের জিনিস। তাহলে বিক্রেতা কে? আল্লাহ। খরিদদার কে? ঈমানদার বান্দা। জান্নাত কেনার বাজার কোনটা? দুনিয়া। বাকী রইল আরেকটা প্রশ্ন মূল্য কত? আল্লাহ তা'আলা খুবই পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন–

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

(التوبة/١١١)

দুটি জিনিস এই জান্নাতের দাম। তোমার জান আর তোমার মাল। তোমার জান আমি কিনে নিলাম, বিনিময়ে তোমার কাছে জান্নাত বিক্রি করে দিলাম। তোমার মাল আমি কিনে নিলাম, বিনিময়ে তোমার কাছে জান্নাত বিক্রি করে দিলাম।

আরেকটা কথা বলি, আল্লাহ যদি বলতেন –এই জান্নাতের দাম ৫০ কোটি টাকা, তাহলে যাদের টাকা আছে তারা জান্নাত কিনে নিত। আর যার টাকা নেই, সে কিনতে পারত না। এখানে আল্লাহ দামের পরিমাণ উল্লেখ করেন নি। এটা কি কঠিন হল, না সহজ হল? সহজ হল। আল্লাহ যদি বলতেন– আমার জান্নাতের দাম ৫০ লক্ষ টাকা। তাহলে ৪০ লক্ষ টাকার মালিক জান্নাত কিনতে পারত না। যদি বলতেন, আমার জান্নাতের দাম ৫০ হাজার টাকা। তাহলে ২০ হাজার টাকার মালিক জান্নাত কিনতে পারত না। আল্লাহ যদি বলতেন, আমার জান্নাতের দাম এক হাজার টাকা– তাহলে পাঁচশ টাকার মালিক জান্নাত কিনতে পারত না। আল্লাহ যদি বলতেন, আমার জান্নাতের দাম ১০ টাকা। তাহলে ১ টাকার মালিক জান্নাত কিনতে পারত না।

জান্নাতের দাম কত? তাহলে আল্লাহ বলেন, তোমার কাছে যত টাকা আছে তত টাকা। তাহলে জান্নাতের দাম কি সাব্যস্ত হল? জান্নাতের দাম কত? যার কাছে আছে যত। জান্নাতের দাম কত? যার কাছে আছে যত। প্রশ্নের জবাবগুলো স্মরণ রাখবেন। জান্নাত কি বিনামূল্যে পুরস্কার পাবে কোন মানুষ? কিনে নিতে হবে। কার কাছ থেকে? আল্লাহর। বিক্রেতা হলেন আল্লাহ। খরিদদার হলেন মুমিন বান্দা। খরিদের একমাত্র বাজার দুনিয়া। মূল্য কত? যার কাছে আছে যত। জান্নাত কিনাটা খুব কঠিন হল, না খুব সহজ হল? খুব সহজ হল। এবার আপনারা আমার একটা কথার জবাব দিবেন। আপনাদের জান এবং আপনাদের মাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করে বিনিময়ে জান্নাত কিনতে রাজী আছেন? শ্রোতাদের ... রাজী। কিনে নিয়েছেন? কিনলেন কি না? কিনেন নি? আপনাদের জান আল্লাহর কাছে বুঝিয়ে দেন নি? আমার জান-মাল আল্লাহর তরে উৎসর্গ করে দিলাম –এই মনোভাব রাখেন? এর বিনিময়ে আমি আল্লাহর কাছে জান্নাত চাই –এই আশা রাখেন?

এবার বলুনতো! এখন আপনার জান আপনার কাছে রয়েছে না বিক্রি

করে দিয়েছেন? বিক্রি করা হয়েছে। তাহলে এবার আল্লাহ কি আপনার জান নিয়ে নিয়েছেন, না আপনার কাছে রেখে দিয়েছেন? আছে কি কোনো মহাজন, যে আপনার কাছ থেকে খরিদ করে আবার আপনার কাছে দিয়ে রাখে? নেই। যিনি বান্দার জান কিনে বিনিময়ে বান্দাকে জান্নাত দিয়ে বিক্রি করে জান্নাত তোমার বাসস্থান, নাও। জানও তোমার কাছেই রইল। জান্নাত তোমার নামে থাকবে আর জান-মালও তোমার কাছে থাকবে। এমন দয়াল মহাজন একমাত্র আল্লাহছাড়া জগতের কেউ নেই। এবার বলুন– আমার কাছে কি আমার জান রইল, না আল্লাহর কাছে বিক্রিত? বিক্রিত। আমার মালগুলো কি আমার কাছে রইল, না আল্লাহর কাছে বিক্রিত? বিক্রিত। জান এবং মাল বিক্রি করে এর বিনিময়ে আমরা জান্নাতের যোগ্য হয়েছি।

সুতরাং আল্লাহ যে আমার কাছে থাকতে দিয়েছেন– এটা তো আল্লাহর অফুরন্ত দয়া। আল্লাহর অধিকার ছিল তুমি জান্নাতের বিনিময়ে জান বিক্রি করেছ আমার কাছে, তুমি এটা নগদ দিয়ে দাও। এটা আল্লাহ চাইতে পারতেন। মাল বিক্রি করেছ আমার কাছে, নগদ দিয়ে দাও। এটা চাইতে পারতেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, তোমার কাছেই থাকুক। তোমার জান তুমি ব্যবহার কর, তোমার মাল তুমি ব্যবহার কর, যখন আমার দরকার পড়ে তখন দিবে। কখন দরকার আসে? যখন জিহাদের ডাক আসে, তখন দরকার পড়ে।

আল্লাহর যখন দরকার পড়ে তখন আল্লাহর কাছে বিক্রিত জান ও মাল দিব। আল্লাহর দরকার বলতে কি? এটা কি আল্লাহর নিজস্ব দরকার? এটা আল্লাহর নিজস্ব দরকার নয়। পরীক্ষা করার জন্য। তুমি যে আল্লাহর কাছে জান ও মাল বিক্রি করেছ, বিনিময়ে যে আমার কাছ থেকে জান্নাত খরিদ করেছ, সেই বিক্রির চুক্তিতে অটল রয়েছ নাকি সেই চুক্তি ভঙ্গ করেছ, তার পরীক্ষার জন্য বেদ্বীন কাফেরদের মুকাবেলায় যখন সংঘর্ষ বাঁধল আর তোমাকে তলব করল, তখন তুমি যে আমার কাছে জান ও মাল বিক্রি করেছিলে, সেই জান ও মাল জিহাদের ময়দানে দিয়ে দাও। এই হল আমার দরকার।

তোমার যে জান বিক্রি করেছিলে, মাল বিক্রি করেছিলে সেটা

তোমাদের কাছে থাকুক আর আমার যখন দরকার পড়ে মানে আমার দ্বীন জিন্দা করার দরকার পড়ে তখন তোমার জান ও মাল দিয়ে দিবে। তখন যদি সেই ব্যক্তি বলে 'আমি জিহাদের ময়দানে গেলে যদি মারা যাই, তাহলে আমি জিহাদে যাব না, আমি বাড়িতে বসে থাকব।' তখন সে যে আল্লাহর কাছে জান্নাত কেনার চুক্তি করেছিল, সেটা কি রইল? রইল না। জিহাদের ময়দানে যদি মাল দিতে হয় তখন যদি সে ব্যক্তি বলে 'আমি জিহাদের ময়দানে যদি মাল দিয়ে দিই, তাহলে আমি খাব কি? আমার বিবি-বাচ্চা খাবে কি?' তখন আল্লাহর সাথে যে জান্নাত কেনার চুক্তি হয়েছিল, সেই চুক্তি কি রইল, না নষ্ট হয়ে গেল? এ রকম জান্নাত বেচা-কেনার চুক্তি যে সমস্ত মুসলমান করতে চায়, কয় জনের চুক্তি ঠিক আছে, আর কয়জনের চুক্তি ঠিক নেই– তা হচ্ছে নিজস্ব ব্যাপার। সেটা যাচাইয়ের ব্যাপার। এটা বর্তমান সময়ে তলিয়ে দেখা দরকার। এজন্য আল্লাহ পাক অন্য এক আয়াতে বলেন–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ
تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ
(الصف/١١)

আল্লাহ আমাদের একটি ব্যবসা শিখিয়েছেন যেই ব্যবসার তিন ফল। হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে একটি ব্যবসা শিখিয়ে দিচ্ছি; যদি ব্যবসাটা করতে পার, তাহলে ফল পাবে ৩টি। এক নম্বর জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আজাব থেকে নাজাত পাবে। দুই নম্বর জান্নাতের সত্বাধিকারী হবে। তিন নম্বর হচ্ছে, জগতের অন্যান্য ব্যবসার তুলনায় আমার দেওয়া ব্যবসায় সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে।

ব্যবসাটা কি? আল্লাহ বলেন–

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনার পর যখন দরকার পড়বে জিহাদের তখন জানে মালে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। যখন দরকার পড়বে তখন? জান-মালে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। কয়টা জিনিসের দ্বারা জিহাদ করতে বলেছেন, দু'টো জিনিসের দ্বারা। একটা

জান, আরেকটা মাল। এই দুই জিনিস দ্বারা জিহাদ করবে কেন? কারণ, এ দুই জিনিস আগেই আল্লাহর কাছে বিক্রিত। এই দু'টি জিনিস যখন জিহাদ লাগবে তখন আল্লাহর পথে জান বিসর্জন দিবে কেন? যখন জিহাদ লাগবে তখন আল্লাহর পথে মাল বিসর্জন দিবে কেন? কারণ, আমার এই দু'টি জিনিস আগেই আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। আগেই আমি এ দুটির মাধ্যমে জান্নাত খরিদ করে নিয়েছি। এই জান্নাত খরিদ যদি ঠিক থাকতে হয়, তাহলে যখনই আল্লাহ চাইবেন জান দিয়ে দিতে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে জান দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

যখনই আল্লাহ চাইবেন মাল দিয়ে দিতে তখনই জিহাদের জন্য মাল উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই প্রস্তুতি একজন মুসলমানের মনে সদা জাগ্রত থাকতে হবে। এই জান ও মাল দিয়ে যখন আমি আল্লাহর জান্নাত খরিদ করেছি– একথাটি সদা সর্বদা মনে থাকে? (শ্রোতাগণ ... থাকে)। সব সময় থাকে? থাকে না। যখন মনে থাকে না যখন ভুলে যায় যে, আমার জান আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি; আমার মাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি– বিনিময়ে জান্নাত খরিদ করে নিয়েছি।

সুতরাং আল্লাহ জান যখন চাইবেন, তখন আল্লাহর রাস্তায় জান দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। যখনই মাল চাইবেন তখনই আল্লাহর রাস্তায় দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কথাটা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার নাম বায়'আত। নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার নাম? বায়'আত। বায়'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ কি? বেচা-কেনা। ফার্সী ভাষায় মুরিদ হওয়া। বাংলা ভাষায়? শপথ।

একজন উকিলের হাতে আমার হাত দিয়ে তার হাতে ধরে শপথ নিব যে, আমার জান আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিতে আমি প্রস্তুত আছি। বিনিময়ে আর কিছু চাই না। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জান্নাত চাই। এই চুক্তিটা নবায়ন করার নাম বায়'আত। এই চুক্তিটা নবায়ন করার নাম মুরিদ হওয়া। এই চুক্তিটা নবায়ন করার নাম শপথ গ্রহণ করা। কথা বুঝলেন কি না? এবার আসেন আয়াতে যাই। সূরায়ে ফাত্‌হের আয়াতে আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ

فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا (الفتح/١٠)

“হে রাসূলে করীম! মক্কাবাসী আপনার উসমানকে হত্যা করেছে আর উসমানের রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য দেড় হাজার সাহাবায়ে কিরামকে সঙ্গে নিয়ে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আমার পথে জান ও মাল উৎসর্গ করে বিনিময়ে জান্নাত কিনেছ, মক্কাবাসীর এই অপরাধের বিচার করার জন্য। তোমরা যে জান ও মাল দিয়ে জান্নাত খরিদের চুক্তিকে নবায়ন করেছ, সেই জান্নাত খরিদের চুক্তিকে নবায়ন করার নামই বায়'আত।

আল্লাহ বলেন– যারা আপনার হাতে ধরে চুক্তি নবায়ন করেছে, তারা যেন আল্লাহর কুদরতী হাতে ধরে চুক্তি নবায়ন করল। আপনার হাতে যখন ধরল বায়'আতের জন্য তখন আল্লাহর কুদরতী হাতখানা তাদের হাতের ওপর ছিল। কাজেই আপনার হাতে যদি বায়'আত হয়, তাহলে এর মানেই হল আল্লাহর হাতে বায়'আত হওয়া। তারা যদি এই চুক্তিতে অটল থাকে তাহলে আল্লাহর দরবারে মহা পুরস্কার আছে। আর যদি এই চুক্তি ভঙ্গ করে তবে এর পরিণাম অবশ্যই তাদের গ্রহণ করতে হবে। এভাবে চুক্তি গ্রহণ করার নামই বায়'আত।

এই বায়'আতে হযরত উসমান উপস্থিত না অনুপস্থিত? অনুপস্থিত। হযরত উসমান যেহেতু অনুপস্থিত, তাঁরও তো জান্নাত কেনার দরকার আছে। রাসূল বলেন, উসমানের জান্নাত খরিদের চুক্তিতে আমি জামিন হলাম। আমি উসমানের পক্ষ থেকে তার জান মাল আল্লাহর রাস্তায় বিক্রি করলাম আর আল্লাহর জান্নাত কিনার জন্য আমি জামিন হলাম। একথা বলে আল্লাহর রাসূল বলেন– আমি এই (ডান) হাত দিলাম আমার পক্ষ থেকে আর এই (বাম) হাত দিলাম উসমানের পক্ষ থেকে। আমি উসমানের পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে জান-মাল বিক্রির চুক্তি নবায়ন করলাম।

এখন জিহাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন কি না। প্রস্তুতি সম্পন্ন। জিহাদের ময়দানে তারা জান দিয়ে দিতে প্রস্তুত কি না? প্রস্তুত? জান্নাতের আশায় সব মাল দিয়ে দিতে প্রস্তুত কি না? প্রস্তুত। কোন কথার ভিত্তিতে? উসমানকে কেন ওরা শহীদ করল সেই ব্যাপারে। প্রস্তুতি সম্পন্ন। ঐ দিক থেকে

সংবাদ আসল, বিষয়টা 'গুজব'মাত্র। তখন হযরত উসমানকে সাথে নিয়ে কুরাইশ বংশের সরদাররা নবীর দরবারে উপস্থিত হল। কোন কথার উপর এই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল? উসমানকে শহীদ করেছে। উসমানকে শহীদ করে ফেলেছে এরই ভিত্তিতে জিহাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল।

দূত উসমানকে তারা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে হত্যা করেছে, এই দূত হত্যার বিচারের জন্য জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল। কিন্তু দেখা গেল উসমানকে সাথে নিয়ে কুরাইশ নেতারা উপস্থিত হয়েছে। তখন প্রমাণ হল, যে খবর রটেছিল সেটা একটা গুজবমাত্র। সুতরাং জিহাদের প্রস্তুতি আপাতত মুলতবী। দেখা যাক এদের সাথে কোন আপস মীমাংসায় পৌছা যায় কি না? যদি আপস-মীমাংসা করা যায়, তাহলে জিহাদ মুলতবী থাকবে আর যদি আপস মীমাংসায় পৌছা না যায়, তাহলে জিহাদের প্রস্তুতি তো আছেই। সেই মুহূর্তেই জিহাদ করা হবে।

আমাদের দেশে অনেকেই বলে জিহাদ জিহাদ জিহাদ চাই, জিহাদ করে বাঁচতে চাই। কেউ বলে জিহাদ করে মরতে চাই। কিন্তু জিহাদ কখন হয়, কার জিহাদ হয়, কার বিরুদ্ধে হয়, কোন সময় হয়, কেন হয়? এই কথাগুলো যারা "জিহাদ জিহাদ জিহাদ চাই –জিহাদ করে বাঁচতে চাই/মরতে চাই" বলে, তাদের অধিকাংশই জানে না।

এ পর্যায়ে আমি আলোচনা করতে চাই– কার জিহাদ হয়, কার বিরুদ্ধে হয়, কখন হয় এবং কিভাবে হয়? এই চারটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। জিহাদ কার হয়? মুমিন মুসলমানের হয়। কার বিরুদ্ধে হয়? বেদ্বীন কাফেরদের বিরুদ্ধে হয়। কখন হয়? এর জবাব লাগবে কি না? কিভাবে হয়? এর জবাব লাগবে কি না? লাগবে। যে দেশ মুসলমানদের, মুসলমান সরকার, মুসলমান শাসনকর্তা সেই দেশের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে অমুসলমান শাসনকর্তাকে আগে দাওয়াত দিতে হবে। জিহাদের প্রথম স্তর।

অমুসলিম দেশের শাসনকর্তাকে মুসলিম দেশের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। জিহাদের প্রথম সবক যদি দাওয়াত গ্রহণ করে ফেলে, তাহলে এর নাম আপস। যদি গ্রহণ না করে, তাহলে জিহাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ –তুমি শাসনকর্তা হিসেবে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ কর নি, ভালো কথা! তুমি তোমার গদি নিয়ে থাকো, তোমার দেশে

অনেক অমুসলিম জনগণ আছে, তারা ইসলামের দাওয়াত পায় নি, তারা বুঝতে পারছে না, আমাদেরকে সুযোগ দাও তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব। ইসলাম চিনার সুযোগ দিব, ইসলাম বুঝার সুযোগ দিব। সেটার অনুমতি দিয়ে দাও।

এই প্রস্তাবে যদি অমুসলিম দেশের শাসনকর্তা রাজী হয়ে যায়, তাহলে জিহাদ চলবে না, আপস। যদি রাজী হয়ে যায়, তাহলে জিহাদ না আপস? আপস। যখন আপস হয়ে গেল, তখন তুমি তোমার গদি নিয়ে বসে থাকো, তোমার দেশের জনগণকে ইসলামের সত্যতা বুঝিয়ে দেব। জনগণ যখন ইসলামের সত্যতা বুঝে নিবে, তখন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নেবে।

আর যদি বলে 'না', আমার দেশের জনগণকে ইসলাম বুঝানোর সুযোগ দিব না, তাহলে জিহাদের তৃতীয় পদক্ষেপ। সেটা কি? সেটা হচ্ছে তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে না আর জনগণকেও ইসলাম গ্রহণ করতে দিবে না, ঠিক আছে তুমি তোমার গদি নিয়ে থাকো আর তোমার দেশের জনগণও যার যার ধর্ম পালন করুক; কোন অসুবিধা নেই। তবে ইসলামী রাষ্ট্রকে 'কর' দিয়ে থাকো।

কারণ اَلْاِسْلَامُ يَعْلُوْ وَلَا يُعْلٰى ইসলামকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন একটি বিজয়ী ধর্ম হিসেবে নাকি পরাজিত হিসেবে? বিজয়ী ধর্ম হিসেবে। যদি ইসলামী রাষ্ট্রকে 'কর' না দেয়, তাহলে ইসলাম বিজয়ী হল কোথায়? ইসলাম বিজয়ী হয়ে থাকবে। যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদের উপর কোন বেদ্বীন কাফেরেরা ঝাণ্ডা উড়াতে পারবে না। যারা বেদ্বীন কাফের তাদের মাথার উপর মুসলমানেরা ইসলামের ঝাণ্ডা উড়াবে যদি 'কর' দেয়, তাহলে জিহাদ চলবে না আপস। কথা বুঝে আসছে কি? এটা জিহাদের কত নম্বর পদক্ষেপ? তিন নম্বর পদক্ষেপ।

এখানে এসে যদি অমুসলিম সরকার মুসলিম দেশে কর দিয়ে থাকতে রাজী হয়ে যায়, যেমন বর্তমান দুনিয়ায় আমেরিকা সৌদি আরবকে কর দিয়ে থাকে (!) না আমেরিকাকে সৌদি আরব কর দিয়ে থাকে? সৌদি আরব আমেরিকাকে কর দিয়ে থাকে। কোন গতিতে চলার কথা ছিল আর কোন গতিতে চলেছি? আপনারা আমার কথা বুঝছেন? আমেরিকা সৌদি

আরবকে কর দেয়, না সৌদি আরব আমেরিকাকে কর দেয়? সৌদি আরব আমেরিকাকে কর দেয়। কত লক্ষ কোটি ডলার কর দেয় তার কোন হিসাব-নিকাশ নেই। বর্তমান দুনিয়াতে প্রায় দেড়শ কোটি মুসলমান আছে। সব মুসলমানই ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের গোলাম। বর্তমান দুনিয়ায় সব মুসলমান? ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম। কিভাবে?

এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সুযোগ আমার নেই। আগামীকাল যদি সম্ভব হয়, সেই সময়ে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। বর্তমান দুনিয়ায় প্রায় অর্ধশত মুসলিম দেশ আছে আর দেড়শ কোটি মুসলমান আছে। কিন্তু সবগুলো ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম। সৌদি আরবের মুসলমান আমেরিকার ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম, ইরাকের মুসলমান ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গেলাম, কুয়েতের মুসলমান ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম, পাকিস্তানের মুসলমান ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম, বাংলাদেশের মুসলমান ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ না অপূর্ণাঙ্গ? পূর্ণাঙ্গ। পরিবারিক সমস্যার সমাধান ইসলাম দিতে জানে কি না? জানে। সামাজিক জীবনের সমস্যার সমাধান ইসলাম দিতে জানে কি না? জানে। সামরিক জীবনের সমস্যার সমাধান ইসলাম দিতে জানে কি না? জানে। অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যার সমাধান ইসলাম দিতে জানে কি না? জানে।

আজ যদি বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা দেয় বাংলাদেশের অর্থনীতি ইসলামের অনুশাসন মতে চলবে। কুরআনের বিধান মতে চলবে। তখন আমেরিকার লাল কুত্তারা এর প্রতিবাদ করবে কি না? করবে। এই প্রতিবাদের মুখে ভয় পেয়ে ওদের অর্থনীতি বর্জন করে ইসলামী অর্থনীতি গ্রহণ করছে না। আমি জিজ্ঞেস করি এই লাল কুত্তাদের অর্থনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য কি না? বাধ্য। আমি একটিমাত্র উদাহরণ দিলাম। বুঝে থাকলে বলুন, বাংলাদেশের মুসলমান স্বয়ং সম্পন্ন মুসলমান, না ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম? গোলাম। মুসলমানের এই রকম গোলামী করার জন্য আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কুরআন দিয়ে এই দুনিয়াতে পাঠাননি। আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا (الصف/٩)

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সত্যগ্রন্থ কুরআন দিয়ে সত্য ধর্ম ইসলাম দিয়ে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন ইসলামকে বিজয়ী রাখার জন্য, না কি গোলামী করার জন্য? ইসলামকে বিজয়ী রাখার জন্য। মুসলমান বিজয়ী হিসেবে বসবাস করবে দুনিয়াতে।

এই জন্যই আল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। মুসলমানরা বেদ্বীন কাফেরের গোলামী করবে, আল্লাহর দুশমনের গোলামী করবে –এজন্যে তাদের পাঠান নি। সুতরাং জিহাদের তৃতীয় পদক্ষেপ কোনটা? 'কর' দেওয়া। জিহাদের প্রথম পদক্ষেপ অমুসলিম সরকারকে ইসলামের দাওয়াত।

গ্রহণ না করলে জিহাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ অমুসলিম সরকারের জনগণকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পার্মিশন। পেলে? আর জিহাদ চলবে না, আপস। না পেলে জিহাদের তৃতীয় পদক্ষেপ। মুসলমান সরকারকে কর দিতে থাকো হে কাফিরের দল! এটা জিহাদের কত নম্বর পদক্ষেপ? তৃতীয় পদক্ষেপ।

কেন কর দেবে? কারণ, ইসলাম বিজয়ী ধর্ম। ইসলাম পরাজিত ধর্ম নয়। মুসলমান জাতিকে বিজয়ী হিসেবে থাকার জন্য ইসলামের আগমন। গোলামী করার জন্য আল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পাঠান নি। যদি কর দিয়ে থাকতে রাজী হয়ে যায়, আপস। জিহাদ চলবে আর? জিহাদ চলবে না।

জিহাদ জিহাদ জিহাদ চাই, বাঁচতে চাই, মরতে চাই– কখন? পর্যায়ক্রমে না যখন মনে চায় তখন? পর্যায়ক্রমে। যদি বলে আমি ইসলাম গ্রহণ করব না এবং আমার দেশের জনগণকে ইসলাম গ্রহণ করতে দিব না, আর তোমাদেরকে কর দিয়েও থাকব না। তোমরা জিহাদের ময়দানে এসো, যুদ্ধের ময়দানে এসো, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো। এটা কত নম্বর পদক্ষেপ? চার নম্বর পদক্ষেপ। চার নম্বরের পদক্ষেপ হল যুদ্ধের ঘোষণা।

আরও আছে যুদ্ধ ঘোষণার কারণ। যেমন কোন অমুসলিম দেশে মুসলিম নাগরিকের ধর্ম পালনে যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে যে অমুসলিম দেশে মুসলিম নাগরিকদের ধর্ম পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, এই অমুসলিম দেশের পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশের উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়। অমুসলিম দেশের সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিম দেশের সরকারের জিহাদ ঘোষণা করা তখন ফরয হয়ে যায়।

যদি পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশ দুর্বল হয়, ছোট হয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোকাবেলার ক্ষমতা না থাকে, যতটা মুসলিম দেশ সম্মিলিত ঘোষণা দিলে মোকাবেলা করতে পারবে ততটা মুসলিম দেশ সম্মিলিতভাবে এই জালিম অমুসলিম দেশের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা ফরয হয়ে যায়। কথা বুঝে আসছে কি? জিহাদ যখন-তখন নাকি নীতিমালা আছে? নীতিমালা আছে। তাহলে বুঝে থাকলে বলুনতো, কে জিহাদ করবে? মুমিন। এই জন্য আল্লাহ বলেন,

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

তোমরা আল্লাহ আর আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনবে আর আল্লাহর পথে জিহাদ করবে জানের দ্বারা মালের দ্বারা। মুসলমান জিহাদ করবে কার বিরুদ্ধে? কাফেরের বিরুদ্ধে। কখন? যদি তারা অত্যাচারিত হ অথবা ঐ তিন পর্যায়ের পদক্ষেপকে অস্বীকার করে, তাহলে মুসলমা জিহাদ করবে কাফেরদের বিরুদ্ধে। বুঝে থাকলে বলুনতো! বর্তমা দুনিয়ায় অমুসলিম দেশে মুসলমান অত্যাচারিত কি না? অত্যাচারিত জিহাদ ফরয হয়েছে কি? হয়েছে। বর্তমান দুনিয়ার কোন অমুসলিম দেশে সরকার ইসলাম গ্রহণ করতে রাজী? না। তাদের দেশের জনগণে ইসলামের দাওয়াত দিতে রাজী? না। মুসলমান সরকারকে কর দি থাকতে রাজী? না। জিহাদ ফরয হয়েছে কি না? হয়েছে। ফরয হয়েছে ফরয হয়েই আছে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালে পর হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাযি. যখন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহ করলেন, তখন সর্বপ্রথম যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন– সেই বক্তৃত

বলেছিলেন, যত দিন পর্যন্ত মুসলমান জিহাদকে আঁকড়ে ধরবে তত দিন পর্যন্ত মুসলমানরা বিজয়ী থাকবে আর যে দিন মুসলমানেরা জিহাদ ছেড়ে দেবে, সেদিন থেকে বেঈমান কাফেরদের হাতে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত হতে থাকবে। হযরত আবু বকরের বক্তব্য কি ঠিক? ঠিক। তাহলে বর্তমান দুনিয়ায় মুসলমানরা কাফেরদের হাতে লাঞ্ছিত বঞ্চিত কেন? জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের মুসলমানকে কোনও বেদ্বীন কাফের ভয় পায় না, পাকিস্তানের মুসলমানকে কোনও বেদ্বীন কাফের ভয় পায় না, ইরাকের মুসলমানকে কোনও বেদ্বীন কাফের ভয় পায় না, সৌদি আরবের মুসলমানকে কোন বেদ্বীন কাফের ভয় পায় না, ইরানের মুসলমানকে কোনও বেদ্বীন কাফের ভয় পায় না; কিন্তু মোল্লাহ উমরকে ভয় পায় কেন? মোল্লাহ উমরকে তারা এই জন্য ভয় পায় যে, সে জিহাদের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে।

সারা দুনিয়ার বেদ্বীন কাফের এক মোল্লার ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। এক মোল্লা জিহাদে থাকার কারণে যদি সারা দুনিয়া তাঁর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে, তাহলে চিন্তা করে দেখুন– লক্ষ লক্ষ মোল্লা যদি জিহাদের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকত, তো কোনও বেদ্বীন-কাফিরের অস্তিত্ব এই দুনিয়াতে থাকত না।

ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব মুসলমান গোলামী করার জন্য না বিজয়ী হওয়ার জন্য? বিজয়ী হওয়ার জন্য। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের শপথ নিয়েছিলেন মুসলমানকে অত্যাচারের সংবাদ পেয়ে। যখন দেখা গেল, অত্যাচার করে নি আপসের জন্য এসেছে, তখন জিহাদ বলবৎ না মুলতবী? মুলতবী। আপাতত মুলতবী। দেখা যাক আপসে আসে কি না? এতক্ষণ জিহাদের নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করলাম।

এবার আরম্ভ হল, সন্ধির শর্তের আলোচনা। মক্কাবাসী প্রস্তাব করল, হে মুহাম্মাদ! যুদ্ধের জন্যে আসনি, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আসনি, লুণ্ঠিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য আসনি, এসেছ উমরা হজ্ব পালন করার জন্য। এটা ধর্মের কাজ। এতে আমাদের বাধা নেই।

আমাদের আপত্তি নেই, আমরা কোন রকমের প্রতিরোধ করব না। কিন্তু এর জন্য সন্ধি করতে হবে, চুক্তি করতে হবে। এ বছর উমরার ইহরাম ভেঙ্গে ফেলতে হবে, এবার মদীনায় ফিরে যেতে হবে। আগামী বছর এসে উমরা হজ্ব পালন করবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেনে নিলেন। ইহরাম ভেঙ্গে ফেললেন।

ইহরাম ভাঙ্গার মানেই হল, নামাযের জন্য যেমন ইহরাম বেঁধে তাকবীর বলে নামায শুরু করা হয়, নামায শেষ করার পূর্ব পর্যন্ত নামায বহির্ভূত আর কোনও কাজ করা যায় না, তেমনিভাবে উমরা অথবা হজ্ব করার জন্য বিশেষ পোশাক পড়ে বিশেষ দু'আর মাধ্যমে হজ্বের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়; এরপর থেকে হজ্বের বহির্ভূত কোনও কাজ আর করা যায় না। এই হল ইহরাম। ইহরাম ভেঙ্গে ফেলো! আগামী বছর কাযা করবে।

এ ব্যাপারে তোমাদের মাঝে আর আমাদের মাঝে একটি চুক্তি হতে হবে। এই চুক্তির মেয়াদ হবে দশ বছর। আর এই দশ বছর মেয়াদের মাঝে মক্কাবাসী মদীনার নিরিহ মানুষের উপর হামলা করবে না। একদল আরেক দলের সাথে আপস-মীমাংসায় চলবে। এই সন্ধির মেয়াদ হবে দশ বছর। তাই এ বছর আর হজ্ব করা যাবে না। আগামী বছর হজ্ব করতে হবে। আর আগামী বছর হজ্বে আসার সময় কোন হাতিয়ার আনা যাবে না।

এই দশ বছরের মাঝে মক্কার কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় চলে গেলে আশ্রয় দেওয়া যাবে না। কিন্তু মদীনার কোন মুসলমান যদি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে মক্কায় আসে, তা হলে তাকে অবশ্যই মক্কাবাসী আশ্রয় দিবে। এমন কতগুলো শর্ত আরোপ করল, যা মেনে নেওয়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে অপমানজনক। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুলমানদের নত স্বীকার, বাহ্যিক দৃষ্টিতে লজ্জাজনক এমন কিছু প্রস্তাব দিল, সবগুলো প্রস্তাব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেনে নিলেন। এই ঐতিহাসিক সন্ধি লেখার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হল হযরত আলী রাযি.-কে কাগজ-কলম হযরত আলী রাযি.-এর কাছে। হযরত আলী রাযি. এই হুদায়বিয়ার সন্ধির শিরোনাম লিখলেন−

هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মক্কার কুরাইশ সরদার এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাঝে সম্পাদিত চুক্তিনামা। তারা আপত্তি উঠাল 'মুহাম্মাদ'-এর সাথে 'রাসূলুল্লাহ' লিখলে আমরা এতে স্বাক্ষর করব না। কেন? মুহাম্মাদকে রাসূলুল্লাহ মানি না বলেই এতসব সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। মুহাম্মাদকে রাসূলুল্লাহ মেনে নিলে তো আর কোন সংঘাতই থাকে না। তোমাদের যত বিরোধ সকল বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু হল 'মুহাম্মাদ' 'রাসূলুল্লাহ' নয়। এটা আমাদের দাবী।

আর এই কাগজে 'রাসূলুল্লাহ' লিখেছ, এই কাগজে আমরা স্বাক্ষর করলে আমাদের দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। সুতরাং যে কাগজে 'রাসূলুল্লাহ' লিখা হবে, সেই কাগজে দস্তখত করব না। তখন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাযি.-কে বললেন, আমার নামে 'রাসূলুল্লাহ' বাদ দিয়ে 'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ' লিখ। কারণ? এই চুক্তি কত বছরের? দশ বছরের। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি দশ বছরের 'রাসূল'? চিরকালের রাসূল। তা হলে দশ বছরের কাগজে লিখলেই আর কি, আর না লিখলেই বা কি?

হযরত আলী রাযি. বললেন, এই কাগজ দশ বছরের হোক বা দশ দিনের হোক আমার হাতে যে কাগজে 'মুহাম্মদ' এর সাথে 'রাসূলুল্লাহ' লিখেছি, সেই কাগজে আমার হাতে 'মুহাম্মাদ' থেকে 'রাসূলুল্লাহ' কেটে দেওয়ার সাহস আমার নেই। রাসূল বললেন, কেটে দেওয়ার সাহস যদি তোমার না হয়, তা হলে কাগজ-কলম আমার হাতে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাতে কাগজ-কলম নিয়ে− আপনারা জানেন রাসূল কারও কাছে পড়াও শিখেন নি, লিখাও শিখেন নি, সেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম −ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধির শিরোনাম লিখলেন−

هٰذَا مَا قَضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ

আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদএবং মক্কার কুরাইশ নেতাদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তিনামা।

আপনাদের মন চায় কি যে 'মুহাম্মাদ' থেকে 'রাসূলুল্লাহ' বাদ দিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হোক? মন চায় না। হযরত উমর রাযি. এর মনটা এমন খারাপ হল, তিনি রাসূলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, হুজুর অনুমতি

পেলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। রাসূল বললেন, কি জিজ্ঞাসা তোমার বল? হযরত উমর প্রশ্ন করলেন, আপনি কি সত্যিই আল্লাহর রাসূল? রাসূল বললেন, হ্যাঁ। সত্যিই আমি আল্লাহর রাসূল। আবার উমর রাযি. প্রশ্ন করলেন, আমরা যারা আপনাকে রাসূল মানি, আমরা কি সত্যিই হক? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।

উমর রাযি. আবার বললেন, যারা আপনাকে রাসূল মানে না তারা কি সত্যিই বাতিল? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। সত্যিই বাতিল। উমর রাযি. আবারো প্রশ্ন করলেন, আপনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নটা কি সত্য? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সত্য-মিথ্যা পরে বলব, আগে বলো, আমার স্বপ্নটা কি এ বছরই বাস্তবায়ন হবে– এমন বলেছি কি? তর্কে হেরে গেলেন হযরত উমর রাযি.।

রাসূলকে হযরত উমর রাযি. অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন, একটা প্রশ্নেও আটকাতে পারলেন না। কিন্তু রাসূল একটিমাত্র প্রশ্ন করলেন, তাতে হযরত উমর রাযি. নিরুত্তর হয়ে গেলেন। প্রশ্নের জবাব না দিতে পেরে নীরব হলেন হযরত উমর রাযি.। কিন্তু ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকলেন।

চুক্তিনামা লিখা হল, এখন স্বাক্ষর করার পালা। এই মুহূর্তে মক্কার এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনারা তো হিজরত করে মদীনায় চলে গিয়েছেন, তারপর আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। হিজরত করার মত আমার তাওফিক নেই, সামর্থ নেই। এই দীর্ঘ দিন যাবৎ ওরা আমার উপর জুলুম অত্যাচার করেছে– কেন আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম। আপনারা চুক্তির মাঝে একটি দফা দিয়েছেন যে, মক্কার কোন মুসলিম মদীনায় গেলে আশ্রয় পাবে না। এর মানেই হল আমাকে ওরা আরও দশ বছর নির্যাতন করবে। কাজেই স্বাক্ষর করার আগে আমাকে আপনাদের দলভুক্ত করে নিন।

সঙ্গে সঙ্গে মক্কাবাসী বাধা হয়ে দাঁড়াল। এই লোককে যদি মুক্ত কর, তাহলে দস্তখত করব না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাকে আল্লাহর হাওলা করলাম। আরও দশ বছর তোমাকে ওরা নির্যাতন করবে, আল্লাহ যেন তোমাকে হেফাজত করেন। তবুও আমার এই সন্ধি সম্পাদন করতে তুমি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িও না। শেষ পর্যন্ত এই

লোকটাকে বাদ দিয়েই সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হল। দেড় হাজার সাহাবায়ে কিরামের মাঝে কোন সাহাবীও শান্ত নয়। একমাত্র আবু বকর রাযি. শান্ত, নীরব। এই একজন সাহাবী ছাড়া বাকী দেড় হাজার সাহাবীর অন্তর দাউ দাউ করছে। মুহাম্মাদ নামের সাথে রাসূলুল্লাহ লিখতে দিল না। এরপরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেনে নিলেন। অসহায় মুসলমানটাকেও আমাদের দলভুক্ত করে থাকতে দিল না। তারপরও নবী মেনে নিলেন।

এদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় গেলে আশ্রয় দেওয়া যাবে না, আমাদের কাছ থেকে কেউ ইসলাম ত্যাগ করে ফিরে গেলে অবশ্যই তারা আশ্রয় দিবে। এরপরও রাসূল মেনে নিলেন। এখন রাসূলকে মানি আন্তরিকভাবে তাই প্রতিবাদ করতে পারি না। রাসূলের সাথে প্রশ্নোত্তর করতে গেলে আমরা ঠেকে যাই; জবাব দিতে পারি না। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তা গ্রহণ করার মত মন মানসিকতা তৈরি নয়।

ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ব্যর্থ মনোরথে যখন সাহাবায়ে কিরাম রাসূলের সাথে মদীনায় ফিরে যাচ্ছিলেন, মদীনায় ফেরত-যাত্রাপথে আল্লাহ পাক এই সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল করলেন। আল্লাহ বলেন,

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا (الفتح/١-٣)

"হে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দিয়েছি। যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য।"

এই সূরা নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে পাঠ করে শুনালেন। তাদের অন্তর তো পূর্ব থেকে আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দেওয়ায় হযরত উমর রাযি. আবারো প্রশ্ন করে বসলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি বিজয়? তখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম! এটা প্রকাশ্য বিজয়। এই ভাষ্যের সামনে সাহাবায়ে কিরাম মাথা নত করে নিলেন এবং গোটা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্য বিজয় মেনে নিলেন। সাহাবাদের মনে দুঃখ ছিল চুক্তিনামায় 'মুহাম্মাদ' এর সাথে 'রাসূলুল্লাহ' লিখতে দিল না। আল্লাহ আয়াত নাযিল করে সান্ত্বনা দিলেন। আল্লাহ বলেন–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

(الفتح/٢٩)

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবীগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।

হে আমার নবীর সাহাবীরা দশ বছরের চুক্তিনামায় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখতে দিল না, এই কারণে তোমাদের মনে বড় দুঃখ। কিন্তু কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে থাকবে। এই কুরআনের আয়াত নাযিল করে দিলাম مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ কত বছরের চুক্তি নামায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লিখতে দিল না? দশ বছরের চুক্তি নামায়। আল্লাহ কত বছরের জন্য আয়াত নাযিল করলেন? কিয়ামত পর্যন্ত। পরাজয় না বিজয়? বিজয়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিলেন। এটা বিজয় কি না তা তুমি এখনও বুঝতে পার নি, কিন্তু সময়মতো ঠিকই বুঝতে পারবে এটা বিজয় কি না।

এটা কোন হিজরী সনের কথা? ৬ষ্ঠ হিজরীর কথা। মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে হিজরত করে যাওয়ার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আরও ছয় বছর অতিবাহিত হওয়ার পরের কথা। এই দীর্ঘ ছয় বছরে মুসলমানরা সামরিক দিক থেকে এমন শক্তিশালী ছিলেন যদি কোন একটা শর্ত মক্কাবাসীর না মানতেন তাহলে যুদ্ধ বাঁধত অনায়াসে। আর যুদ্ধ বাঁধলে মদীনাবাসী মুসলমানরা মক্কাবাসী কুরাইশ বংশকে পরাজিত করে অতি সহজে মক্কা জয় করে নিত।

৬ষ্ঠ হিজরীর মদীনাবাসী মুসলমানদের পক্ষে মক্কাবাসীকে পরাজিত করে মক্কা দখল করে নেওয়া খুবই সহজ ব্যাপার ছিল। তাহলে যেখানে যুদ্ধ হলেই মুসলমানরা বিজয়ী হতে পারে, সেখানে এক তরফা শর্ত মেনে নিয়ে, নতী স্বীকারমূলক প্রস্তাবগুলো মেনে নিয়ে সন্ধি করার, আপস-

মীমাংসার কী দরকার ছিল? অথচ সেই সন্ধিকে, সেই আপসকে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন 'প্রকাশ্য বিজয়' আখ্যা দিলেন। কেন আল্লাহর রাসূল নিশ্চিত বিজয় পরিহার করে সন্ধির পথ ধরলেন? মুফাসসিরীনে কিরাম তাফসীরের কিতাবে এর বেশ কিছু কারণ বর্ণনা করেছেন। এর মাঝে আমি আপনাদের সামনে দু'টি কারণ পেশ করার চেষ্টা করব।

প্রথম কারণ ঃ আখেরী জামানার নবী যখন মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এর প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্ব পুরুষের একজন বিশিষ্ট পয়গাম্বর ছিলেন হযরত ইবরাহীম আ.।

হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর ছেলে হযরত ইসমাঈল আ.-কে সঙ্গে নিয়ে নতুনভাবে কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন হযরত নূহ আ.-এর জামানায় বন্যায় ভেসে যাওয়ার পর। ইতিহাস আপনারা অনেকেই জানেন। হযরত নূহ আ.-এর আমলে বিশ্বব্যাপী বন্যার কারণে কা'বা ঘর ধ্বসে গিয়েছিল। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন হযরত আদম আ.-কে দুনিয়াতে পাঠাবার আগেই সর্বপ্রথম ফিরিশতাদের দ্বারা নির্মাণ করিয়েছিলেন এ ঘর।

হযরত আদম আ. দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে ফিরিশতাদের হাতে নির্মাণকৃত কা'বা ঘর ধ্বসে গিয়েছিল। তাই হযরত আদম আ. দুনিয়াতে আসার পর আবার কা'বা ঘর নতুনভাবে নির্মাণ করলেন। আদম আ. নির্মিত কা'বা ঘর হযর নূহ আ.-এর যুগের বন্যায় আবার ধসে যায়। এই বিশ্বব্যাপী বন্যার পর হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত ইসমাঈল আ. আল্লাহর নির্দেশে আবার কা'বা ঘর নির্মাণ করলেন। হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত ইসমাঈল আ. কা'বা ঘরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার পর আল্লাহর কাছে কতগুলো দু'আ করেছিলেন। এর মাঝে একটা দু'আ–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (البقرة/١٢٧)

হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে এই খেদমতটুকু কবুল কর। তুমি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। তারা আরও দু'আ করেছিলেন–

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ (البقرة/١٢٨)

হে আল্লাহ! আমি ইবরাহীম এবং আমার ছেলে ইসমাঈলকে 'মুসলিম'

হিসেবে কবুল করুন। মুসলিম শব্দের অর্থ হল, আত্মসমর্পণকারী। হে আল্লাহ! আমি যেন আপনার দরবারে আত্মসমর্পণকারী হতে পারি, আমার ছেলে ইসমাঈল আজীবন আপনার দরবারে আত্মসমর্পনকারী হিসেবে থাকতে পারে– এ হিসেবে আমাকে এবং আমার ছেলেকে কবুল ও মনজুর কর। এখান থেকে মুসলমানদের নামকরণ করা হয় 'মুসলিম' হিসেবে।

'মুসলিম' ঐ লোককেই বলা হয়, যেই লোক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত। আত্মসমর্পণের সারমর্ম– আমার কথাই কথা নয়; আল্লাহর কথাই কথা। আমার মতই মত নয়; আল্লাহর মতই মত। আমার পথ পথ নয়; আল্লাহর পথই পথ। যে ব্যক্তি নিজের মত ছাড়তে রাজী আল্লাহর মতে চলার জন্য, যে ব্যক্তি নিজের পথ ছাড়তে রাজী আল্লাহর পথে চলার জন্য, যে ব্যক্তি নিজের কথা ছাড়তে রাজী আল্লাহর কথায় চলার জন্য, সেই ব্যক্তির নাম মুসলমান।

আপনারা কি মনে করেন বর্তমান দুনিয়ার যারা মুসলমান দাবী করে তাদের সবাই কি পরিপূর্ণ মুসলমান? না। পরিপূর্ণ মুসলমান তো দূরের কথা, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে– বর্তমান দুনিয়াতে যারা মুসলমান দাবী করে, তাদের অনেকেই প্রকৃত মুসলমান নয়। আসলে শুধু দাবীদার মুসলমান। মুসলমান কাকে বলে? যে আল্লাহর কথা রক্ষা করার জন্য নিজের কথা বাদ দিতে প্রস্তুত, আল্লাহর পথে চলার জন্য নিজের পথ ছাড়তে প্রস্তুত, যে আল্লাহর মতে চলার জন্য নিজের মত ত্যাগ করতে প্রস্তুত তারা মুসলমান। বলুনতো! আল্লাহর কথা কি নামায পড়া ,নাকি না-পড়া? পড়া। বর্তমান সমাজে অধিকাংশ মুসলমান নামায পড়ে? না। এরা কার কথায় চলে? আল্লাহর কথায় না নিজের কথায়? নিজের কথায়। এরা কেমন মুলমান।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের সূরায়ে বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন,

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"ব্যবসাকে আল্লাহ হালাল করেছেন, সুদের কারবারকে হারাম ঘোষণা করেছেন।"

সুদের কারবারকে আল্লাহ হালাল ঘোষণা করেছেন, না হারাম? হারাম।

আয়াতের শেষের অংশে আল্লাহ বলেন–,

وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (البقرة/٢٧٥)

সুদের কারবারকে আল্লাহ হারাম ঘোষণা করার পরও যারা সুদের কারবারকে বৈধ করণের চেষ্টা করবে; বৈধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ বলেন– এরা চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে। সুদের কারবারকে বৈধ করার চেষ্টা করলে চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে কেন? অথচ হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান ঃ

مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْاِيْمَانِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

যার অন্তরে সরিষার বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকবে, ঈমানের লেশমাত্র যাদের অন্তরে বাকী থাকবে, সেই ব্যক্তিও চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে না। আর সুদের কারবারকে বৈধ করার চেষ্টা করলে চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে, এর একমাত্র কারণ আল্লাহ যেই কাজকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন, সেই কাজকে যারা হালাল বানাতে চায়, আল্লাহ যে বস্তুকে অবৈধ ঘোষণা দিয়েছেন সেই বস্তুকে যে বৈধ প্রমাণের চেষ্টা করতে চায়, এদের অন্তরে ঈমানের নাম-গন্ধও বাকী থাকে না।

বুঝে থাকলে বলুন তো! এমন কোন নামধারী মুসলমান আছে কি– যারা বলে সুদের কারবার হারাম হবে কেন? আছে। এদের মত কি আল্লাহর মতে, না নিজের মতে? নিজের মতে মত। এদের কি আল্লাহর পথে পথ, না নিজের পথে পথ? নিজের পথে পথ। এদের কি আল্লাহর কথায় কথা, না নিজের কথায় কথা? নিজের কথায় কথা। এরাও মুসলমান? ভালো করে বুঝা দরকার মুসলমান কাকে বলে? হযরত ইবরাহীম আ. এবং হযরত ইসমাঈল আ. যে দু'আ করেছিলেন-

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

হে আল্লাহ! আমি ইবরাহীমকে মুসলিমরূপে গ্রহণ কর, আমার ছেলে ইসমাঈলকে মুসলিমরূপে গ্রহণ কর।

মুসলিম কাকে বলে? যেই ব্যক্তি আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত। তার মতে মত নয় আল্লাহর মতে মত, তার পথে পথ নয় আল্লাহর পথে পথ, তার কথায় কথা নয় আল্লাহর কথায় কথা সেই বিষয়টা যারা

গ্রহণ করতে রাজী, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাদেরকে নাম দিয়েছেন মুসলমান।

বুঝে থাকলে বলুন তো! আমাদের সমাজে যারা মুসলমান হওয়ার দাবীদার আছে, তাদের সবাই কি মুসলমান? সুদের কারবারকে যারা বৈধ করার চেষ্টা করে তারা মুসলমান, না অমুসলমান? তাদের অন্তরে ঈমানের গন্ধও বাকী নেই। এই জন্য চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে। সুদের কারবারকে যারা বৈধ প্রমাণের চেষ্টা করে তারা কত দিনের জন্য জাহান্নামে যাবে? চিরকালের জন্য। চিরকালের জন্য জাহান্নামে যায় ঈমানের লেশমাত্র বাকী থাকলে, না সম্পূর্ণ বেঈমান হলে? সম্পূর্ণ বেঈমান হলে চিরকালের জন্য জাহান্নামে যায়।

আল্লাহ বলেন, যারা সুদের কারবারকে বৈধ করার চেষ্টা করবে, তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে। কেননা তাদের অন্তরে ঈমানের গন্ধও বাকী নেই। ঈমানের লেশমাত্র বাকী নেই। এমন সুদের কারবারী যদি বলে, আমি মুসলমান। সে কি সত্যিই মুসলমান, না দাবীদার মুসলমান? দাবীদার মুসলমান। বুঝে থাকলে বলুন, আমাদের সমাজে সত্যিকারের মুসলমান বেশি, না দাবীদার মুসলমান বেশি? দাবীদার মুসলমান বেশী। এ সমস্ত দাবীদার মুসলমান নামে রয়েছে মুসলমান আর কাজ-কর্মে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের গোলামে পরিণত হয়ে গিয়েছে। ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম হয়ে গিয়েছে বর্তমান মুসলমান।

বাংলাদেশের মুসলমানও ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলামী করে, পাকিস্তানের মুসলমানও ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলামী করে, ইরানের মুসলমান ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলামী করে, ইরাকের মুসলমান ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলামী করে। সৌদি আরবের মুসলমান ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলামী করে, সারা বিশ্বের অর্ধশত দেশের মুসলমান ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলামী করে। কোন না কোন পর্যায়ে তারা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলামে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বর্তমান দুনিয়ার ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান নারী-পুরুষের মধ্যকার পর্দার পক্ষপাতী, না বিরোধী? বিরোধী। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন নারী-পুরুষের মধ্যকার পর্দা বিধান দিয়েছেন। পর্দার বিধান

পালন করা মুসলমানের কাজ। কি বলেন আপনারা? পর্দার বিধান দিয়েছেন আল্লাহ পবিত্র কুরআনে। পালন করা কার কাজ? মুসলমানের। কোন নামধারী মুসলমান যদি বলে পর্দার দ্বারা নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, আছে কি এমন মুসলমান? আছে। পর্দার কারণে নারীর অধিকার খর্ব হয়। পর্দার কারণে নারীর অধিকার খর্ব হয়, এই কথা যদি বলে, তাহলে সে আল্লাহর গোলাম, না ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম? ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম। বুঝে থাকলে বলুন তো এবার! বাংলাদেশে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম আছে কি নেই? আছে।

পাকিস্তানে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম আছে কি নেই?

আছে।

ইরানে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম আছে কি নেই?

আছে। ইরাকে ইয়াহুদী- খ্রিষ্টানের গোলাম আছে কি নেই?

আছে।

সৌদি আরবে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম আছে কি নেই?

আছে।

ইয়ামানে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম আছে কি নেই?

আছে।

সমস্ত মুসলিম দেশে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের গোলাম আছে কি নেই?

আছে।

গোলামী করবে ইয়াহুদী খ্রিষ্টানের আর দাবী করবে মুসলমান, আল্লাহর বান্দা হওয়ার।

হে মুসলমান! মুসলমানী কাকে বলে ভালো করে বুঝে রেখো। হযরত ইবরাহীম আ. এর মত পয়গাম্বর পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন—

হে আল্লাহ! আমাকে মুসলিমরূপে গ্রহণ করো। হযরত ইসমাঈল আ.-এর মত পয়গাম্বর পর্যন্ত দু'আ করেছেন —

হে আল্লাহ! আমাকে মুসলিম হিসেবে কবুল করো।

ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের তাঁবেদার মুসলমানী নয়। ইসলাম ধর্ম কেমন করে সারা বিশ্বে বিজয়ী হতে পারে, তার রূপরেখা হল, আমার মূল আলোচ্য বিষয়। কিন্তু কেন হচ্ছে না? না-হওয়ার যত কারণ আছে— এর প্রধান কারণ

হচ্ছে, ইসলামের বিশ্ব বিজয় সাধিত হবে, ইসলাম বিশ্ব বিজয়ী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে,

মুনাফিকের হাতে?

বেদ্বীনের হাতে? কাফিরের হাতে?

ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের হাতে? না সাচ্চা মুসলমানের হাতে?

সাচ্চা মুসলমানের হাতে। ইসলামের বিশ্ববিজয় সাধিত হবে সাচ্চা মুসলমানের হাতে।

বর্তমান দুনিয়াতে সাচ্চা মুসলমান কোথায়?

নাম ধরে মুসলমান আর সমাজনীতি ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান থেকে আমদানী করে,

অর্থনীতি ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান থেকে আমদানী করে আর নাম ধারণ করে আমরা মুসলমান।

এই জাতীয় মুনাফিক মুসলমানের হাতে কখনও ইসলামের বিশ্ববিজয় সাধিত হবে না।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সঙ্গী-সাথী মুসলমান সাহাবায়ে কিরাম যেই আদর্শ বিশ্ব মুসলমানের জন্য রেখে গিয়েছিলেন, যেদিন মুসলিম দুনিয়ার মুসলমান সেই আদর্শে রঙিন হতে পারবে, সেদিন ইসলামের বিশ্ববিজয় সাধিত হবে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের আদর্শে আদর্শবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। সবাই বলুন আমীন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

মাওয়ায়েজে হাসানাহ

খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,

তরজমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত

মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান—১

কিয়ামতের বিভীষিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَ اِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, হযরাত উলামায়ে কেরাম,
সম্মানিত সুধী সমাজ।

আল্লাহ্‌পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালাম সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব কুরআন শরীফ সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর নাযিল করেছেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে পথপ্রদর্শন করার জন্য। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন কুরআনের কয়েক হাজার আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে পথপ্রদর্শন করেছেন একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দিয়ে।

এই কুরআনের সর্বমোট আয়াত সংখ্যা এক গণনা মতে ৬২৩৬ টি। এর মাঝে ৫০০ আয়াতে আল্লাহ্ বিধি বিধান দিয়েছেন। কোন কাজ হালাল, কোন কাজ হারাম; মানুষের দুনিয়ার জীবনে কোন কাজ জায়েয আর কোন

কাজ নাজায়েয, কোন কাজ বৈধ আর কোন কাজ অবৈধ, কোন কাজ করণীয় আর কোন কাজ বর্জনীয় এর নাম বিধি-বিধান। এই বিধি-বিধানের বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহ্ ৫০০ আয়াতে।

আর বাকী ৫৭৩৬ আয়াতে কোন বিধি- বিধানের বিরবণ নেই। ৫৭৩৬ আয়াতে আছে শুধু ওয়াজ-নসিহত। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের প্রায় ১৩ ভাগের এক ভাগে বিধি-বিধান দিয়েছেন আর ১২ ভাগে করেছেন নসিহত। আল্লাহ্র এই ছয় সহস্রাধিক আয়াতে তিনটি পদ্ধতিতে নসিহত করেছেন।

একটা পদ্ধতির নাম تَذْكِيْر بِآلَاءِ اللّٰه

আরেক পদ্ধতির নাম تَذْكِيْر بِاَيَّامِ اللّٰه

আরেকটা পদ্ধতির নাম تَذْكِيْر بِمَا بَعْدَ الْمَوْت

বাংলা ভাষার আল্লাহ্র কুদরাতের বিবরণ দিয়ে ওয়াজ, অতীতের ঘটনার বিরবণ দিয়ে ওয়াজ, আর পরকালের বিবরণ দিয়ে ওয়াজ। ছয় সহস্রাধিক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ৩টি পদ্ধতিতে মানুষকে ওয়াজ করেছেন। হিদায়াতের জন্য, শান্তি ও মুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য।

এই তিন পদ্ধতির তৃতীয় পদ্ধতি আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হল ছয় হাজার আয়াতে যদি তিন পদ্ধতিতে ওয়াজ করা হয়, তাহলে গড়ে একেক পদ্ধতিকে কত আয়াত হয়? দুই হাজার। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের প্রায় দুই হাজার আয়াতে আল্লাহ্ পরকালের বিবরণ দিয়েছেন।

সেই বিরবণ হল আমার আলোচ্য বিষয় সূরায়ে ক্বারিয়াহ্ অবলম্বনে। অথচ সূরায়ে ক্বারিয়াহ্তে মাত্র আছে ১১ আয়াত। এই ১১ আয়াতে কিয়ামতের বিবরণ সীমাবদ্ধ নয়। কুরআন শরীফের প্রায় দুই হাজার আয়াতে আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের বিবরণ দিয়েছেন।

কাজেই সূরায়ে কারিয়াহ্ এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনুবাদ এবং মর্মার্থ বলে দিলেই কিয়ামত সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা কঠিন হবে। এজন্য আমি সূরায়ে কারিয়াহ্ অবলম্বনে আরো যে সমস্ত আয়াতে কিয়ামতের বিবরণ আছে, এর একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। যেন কিয়ামত সম্পর্কে আপনাদের সংক্ষিপ্ত হলেও আগাগোড়া স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতপক্ষে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের ভয় যাদের অন্তরে থাকে, তাদের পক্ষেই দুনিয়ায় সৎপথে চলা ন্যায়পথে চলা সম্ভব। কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের ভয় যাদের অন্তরে থাকে না, তাদের পক্ষে দুনিয়ায় সৎপথে চলা সম্ভব নয়।

এ সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বের সম্প্রতিক একটা উদাহরণ পেশ করছি। বাংলাদেশের ১৫ কোটি মুসলমানের মাঝে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে একটা সংস্থা বছরের পর বছর কাজ করে চলেছে। সংস্থার নাম খ্রিষ্টান মিশনারী। খ্রিষ্টান মিশনারী সংস্থার পক্ষ থেকে শত শত বই পুস্তক লিখা হচ্ছে শুধু বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর জন্য।

এ সকল বইয়ের মাঝে একটি বই 'কুরআনের আলোকে জান্নাতে যাওয়ার পথ'। বইয়ের নাম থেকে একজন সাধারণ মানুষ মনে করবে বইটি হয়তো কোন আলেম লিখেছেন।

আসলে এখানে কুরআনের আলোকে বলতে কিছু নেই, জান্নাত বলতে কিছু নেই। এখানে শুধু বর্তমান দুনিয়ার খ্রিষ্টানদের মনগড়া কিছু কল্পনা-কাহিনী আছে,যে কল্পনা-কাহিনীতে তাদের জান্নাতে যাওয়ার 'খেয়ালী পোলাও' আবিষ্কার করেছে।

এই 'কুরআনের আলোকে জান্নাতে যাওয়ার পথ' বইয়ে খ্রিষ্টানরা লিখেছে হযরত ঈসা আ. কে যারা আল্লাহ্র পুত্র বিশ্বাস করবে তারা দুনিয়াতে যত অপরাধ করুক না কেন, সমস্ত অপরাধের কাফফারা দেওয়ার জন্য হযরত ঈসা আ. স্বেচ্ছায় শূলীবিদ্ধ হয়ে মরণ গ্রহণ করেছেন।

শূলীবিদ্ধ হয়ে তার মরতে যে কষ্ট হয়েছে, এই কষ্টটা তিনি ঐ সমস্ত লোকের পাপের কাফফারা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যারা তাকে আল্লাহ্র পুত্র হিসাবে গ্রহণ করবে, তারা দুনিয়াতে যত অপরাধ করুক সবগুলো অপরাধের অগ্রিম কাফফারা দিয়ে ফেলেছেন।

সুতরাং বর্তমান দুনিয়াতে যত খ্রিষ্টান আছে, এদের পরকালে হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ভয় অন্তরে নেই। পরকালে হাশরের ময়দানে বর্তমান দুনিয়ার খৃষ্টানদের হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ভয় নেই কেন? তাদের ধর্মবিশ্বাস– আমরা যত পাপ করি না কেন, দুনিয়াতে যত অপরাধ করি না কেন, দুনিয়াতে এগুলোর অগ্রিম কাফফারা আল্লাহ্র নবী দিয়ে গেছেন।

সুতরাং হাশরের ময়দানে আমাদের কোন ভয় নেই। এজন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ জেনে-শুনেই ইরাকে হামলা করার মত জঘন্যতম অপরাধ করেছে। বুশের বাহিনীর ইরাক আক্রমণ করা একটা জঘন্যতম অপরাধ। এটা বুঝার মত বিবেক বুশের নেই তা নয়, ভাল করেই বুঝে এটা অপরাধ।

জেনে-শুনে এ অপরাধ করল কেন? কারণ, তাদের ধর্মবিশ্বাস– আমরা যত অপরাধই করি না কেন, আমাদের নবী এর কাফফারা দিয়ে গেছেন। অতএব, হাশরের ময়দানে জবাবদিহির কোন ভয় নেই।

এই উদাহরণটা এজন্য পেশ করলাম, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন দুনিয়াতে অপরাধের পথ বেছে নেয় কারা, হাশরের মাঠের হিসাব-নিকাশের ভয় করে না যারা। যারা হাশরের মাঠের হিসাব-নিকাশের ভয় করে, তারা দুনিয়াতে অপরাধের পথ অবলম্বন করতে পারে না। এজন্য আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন এক আয়াতে বলেন–

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (المؤمنون/١١٥)

" হে মানুষেরা তোমরা কি মনে করেছ আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি?"

বৃথা সৃষ্টি করি নি তোমাদেরকে বরং আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার বিধান পালন করার জন্য, হালাল-হারাম বুঝে চলার জন্য। কাজেই তোমরা দুনিয়াতে কে হালাল-হারামের বিধান পালন করেছ, আর কে হালাল-হারামের বিধান পালন কর নি– এর হিসাব দেওয়ার জন্য আমার কাছে আসবে না, এটা মনে কর না। অবশ্যই একদিন তোমাকে আল্লাহ্র দরবারে হাজিরা দিতে হবে, হালাল পথে জীবন যাপন করেছ নাকি হারাম পথে জীবন যাপন করেছ সেই হিসাব দিতে হবে।

হাদীস শরীফে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, হাশরের মাঠে একটি আদম সন্তানও ততক্ষণ পর্যন্ত স্থানান্তরিত হতে পারবে না; নড়াচড়া করতে পারবে না, সস্থানে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে– যতক্ষণ না তাকে পাঁচটা বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।

হাশরের মাঠে ৫টি প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত কোন নড়াচড়া করতে পারবে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। মুফাসসিরীনে কেরাম তাফসীরের কিতাবে লিখেছেন দু'পায়ে দাঁড়াতে পায়ের তালুর যে

পরিমাণ জায়গা হয় এর চেয়ে বেশী জায়গা পাবে না হাশরের মাঠে দাঁড়ানোর। দু'পায়ের তালুর নিচে দুই ফুটের বেশী জায়গা পাবে না। এই হল হাশরের মাঠে দাঁড়ানোর জায়গার পরিমাণ। সময়ের পরিমাণ কত? এর বিবরণ আল্লাহ্ পরিষ্কার ভাষায় কুরআনে নিজেই বলেন–

يَوْمًا كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ (معارج/٤)

"দুনিয়ার সময়ের পঞ্চাশ হাজার বছরে যে পরিমাণ সময় হয়, হাশরের মাঠে একদিন হবে সেই পরিমাণ সময়। হাশরের মাঠে এক দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

আপনাদেরকে যদি বলা হত এই মাঠে ৭ ঘণ্টা তাফসীর শুনবেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে– এটা কি আপনাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হত না? অবশ্যই হত। ৭ ঘণ্টা এক জায়গায় দাঁড়াতে যদি এত কষ্ট হয়, তা হলে ৫০ হাজার বছর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা কি পরিমাণ মারাত্মক কষ্ট হবে, তা আপনারা অনুমাণ করলে আশা করি বুঝতে পারবেন।

তারপর আবার হাদীস শরীফে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আকাশের সূর্যের যে পরিমাণ হিট আছে, তাপ আছে (লণ্ডনের এক জায়গায় 'সূর্যের তাপ' বলেছিলাম, ওয়াজের পর একজন জিজ্ঞেস করল সূর্যের গায়ে কি জ্বর আছে? আমি বললাম, না। বলে আপনি তো বললেন– 'সূর্যের তাপ'।

আমি বললাম, 'তাপ বাংলাভাষায় 'হিট'কে বুঝায়। বলে হিট বলবেন 'তাপ' বলবেন কেন? তা আপনারা যদি এ রকম প্রশ্ন না করেন, তা হলে আমি 'তাপ' বলব, আর যদি প্রশ্ন করেন তাহলে 'হিট' বলব)

আল্লাহ্র রাসূল বলেন বর্তমান দুনিয়ায় সূর্যের যে পরিমাণ তাপ আছে, এর চেয়ে সত্তর গুণ তাপ বাড়িয়ে দিয়ে হাশরের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের মাথার আধা হাত উপরে রাখা হবে। কি পরিমাণ তাপ দিয়ে? সত্তর গুণ তাপ বাড়িয়ে দিয়ে।

বর্তমান সূর্য আমাদের মাথা থেকে যতদূরে আছে ততদূরে থাকবে নাকি মাথা থেকে ৯ ইঞ্চি উপরে। ৯ ইঞ্চি উপরে। বিজ্ঞানীরা বলেন, সূর্যটা পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে আছে। সেই ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরের সূর্য হাশরের মাঠের মানুষের মাথার আধা হাত উপরে রাখা

হবে। হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, হাশরের মাঠে মানুষ দাঁড়াবে উলঙ্গ অবস্থায়।

হযরত আয়শা সিদ্দিকা রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে আল্লাহ্‌র রাসূল! সারা দুনিয়ার সর্বযুগের সকল নারী-পুরুষ উলঙ্গ অবস্থায় একের সামনে অপরে দাঁড়াবে –এটা তো লজ্জার কথাঐ

জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! হাশরের মাঠে ভয়াবহ পরিস্থিতি এমন হবে যে, ভয়াবহতার কারণে ভয়ে ভীত হয়ে লোকেরা 'হা' করে যে উপরের দিকে তাকাবে পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত নিচের দিকে তাকানোর সাহস পাবে না।

সুতরাং কে নারী আর কে পুরুষ, কে কাপড় পড়া আর কে উলঙ্গ– সেই চিন্তা করার অবকাশ কোথায়? এই পরিস্থিতিতে পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সকলকে নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে উলঙ্গ অবস্থায় উত্তপ্ত সূর্যের ৯ ইঞ্চি নিচে পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত। এমতাবস্থায় বেদ্বীন কাফেরদের মনের ভাষা হবে হাশরের মাঠের কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না।

যদি বিচার কাজটা সমাধা হয়ে যেত, জান্নাতে যাই আর জাহান্নামে যাই সেই চিন্তা পরে করতাম। মুমিন মুসলমানদেরও মনের আকাঙ্খা হবে, হাশরের মাঠের বিচার কাজ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত তো জান্নাতে প্রবেশের অনুমতিই পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং মুমিনরাও চায় হাশরের মাঠের বিচার কাজ সমাধা হয়ে যাক।

বেঈমান কাফেরদের আকাঙ্খা হাশরের মাঠের বিচারকার্য সমাধা হয়ে যাক। তাই তারা প্রথমে হযরত আদম আ. কে অনুরোধ করবে, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করুন; যারা জান্নাতে যাওয়ার যাবে আর যারা জাহান্নামে যাওয়ার যাবে, কিন্তু হাশরের মাঠের বিচার কার্যটা যেন আল্লাহ্ সমাধা করে নেন।

আদম আ. বলবেন, আমার সাহস নেই। আমি যদি তোমাদের বিচার শুরু করার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করতে যাই আর আল্লাহ্ যদি বলেন, ওহে আদম! তোমার সন্তানদের বিচার শুরুর সুপারিশ করবে পরে; আগে বলো তোমাকে জান্নাতে দিয়ে যে বলেছিলাম, নিষিদ্ধ গাছের ফল

খেয়ো না, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সেই ফল খেয়েছিলে কেন? তখন তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করব, না আমার প্রশ্নের জবাব দিব। কাজেই আমার সাহস হচ্ছে না।

হযরত নূহ আ. এর কাছে তারা বলবে, কিন্তু তিনিও বলবেন আমার সাহস নেই। হযরত ইবরাহীম আ.-এর কাছে অনুরোধ করবে আল্লাহ্‌র নিকট হাশরের মাঠের বিচারকার্য সমাধা করার সুপারিশ করার জন্য।

তিনিও বলবেন, আমার সাহস নেই। হযরত মূসা আ. এর কাছে অনুরোধ করবে আল্লাহ্ হাশরের মাঠের বিচারের কার্যটা যেন সমাধা করে দেন, সেই সুপারিশ করার জন্য।

মূসা আ. ও বলবেন, আমার সাহস নেই। হযরত ঈসা আ. কে বলবে। তিনিও বলবেন- আমার সাহস নেই। আপনারা কী মনে করেন, কেমন ভয়াবহ হলে আল্লাহ্‌র কাছে বিচারকার্য শুরুর সুপারিশ করার সাহস হবে না কোনো নবী রাসূলের। পরিস্থিতি কত ভয়াবহ হবে।

তবে হযরত ঈসা আ. একটা পরামর্শ দেবেন। বলবেন, আল্লাহ্ কোন নবীর সুপারিশে বিচারকার্য শুরু করবেন না একমাত্র আখেরী জামানার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুপারিশ ছাড়া।

সুতরাং তোমরা যদি সুপারিশের জন্য অনুরোধ করতে চাও, তা হলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র দরবারে অনুরোধ জানাও। তাই হযরত ঈসা আ. এর পরামর্শক্রমে হাশরের মাঠের লোকেরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে অনুরোধ জানাবে।

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের অনুরোধ রক্ষা করবেন। তবে বলবেন, তোমরা একটু অপেক্ষা করো আমি আল্লাহ্‌র কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে নেই। আমি সুপারিশ করলে তিনি কবুল করবেন কিনা? কারণ, কুরআন হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত আছে,

হাশরের মাঠে কোন লোক নিজের অধিকার বলে নিজের মর্যাদা বলে আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করতে পারবে না। আল্লাহ্ যাকে যখন যে ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন, শুধু তিনিই তখন ঐ ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারবেন। এর বাইরে সুপারিশ করার কোনো অধিকার মানুষকে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন দেবেন না। এই কথাটা আমাদের সমাজের

অনেক মুসলমানের জানা না-থাকার কারণে মুসলমানেরা বেপরোয়াভাবে গুনাহ্ করে খ্রিষ্টানদের মতো। আর বলে, 'আমি গোনাহ্গার নবী আছেন সুপারিশগার'।

যেমনভাবে বর্তমান সময়ের বুশ বলে আমি সারা দুনিয়ার সন্ত্রাস চালাব যীশু আমার কাফফারা দিয়ে গেছেন। সন্ত্রাস চালাতে ভয়ের কোন কারণ নেই। এ রকম কিছু মুসলমান আছে বেপরোয়াভাবে যারা গুনাহ্ করে আর বলে 'আমি গুণাহ্গার নবী আছেন সুপারিশগার'।

আল্লাহ্ কি নবীকে এই রকম সুপারিশগার বানিয়েছেন যে, তুমি ইচ্ছামত যাই মনে চায় গোনাহ্ করবে আর নবী তোমাকে সুপারিশ করে বেহেশতে সাথে করে নিয়ে যাবেন। এ ধরনের সুপারিশের সিসটেম আল্লাহ্র দরবারে নেই। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন হাশরের ময়দানে যখন যাকে যে ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন, শুধু তিনি তখন সেই ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারবেন। এর বেশী নয়।

এজন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাশরের মাঠে মানুষদের বলবেন, তোমরা অপেক্ষা করো; আমি আল্লাহ্র দরবারে অনুমতি প্রার্থনা করে নেই যে, এখনই সুপারিশ করলে তিনি কবুল করবেন কি না।

এই বলে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'মাকামে মাহমূদ' নামক একটা মর্যাদাসম্পন্ন জায়গায় যে জায়গাটা আল্লাহ্ কোন নবী-রাসূলকে দান করেননি, একমাত্র আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য রিজার্ভ রেখেছেন। সেই মাকামে মাহমূদে গিয়ে আল্লাহ্র দরবারে এত কাকুতি-মিনতি করবেন, এত কান্নাকাটি করবেন আর আল্লাহ্র এত তাছবীহ পড়বেন, এত গুণগান গাইবেন যে সারা দুনিয়ার মাখলুকাত মিলেও এ পরিমাণ করতে পারে নি।

তখন আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন আমাদের নবীকে বলবেন–

يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ

"হে মুহাম্মদ! কেন আপনি এতো কাকুতি-মিনতি করছেন? কেন আপনি এত আহাজারি করছেন, আপনি মাথা মুবারক উঠান। আপনি কি বলতে চান বলুন। আমি রক্ষা করব। আপনি সুপারিশ করতে চাইলে করুন। আমি তা কবুল করব।

তখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা থেকে মাথা মুবারক উঠিয়ে বলবেন, আল্লাহ্ হাশরের মাঠের মানুষের বিচার কার্যটা সমাধা করে দিন, যারা জান্নাতে যাওয়ার জান্নাতে চলে যাক, আর যারা জাহান্নামে যাওয়ার জাহান্নামে চলে যাক। হাশরের মাঠে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়।

এ আলোচনা দ্বারা আপনারা কি বুঝলেন, হাশরের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা কি স্বাভাবিক না অত্যন্ত ভয়াবহ? অত্যন্ত ভয়াবহ। এজন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
(المؤمنون/١١٥)

"তোমারা কি মনে করেছ খামোখা সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে? কখনও নয়। হে মানব জাতি! তোমাদেরকে আমি আল্লাহ্র হালাল-হারামের বিধান পালন করার জন্য সৃষ্টি করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছি।"

যথারীতি আল্লাহ্র বিধান পালনকে আল্লাহ্র ইবাদত বলা হয়। সারমর্ম হল, আমার ইবাদত করার জন্য তোমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছি। অতএব, তোমরা আমার ইবাদত করো না নিজের ইচ্ছেমত জীবন যাপন কর, এর জন্য একদিন আমার দরবারে হিসাব দিতে হবে, হাশরের মাঠে দাঁড়াতে হবে।

তোমরা একথা মনে করো না দুনিয়ার জীবন কোন পথে বিলীন করেছ, হিসাব দেওয়ার জন্য কোন দিন আমার সামনে দাঁড়াতে হবে না। কখনও তা মনে করো না। এজন্য বলেছিলাম, হাশরের মাঠের হিসাবের ভয় যারা অন্তরে রাখে তাদের পক্ষেই দুনিয়ার হালাল পথে চলা সম্ভব। যারা হাশরের মাঠের হিসাব দেওয়ার ভয় অন্তরে রাখে না, তাদের পক্ষে দুনিয়াতে হালাল পথে চলা সম্ভব হয় না।

তাই হাদীস শরীফে হযরত হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হাশরের মাঠে একটি আদম সন্তানও নড়াচড়া করতে পারবে না, ঠাই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত ৫টি প্রশ্নের জবাব না

দিবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। জায়গার পরিমাণ কতটুকু? দু'পায়ের তালুর নিচে পড়ে যত। সময়ের পরিমাণ কত?

পঞ্চাশ হাজার বছর। কেমন অবস্থায়? উলঙ্গ অবস্থায়। কেমন আবহাওয়ার মধ্যে? সত্তরগুণ তাপের সূর্যের আধহাত নিচে। যতক্ষণ পর্যন্ত ৫টি প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না ততক্ষণ পর্যন্ত নড়াচড়া করতে পারবে না।

আল্লাহ্র রাসূল বলেন, ৫টি প্রশ্নের

প্রথম প্রশ্ন হল: দুনিয়ার জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছ?

দুই নম্বর প্রশ্নঃ দুনিয়ার সম্পদ কিভাবে অর্জন করেছ?

তিন নম্বর প্রশ্ন হল: উপার্জিত সম্পদ হালাল পথে, না হারাম পথে ব্যয় করেছ?

চার নম্বর প্রশ্ন হল: যৌবনকাল কোন পথে ব্যয় করেছ?

পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হবে: হাশরের মাঠে, আল্লাহ্র হুকুম নবীর তরীকা যে পরিমাণ জানতে পেরেছ, তা কি পরিমাণ আমল করেছ?

এই পাঁচটি প্রশ্নের বিষয়বস্তু বুঝতে পারলে আপনি কি মনে করেন কোন কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমাকে আল্লাহ্র আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

দুনিয়ায় আমার জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছি, আল্লাহ্র কাছে জবাব দিতে হবে,

যৌবনকাল কোন কাজে ব্যয় করেছি আল্লাহ্র কাছে জবাব দিতে হবে, আমি দুনিয়াতে যত ধন-সম্পদ উপার্জন করেছি হালাল উপায়ে না হারাম উপায়ে, তা আল্লাহ্র কাছে জবাব দিতে হবে,

আমি দুনিয়াতে যত ধন-সম্পদ খরচ করেছি, তা হালাল কাজে না হারাম কাজে– আল্লাহ্র কাছে জবাব দিতে হবে,

আমি দুনিয়াতে আল্লাহ্র হুকুম নবীর তরীকা যেটুকু জানতে পেরেছি, তা আমল করেছি কিনা আল্লাহ্র কাজে জবাব দিতে হবে।

এসবের ভয় যাদের অন্তরে থাকে, শুধু তাদের পক্ষে দুনিয়াতে হালাল পথে জীবন যাপন সম্ভব হয়, এই কথার ভয় যাদের অন্তরে থাকে না, তাদের পক্ষে দুনিয়াতে হালাল পথে জীবন যাপন সম্ভব হয় না।

এবার বলুন! আমাদের সমাজে হারাম পথে চলে এমন মানুষ কি আছে? খুবই কম না বেশী? বেশী। হাশরের হিসাব-নিকাশের ভয় আছে অন্তরে? ভয় নেই। তাহলে বুঝতে পারলেন, কোন মুসলমান দুনিয়াতে বেপরোয়াভাবে হারাম পথে কখন চলে?

যখন হাশরের মাঠের হিসাব নিকাশের ভয় অন্তরে না থাকে, তখনই বেপরোয়াভাবে হারাম পথে চলে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তির অন্তরে হাশরের মাঠের হিসাব-নিকাশের ভয় অন্তরে থাকে, সেই ব্যক্তি দুনিয়াতে বেপরওয়াভাবে হারাম পথে জীবন-যাপন করতে পারে না।

এই কারণে বলেছিলাম, দুনিয়ার মানুষকে হালাল পথে পরিচালনা করার জন্য যত ওয়াজ করেছেন এর মাঝে পরকালের বিবরণ দিয়ে ওয়াজ করেছেন, পবিত্র কুরআনের প্রায় দুই হাজার আয়াতে।

পরকালের অবস্থা যদি তোমার বুঝে আসে, তখন গুরুত্ব হবে। অন্তরে হাশরের মাঠের ভয় থাকলেই তোমার পক্ষে হালাল পথে জীবন যাপন সম্ভব হবে।

এই রকমের বিপদজনক হাশরের মাঠের বিবরণ মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, তিনটা অবস্থা হবে সবচেয়ে ভয়াবহ। হাশরে মাঠে তিনটা অবস্থা এমন আছে যে তিন অবস্থায় নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত শুধু নিজের জান বাঁচানোর ফিকির করবেন; অন্য সমস্ত মানুষের ফিকির ভুলে যাবেন।

শুধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তিন বিপদের সময়ও আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করবেন–

আল্লাহ্! আমার উম্মতকে বাঁচাও!

আল্লাহ্! আমার উম্মতকে বাঁচাও!

আল্লাহ্! আমার উম্মতকে বাঁচাও!

হাশরের মাঠে যে তিন বিপদে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত সমস্ত নবী-রাসূল, পীর-বুযুর্গ, ওলী-আওলীয়া, আলেম-উলামা সবাই নিজের বিবি-বাচ্চা, আত্মীয়-স্বজনের ফিকির ছেড়ে শুধু নিজের জান বাঁচানোর ফিকির করবেন,

এই তিনটি বিপদ কি কি? আল্লাহ্ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। মুফাসসীরিনে কেরাম একত্র করে দিয়েছেন,

তিনটি বিপদ হাশরের মাঠে অত্যন্ত ভয়াবহ। যেই বিপদের সময় মানুষ নিজের মায়ের কথা ভুলে যাবে। যেই বিপদের সময় মানুষ নিজের স্বামীর কথা ভুলে যাবে। নিজের স্ত্রীর কথা ভুলে যাবে। নিজের কলিজার টুকরা সন্তানের কথা ভুলে যাবে। এ রকম তিনটি বিপদ আছে হাশরের ময়দানে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হাশরের মাঠে এই তিন বিপদে পিতা-পুত্রের অবস্থা কেমন হবে। একটা নেকীর অভাবে এক পিতার জাহান্নামে যাওয়া সাব্যস্ত হবে। তোমার একটা নেকী কম উপযুক্ত তাই তোমাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

সে বলবে, হে আল্লাহ্! আমার তো অনেক আত্মীয় স্বজন ছিল দুনিয়াতে। আমাকে সুযোগ দিন আমার কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে একটা নেকী আজ সংগ্রহ করতে পারি কিনা।

আল্লাহ্ বলবেন, ঠিক আছে। দেখো, তোমার কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে একটা নেকি সংগ্রহ করতে পারলে তুমি জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য সাব্যস্ত হবে। ঐ লোকটা তখন হাশরের মাঠে অনুসন্ধান চালিয়ে তার কলিজার টুকরা সন্তানকে বের করবে।

সে বলবে, তোমাকে দুনিয়াতে বহু কষ্ট করে লালন-পালন করেছি। নিজে না খেয়ে তোমাকে খাইয়েছি। নিজে দুঃখ-কষ্ট করে তোমাকে সুখ শান্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আজ আমি একটা নেকির জন্য বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। তুমি তোমার নেকি থেকে একটা নেকি দান কর। যেন আমি জাহান্নাম থেকে নাজাত পেতে পারি।

ছেলে জবাব দেবে, অবশ্যই আমি একজন পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করে দুনিয়াতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি কে? তোমাকে তো চিনি না। একটি নেকি তোমাকে দিয়ে দিলে আমার বিপদের সময় কি হবে?

ছেলে বলবে, তোমাকে চিনি না।

আপনারা কি মনে করেন হাশরের মাঠে কেমন বিপদের সময় পিতাকে পুত্র বলতে পারে তুমি কে? তোমাকে তো চিনি না।

বাবার কাছে যাবে এবং বলবে বাবা!

দুনিয়াতে বহু কষ্ট করে আমাকে লালন পালন করেছ, নিজে না খেয়ে আমাকে খাইয়েছ, নিজে কষ্ট স্বীকার করে আমাকে সুখ-শান্তি দেওয়ার

চেষ্টা করেছ। আজ আমি একটা নেকির জন্য বিপদগ্রস্ত হয়েছি। তোমার একটি নেকি দিয়ে আমাকে সাহায্য করো।

বাবা বলবে, দুনিয়াতে আমার ঘরে সন্তানাদি হয়েছিল ঠিক, কিন্তু তুমি কে? তোমাকে তো আমি চিনি না। তোমাকে যদি একটি নেকি দিয়ে দেই তাহলে আমার বিপদের সময় কি অবস্থা হবে? পুত্র যেভাবে বলেছিল- তোমাকে আমি চিনি না, ঠিক তেমনিভাবে বাবাও বলবে, তোমাকে আমি চিনি না।

আপনারা চিন্তা করুন, কি রকম বিপদ হলে পিতা পুত্রকে বলতে পারে "তোমাকে আমি চিনি না।" এই মর্মে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের আয়াতে বলেছেন–

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُغْنِيْهِ (عبس/٣٤-٣٧)

"সেদিন (কিয়ামতের দিন) ভাই ভাইকে দেখলে পলায়ন করবে। কিসের ভয়ে? ভাই যদি আমার ছাওয়াব নিতে চায়।"

সন্তান মা থেকে পলায়ন করবে। কিসের ভয়ে? মা যে দুনিয়াতে লালন পালন করেছিল, সে দাবীতে আমার ছাওয়াব যদি নিতে চায়। সেই ভয়ে মানুষ মা থেকে পলায়ন করবে, মাকে ভুলে যাবে। সন্তান বাবা থেকেও পলায়ন করবে। স্ত্রীকে দেখলে পলায়ন করবে। মা-বাবা সন্তানকে দেখলে পলায়ন করবে।

আপনারা বুঝুন কেমন ভয়াবহ পরিস্থিতি হলে সন্তান বাবা-মাকে দেখলে পলায়ন করে, মা-বাবা সন্তান থেকে পলায়ন করে, স্বামী স্ত্রী থেকে পলায়ন করে, স্ত্রী স্বামী থেকে পলায়ন করে, ভাই ভাই থেকে পলায়ন করে। মানুষ কত বড় ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পতিত হবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন–

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا

" কেমন করে বাঁচবে তোমরা যদি আল্লাহ্র নাফরমানী করো। যদি আল্লাহ্র অবাধ্য হও। তাহলে তোমরা কেমন করে বাঁচবে ঐ দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, যেদিনের ভয়াবহতা, যেদিনের চিন্তা, যেদিনের টেনশন

শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করে দেবে। শিশু বয়স্ক হয়ে যাবে। সেদিনের বিপদে পড়লে তোমরা বাঁচবে কেমন করে? অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَوْمَ يُوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ (معارج/١١)

"কিয়ামতের দিন নাফরমান অবাধ্য বান্দারা আল্লাহ্র কাছে আগ্রহ প্রকাশ করবে, হে আল্লাহ্! আমার কলিজার টুকরা সন্তানকে আমার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে জাহান্নামে দিয়ে আমাকে মুক্ত করে দাও। কি আন্দাজ করেন আপনারা? কেমন বিপদ? কত ভয়াবহ হলে বাবা বলতে পারে, আমার কলিজার টুকরা সন্তানকে জাহান্নামে দিয়ে এর বিনিময়ে আমাকে মুক্ত করে দাও! এভাবে সন্তানদের ব্যাপারে বলবে, এভাবে স্ত্রী স্বামীর ব্যাপারে বলবে। স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে বলবে। ভাই ভাইয়ের ব্যাপারে বলবে। কোন অবস্থায় যখন আল্লাহ্ কবুল করবেন না, তখন বলবেন–

وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ

"সমস্ত মানুষকে আমার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দাও। এদের বিনিময়ে আমাকে জাহান্নাম থেকে রেহাই দিয়ে দাও। আপনারা একটু চিন্তা করুন! কত বড় ভয়াবহ হলে এ রকম বলতে পারে। দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে মুক্তিপণ দিলাম তাদের সবাইকে জাহান্নামে দাও আর বিনিময়ে আমাকে নাজাত দাও।

আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন বলেন, كلا কখনও নয়। অন্য আয়াতে বলেন, لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى আল্লাহ্র বিচারে একের পাপের সাজা অপরকে দেওয়া হবে না।

একের সাজা অপরকে দেওয়া হবে না। অথচ বর্তমান দুনিয়ার খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস, সমস্ত খ্রিষ্টানদের পাপের সাজা তাদের নবীকে দেওয়া হয়েছে শূলিবিদ্ধ করে। এটা খ্রিষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাস তাদের নবীকে শূলিতে চড়িয়ে মৃত্যু দেওয়া হয়েছে উম্মতের পাপের সাজা হিসেবে, আর আল্লাহ্ বলেন, একের পাপের সাজা অপরকে দেওয়া হবে না। তাই হাদীস শরীফে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হাশরের মাঠে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে আয়শা যখন জিজ্ঞেস করলেন, ওগো আল্লাহ্র রাসূল! হাশরের মাঠে সারা দুনিয়ার সমস্ত নারী-পুরুষ একে অপরের পাশে

উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে– এতো লজ্জার কথা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ও আয়েশা! হাশরের মাঠের ভয়াবহ পরিস্থিতি এমন হবে যে, হা করে যে উপরের দিকে তাকাবে পঞ্চাশ হাজার বছরের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও নিচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার অবকাশ হবে না।

অতএব কে নারী আর কে পুরুষ, কে কাপড় পড়া আর কে উলঙ্গ তা চিন্তা করার সুযোগ কোথায়? এই বিপদের মাঝেও এত ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝেও তিনটা মুহূর্ত হবে সবচেয়ে ভয়াবহ। হাশরের মাঠে তিনটা সময় সবচেয়ে কঠিন। সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ সময়।

একটা হল আমলনামা হাতে দেওয়ার সময়।

আরেকটা হল আমলনামা ওজন করার সময়।

আরেকটা পুলছিরাত পার হওয়ার সময়।

এর মাঝে সূরাতুল কারিয়ায় শুধু আমলনামা ওজন করার সময়টা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন,

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ (القارعة/٦-١١)

সেদিন অর্থাৎ হাশরের দিন মিজানে ওজন করার সময় যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে সে সন্তুষ্টজনক জীবন ব্যবস্থা অর্থাৎ জান্নাতের অধিকারী হবে। আর যার নেকী যদি ওজনের সময় গুনাহের পাল্লা ভারি হবে, তার জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

এই সূরায় হাশরের মাঠের তিনটা কঠিন সময়ের মাঝে মিজানের পাল্লায় আমলনামা ওজন করার আলোচনা করেছেন। অন্যান্য আয়াতে আমলনামা হাতে দেওয়ার আলোচনা করেছেন; অন্যান্য আয়াতে পুলছিরাত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এজন্য বলেছিলাম, শুধু সূরায়ে কারিয়ার আয়াতগুলোর অর্থ ও মর্ম বলে দিলে অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাবে।

আমি হাশরের মাঠের তিনটা ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি। যেন হাশরের মাঠের ভয়াবহতা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা নিয়ে যেতে পারি।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলে দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষের সাথে আল্লাহ্ পাক বেশ কিছু ফিরিশতা নিয়োজিত করেছেন। এক একজন ফিরিশতার, এক এক রকম দায়িত্ব আছে।

প্রতিটি মানুষের ডান কাঁধে একজন ফিরিশতা আছেন, বাম কাঁধে একজন ফিরিশতা আছেন।

ডান কাঁধের ফিরিশতা তার ছাওয়াবের কাজগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখেন,

আর বাম কাঁধের ফিরিশতা তার গুনাহের কাজগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

সারা জীবন যত ছাওয়াবের কাজ করছে ডান কাঁধের ফিরিশতা লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। সারা জীবন যত গুনাহ্ করছে, বাম কাঁধের ফিরিশতা সব লিপিবদ্ধ করে রাখছেন।

হাশরের মাঠে তার নেক কাজের আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে। বেঈমান-কাফিরদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। যখন ঈমানদার নেককার ব্যক্তিদের হাতে তাদের ডান কাঁধে লিপিবদ্ধকারী ফিরিশতার লিপিবদ্ধ করা আমলনামা দেওয়া হবে।

সেই আমলনামায় লেখা থাকবে, তুমি বেঈমান-কাফিরদের মত চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে না।

এই লেখা দেখেই সে হাশরের মাঠে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকবে–

هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ

পরীক্ষায় যদি প্রথম ডিভিশনে পাশ করে– বাড়ীতে গিয়ে দুলাভাইকে খোঁজে, দাদাকে খোঁজে, নানাকে খোঁজে। কেন? প্রথম ডিভিশন পেয়েছি এসো মিষ্টি খাও।

ঠিক তেমনিভাবে হাশরের মাঠে যাদের আমলনামা ডান হাতে পাবে, আমলনামায় লেখা থাকবে বে-দ্বীন কাফিরের মত জাহান্নামে যেতে হবে না। সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে বলতে থাকবে–

এসো আমার আপনজন, দেখো আমলনামা, আল্লাহ আমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন আমি রিচকালের জন্য জহান্নামে যাব না। পক্ষান্তরে বেঈমান পাপীষ্ঠদের আমলনামা বাম কাঁধের ফিরিশতার লিখিত আমলনামা যখন

তার হাতে দেওয়া হবে প্রথমে তার ডান হাত বাড়াবে আমলনামা নেওয়ার জন্য।

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফিরিশতারা ডানহাতটা মুড়িয়ে তার কাঁধে বেঁধে দিবে। এই অবস্থায় সে আর ডানহাত বাড়াতে পারবে না। তারপর তার বাম হাতটা বুকের ভেতর ঢুকিয়ে পিট ছিদ্র করে পেছন দিকে বের করা হবে। ঐখানে তার আমলনামা দেওয়া হবে। বে-দ্বীন পাপীষ্ঠদের আমলনামা দেওয়া হবে সামনের দিকে, না পেছন দিকে? বাম হাত পেছন দিয়ে।

জানেন কিভাবে? বুক ছিদ্র করে পেছন দিকে বের করা হবে বাম হাত তারপর পিঠ ছিদ্র করে পেছন দিকে বের করা হবে বাম হাত। এভাবে তার আমলনামা দেওয়া হবে। এখন বাম হাতে আমলনামা পেছন দিকে দেওয়া হল, চেহারা সামনের দিকে রইল, দেখবে কিভাবে, এই জন্য ঘাড় মচকিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে তার চেহারাকে পেছন দিকে নিয়ে বলা হবে–

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا (الإسراء/١٤)

চেয়ে দেখ তোর আমলনামা, তোর ভাগ্য কেমন –এটা কোন ঘোষকের ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

এই আমলনামা দেখে তুই নিজেই বলতে পারবে তোর ফলাফল আজকে কেমন। সুতরাং আমলনামা ডান হাতে আসে না বাম হাতে আসে, আমলনামা দেওয়ার সময় প্রতিটি মানুষ নিজের স্ত্রীকে ভুলে যাবে, তাদের বাচ্চাকে ভুলে যাবে, নিজের পিতা-মাতাকে ভুলে যাবে, আত্মীয় স্বজনকে ভুলে যাবে। সারা জগতের সবাইকে ভুলে যাবে।

এমন অবস্থা হবে আমার আমলনামা ডান হাতে আসে না বাম হাতে আসে। আগে দেখা দরকার যদি ডান হাতে আমলনামা আসে, তারপরে চিন্তা করব আমার কে কোথায় আছে। যদি আমলনামা ডান হাতে না আসে, তাহলে স্ত্রীর চিন্তা করে আমার কোন লাভ নেই, বাচ্চার চিন্তা করে আমার কোন লাভ নেই, পিতা-মাতার চিন্তা করে আমার কোন লাভ নেই।

এজন্য মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, আমলনামা হাতে দেওয়ার সময় এত টেনশনযুক্ত হবে, এত চিন্তাগ্রস্ত হবে যে, নিজের আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোন পিতা-মাতাকে স্মরণ করার অবস্থা থাকবে না। এটা হল হাশরের মাঠের তিন বিপদের এক বিপদ।

যাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, আমলনামায় শুধু লেখা হবে চিরকালের জন্য জাহান্নামে যেতে হবে না। কিছু বা দীর্ঘকালের জন্য জাহান্নামে যেতে হবে কি না, সেটা এখন ফয়সালা হবে না; সেটা ফয়সালা হবে আমলনামা ওজনের দ্বারা।

চিরকালের জন্য জাহান্নামে যেতে হবে না –এটা ফয়সালা হল ডান হাতে আমলনামা দিয়ে। কিছু কালের বা দীর্ঘকালের জন্য জাহান্নামে যেতে হবে কি না, সেটা ফয়সালা হবে আমলনামা ওজন করার দ্বারা। কাজেই আমলনামা ওজন করার সময় হাশরের মাঠের দ্বিতীয় বিপদ।

এই দ্বিতীয় বিপদ আমলনামা ওজন করার সময়ও মানুষ নিজের স্ত্রীর কথা ভুলে যাবে, বাচ্চার কথা ভুলে যাবে, পিতা-মাতার কথা ভুলে যাবে, আত্মীয়-স্বজনের কথা ভুলে যাবে, সমস্ত জগতবাসীর কথা ভুলে যাবে, শুধু লক্ষ্য করবে তার নেকীর পাল্লা ভারী হয় কি না।

যদি ভারী হয় তাহলে আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে না ফয়সালা হবে, যদি আমার নেকীর পাল্লা ভারী না হয়, তা হলে আমি মুমিন হওয়া সত্ত্বেও, আমি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

অতএব আমার স্ত্রীর চিন্তা পরে করবো আগে দেখি আমার নেকীর পাল্লা ভারী হয় কিনা। অন্যদের চিন্তা পরে করবো। যদি আমার নেকীর পাল্লা ভারী না হয় তাহলে আমার অন্যদের চিন্তা করে কোন লাভ নেই। এই জন্য আমলনামা ওজন করার সময়ও অন্য সকলের কথা ভুলে যাবে। শুধু নিজের জান বাঁচানোর ফিকিরে লেগে যাবে।

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, কোনো কোনো মুমিন মুসলমানের আমলনামা ওজনই হবে না। বিনা হিসেবে তাদেরকে বেহেশতে দিয়ে দেওয়া হবে। আবার মুহাদ্দিসীনে কেরাম এই সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন- কোন ধরনের মুমিন মুসলমানদের বিনা হিসাবে বেহেশতে দেওয়া হবে যে সমস্ত মুমিন-মুসলমানের আমলনামায় শুধু ছাওয়াবই আছে, গুনাহ বলতে কিছুই নেই। তারা আবার দুই দল।

একদল যারা জীবনে কোন দিন গুনাহ্ করেই নি। আরেকদল গুনাহ্ করেছিল কিন্তু মাফের ব্যবস্থা হয়ে গেছে তাওবার দ্বারা, বিপদের দ্বারা, হজ্বের দ্বারা, রোগের দ্বারা, যে কোন উছিলায় তার গুণাহ্ মাফ হয়ে গেছে।

অতীতে গুনাহ্ করেছিল মৃত্যুর আগে তার আমলনামায় গুনাহ্ মুছে ফেলা হয়েছে।

এই ব্যক্তিও সম্পূর্ণ নেকী নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। তার কোন গুনাহ্ নেই। যারা দুনিয়াতে কোন দিন গুনাহ্ করেই নি তারা হলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম। আপনাদের ধারণা কি নবীগণ জীবনে কোনও গুনাহ্ করেছেন? নবীগণ জীবনে গুনাহ্ করেন নি।

আর উম্মতের মাঝে গুনাহ্ করার পর তাওবা করে তারা চিরকালের জন্য গুনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন আর মরণের আগে কোন দিন গুনাহে লিপ্ত হন নি আর এই অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে হাশরের মাঠে তাদেরও আমলনামায় দেখা যাবে শুধু ছাওয়াব আছে গুনাহ্ নেই।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম লিখেছেন, যাদের আমলনামায় শুধু ছাওয়াব আছে গুনাহ্ বলতেই নেই, তাদেরকে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন হাশরের ময়দানে বিনা হিসেবে বেহেশতে দিয়ে দেবেন। এই সুযোগটা আমাদের আছে কি? যত গুনাহ্ জীবনে করেছি আর যদি এই গুণাহের পথে না যাই এবং এই অবস্থায় মৃত্যু হয়ে যায়, তা হলে তো এই সুযোগটা আমাদেরও আছে।

এজন্য মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, বেদ্বীন কাফিরদের আমলনামা ওজন হবে একবার। মুমিন মুসলমানের আমলনামা ওজন হবে দু'বার। দ্বিতীয় দফায় কাফেরের কোন ওজনই হবে না। এই মর্মে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন এক আয়াতে বলেছেন–

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (الكهف/١٠٥)

যে ওজনের দ্বারা জান্নাতে যাবে, না জাহান্নামে যাবে, সেই ওজনই হবে না বেদ্বীন কাফিরদের। আল্লাহ্ বলেন, এদের জন্য কোন ওজনের ব্যবস্থাই করা হবে না বরং প্রথম দফায় ওজনের দ্বারাই এদের ফলাফল ঘোষণা করে দেওয়া হবে, তোমরা চিরকালের জন্য জাহান্নামী।

অতএব, তোমরা নামায পড়েছিলে কি না এই হিসাবের আর দরকার নেই, রোযা রেখেছিলে কিনা এই হিসাবের আর দরকার নেই, তোমরা চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাও। এখানে আমাদের গুরুত্বসহকারে দু'টি কথা বুঝার দরকার। একটা হল বেদ্বীন কাফেরদের আমলনামা ওজন

একবার হবে কেন? আরেকটা হল মুমিন-মুসলমানের আমলনামা দু'বার ওজন হবে কেন? সূরায়ে কারিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল আমলনামা ওজনের ব্যাপারে।

বেদ্বীন-কাফিররা সারা জীবন যত ভাল কাজ করেছে, নামায-রোযা তো করেই নি, যদি সমাজসেবামূলক কোন কাজ করে থাকে, যদি আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের মত কোন ভাল কাজ করে থাকে, তা হলে এ সমস্ত ভাল কাজের ছাওয়াব নেকীর পাল্লায় উঠানো হবে আর আল্লাহ্র দ্বীন যে বিশ্বাস করল না, আল্লাহ্র কিতাব যে বিশ্বাস করল না, আল্লাহ্কে যে বিশ্বাস করল না, আল্লাহ্র রাসূলকে যে বিশ্বাস করল না- এর একটা গুনাহ্ গুনাহের পাল্লায় উঠানো হবে, ওজন দেওয়া হবে।

ওজনে দেখা যাবে সারা জীবন জনসেবা করেছে, সারা জীবন ভর যত মানবসেবা করেছে, সারা জীবন যত আত্মীয়দের যত আদর-আপ্যায়ণ করেছে সবগুলো ছাওয়াবের পাল্লা হালকা হয়ে গেছে।

কালেমা বিশ্বাস না করার একটা গুনাহের পাল্লা ভারী হয়ে গেছে। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা নামায পড়েছিলে কি না? রোযা রেখেছিলে কিনা? এগুলো জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, ওজনেরও দরকার নেই; কালেমা বিশ্বাস না করে যে একটা গুনাহ্ করেছ একটা গুনাহের কারণেই তোমরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অতএব যারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী এদের আবার নামায পড়ল কি না, সেটা হিসেবের কি দরকার।

এই জন্য বেদ্বীন কাফেরদের আমলনামা ওজন হবে একবার; পক্ষান্তরে মুমিন মুসলমানের আমলনামা ওজন হবে দু'বার। প্রথম দফায় কালেমা বিশ্বাস করার একটা ছাওয়াব নেকীর পাল্লায় উঠানো হবে, আর জীবনভর যত নামায কাজা করেছে, যত রোযা কাযা করেছে, যত মিথ্যা কথা বলেছে, যত সুদ খেয়েছে, যত ঘুষ খেয়েছে, যত মদ খেয়েছে, যত গাঁজা খেয়েছে, যত খুনখারাবী করেছে, যত যিনা-ব্যভিচার করেছে, যত সন্ত্রাস করেছে- সবগুলো উঠানো হবে গুনাহের পাল্লায়।

ওজন দেওয়ার পর দেখা যাবে সারা জীবন যত নামায কাযা করেছিল, যত মিথ্যা কথা বলেছিলো, যত সুদ খেয়েছিল, যত ঘুষ খেয়েছিল, যত গাঁজা খেয়েছিল, যত চুরি করেছিল, যত হত্যা করেছিল, সবগুলো গুনাহের

পাল্লা পাতলা হয়ে গেছে। ঈমানের পাল্লা ভারী হয়ে গেছে। এই পর্যন্ত শুনে যদি কোন লোক চলে যায়, তা হলে তো শেষই, আর তো কোন দরকারই নেই। তা হলে দ্বিতীয় দফা ওজনের খবর নেবে কে?

এক হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা কালেমা বিশ্বাস করবে, তারা বেহেশতে যাবে। হযরত আবু যর এক সময় নবীর এই কথার প্রেক্ষাপটে নবীকে জিজ্ঞেস করলেন, وَاِنْ زَنَى وَاِنْ سَرَقَ কালেমা বিশ্বাসীরা যদি যিনাও করে কালেমা বিশ্বাসীরা যদি চুরিও করে তবুও কি বেহেশতে যাবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- হ্যাঁ, চুরিও যদি করে যিনাও যদি করে তবুও বহেশেতে যাবে। আবু যর আবার জিজ্ঞাসা করেন, وَاِنْ زَنَى وَاِنْ سَرَقَ কালেমা বিশ্বাসীরা যদি যিনাও করে, চুরিও করে, তবুও কি কালেমা বিশ্বাসীরা বেহেশতে যাবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি চুরিও করে যিনাও করে, তা হলেও কালেমা বিশ্বাসীরা বেহেশতে যাবে।

আবু যর আবার জিজ্ঞাসা করেন, وَاِنْ زَنَى وَاِنْ سَرَقَ আরে কালেমা বিশ্বাসীরা চুরি করলেও বেহেশতে যাবে না কি, কালেমা বিশ্বাসীরা যিনা করলেও বেহেশতে যাবে না কি? তৃতীয় বারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

وَاِنْ زَنَى وَاِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ اَنْفِ اَبِى ذَرٍّ

আবু যর! কালেমা বিশ্বাসীরা যিনা করেও বেহেশতে গেলে, কালেমা বিশ্বাসীরা চুরি করেও বেহেশতে গেলে যদি তোমার বেইজ্জতি অনুভব হয়, তুমি বেইজ্জত হতে পার, কিন্তু কালেমার বিশ্বাসী চোর হলেও, ব্যভিচারী হলেও বেহেশতে যাবেই যাবে।

এ ধরনের হাদীস শোনে যদি কোন লোক চলে যান, তা হলে ঠকে যাবেন। এক হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে এক জায়গায় বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি অন্য কোথাও চলে গেলেন।

অনেকক্ষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসছিলেন না। সাহাবায়ে কেরাম চিন্তিত হয়ে গেলেন। রাসূল গেলেন কোথায়, রাসূল

ফিরে আসছেন না কেন? সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের অনুসন্ধানে বের হলেন। অনুসন্ধান করতে করতে শেষ পর্যন্ত হযরত আবু হুরাইরা রাযি. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখলেন আল্লাহ্র ধ্যানে এক জায়গায় মুরাকাবা অবস্থায় আছেন।

পাওয়ার পরে বললেন, ওহে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে হারিয়ে আমরা চিন্তিত ছিলাম। আপনি কোথায় চলে গেলেন আমাদেরকে বললেন না, আপনার কত শত্রু আছে। কোনো রকম বিপদ হল কিনা, আমরা আপনার অনুসন্ধানে বের হয়েছি। আমরা বড়ই পেরেশান।

রাসূল বলেন, ওহে আবু হুরাইরা শোন! মুসলমানের পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই। যারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বিশ্বাস করবে তারাই বেহেশতে যাবে, আবু হুরাইরা তোমরা তো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বিশ্বাস করেছ। তোমরা তো জান্নাতে যাবে। যাও আমার পক্ষ থেকে মানুষদের ঘোষণা করে দাও– যারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ স্বীকার করবে তারাই বেহেশতে যাবে।

হযরত আবু হুরাইরা বললেন, ওহে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কি এত সহজ কথা! যারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ স্বীকার করবে তারাই বেহেশতে যাবে। চুরি করলেও বেহেশতে যাবে, যিনা করলেও বেহেশতে যাবে, নামায না পড়লেও বেহেশতে যাবে, বদমাইশী করলেও বেহেশতে যাবে, খুন-খারাবী করলেও বেহেশতে যাবে– এত সোজা কথা যদি আমি বলি, তা হলে কোন মুসলমান বিশ্বাস করবে না। এটা যে আপনি বলেছেন আর আপনার সাথে যে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে –এর একটা সনদ দিন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জুতা মুবারক হযরত আবু হুরায়রার হাতে উঠিয়ে দিলেন, তোমার যদি আমার সাথে সাক্ষাৎ না-হত তা হলে আমার জুতা পেলে কোথায়? আমার জুতা দেখিয়ে বলবে এই জুতা হলো আমার সনদ, রাসূলের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি ঘোষণা করতে বলেছেন, যার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বিশ্বাস করবে, তারা অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করবে। হযরত আবু হুরাইরা রাসূলের নিকট থেকে বের হলেন আর রাস্তায় যে মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হয় তাকে জুতা দেখিয়ে বলেন, এই দেখো আমার সনদ, রাসূলের সাথে আমার সাক্ষাৎ

হয়েছে। তিনি বলেছেন, এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য যারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বিশ্বাস করে তারাই বেহেশতে যাবে, যারাই لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বিশ্বাস করে তারাই বেহেশতে যাবে। যেতে যেতে হযরত উমরের সাথে সাক্ষাৎ।

উমরের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর আবু হুরাইরা বললেন, রাসূলের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি জুতা দিয়েছেন সনদ হিসেবে আমার হাতে, আমার যে সাক্ষাৎ হয়েছে তার প্রমাণ। আর তিনি বলেছেন, আমি একথার ঘোষণা দেওয়ার জন্য যারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বিশ্বাস করবে তারাই বেহেশতে যাবে।

হযরত উমর একথার সাথে সাথে আবু হুরাইরার বুকে এমন জোড়ে ধাক্কা মারলেন, চিৎ করে ফেলে দিলেন মাটিতে। আবু হুরাইরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। রাসূলের কথা ঘোষণা দিলাম আর উমর আমাকে মারলেন? এর বিচার দেওয়ার জন্য আবার চললেন রাসূলের নিকট। আর হযরত উমরও সাথে সাথে চললেন আবু হুরাইরার।

আর আবু হুরাইরার যেহেতু রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাই আবু হুরাইরার সাথে সাথে গেলে রাসূলকে পাওয়া যাবে। উমর গেলেন আবু হুরাইরা কেন এ ঘোষণা দিল সেই কথার বিচার দেওয়ার জন্য, আর আবু হুরাইরা গেলেন এ কথার বিচার দেওয়ার জন্য যে আমি আপনার কথার ঘোষণা দিলাম আর উমর কেন আমাকে বুকে ঘুষি মেরে মাটিতে চিৎ করে ফেলে দিলেন?

(এরপর পরবর্তী কিস্তিতে)

মাওয়ায়েজে হাসানাহ

খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,

তরজমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত

মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান—১

মুসলমানের ঘরে আগুন

স্থান

বাথুরা মাদ্‌রাসা ময়দান

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

মুহাতারাম হাজিরিন, হযরত উলামায়ে কিরাম,
সম্মানিত সুধী সমাজ, এলাকার সর্বস্তরের
মুসলমান ভাইসব ও পর্দানশীন মা-বোনেরা!

বাথুরা মাদ্‌রাসার উদ্যোগে আয়োজিত এই মোবারক সমাবেশে আমরা একত্রিত হয়েছি। তাই মাদ্‌রাসা শিক্ষা সম্পর্কে আপনাদের সামনে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আমি আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম থেকে একটি আয়াত এবং হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি সংক্ষিপ্ত হাদীস তিলাওয়াত করেছি।

হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর ছেলে ইসমাইল আ.-কে নিয়ে আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে কাবা ঘরের পনুঃনির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার পর আল্লাহ্‌র কাছে কতগুলো দু'আ করেছিলেন, এর মাঝে একটা দু'আ তিলাওয়াতকৃত আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে,

"হে আল্লাহ্ একজন রাসূল যেন আমি ইবরাহীম এবং আমার ছেলে ইসমাইলের আওলাদে জন্মগ্রহণ করে। আর সেই নবী চারটা দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যেন উম্মতকে হিদায়াত করে।

দু'আর শেষের এই দু'টি কথা; একটি কথা হল, শেষ নবী হযরত ইবরাহীম এবং তার ছেলে ইসমাইলের আওলাদে জন্ম দিয়ে পাঠাবে। আরেকটি কথা হল, এই চার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে উম্মতকে হিদায়েত দেওয়া।

চার দায়িত্বের প্রথমটা হল: আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে শুনাবেন।

দ্বিতীয়টা হল: আল্লাহ্র কিতাবের শিক্ষা দেবেন।

তৃতীয়টা আল্লাহ্র কিতাবের হিকমত-কৌশল তথা হাদীস শিক্ষা দেবেন।

চতুর্থ দায়িত্ব হল: উম্মতের অপবিত্র আত্মাকে পাক-পবিত্র করে দেবেন।

এই কয়েকটা কথার ধারাবাহিক আলোচনা শুনলে আমি আশা করি মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে মোটামোটি ধারণা পেয়ে যাব এবং মুসলমানদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাব। দু'আতে বলা হয়েছে হযরত ইবরাহীম আ. এবং তাঁর ছেলে হযরত ইসমাইল আ.-এর আওলাদে যেন আল্লাহ্ শেষ নবীকে পাঠান।

দু'আটা তখনই আল্লাহ্র কাছে কবুল হয়ে গেছে, মঞ্জুর হয়ে গেছে।

এ জন্যেই আল্লাহ্ পাক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কুরাইশ বংশে জন্ম দিয়ে পাঠালেন। আমাদের নবীকে কুরাইশ বংশে জন্ম দেওয়ার যত কারণ আছে এর মাঝে প্রধান কারণ হযরত ইবরাহীম পয়গাম্বরের দু'আ।

কুরাইশ বংশের লোকেরাই ছিল হযরত ইবরাহীমের ছেলে হযরত ইসমাইলের আওলাদ।

সামনের কথাগুলো বুঝার সুবিধার্থে এ পর্যায়ে আপনাদের এ কথাটি স্মরণ রাখা দরকার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারা কার আওলাদ? ইসমাইল আ. এর আওলাদ।

কেন আল্লাহ্ ইসমাইলের আওলাদ কুরাইশ বংশে শেষ নবীকে পাঠালেন, তার প্রধান কারণ হযরত ইবরাহীম পয়গম্বর তাঁর ছেলেকে নিয়ে যে দু'আ করেছিলেন, সেই দু'আ। তখনই কবুল হয়ে গিয়েছিল।

হযরত ইবরাহীম আ.-এর প্রথম ছেলের নাম হযরত ইসমাইল আ. দ্বিতীয় ছেলের নাম হযরত ইসহাক আ. দ্বিতীয় ছেলে ইসহাক আ. এর এক

পুত্রের নাম হযরত ইয়াকুব আ.। তাঁর মাতৃভাষা ছিল হিব্রু ভাষা। হিব্রু ভাষায় হযরত ইয়াকুব আ. এর আরেক নাম ছিল ইসরাঈল। ইসরাঈল হিব্রু ভাষার শব্দ। অর্থ আল্লাহ্র বান্দা।

যেহেতু হিব্রু ভাষায় হযরত ইয়াকুব আ. এর আরেক নাম ছিল ইসরাঈল, এজন্য ইয়াকুব আ. এর পরবর্তী বংশধরকে কুরআনের ভাষায় বলা হয় বনি ইসরাঈল। বনি ইসরাঈলের অর্থ হল হযরত ইয়াকুব আ. এর বংশধর।

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীনের হেকমত- কৌশল ইবরাহীম পয়গাম্বরের প্রথম ছেলে হযরত ইসমাইল নিজে পয়গাম্বর ছিলেন। পরবর্তী কয়েক হাজার বছরের মাঝে ইসমাইলের বংশে আল্লাহ্ আর কাউকে নবী বানান নি।

কিন্তু ইয়াকুব আ. এর আওলাদের মাঝে, ইসরাঈলের বংশধরের মাঝে অগণিত নবী রাসূল আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন। হাজার হাজার নবী রাসূল আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন বনি ইব্রাহীমে পাঠিয়েছেন। এ সমস্ত নবীগণের মাঝে একজন নবী ছিলেন হযরত ইউসূফ আ.। বনি ইসরাঈলের নবী। তিনি কিব্তী বংশের লোক। একজন নবী ছিলেন হযরত মুসা আ. তিনিও ইসরাঈলি বংশের লোক। এক জন নবী ছিলেন হযরত ঈসা আ. তিনিও ছিলেন ইসরাঈলি বংশের লোক।

আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন হযরত মুসা আ. এর উপর আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন তার নাম হচ্ছে তাওরাত। আর হযরত ঈসা আ. এর উপর আল্লাহ্ যে আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন সেই কিতাবের নাম হচ্ছে ইঞ্জিল। ঈসা আ. দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার চারশত বছর পর ইসরাঈলি বংশের চার পন্ডিত তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবের একটি সমন্বিত এডিশন তৈরি করে। সেই এডিশন অবিকৃত ছিল না। বিকৃত এডিশন ছিল।

তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবের সমন্বিত বিকৃত এডিশনটির নাম হচ্ছে বাইবেল। বর্তমান দুনিয়ার ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের হাতে যে বাইবেল বিদ্যমান, সে সম্পর্কে কয়েকটা কথা স্মরণ রাখা দরকার।

(এক) এই কিতাবটি একক কোন আসমানী কিতাব নয়; বরং দু'ই কিতাবের সমন্বিত এডিশন। একটা তাওরাত আরেকটি ইঞ্জিল।

(দুই) এই বাইবেল কিতাবটা তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবের অবিকৃত এডিশন নয়, বিকৃত এডিশন।

(তিন) এই বাইবেল কিতাব হযরত মূসা আ. জীবিত থাকা অবস্থায় তার চোখের সামনে তৈরি করা হয় নি। ঈসা আ. দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় তার চোখের সামনে তৈরি করা হয়নি। মূসা নবী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর, ঈসা নবী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার আরো চারশত বছর পর এই বিকৃত এডিশন বাইবেল নামে তৈরি করা হয়।

এই কারণে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইবেলের রেফারেন্স সম্পর্কে বলেছেন لَا تُصَدِّقُ وَلَا تُكَذِّبُ বাইবেলের কোন কথাকে বিনা যাচাইয়ে সত্যায়নও করা যাবে না, বাইবেলের কোন কথাকে বিনা যাচাইয়ে মিথ্যাও বলা যাবে না। কারণ, কোন অংশ বিকৃত আর কোন অংশটি অবিকৃত তার কোনও চিহ্ন নেই।

কাজেই বর্তমান ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের বাইবেল কিতাবের কোন অংশকে বিনা যাচাইয়ে সত্যও বলা যাবে না; কোন অংশকে বিনা যাচাইয়ে মিথ্যাও বলা যাবে না। যাচাই কিভাবে করতে হবে? বাইবেল দু'টি আসমানি কিতাবের এডিশন। এ জন্য যাচাইটাও আসমানী কিতাব দ্বারা করতে হবে। এ দুই কিতাবের পরবর্তী আসমানী কিতাব হল কুরআন।

বাইবেলের যে কথা কুরআনের অনুকূলে হয় সেটা সত্য সাব্যস্ত হবে, আর বাইবেলের যে কথা কুরআন বিরোধী হয় সেটা মিথ্যা সাব্যস্ত হবে। কারণ, বাইবেলে যেই আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়েছে কুরআনেও সেই আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়েছে। কুরআন বিকৃত নয়। কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ (الحجر/٩)

এই কুরআন আমি নিজ দায়িত্বে নাজিল করেছি নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করব। তাওরাত এবং ইঞ্জিল তথা বাইবেলে বনী ইসরাঈল বিকৃতি সাধন করেছে, আল্লাহ্ গ্যারান্টি দিয়েছেন কুরআনে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ বিকৃতি সাধন করতে পারবে না।

তা হলে কুরআন আল্লাহ্‌র বিকৃত কথা, না অবিকৃত কথা? অবিকৃত। বাইবেলের সব কথা কি বিকৃত, না অনেক কথা বিকৃত? অনেক কথা বিকৃত। কাজেই বাইবেলের কোন কথা বিকৃত, আর কোন কথা বিকৃত নয়

তা যাচাইয়ের জন্য আল্লাহ্‌র অবিকৃত কথা হবে মাপকাঠি। তাই বাইবেলে যে কথায় কুরআনের সমর্থন পাওয়া যাবে সেই কথা অবিকৃত সাব্যস্ত হবে,আর বাইবেলের যে কথার প্রতি কুরআনের সমর্থন পাওয়া যাবে না তা বিকৃত সাব্যস্ত হবে। একথা স্মরণ রাখলে আমার সামনের কথাগুলো বুঝতে সহজ হবে।

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন হযরত মূসা আ.-এর উপর যে তাওরাত কিতাব নাযিল করেছিলেন এবং ঈসা আ. এর কাছে যে ইঞ্জিল কিতাব নাযিল করেছিলেন, দুটো কিতাবে আল্লাহ্ বলে দিয়েছিলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল ধর্মের বিধি-বিধান রহিত সাব্যস্ত হবে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের পর সারা দুনিয়া জুড়ে একমাত্র মুহাম্মাদী শরীয়ত বলবৎ হবে। একথাটা তাওরাতেও আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করে দিয়েছিলেন, ইঞ্জিলেও আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করে দিয়েছিলেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধর্ম হবে বিশ্বধর্ম, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে নাজিল করা কুরআন হবে সারা বিশ্ববাসীর জন্য পথপ্রদর্শক।

তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবের বিবরণ মতে মুহাম্মদ হবেন বিশ্বনবী, মুহাম্মদের ধর্ম হবে বিশ্বধর্ম, মুহাম্মাদের কাছে নাজিল করা কুরআন হবে বিশ্ব ধর্মগ্রন্থ। ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান মূসা আ.-এর ইসরাঈলী উম্মতেরা ইয়াহুদী নাম ধারণ করে এবং ঈসা আ.-এর ইসরাঈলী উম্মতেরা খ্রিষ্টান নাম ধারণ করে। এদের গোষ্ঠীগত পরিচয় ওরা ইসরাঈলী।

এদের ধর্মীয় পরিচয় এদের একদল ইয়াহুদী আর একদল খ্রিষ্টান। ইয়াহুদীরা মূসা নবীর উম্মত হওয়ার দাবীদার আর খ্রিষ্টানেরা ঈসা নবীর উম্মত হওয়ার দাবীদার। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের পর তাওরাত এবং ইঞ্জিলের বিবরণ মতে মুহাম্মদী শরীয়ত গ্রহণ করা তাদের জন্য জরুরী ছিল, যা তারা করে নি। তাই ওরা মূসা নবী আর ঈসা নবীর উম্মত হওয়ার সত্যতার প্রমাণ দিতে পারে নি।

এরা মূসা নবী আর ঈসা নবীর উম্মত হওয়ার মিথ্যা দাবীদার। যাই হোক একটা হল ওদের গোষ্ঠীগত পরিচয় আর একটা হল ধর্মীয় পরিচয়।

ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের গোষ্ঠীগত পরিচয় হল ওরা ঈসাঈলী বংশ বনী ইসরাঈল। আর বনি ইসরাঈলের ধর্মীয় পরিচয় দু'টি। একদল বনি ইসরাঈল মূসা আ.-এর উম্মত হওয়ার দাবীদার এদের ধর্মীয় পরিচয় ইয়াহুদী। আরেক দল বনি ঈসরাঈল ঈসা আ. এর উম্মত হওয়ার দাবীদার, ওদের ধর্মীয় পরিচয় খ্রিষ্টান।

এই ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবের বিবরণ মতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুসংবাদ জানত, তাই ওরা যখন কোন মূর্তিপূজারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য দু'আ করত হে আল্লাহ্! তাওরাত কিতাবের প্রতিশ্রুত শেষ নবীকে ইঞ্জিল কিতাবের প্রতিশ্রুত শেষ নবীকে আমাদের যুগেই পাঠিয়ে দাও, যেন তাঁর সহযোগিতায় মূর্তীপূজারীদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করতে পারি। এর বিবরণ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا (البقرة/٨٩)

ইয়াহুদীরা খৃষ্টানেরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে কাফেরদের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ করতো শেষ নবীর আগমনের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করত। সর্বশেষে আল্লাহ্পাক রব্বালু আলামীন ঈসা আ. দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার আরো প্রায় পাঁচশ বছর পর যখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পাঠিয়ে দিলেন, তাওরাত কিতাবের প্রতিশ্রুত নবীকে ইঞ্জিল কিতাবের প্রতিশ্রুত নবীকে পাঠিয়ে দিলেন।

কয়েক হাজার বছর আল্লাহ্ নবী পাঠিয়েছেন শুধু ইসরাঈলী গোষ্ঠীতে। ইসমাইলের গোষ্ঠীতে আল্লাহ্ একজন নবীকেও পাঠান নি। সর্বশেষ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ইসরাঈলী গোষ্ঠীতে না পাঠিয়ে ঐ তাদের দু'জনের দু'আ মোতাবেক ইসমাঈলী খান্দানে কুরাঈশ বংশে জন্ম দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে দেখামাত্র চিনতে পারত তিনিই তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবের প্রতিশ্রুত নবী। কত পরিষ্কারভাবে চিনতে পারত তার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ্ বলেন–

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ (البقرة/١٤٦)

পিতার হাতে পুত্র লালিত-পালিত হলে ঐ পুত্রকে পিতার জন্য না-চিনার কোনও কারণ নেই, তেমনিভাবে ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টানেরা তাওরাত

এবং ইঞ্জিল কিতাবের বিবরণ মতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখা মাত্র সুস্পষ্টভাবে চিনতে পারত। তিনিই তাওরাত কিতাবের প্রতিশ্রুত নবী, ইঞ্জিল কিতাবের প্রতিশ্রুত নবী।

আমার কথা বুঝে থাকলে আপনারা একটু দয়া করে বলবেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখামাত্রই ইহয়াহুদী-খ্রিষ্টানরা চিনতে পারত কিসের দ্বারা। তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবের সুস্পষ্ট বিবরণের দ্বারা চিনতে পারত।

কিন্তু যে নবীর জন্য শত শত বছর আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেছিল, যে নবীর শুভাগমনের অপেক্ষা করেছিল শত শত বছর, সেই নবী তাদের গোষ্ঠীতে জন্ম না হয়ে, ইসরাঈলী গোষ্ঠীতে জন্ম না হয়ে, কেন ইসমাইলী গোষ্ঠীতে জন্ম নিলেন, ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের গোষ্ঠীতে জন্ম না হয়ে, কেন কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করলেন, বংশগত জেদের কারণে তারা এই নবীকে নবী মানবে না সিদ্ধান্ত নিল।

কথা বুঝে থাকলে বলুনতো, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরা নবী মানতে রাজি হল না, না চিনার কারণে; না চেনা সত্ত্বেও? চেনা সত্ত্বেও। কেন রাজি হল না? গোষ্ঠীগত জেদের কারণে। আল্লাহ্ বলেন, بَغْيًا بَيْنَهُمْ তাদের গোষ্ঠীগত জেদ প্রবল হল। যে নবীর জন্য শত শত বছর অপেক্ষা করলাম, যে নবীর জন্য শত শত বছর আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলাম, যে নবীর সুসংবাদ আল্লাহ্ আমাদেরে তাওরাত কিতাবে দিলেন, সেই নবী আমাদের গোষ্ঠীতে জন্ম না নিয়ে, অন্য গোষ্ঠীতে কেন জন্ম নিলেন? মানব না তাকে নবী!

এখন যদি সমাজের অন্যরাও তাকে নবী না মানে, তাহলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে বয়কটে সফল হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল কুরাইশ বংশের লোকেরা শেষ পর্যন্ত নবীকে নবী মেনে নিল। মদীনার আউস বংশের লোকেরা এই নবীকে নবী মেনে নিল। মদীনার খাযরাজ বংশের লোকেরা এই নবীকে নবী মেনে নিল।

কারো বিরুদ্ধে একজন অনাস্থা দিল আর তিনজন যদি সমর্থন দিয়ে দেয়, তা হলে একজন যে অনাস্থা দিল তার অনাস্থার কি কোনও মূল্য থাকে? অনাস্থা বিফল হয়ে যাবে।

ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান যখন দেখল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নবুওয়াতে অনাস্থা দিয়ে সফল হতে পারে নি; বিফল হয়ে গেল। কারণ, মক্কার কুরাইশ বংশ এক দিকে সমর্থন দিয়েছে, মদীনার আউছ বংশের লোকেরা সমর্থন দিয়েছে, মদীনার খাযরাজ বংশের লোকেরা এই নবীকে সমর্থন দিয়েছে, তখন তাদের অনাস্থা বিফল হয়ে গেল।

এখান থেকে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান মুসলমানের চিরশত্রুতে পরিণত হল। ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এতো শত্রুতা কেন করে?

বর্তমান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ একবার আফগানিস্তানের মুসলমানকে মারে একবার পাকিস্তানের মুসলমানকে মারার হুমকি দেয়, একবার ইরাকের মুসলমানকে মারার হুমকি দেয়, একবার সৌদির মুসলমানকে মারার হুমকি দেয়, আসলে ব্যাপারটা কি? আসলে ব্যাপারটা হল মুসলমানদের সাথে তাদের ধর্মীয় বিরোধ।

মুসলমানদের নবীর বংশগত ব্যাপারে তাদের গোষ্ঠীগত জেদ। দুশমনির মূল ঐতিহাসিক কারণ এটাই। তারা এই নবী মানবে না বলে অনাস্থা দিয়েছিল গোষ্ঠীগত জেদের কারণে। যদি আপনারা না মানতেন তাদের অনাস্থা সফল হত। যদি মদীনার আউছ বংশের লোকেরা এই নবীকে নবী না মানত, তা হলে তাদের অনাস্থা সফল হতো। যদি মদীনার খাযরাজ বংশের লোকেরা এই নবীকে নবী না-মানত, তা হলে তাদের অনাস্থা সফল হত।

হে দুনিয়ার মুসলমানেরা! তোমরা এই নবীকে নবী মানার কারণে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের অনাস্থা বিফল হয়ে গেছে। সেখান থেকে তারা তোমাদের চিরশত্রুতে পরিণত হয়েছে।

গোড়ার কথা স্মরণ রাখতে হবে আপনাদেরকে, কেন ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের চির শত্রু? কখন থেকে? কিভাবে? যতদিন পর্যন্ত আপনারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেসালতে বিশ্বাস করবেন,

যতদিন পর্যন্ত আপনারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নবী মানবেন, ততদিন পর্যন্ত তারা আপনাদের দুশমন থাকবে। তাহলে তাদের দুশমনিটা কি? সাময়িক না স্থায়ী? স্থায়ী দুশমনি। কোন দিন

ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান কোন মুসলমানের বন্ধু হবে না। আল্লাহ্ পরিষ্কার ভাষায় এক আয়াতে বলে দিয়েছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَاتَتَخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَرَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَانَّهُ مِنْهُمْ (المائدة/٥١)

"হে ঈমানদারেরা! কখনো ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু মনে করো না।"

কেন? কেন আল্লাহ্ কুরআনে বলে দিলেন তোমরা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানকে বন্ধু মনে করো না? এর ঐতিহাসিক কারণ বুঝে এসেছে কি আপনাদের? তাই আল্লাহ্ বলেন, সাবধান মুসলমানেরা! ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান তোমাদের বন্ধু নয়। ওরা তোমাদের চিরশত্রু। তারা তাদের বন্ধু। তোমাদের বন্ধু নয়।

সুতরাং কোন মুসলমান যদি কোন ইয়াহুদীকে বন্ধু বানায় আমি আল্লাহ্ সেই মুসলমানকে ইয়াহুদী গণ্য করবো। কোন মুসলমান যদি খ্রিষ্টানকে বন্ধু বানায় আমি আল্লাহ্ সেই মুসলমানকে খ্রিষ্টান গণ্য করবো। তাহলে আমেরিকার ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের সন্ত্রাসের নায়ক, সারা দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক যত সন্ত্রাসী আছে, যত ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিস্ট আছে সবগুলোর শীর্ষ নেতা হল, আমেরিকা প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ।

এই শীর্ষ সন্ত্রাসী নেতা কোন মুসলমান দেশের উপর যখন চড়াও হয়, তখন দেখা যায় পাশাপাশি অন্যদেশের মুসলমান সরকার তার বন্ধুত্ব অবলম্বন করে। আফগানিস্তানের নিরিহ মুসলমানদের উপর যখন এই সন্ত্রাসী বুশ হামলা করলো তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশাররফ আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব করে ফেলল।

আল্লাহ্ কি বলেছেন, কোন মুসলমান যদি খ্রিষ্টানকে বন্ধু বানায়, তা হলে আল্লাহ্ তাকে কি সাব্যস্ত করবেন। খ্রিষ্টান গণ্য করবেন। অথচ আমাদের বর্তমান সমাজের মুসলমান জবাব তালাশ করে পায় না যে, আমেরিকার এই সন্ত্রাসী বুশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের উপর অহেতুক জুলুম- নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন তাকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন না, মুসলমানকে গাইবী সাহায্য করছেন না।

আল্লাহ্ মুসলমানকে গাইবী সাহায্য করবেন ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানকে বন্ধু বানালে? আল্লাহ্ পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানকে বন্ধু

নয়, ওরা ওদের বন্ধু, ওরা তোমাদের চির শত্রু। ওরা তোমাদের বন্ধু নয়, ওরা ওদের বন্ধু।

তোমরা যদি ওদেরকে বন্ধু বানাও তাহলে ইয়াহুদী গণ্য করব। তোমরা যদি ওদের কাউকে বন্ধু বানাও আমি তাকে খ্রিষ্টান গণ্য করব। তাহলে এই ইয়াহুদী মার্কা খ্রিষ্টান মার্কা মুসলমানকে গাইবী সাহায্য করবেন?

মুফাসসিরীনে কিরাম তাফসীরের কিতাবে লিখেছেন, মুসলমান এবং অমুসলমানে যখন যুদ্ধ হয় মুমিনে আর কাফিরে যখন যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আছে। এক নম্বর শর্ত হচ্ছে, আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ ভরসা। বর্তমান দুনিয়ার দেড়শ কোটি মুসলমানের কি আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ ভরসা আছে? এর একটা রিপোর্ট শোনাতে চাই।

বর্তমান দুনিয়ায় দেড়শ কোটি মুসলমান বাস করে। আল্লাহ্‌র উপর এদের কি পরিমাণ ভরসা আছে, এর একটা খতিয়ান পেশ করতে চাই। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যখন আমেরিকার টুইন টাওয়ারে তারাই যড়যন্ত্রমূলক হামলা করল, না কোন মুসলমান হামলা করল? না কি এই নাটকটা আপনারা জানেন না? অবস্থায় বুঝা যায়, এই নাটকটা আপনারা অনেকেই জানেন না।

২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বর একটা ঐতিহাসিক নাটক সাজিয়েছিল বুশ। এটা একটা ঐতিহাসিক নাটক। নাটকের রূপরেখা হল, আমেরিকান এয়ারপোর্ট থেকে আমেরিকান ফ্লাইট আমেরিকান পাইলট আমেরিকান পেসেঞ্জার নিয়ে উড়ে গেল। ফ্লাইট কোন দেশের? পেসেঞ্জার কোন দেশের? পাইলট কোন দেশের? কোন দেশের এয়ারপোর্ট থেকে গেল?

এ বিমান যে আমেরিকান টুইন টাওয়ারে হামলা করল সেটা কোন দেশের? কোন মুসলমান, কিভাবে অংশীদার হল? এই নাটকে কি কোন মুসলমানের সম্পর্ক হতে পারে? না। বরং এই টাওয়ারে কয়েক হাজার ইয়াহুদী কাজ করত। যেদিন ঘটনা ঘটে, সেদিন একটা ইয়াহুদীও সেই টাওয়ারে উপস্থিত ছিল না। কি প্রমাণ হল? নাটকটা কে সাজাল?

এই ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের দলই এ নাটক সাজাল। সাজিয়ে দলীল-প্রমাণ ছাড়া যুক্তি ছাড়া গায়ের জোরে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিল। চাপিয়ে

দিল তৎকালীন দুনিয়ার সত্যিকারের ইসলামের আদর্শে শাসিত দেশ আফগানিস্তানের উপর।

এজন্য সত্যিকারের-ইসলামের উপর যারা অটল, এরা যে পরিপূর্ণ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখে, দুনিয়ার কোন বেদ্বীন কাফেরের উপর ভরসা রাখে না; এই জন্য আল্লাহ্‌র গাইবী সাহায্য যে তাদের পক্ষেই আসে, বেদ্বীন কাফেরেরা যে তাদের মুকাবিলায় পারবে না– এই কথাগুলো বুশের ভাল রকম জানা ছিল।

এ কথাগুলো বুশ জানল কোত্থেকে? তৎকালীন পৃথিবীর পরাশক্তি হিসাবে পরিচিত রাশিয়া যখন আফগানীস্তানের উপর চড়াও হল, আফগানিস্তানের মতো একটা দুর্বল রাষ্ট্রের মোকাবিলা করতে এসে বিশ্বের পরাশক্তি রাশিয়া টুকরা টুকরা হয়ে গেল।

এখান থেকে আমেরিকার ডব্লিউ বুশ সবক শিখল সত্যিকারের আদর্শের ভিত্তিতে যে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত, এই মুসলমানের মোকাবিলা কোন রকম ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা করা যায় না, কোন রকম দূরপাল্লার অস্ত্র দিয়ে মোকাবিলা করা যায় না। কোন প্রকার অত্যাধুনিক অস্ত্রের দ্বারা করা যায় না। এদের কাছে সবচেয়ে বড় যে শক্তি আছে, সেটা হল, আল্লাহ্‌র 'গাইবী মদদ'। এই ঘটনা আমেরিকার ডব্লিউ বুশ দেখেছে কি না? দেখেছে।

এজন্য আমেরিকা চেষ্টা চালাচ্ছে যে, এই টুইন টাওয়ারে হামলার দোষটা আফগান সরকারের উপর আরোপ করে যদি আফগান সরকারের পতন ঘটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সত্যিকারের ইসলামের আদর্শের আর কোন রাষ্ট্র থাকবে না। তখন এ সকল মুসলমানদের ধ্বংস করলে এর প্রতিবাদ-মোকাবিলা করার মত আর কোন মুসলিম রাষ্ট্র থাকবে না।

এখান থেকে বুশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, দোষটা চাপাতে হবে আফগান সরকারের ওপর। দলিল-প্রমাণ ছাড়া, যুক্তি ছাড়া, তর্ক ছাড়া, আইন ছাড়া, আদালত ছাড়া, সম্পূর্ণ গায়ের জোড়ে দোষ চাপিয়ে দিল আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোল্লা ওমর আর তার উপদেষ্টা উসামা বিন লাদেনের উপর। তারপরও কিছু করতে পারত না, যদি আফগানিস্তানের ভেতরের উত্তরাঞ্চলীয় জোটের মুসলমানরা আমেরিকার সমর্থন না দিত। এদের সমর্থন পেয়ে আমেরিকা মোল্লা ওমরের সরকারকে গদিচ্ছেদ করেছে এবং বর্তমান আফগানিস্তানে পুতুল সরকার বানিয়ে রেখেছে। হল কি না সত্যিকারের

ইসলামী সরকারের পতন? দুশমনের কারণে পতন হয়েছে, না অভ্যন্তরীণ মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে? আপনাদের জানা মতে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার ইরেজদের হাতে পতন হয়েছিল ইংরেজ বাহিনীর শক্তির কারণে, নাকি নিজের সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে? বিশ্বাসঘাতকতার কারণে।

তাহলে শত্রুর হাতে মুসলমানরা পরাজিত হয় কখনো? বেঈমানদের শক্তি বেশী আর নিজেদের শক্তি কম হওয়ার কারণে না অভ্যন্তরীণ মীর জাফরদের কারণে? আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের পতন হল অভ্যন্তরীণ মীর জাফরদের কারণে।

এই সময় আফগানিস্তানের উপর মিথ্যা আরোপিত দোষ চাপিয়ে দিয়ে আফগানিস্তানে হামলা করার জন্য পাকিস্তানের স্থল ব্যবহার করতে চাইল, পাকিস্তানের জল ব্যবহার করতে চাইল, পাকিস্তানের আকাশ ব্যবহার করতে চাইল। তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন পারভেজ মুশাররফ।

পারভেজ মুশাররফ আমেরিকাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিল, আমার দেশের জল ব্যবহার কর, স্থল ব্যবহার কর, আকাশ ব্যবহার কর। আফগানিস্তানের মুসলমানদের মারো, আমাকে মেরো না। ঘটনা আগে থেকে যাদের জানা নেই এবার জানলেন। বিশ্বাস হয়ে থাকলে এবার বলুন! বেঈমান কাফের আর মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ হলে বিজয়ী হওয়ার প্রথম শর্ত কি ছিল? আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ ভরসা।

পাকিস্তান সরকার যে আফগানিস্তানের মুসলমান মারার জন্য নিজের সবকিছু দিয়ে দিল, আমাকে মেরো না বলল, এর দ্বারা কি প্রমাণ দিল, আল্লাহ্‌র ভরসা, না বর্তমান দুনিয়ার দেড়শ কোটি মুসলমানের জাত শত্রু বুশের উপর ভরসা? বুশের ওপর। কেন আল্লাহ্‌র গাইবী মদদ তোমাদের পক্ষে আসবে? তোমাদের তো আল্লাহ্‌র উপর ভসরা নেই। বুশের উপর ভরসা। একটা দৃষ্টান্ত পেশ করলাম।

আরেকটা দৃষ্টান্ত পেশ করি, এই বুশের আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিল বিল ক্লিনটন। বিল ক্লিনটন ছিল একটা ইন্টারন্যাশনাল বদমাইশ। বিল ক্লিনটন ছিল একটা ইন্টারন্যাশনাল চরিত্রহীন। হোয়াইট হাউজের কর্মচারীর সাথে অপকর্ম করে আন্তর্জাতিকভাবে ধরা পড়েছিল। আপনারা চিন্তা করুন, যে দেশের প্রেসিডেন্ট একটা ইন্টারন্যাশনাল চরিত্রহীন হতে

পারে, বদমাইশ হতে পারে সেই দেশের জনগণ কত নিকৃষ্টতম, কত জঘন্যতম হতে পারে? সেই বিল ক্লিনটনের পূর্বে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিল জর্জ বুশ। সেই জর্জ বুশ ছিল আজকের ডব্লিউ বুশের বাবা। সেই জর্জ বুশ ছিল একটা ইন্টারন্যাশনাল বাটপার। কেমন ইন্টারন্যাশনাল বাটপার?

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে লেলিয়ে দিল তুই কুয়েত দখল কর। এই সাদ্দাম মুসলমান সমাজের জন্য একটা বলদ। সে যে বলদ তা বুঝার জন্য একটা গল্প বলি। এক লোক ট্রাফিক পুলিশে চাকুরী করত।

ঘটনাক্রমে তার স্ত্রী ছিল মারাত্মক অবাধ্য। স্ত্রী তার কথা মানে না। সেই ট্রাফিক পুলিশ তার অবাধ্য স্ত্রীর সাথে গল্প করে বলে, তুই আমার কথা মানিস না, অথচ বড় বড় অফিসারদের গাড়ী আমার আঙ্গুলের ইশারায় দাঁড়ায়। স্ত্রী কথাটা বিশ্বাস করতে রাজি হল না। স্ত্রীকে কথাটা বিশ্বাস করানোর জন্য পরের দিন ডিউটির সময় স্ত্রীকে সাথে নিয়ে গেল। তার ইশারায় যে বড় বড় অফিসারদের গাড়ী থামে দেখানোর জন্য।

কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই দিন রোড ছিল ক্লিয়ার। রোড ক্লিয়ার থাকলে কি গাড়ী দাঁড় করাবার দরকার হয়? স্ত্রীকে দেখাতে পারে না, এখন কি করবে? শুধু স্ত্রীকে প্রমাণ করে দেখানোর জন্য এক লাইনের সব গাড়ী দাঁড় করিয়ে দিল। তখন সব গাড়ীর ড্রাইভার নেমে এসে একত্রে "অকারণে তুই আমাদের গাড়ী থামালে কেন" বলে ইচ্ছেমত উত্তম-মাধ্যম দিল। পিটিয়ে তাকে রাস্তায় ফেলে ড্রাইভারেরা যার যার মতো চলে গেল। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, কি হল? ট্রাফিক পুলিশ বলল, কি হল মানে, আমার আঙ্গুলের ইশারায় কি গাড়ী দাঁড়ায় নি? গাড়ী তো দাঁড়াল তারপর কি হল? সে জবাব দিল, আমার বাহাদুরী আমি দেখালাম, আর ওরা ওদের বাহাদুরী ওরা দেখাল।

এই ট্রাফিক যে রকমের গর্দভ আমাদের মাঝে ইরাকের প্রেসিডেন্ট একটা সেই রকম বলদ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের উস্কানিতে কুয়েত দখল করল। কুয়েত দখলের পর জর্জ বুশ সৌদি সরকারকে বলল- কুয়েতের বাদশা তোমার আত্মীয়। তোমার আত্মীয় তোমার দেশে পালিয়ে আত্মগোপন করেছে আর দেশটা সাদ্দামে দখল করে ফেলেছে। তোমার আত্মীয়ের দেশ কুয়েত আমি সারা বিশ্বের সেনা বাহিনী দিয়ে উদ্ধার করে দেব। শুধু নীতিগতভাবে ফর্মালিটি রক্ষার্থে আমাদের আমন্ত্রণ জানাও। কি

করল ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? এটা কি বাটপারী নয়? সাদ্দামকে লেলিয়ে দিয়ে কুয়েত দখল করাল, আর এদিকে সৌদি সরকারকে বলল আমাকে আমন্ত্রণ জানাও। উদ্ধার করে দেব। এটা কি বাটপারী নয়?

এজন্য বলেছি, ডব্লিউ বুশের বাবা জর্জ বুশ ছিল ইন্টারন্যাশনাল বাটপার। এই বাটপারের লেলানীতে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখল করল। উদ্ধার করার নামে আমেরিকার হাজার হাজার সেনাবাহিনী সৌদি আরবে পাঠিয়ে মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র মক্কা-মদীনার দেশে ঘাঁটি বানাল, কুয়েতে ঘাঁটি বানাল, সৌদি আরবে ঘাঁটি বানাল। ঘাঁটি বানিয়ে সাদ্দামের দশা তাই ঘটাল, গাড়ীর ড্রাইভারেরা ট্রাফিক পুলিশকে যা ঘটিয়ে ছিল।

শুধু এই পর্যন্তই নয়, কুয়েত দখল করার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমেরিকান ঘাঁটি সরিয়ে নেয় নি। মক্কা মদীনার দেশে সৌদি আরবে ঘাঁটি বানিয়ে হাজার হাজার লাল কুত্তার দলেরা, সেখানে থাকে। মতলবটা কি ছিল? কুয়েত উদ্ধার করা, না মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র মক্কা-মদীনার দেশে ঘাঁটি তৈরি করা? এই মতলব চরিতার্থ করেছে কি না? কোন বলদের ঘাড়ে পা দিয়ে? এজন্য বলেছি, সাদ্দাম আমাদের সমাজে একটা বলদ।

এই বলদের ঘাড়ে পা দিয়ে লাল কুত্তার বাহিনীরা মুসলমানদের মক্কা-মদীনায় ঘাঁটি তৈরী করেছে। আমি আপনাদেরকে যে কথাটা বুঝাতে চাচ্ছি, সেটা হল তখনকার সৌদি সরকার ইন্টারন্যাশনাল বাটপার জর্জ বুশকে তুমি আমার আত্মীয়ের দেশটা উদ্ধার করে দাও বলে, আর আল্লাহ্কে না বলে, মুসলিম জাহানের সাথে পরামর্শ না করে যে আমন্ত্রণ জানাল, এর দ্বারা কি প্রমাণ করে?

সৌদি সরকারের ভরসা আল্লাহ্র উপর, না আমেরিকার ওপর? দু'টি উদাহরণ আমি পেশ করলাম– বর্তমান দুনিয়ার দেড়শ কোটি মুসলমানের ভরসা আল্লাহ্র উপর নয়। বর্তমান দুনিয়ার দেড়শ কোটি মুসলমানের তথা মুসলিম সরকারের ভরসা লাল কুত্তার বাহিনী আমেরিকার উপর, ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের উপর, মুসলমানদের চির শত্রুদের উপর। তোমরা নিজেরা শত্রুর পক্ষ নিয়েছ আল্লাহ্ গাইবী সাহায্য পাঠাবেন কার পক্ষে?

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, মুমিন আর কাফিরে যুদ্ধ হলে মুমিন বিজয়ী হওয়ার শর্ত ৩টি। প্রথম শর্ত হল: বুশের উপর পূর্ণ ভরসা থাকা (?)

না আল্লাহ্র উপর ভরসা থাকা? আমার কথা বুঝে থাকলে বলুন, মুসলমানদের সরকারীভাবে ভরসা কার উপর? বুশের ওপর।

তাহলে তোমরা বিজয়ী হবে কিভাবে? প্রথম নম্বর শর্ত হচ্ছে, আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ ভরসা থাকতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, মুসলমানদের সম্মিলিতভাবে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

পাকিস্তান সরকার যে বুশের সমর্থন দিল, সে কোন মুসলমানের সাথে পরামর্শ করেছে? সৌদি সরকার যে লাল কুত্তার বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানাল মক্কা-মদীনায় ঘাঁটি বানানোর জন্যে, সে কোন মুসলমানের সাথে পরামর্শ করেছে? বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানদের মাঝে সম্মিলিত পরামর্শ নেই, কাফেরদের মুকাবিলার জন্য। এটা হল পরাজয়ের দ্বিতীয় কারণ।

মুসলমান বিজয়ী হওয়ার তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, যুগোপযোগী অস্ত্রের উৎপাদন। যুগোপযোগী অস্ত্র আবিষ্কারের ফিকির করে ছিল উসামা বিন লাদেন। যার পতন ঘটানো হয়েছে। যুগোপযোগী অস্ত্র উৎপাদনের চিন্তা করেছিল সাদ্দাম। তার পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্র আঁটা হয়েছে।

সুতরাং এই তিন কাজ যারা করতে চায়, কোনও মুসলমান এদের পক্ষে থাকে না। এজন্য কোন মুসলমান ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের মুকাবিলায় যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারে না। আমার কথা আপনারা বুঝে থাকলে আশা করি অতি সহজে বুঝতে পেরেছেন, বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সংকট ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানেরা সৃষ্টি করেনি; মুসলমানরা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে।

নিজের হাতের বাতি থেকে নিজের ঘরে নিজে আগুণ লাগালে নিভাবে কে? মুসলমানদের ঘরে আগুন লেগেছে আজকের বিশ্বে মুসলমানদের হাতের বাতি থেকে। মুসলমান দেশ পাকিস্তানের সরকার আমন্ত্রণ জানিয়েছে আফগানিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য, মুসলিম দেশ সৌদি সরকার আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ইরাকের মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য। এখনো সৌদি সরকার ইরাকে হামলা করার জন্য আমেরিকা সর্বস্ব দিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছে বিশাল সৌদি রাষ্ট্র আমেরিকা তুমি ব্যবহার কর। আকাশ পথ ব্যবহার কর। সাদ্দামকে মারো, আমি তোমার সমর্থনে আছি। এমন মুসলমানের পক্ষে আল্লাহ্র গাইবী সাহায্য কিভাবে আসবে? মুসলমান তো আমেরিকার পক্ষে। আল্লাহ্র গাইবী সাহায্য কার পক্ষে আসবে?

যাই হোক, আমি বলছিলাম, ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের পরিচয়। গোষ্ঠীগত পরিচয় ওরা ইস্রাইলী গোষ্ঠী। ধর্মীয় পরিচয় ইয়াহুদীরা হযরত মূসা নবীর উম্মত হওয়ার মিথ্যা দাবীদার। খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা নবীর উম্মত হওয়ার মিথ্যা দাবীদার। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ তাদের গোষ্ঠীতে কেন জন্মগ্রহণ করলেন না– এই গোষ্ঠীগত জেদের কারণে এরা মুসলমানদের চির শত্রু। মুসলমান যে কোন সময় এই শত্রুদেরকে বিশ্ব থেকে নির্মূল করতে পারবে, পাওয়ারলেস করে দিতে পারবে ৩টি শর্ত মানলে।

(১) আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ ভরসা থাকলে

(২) সম্মিলিত পরামর্শ গ্রহণ করলে

(৩) যুগোপযোগী অস্ত্র আবিষ্কার করলে। এই তিন শর্তে মুসলমানরা ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদেরকে বিশ্ব থেকে চিরতরে দুর্বল করে দিতে পারবে, চিরতরে পরাজিত করে দিতে পারবে, চিরতরে বিশ্বের বুক থেক মুছে দিতে পারবে।

এবার সামনের কথা শুনুন। হযরত ইবরাহীম আ. তার ছেলে হযরত ইসামঈল আ.-কে সঙ্গে নিয়ে দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ্! শেষ নবীকে আমাদের বংশে পাঠাও। সে জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ্ ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান বংশে জন্ম না দিয়ে কুরাইশ বংশে পাঠালেন। এখান থেকেই ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরা মুসলমানের চির শত্রুতে পরিণত হল। মুসলমান বুঝতে না পেরে ইয়াহুদী খ্রিষ্টানকে বন্ধু বানিয়ে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত অপদস্ত হল।

তারা আরো দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ চার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাঁর উম্মতকে হিদায়াত করবেন। এক নম্বর তোমার নাজিল করা কুরআনের তিলাওয়াত শুনাবেন। কুরআনের তিলাওয়াত শুনানো নবীর এক নম্বর দায়িত্ব। কুরআন শিক্ষা দেওয়া নবীর দুই নম্বর দায়িত্ব। হাদীস শিক্ষা দেওয়া নবীর তিন নম্বর দায়িত্ব। আর মানুষের নাপাক অন্তরকে পাক পবিত্র করে দেওয়া নবীর চার নম্বর দায়িত্ব। চারটা দায়িত্ব ধারাবাহিকভাবে স্মরণ রাখলে সামনের কথা বুঝতে সহজ হবে। চতুর্থ নম্বর দায়িত্বটা পরে বুঝবেন, আগে বুঝুন প্রথম তিন দায়িত্ব।

কুরআনের সহীহ্ তিলাওয়াত কুরআনের শিক্ষা, হাদীসের শিক্ষা কোন প্রতিষ্ঠানে হয়? একমাত্র মাদ্‌রাসায়।

একমাত্র মাদ্‌রাসা ছাড়া আর কোথাও কুরআনের সহীহ্ তিলাওয়াত শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। একমাত্র মাদ্‌রাসা ছাড়া কুরআনের মর্মবাণী বুঝার আর কোন প্রতিষ্ঠান নেই।

একমাত্র মাদ্‌রাসা ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠানে নবীর হাদীস যথার্থভাবে শিক্ষা করার ব্যবস্থা নেই। হাদীস শরীফে আল্লাহ্‌র রাসূল বলেন–

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهِ

আমার উম্মত মুসলমানেরা! আমি তোমাদের হাতে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন পর্যন্ত আমার রেখে যাওয়া দু'টি জিনিস শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা বিপথগামী হবে না, জাহান্নামের পথের যাত্রী হবে না, জান্নাতের পথ হারাবে না।

আমার রেখে যাওয়া দু'ইটি জিনিসের একটি আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন আর দ্বিতীয়টির নাম নবীর সুন্নাত- হাদীস।

এই কুরআন হাদীস মুসলমান যতদিন আঁকড়ে থাকবে ততদিন পথহারা হবে না। রাসূলের কথা বিশ্বাস হয়ে থাকলে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে এই কুরআন হাদীসকে আঁকড়ে রেখেছে একমাত্র মাদ্‌রাসা ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠান? আর কোন প্রতিষ্ঠান নয়, একমাত্র মাদ্‌রাসা।

সুতরাং পতনের হাত থেকে যদি বাঁচতে হয় ধ্বংসের হাত থেকে যদি বাঁচতে হয় বেঈমান কাফিরদের হাতে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত হওয়া থেকে যদি বাঁচতে হয়, অপদস্ত হওয়া থেকে যদি বাঁচতে হয়, বেঈমান কাফেরের হাতে মজলুম হওয়া থেকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে কুরআন হাদীসকে যে প্রতিষ্ঠান আঁকড়ে রেখেছে সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে গোটা মুসলিম জাতিকে আঁকড়ে থাকতে হবে।

চতুর্থ নম্বর দায়িত্ব হল, এই নবী উম্মতের নাপাক অন্তরকে পাক পবিত্র করে দেবেন। আমাদের সামাজের অনেকেরই এ অনুভূতি নেই যে মানুষের অন্তর-আত্মা নাপাক হয় কিভাবে? কাজেই পাক-পবিত্র বুঝানো তাদেরকে সম্ভবপর ব্যাপার নয়।

আত্মা অপবিত্র হয় কিভাবে, তা বুঝে আসলে পরে বুঝে আসবে আত্মা পবিত্রকরণ কাকে বলে? আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আত্মা পবিত্রকরণের কথা বলেছেন। এর মাঝে সূরায়ে শামস এর মাঝে

বলেছেন–

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا

(الشمس/١-٧)

আমি সূর্যের কসম খেয়ে বলছি, রোদের কসম খেয়ে বলছি, আমি চন্দ্রের কসম খেয়ে বলছি, চাদনীর কসম খেয়ে বলছি, আমি দিনের আলোর কসম খেয়ে বলছি, রাতের অন্ধকারের কসম খেয়ে বলছি, আমি আকাশের কসম খেয়ে বলছি, আকাশের সৃষ্টিকর্তার কসম খেয়ে বলছি, আমি জমিনের কসম খেয়ে বলছি, জমিনকে সমতল করার কসম খেয়ে বলছি, আমি আত্মার কসম খেয়ে বলছি এবং আত্মাকে উপযোগী করার কসম খেয়ে বলছি।

কথাটি বলা হয়েছে না কসম খাওয়া হয়েছে। কসম খাওয়া হয়েছে। একটা দু'টা কসম, না বহু কসম? বহু কসম। এতগুলো কসম খেয়ে আল্লাহ্ বলেন– فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا

আমি প্রতিটি মানুষের আত্মার মাঝে পাপের সাজা বুঝারও যোগ্যাতা দান করেছি, পাপের মজা বুঝারও যোগ্যতা দান করেছি। প্রত্যেকটা মানুষের আত্মার মাঝে যত পাপের কাজ আছে এটা করলে কি মজা হয়, সেটা বুঝার যোগ্যতা আছে।

এই কাজটা করলে কি সাজা হবে সেটাও বুঝার যোগ্যতা আছে। যেমন ধরুন, বিয়ে ছাড়া নারী পুরুষ মেলা-মেশা। বিয়ে ছাড়া নারী-পুরুষের মেলা-মেশা পাপ কি না? পাপ। শুধু সাধারণ মানুষের জন্য, না পীরদের জন্যও? কোনও পীর যদি নারী মুরিদের সাথে মেলা-মেশা করে, পাপ নেই? পাপ আছে। আপনারা কি মনে করেন, বাংলাদেশে এমন পীর নেই? আছে। যে পীর নারী মুরিদের সাথে পর্দা রক্ষা করে না, যে পীর নারীর সাথে অবাধে চলাফেরা করে, নেই কি? আছে।

পীরের দায়িত্ব কি ছিল? অপরের আত্মাকে পবিত্র করা। যে পীর নারীদের সাথে বেপর্দা চলে সেই পীরের আত্মা অপবিত্র, মুরিদের আত্মা কিভাবে করবে পবিত্র?

বাংলাদেশে এ জাতীয় পীরের সংখ্যা বেশী। কামেল পীরের সংখ্যা খুব কম। ভণ্ডপীরের সংখ্যা বেশী। অনেকেই জিজ্ঞেস করে কামেল পীর আর ভণ্ডপীরের পার্থক্য কি? অনেক পার্থক্য আছে। এর মাঝে সহজ দু'টি পার্থক্য আমি আপনাদের বলি।

কামিল পীর মুরিদ করে মুরিদের আমল সংশোধন করে দেয়ার জন্য। কিছু নেওয়া জন্য, না দেওয়ার জন্য? আর ভণ্ডপীর মুরিদ করে মুরিদের ধন সম্পদ নেওয়ার জন্য। কোন সময় মান্নতের নামে, কোন সময় দান খয়রাতের নামে, কোন সময় শিরনির নামে, কোন সময় ছালাতের নামে, কোন সময় ওরশের নামে, কোন সময় ইছালে ছওয়াবের নামে। মুরিদ শুধু দিত আর সে শুধু নিত।

আরেকটি পার্থক্য হল, আপনাদের এলাকায় ভাল কোন এম বি বি এস ডাক্তার আছে? এই এম বি বি এস কি কোন শহরে ওয়াল রাইটিং করে আমি একজন ভাল ডাক্তার! কোন বাজারে ব্যানার লটকায় যে আমি একজন ভাল ডাক্তার!

কোন মার্কেটে পোষ্টারিং করে আমি একজন ভাল ডাক্তার!

কোন মানুষের কাছে লিফলেট বিলি করে বলে, আমি একজন ভাল ডাক্তার! করে না। কেন? সে প্রচার-সর্বস্ব ডাক্তার নয়, কর্ম-সর্বস্ব ডাক্তার। ডিগ্রীধারী ডাক্তার প্রচার-সর্বস্ব নয় কর্ম-সর্বস্ব।

আর যারা হাতুড়ে ডাক্তার তারা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রেলগাড়ীতে দাঁড়িয়ে, বাসে দাঁড়িয়ে প্রচার করে আমি ভাল ডাক্তার! আমি ভালো ডাক্তার!! এরা কর্ম-সর্বস্ব নয়, প্রচার-সর্বস্ব। ওদের বাহাদুরীপূর্ণ বক্তৃতা শুনলে আপনি তাক লেগে যাবেন। ওরা বলে রাইফেলের গুলি মিস হতে পারে, আমার গুলি মিস নেই। চ্যালেঞ্জ করলাম, দেশের সকল এম. বি. বি. এস. ডাক্তারকে বাবার বেটা হয়ে থাকলে আমার ঔষধে ভুল দেখাও।

এবার বুঝে থাকলে বলুনতো! সত্যিকারের ডাক্তার কর্ম-সর্বস্ব, না প্রচার-সর্বস্ব? কর্ম-সর্বস্ব। ভণ্ড ডাক্তার প্রচার-সর্বস্ব না কর্ম-সর্বস্ব? প্রচার-সর্বস্ব। ঠিক তেমনিভাবে কামিল পীর কর্ম-সবর্স্ব আর ভণ্ডপীর প্রচার-সর্বস্ব। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উম্মতের চতুর্থ দায়িত্বটা আল্লাহ্ কি দিলেন?

নাপাক আত্মাকে পাক পবিত্র করে দেবেন। মানুষের আত্মার ভিতরে আল্লাহ্ পরস্পর বিরোধী দু'টি অনুভূতি শক্তি দান করেছেন। একটা হল, পাপের মজা বুঝার অনুভূতি আর একটা হল, পাপের সাজা বুঝার অনুভূতি। প্রত্যেকটি পাপের দু'টি করে ফলাফল আছে। একটা মজা আরেকটা সাজা।

জানোয়ারেরা শুধু মজা বুঝে সাজা বুঝে না। এ জন্য জানোয়ারের দল কোন পাপের কাজ করলে সাজা হবে না। ফিরিশতার দল কোনও পাপের কাজ করলে সাজা হবে না। ফিরিশতারা শুধু সাজা বুঝে মজা বুঝে না। এজন্য আজীবন পাপ থেকে বিরত থাকলেও ফিরিশতারা পুরস্কারের যোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে মানুষকে আল্লাহ্ বলেন,

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا

এই এতগুলো কসম খেয়ে আল্লাহ্ বলেছেন- মানুষের আত্মার মাঝে পাপের মজা বুঝারও যোগ্যতা দিয়েছি, পাপের সাজা বুঝারও যোগ্যতা দিয়েছি। এর মাধ্যমে আমি মানুষকে পরীক্ষা করবো মজার লোভে পাপ করে, না সাজার ভয়ে পাপ ছেড়ে দেয়।

যদি মজার লোভে পাপ করে, তা হলে আমার পরীক্ষায় ফেল করে জাহান্নামে যাবে, আর সাজার ভয়ে যদি পাপ ছেড়ে দেয়, তা হলে আমার পরীক্ষায় পাশ করে পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে জান্নাতে যাবে।

পাপের মজা অতি অল্প সময়। সাজা অনেক দীর্ঘ। মজা আর সাজা সমান সমান নয়। আকাশ-পাতাল ব্যবধান। মজাটা ছোট আর সাজাটা বড়। বুঝার জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি: ফজরের নামাযের সময় আযানে ঘুম ভাঙল। কিন্তু নামাযে গেলে ঘুমের মজা নষ্ট হয়।

এজন্য আযান শুনল নামাযে গেল না আরো ঘুমাল এক ঘণ্টা। ফজরের নামাযে না গিয়ে এক ঘণ্টা মজা ভোগ করল। এই লোকটা কি এক ঘণ্টার জন্য জাহান্নামে যাবে? দুই কোটি আটাশি লক্ষ বছরের জন্য জাহান্নামে যাবে! তাহলে ফযরের নামায না পড়ার মজা কত? এক ঘণ্টা। সাজা কত? দুই কোটি আটাশি লক্ষ বছর।

এক ঘণ্টার মজা আর দুই কোটি আটাশি লক্ষ বছরের সাজা। এ কথা বুঝার পরে যে ব্যক্তি দু'কোটি আটাশি লক্ষ বছর সাজার পরওয়া করে না,

এক ঘণ্টা মজার জন্য ঘুমিয়ে থাকে, তার বিবেকটা তাজা না পঁচা? পঁচা। পঁচা জিনিস পাক না নাপাক? নাপাক।

এই জন্যই মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, যেই লোক পাপের সাজার ভয় করে না, অল্প মজার লোভে পাপ করে, তার আত্মাটা নাপাক। যখন পাপের সাজার ভয় করে না, মজার লোভে পাপ করে, তখন আত্মাটা হয় নাপাক। এই নাপাক আত্মাটাকে পাক করে দেওয়া রাসূলের চার নম্বর দায়িত্ব। শরীয়তের বিধান থাকবে তার কর্তা, আর নিজের আত্মাকে করবে অধীন। যখন শরীয়তের বিধানকে করবে অধীন, নিজের আত্মাকে করবে কর্তা,

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন সেই ব্যক্তি সত্যিকারের মুমিন নয়। আল্লাহ্পাক আপনাকে আমাকে সবাইকে আত্মাকে অধীন করে শরীয়তের বিধানকে কর্তা করে আমাদের সত্যিকারের মুমিন হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। সবাই বলুন আমীন॥

(সংকলন কাল : ১৩ জুন ২০০৯ ঈসায়ী)

মাওয়ায়েজে হাসানাহ

খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,

তরজমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত

মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান—১

নামায পাপ থেকে ফিরায় না কেন?

আয়োজনে ঃ মজলিসে দাওাতুল হক কাতার

পৃষ্ঠপোষকতায়ঃ ধর্ম মন্ত্রনালয়, কাতার সরকার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَ اِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

সম্মানিত কাতারপ্রবাসী বাংলাদেশী মুসলমান ভাইসব !

প্রকৃত পক্ষে দুনিয়ার সমস্ত মানুষই প্রবাসী। এই দুনিয়া কোনো মানুষের স্থায়ী ঠিকানা নয়। যারা নির্ধারিত একটা ডিউটি করার জন্য বাংলাদেশ থেকে কাতার এসেছেন, আপনারা হয় তো ভাবছেন– এদেশে দায়িত্ব-কর্তব্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে আপনারা নিজেদের বাড়ী-ঘরে চলে যাবেন বা অন্য দেশে চলে যাবেন। হ্যাঁ, যেতে পারেন কিন্তু যে দেশে যাবেন, সেই দেশটাও আমাদের বাড়ী-ঘর নয়। দুনিয়ার যে মানুষই এই দুনিয়ার বাড়ী-ঘরকে নিজের বাড়ী-ঘর মনে করছে, সেই বাড়ী-ঘরে কখনও থাকতে পারবে না। প্রত্যেকটা মানুষের চিরস্থায়ী বাড়ী পরকালের জান্নাতে।

মুফাস্সিরীনে কেরাম তাফসীরের কিতাবে লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে যত সংখ্যক মানুষ সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটা মানুষের জন্য জান্নাতে একটা করে বাড়ী বরাদ্দ করেছেন, এটাই তার স্থায়ী বাড়ী, এটাই তার স্থায়ী ঠিকানা। কিন্তু জান্নাতে প্রত্যেক মানুষের জন্য যে বাড়ী বরাদ্দ করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র একটা পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে

www.tolaba.com

না, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই বাড়ী তাকে দেওয়া হবে না। সেই পরীক্ষাটা কি ? মানুষকে আল্লাহ্ দুনিয়াতে একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য পাঠিয়েছেন সেই সময়টা আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে অতিবাহিত করার জন্য। যে দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ্ মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সেই দায়িত্ব যারা পালন করবে, তারাই আল্লাহ্র পরীক্ষায় পাশ করবে। তারাই পরকালে জান্নাতের বরাদ্দকৃত বাড়ীর ভাগিদার হবে। কিন্তু দুনিয়াতে আসার পর যারাই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তি ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে দুনিয়ার অস্থায়ী রঙ-তামাশাতে লিপ্ত হয়ে এটা যে তার স্থায়ী ঠিকানা নয় তার স্থায়ী ঠিকানা যে জান্নাতে একথাটা ভুলে যাবে, তাদের জন্য জান্নাতে যে বাড়ী বরাদ্দ করা হয়েছে, সেই বাড়ী থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেওয়া হবে।

তাদের মরণকালে তাদের জান কবজ করার সময় জান্নাতে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বাড়ী দেখিয়ে বলা হবে, এই বাড়ীটা তোমার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল, এই বাড়ী তালাশ করার জন্য একটা নির্ধারিত সময়ে ইবাদত করার দায়িত্ব দিয়ে তোমাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তুমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের রঙ-তামাশা পেয়ে পরকালের চিরস্থায়ী সুখ শান্তির কথা ভুলে গিয়েছিলে। এজন্য মরণকালে তোমাকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে: তোমার জন্য জান্নাতে যে বাড়ী বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই বাড়ী থেকে তোমাকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করা হল। এই ঘোষণা দিয়ে তার জান কবজ করা হবে।

এজন্য আমি বলেছি, বাংলাদেশের যারা কাতারে অবস্থান করছেন, শুধু আপনারাই প্রবাসী নন, এই দুনিয়ার প্রতিটি মানুষই প্রবাসী। আপনারা ভাবতে পারেন বাংলাদেশে আপনাদের বাড়ী-ঘর আছে, কিন্তু সেই বাড়ী-ঘর আপনাদের স্থায়ী কোনো বাড়ী-ঘর নয়। দুনিয়ার কোনো মানুষের স্থায়ী বাড়ী-ঘর এই দুনিয়াতে নেই। দুনিয়ার প্রত্যেকটা মানুষের স্থায়ী ঠিকানা জান্নাতে। এই ঠিকানা লাভ করার জন্য, এই ঠিকানা হাসিল করার জন্য মাত্র কিছু দিনের দায়িত্ব নিয়ে এই দুনিয়াতে এসেছেন।

বিষয়টাকে সহজে উপলব্ধি করার জন্য আমি কাতার প্রবাসী ভাইদের জীবনের একটা উদাহরণ পেশ করছি। ধরুন এক ব্যক্তির বাড়ী ছিল

বাংলাদেশে। কাতারে রুজি রোজগার করার জন্য আসতে তাকে বাংলাদেশের জমি বিক্রি করতে হয়েছে, বাড়ী বিক্রি করতে হয়েছে, অনেক কিছু বিক্রি করতে হয়েছে। অধিকাংশ প্রবাসীরা এমনিভাবে প্রবাসে আসেন। কেউ ঋণ করে আসেন, কেউ জমি বিক্রি করে আসেন, কেউ বাড়ী বিক্রি করে আসেন। যাদের লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা আছে, তারা বিদেশের বাড়ীতে চাকুরী করার দরকার মনে করে না।

তাই সাধারণত যারা প্রবাস জীবনে রুজি রোজগারের উদ্দেশ্যে আসেন, হয়তো ঋণ করে আসেন, না হয় জমি বিক্রি করে আসেন, না হয় বন্ধক দিয়ে আসেন, না হয় বাড়ী বন্ধক দিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য এখানে যদি ১০ বছর চাকুরী করা যায়, ২০ বছর, ৩০বছর এখানে যদি রুজি-রোজগার করা যায়, তাহলে যে জমি বিক্রি করা হয়েছে, যে জমি বন্ধক দেওয়া হয়েছে, যে বাড়ী বিক্রি করা হয়েছে, তা এখানের ডিউটির বেতন দিয়ে আবার খরিদ করা যাবে।

এই চিন্তাধারার মাধ্যমে যারা এখানে রুজি রোজগারের জন্য এসেছেন, এখানে আসার পরে যদি চাকুরীর সময় চাকুরী করে না, ডিউটির সময় ডিউটি করে না, ডিউটির সময় আমোদ-প্রমোদ, রঙ-তামাশায় ভোগ-বিলাসে কাটিয়ে দেন, এভাবেই যদি আপনার ২০ বছরের সময় শেষ হয়ে যায়। যেহেতু আপনি এখানে নির্ধারিত ২০ বছরের সময়ের জন্য এসেছিলেন, ২০ বছরের সময় আপনার রঙ-তামাশায় কেটে গেল, ডিউটি পালন করলেন না।

এমতাবস্থায় আপনার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আপনি যখন বাধ্য হয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাবেন, তখন সেখানে গিয়ে নতুন জমি, সম্পত্তি খরিদ করবেন দূরের কথা, যেই জমি বিক্রি করে এসেছিলেন, যেই জমি বন্ধক দিয়ে এসেছিলেন, তা-ও ফেরৎ পাবেন না। হুবহু একই অবস্থা সারা দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের। আল্লাহ্ বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

প্রত্যেকটা মানুষের যা তার আমলের বিনিময়ে বন্ধক দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ এই দুনিয়ার আসার পরে যেই ব্যক্তি নেক আমল করবে, সেই ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে তার জান্নাতের ঠিকানা পাবে। পক্ষান্তরে এই

দুনিয়াতে আসার পরে যারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী রঙ-তামাশাতে পরকাল ভুলে গেল, মরণ ভুলে গেল, তারা মরণের পরে জান্নাতের ঠিকানা পাবে না। তারা দুনিয়াতে যে অপকর্ম করেছিল, সেই অপকর্মের জন্য তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তুমি এই দুনিয়াতে প্রবাসীর মত জীবন যাপন করো, মুসাফিরের মত জীবন-যাপন করো। যেহেতু এই দুনিয়া তোমার স্থায়ী ঠিকানা নয়। অথচ দুঃখের বিষয় হল এই দুনিয়াতে আসার পর অধিকাংশ মানুষ এই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী রঙ-তামাশায় আমোদ-প্রমোদ আর ভোগ-বিলাসে পরকাল ভুলে যায়। এই সমস্ত পরকাল ভুলা মানুষদেরকে আল্লাহ্ উদ্দেশ্য করে পবিত্র কুরআনে বলেন,

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى (الأعلى/١٦-١٩)

তোমরা যারা দুনিয়াতে পরকাল ভুলে যাও ভালো করে স্মরণ রেখো, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আর পরকালের ভোগ-বিলাসের দু'টা পার্থক্য আছে। একটা পার্থক্য হল দুনিয়ার ভোগ-বিলাস হল, বড় তুচ্ছ বড় নিম্নমানের, আর পরকালের ভোগ-বিলাস বড় উচ্চ অনেক উন্নতমানের।

দ্বিতীয় পার্থক্য হল, দুনিয়ার তুচ্ছ ভোগ-বিলাসও একদিন ফুরিয়ে যায়, চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আর পরকালের উন্নত মানের ভোগ-বিলাস স্থায়ী থাকে বাকী থাকে; কোনো দিন ফুরায় না।

সুতরাং যারা দুনিয়ার তুচ্ছ ভোগ-বিলাস আর আমোদ-প্রমোদের সামগ্রী পেয়ে পরকালের চিরস্থায়ী ভোগ-বিলাসের কথা ভুলে যায়, তাদের মতো বোকা, তাদের মত নির্বোধ, তাদের মত বে আকল জগতে আর কেউ হতে পারে না।

এ সমস্ত পরকাল ভুলা মানুষদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত লাখের বেশী নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।

সমস্ত নবী-রাসূল দুনিয়াবাসীকে যে সমস্ত ওয়াজ নসীহত করেছেন, সকল ওয়াজ-নছিহতের সারমর্ম হল, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আর তুচ্ছ ভোগ-বিলাস পেয়ে চিরস্থায়ী পরকাল ভুলে যেয়ো না। আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى

পূর্ববর্তী নবীদের কাছে যে সমস্ত আসমানী কিতাব নাজিল হয়েছিল, সেই সমস্ত আসমানী কিতাবে এই নসীহতটাই করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম আ.-এর কাছে যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড কিতাব নাজিল করা হয়েছিল, সেই কিতাবগুলোতেও মৌলিকভাবে এই নসীহতটাই করা হয়েছে। হযরত মূসা আ.-এর কাছে যে কিতাব নাজিল করা হয়েছিল, সেই তাওরাত কিতাবেও মৌলিকভাবে এই নসীহতটাই করা হয়েছে।

দুনিয়ার রঙ্গ-তামাশা পেয়ে পরকাল ভুলে যেয়ো না। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস নিম্নমানের আর পরকালের ভোগ-বিলাস অনেক উন্নত, অনেক উচ্চমানের। উন্নতমানের চিরস্থায়ী ভোগ-বিলাস ভুলে গিয়ে ক্ষণস্থায়ী নিম্নমানের ভোগ-বিলাসে তোমরা মত্ত হয়ো না। এটাই হল সমস্ত নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক দুনিয়াবাসী মানুষকে যত নসীহত করেছেন সকল নসীহতের সারমর্ম।

এ সমস্ত নবী-রাসূলের মাঝে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন আমাদের নবীকে সকল নবীর মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছেন। আর আমাদেরকে সকল নবীর উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে মর্যাদা দান করেছেন। এমর্মে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতেরা! তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। মুফাস্সিরীনে কেরাম আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, সকল নবীর উম্মতের চেয়ে এই নবীর উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ কেন?

এর বিভিন্ন কারণ আছে। এর মাঝে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কারণ হল, অন্য নবীর উম্মতেরা দুনিয়াবাসীর উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে পরকালের জীবন সংক্রান্ত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালু রাখতে পারে নি। মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সর্বশেষ নবী তার পরে এই দুনিয়াতে আর কেউ নবী হবে না। এ জন্য কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াবাসীর উদ্দেশ্যে পরকাল সংক্রান্ত ব্যাপারের দাওয়াত ও তাবলীগ এই নবীর উম্মতেরা চালু রাখবে।

এজন্য এই নবীর উম্মত সকল নবীর উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান কোনো নবী ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর কোনো নবীর উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

এই যে এত বড় মর্যাদা আমাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দেওয়া হল। এর পরও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হিসেবে সর্বশেষ নবীর উম্মত হিসেবে আমরা যদি দুনিয়াবাসীকে পরকাল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মত ওয়াজ নসীহত করা দূরের কথা, দাওয়াত-তাবলীগ করব দূরের কথা আমরা যদি নিজেরাই পরকাল ভুলে যাই দুনিয়ার রঙ্গ-তামাশাতে মত্ত সবচেয়ে ভাল জিনিস যদি নষ্ট হয়।

সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত যে দাওয়াত ও তাবলীগের কারণে সর্বশ্রেষ্ঠ হল, সেই দাওয়াত ও তাবলীগের কথা যদি ভুলে যায়, পরকাল যদি ভুলে যায় তাহলে তার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কেউ হতে পারে না। আপনারা জানেন মানুষ জাতিকে আল্লাহ্ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ আশরাফুল মাফলুকাত মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু সেই মানুষ যে কারণে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকবে না, পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে সুখী হওয়ার চেষ্টা করবে।

এজন্য মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। যে কারণে মানুষ শ্রেষ্ঠ সেই কারণ যদি মানুষ ভুলে যায়, আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে সেই মানুষকে যেই মানুষ ছিল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সেই মানুষকে জীব জানোয়ারের চেয়েও, চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও আরো নিকৃষ্ট আখ্যায়িত করেছেন।

এ মর্মে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَايُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَايَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ (الأعراف/١٧٩)

আল্লাহ্ বলেন, অধিকাংশ মানব-দানবের জন্য আমি জাহান্নাম তৈরী করেছি। এরা কারা? যাদেরকে অন্তর দিয়েছি, শ্রেষ্ঠত্ব বুঝার মত, কিন্তু অন্তরকে সেই "বুঝার" কাজে ব্যবহার করে না, যাদের কর্ণ দিয়েছি কিন্তু কান এই কথা শোনার কাজে ব্যবহার করে না, যাদেরকে চক্ষু দিয়েছি কিন্তু সেই চক্ষু 'নিদর্শন' দেখার জন্য ব্যবহার করে না, আল্লাহ্ বলেন,

اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ

এদের জীবন-যাপন চতুষ্পদ জন্তুর মতো। চতুষ্পদ জন্তু যেমন দুনিয়াতে ক্ষিদে লাগলে ইচ্ছেমতো খেতে পারলে, ক্লান্তি আসলে ইচ্ছামতো ঘুমুতে পারলে, যৌবনের উত্তেজনার বেলায় ইচ্ছামতো তা নিবারণ করতে পারলে, দুনিয়াতে আর কিছু চায় না।

কোনো মানুষ যদি এই রকমের স্বভাবের অভিকারী হয়ে যায়, ইচ্ছামতো খেতে পারলে, ইচ্ছামতো ঘুমুতে পারলে, ইচ্ছামতো যৌবনের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারলে তার দুনিয়াতে চাওয়ার আর কিছু মনে করে না আর কিছু পাওয়ার আছে মনে করে না, এ সমস্ত মানুষে আর চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। এজন্য আল্লাহ্ বলেন-

اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ

এরা চতুষ্পদ জন্তুর মতো। পরবর্তী অংশে বলেন, بَلْ هُمْ اَضَلُّ বরং ঐ সমস্ত মানুষেরা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে আরো নিকৃষ্ট। কেননা কোনো জীব-জন্তু জাহান্নামে যাবে না।

এই সমস্ত মানুষেরা চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে। আপনারা কি মনে করেন, যে সমস্ত মানুষ চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে, এরা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে উৎকৃষ্ট না নিকৃষ্ট? নিকৃষ্ট।

এজন্য আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন,

اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ

"এদের জীবনযাত্রা দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তুর মতো হলেও বাস্তবিক মূল্যায়ণে এরা আরো ভ্রষ্ট আরো নিকৃষ্ট।"

কারণ চতুষ্পদ জন্তুর দল খাওয়া, ঘুমানো আর বাচ্চা জন্ম দেওয়ার কাজে ব্যস্ত রয়েছে দুনিয়াতে, তাদের পরকাল বুঝার মতো যোগ্যতা ছিল না, পরকাল বুঝা তাদের কোনো দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু মানুষকে পরকাল বুঝার যোগ্যতা দান করা হয়েছে, পরকাল বুঝে চিন্তা-ভাবনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং মানুষ যদি পরকাল ভুলে যায়, সেই মানুষ জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়। হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে 'কুকুর' বলেছেন 'কুকুর'। পরকাল ভুলা মানুষ দুনিয়ার কুকুরের মরা গরু খাওয়ার মতো। আর পরকাল ভোলা মানুষ কুকুরের মতো। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, এই দেশের পরিবেশ-পরিস্থিতি আমার জানা নেই।

বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে গরু যখন মরে যায়, তখন সেই মরা গরু মাঠে ফেলে দেয়। মাঠে ফেলে দেওয়া মরা গরু সাধারণত তিন প্রকার জানোয়ার খায়। শকুনে খায়, শিয়ালে খায়, কুকুরে খায়। কিন্তু পরিত্যক্ত মরা গরু শকুন দিনে রাতে ২৪ ঘণ্টা খায় না। শকুন শুধু দিনের বেলা মরা গরু খায়। রাতের বেলা শকুন মরা গরু খায় না। রাতের বেলায় শকুন তার আসল ঠিকানা গাছের ডালে যায়।

আর শিয়াল মরা গরু খায়, দিন রাত ২৪ ঘন্টা খায় না। শিয়াল শুধু রাতের বেলায় মরা গরু খায়। দিনের বেলায় তার আসল ঠিকানা জঙ্গলে যায়। কিন্তু কুকুর যে মরা গরু খায়, রাতের বেলায়ও খায়, দিনের বেলায়ও খায়। বাকী জীবন কোন মালিক পালল, কোন মালিকের বাড়ীতে রইল, বাড়ী ভুলে যায়, ঠিকানাও ভুলে যায়।

দেখা গেল, শকুন মরা গরু খেলেও ঠিকানা ভুলে না, শিয়াল মরা গরু খায় কিন্তু ঠিকানা ভুলে না। 'কুত্তা'ও মরা গরু খায় কিন্তু তার ঠিকানা ভুলে যায়। যেমনভাবে একদল মানুষ দুনিয়ার রঙ্গ-তামাশায় মত্ত হয়ে পরকাল ভুলে যায়। সুতরাং পরকাল ভুলা মানুষ শকুনের তূল্য নয়, পরকাল ভুলা মানুষ শিয়ালের তূল্য নয়, পরকাল ভুলা মানুষ কুকুরের তূল্য।

দুনিয়ার জীবনযাত্রার বেলায় তারা কুকুরের মতো হলেও তারা কুকুরের চেয়ে আরো নিকৃষ্ট। কিভাবে তারা কুকুরের চেয়েও আরো নিকৃষ্ট কথাটা আরো পরিষ্কারভাবে বুঝার জন্য আমি আপনাদের সামনে একটা উদাহরণ তুলে ধরছি।

হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান হাশরের মাঠে সমস্ত মানুষকে জিন্দা করে দাঁড় করানো হবে আর সমস্ত জন্তুকেও জিন্দা করে দাঁড় করানো হবে। মানুষ জাতিরও বিচার হবে পশু জাতিরও বিচার হবে হাশরের মাঠে। কিন্তু মানুষ জাতি আর পশু জাতির বিচারের পদ্ধতি ভিন্ন হবে, একটা শক্তিশালী একটা দুর্বল পশুকে আঘাত করে। সেই আঘাতের প্রতিশোধ সে আর কখনো নিতে পারে না। সেই আঘাতকারী আর আঘাতপ্রাপ্ত দু'টাই মারা যায়।

আপনারা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, শক্তিশালী একটা কুকুরের সামনে যদি একটা দুর্বল কুকুর দুর্ভাগ্যবশতঃ পড়ে যায়, তাহলে শক্তিশালী কুকুর দুর্বল কুকুরকে তার ইচ্ছেমতো অত্যাচার করে জুলুম করে আঘাত করে; দুর্বল কুকুরটা তার কোনো প্রতিশোধ নিতে পারে না। এমনিতেই উভয় কুকুরের জীবন শেষ হয়ে যায়। আপনাদের বিবেক কি বলে আপনাদের ইনসাফ কি বলে এই মজলুম কুকুরটার বিচার পাওয়ার দরকার আছে, না দরকার নেই?

মজলুম কুকুরটাও মারা গেল, জালিম কুকুরটাও মারা গেল, বিচার হল না, তাহলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হল কোথায়? আল্লাহ্‌র রাজ্যে জুলুম হবে অথচ তার বিচার হবে না, সেটা আল্লাহ্ বরদাশত করবেন না। এজন্য জালিম জানোয়ার কেও জিন্দা করে উঠানো হবে মজলুম জানোয়ারকেও জিন্দা করে উঠানো হবে হাশরের মাঠে। সমস্ত মজলুম জানোয়ারের পক্ষ থেকে জালিম জানোয়ারদের সেই জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তারপরে সমস্ত জীব-জন্তুকে বলা হবে-

كُونُوا تُرَابًا

তোমরা মাটির সাথে মিশে যাও। তোমরা চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে যাও।

তারপর সমস্ত জীব-জন্তু মাটির সাথে মিশে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে যাবে। এ বিচারটা হবে মানুষের সামনেই

পশুদের বিচারকার্য সমাধা করার পর আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন মানুষের বিচার করবেন। মানুষের বিচারের পদ্ধতি হবে ভিন্ন।

মানুষদের মাঝে যারা দুনিয়াতে পরকাল ভুলে নি, পরকালকে সফল করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যারা কাজ করেছিল তাদেরকে আদেশ করা হবে জান্নাতে যাওয়ার জন্য। যারা দুনিয়াতে আসার পর ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসে পরকাল ভুলে গিয়েছিল, পরকালে সুখী হওয়ার জন্য যেই দায় দায়িত্ব ছিল এরা তা মানে নি, কাজ করে নি। এ সমস্ত মানুষগুলোকে আদেশ করা হবে চিরকালের জন্য জাহান্নামে যেতে। এরা জাহান্নামে যাবে আর আক্ষেপ করবে আর বলবে– يَالَيْتَنِى كُنْتُ تُرَابًا

হায়রে আমার পোড়া কপাল! যেই রকমের মানুষ হয়ে চিরকালের জন্য জাহান্নামে যেতে হয়, এরকমের মানুষ না-হয়ে যদি কুকুর, শৃগাল, বিড়াল, গাঁধা হতাম। যে সমস্ত কুকুরের জাহান্নাম নেই, শিয়ালের জাহান্নাম নেই, গরু গাধাঁর জাহান্নাম নেই ঐ সমস্ত গরু গাঁধা হয়ে মাটির সাথে মিশে যেতাম খুবই ভালো হত। এ রকম মানুষ না হয়ে যে মানুষ হওয়ার কারণে আজ চিরকালের জন্য জাহান্নামে যেতে হচ্ছে।

হাশরের মাঠের এ বিচার পদ্ধতি আমার উদাহরণের মাধ্যমে আশা করি আপনারা সুস্পষ্ট বুঝতে পারছেন। যে সমস্ত মানুষ দুনিয়ার রঙ্গ-তামাশা পেয়ে পরকাল ভুলে যায় এদের চেয়ে জীব-জন্তু ভালো।

ফেরাউন নমরূদ কারুনের নাম আপনারা শুনে থাকবেন, আবু জেহেল আবু লাহাবের নাম আপনারা শুনে থাকবেন। এরা চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে। এরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার রঙ্গ-তামাশা পেয়ে পরকাল ভুলে গিয়েছিল।

আপনারা আমার কথা বুঝে থাকলে দয়া করে জবাব দিবেন পরকালের বিচারে ফেরাউনের কপাল বেশী ভালো গণ্য হবে, না একটা কুকুরের কপাল ফেরাউনের চেয়ে ভালো গণ্য হবে ? পরকালের বিচারে ফেরাউনের চেয়ে কুকুরের কপাল অনেক ভালো। নমরূদের চেয়ে কুকুর অনেক ভালো। আবু জেহেল আবু লাহাবের চেয়ে শৃগাল-বিড়াল, গরু-গাঁধা অনেক ভালো।

কারণ, আবু জেহেল আবু লাহাবের কপালে চিরস্থায়ী জাহান্নাম আছে। নমরূদ ফেরাউনের কপালে চিরস্থায়ী জাহান্নাম আছে। দুনিয়ার কোনো কুকুরের কপালে জাহান্নাম নেই, দুনিয়ার কোনো শৃগাল-বিড়াল গরু-গাঁধার কপালে জাহান্নাম নেই।

এজন্য আল্লাহ্ কুরআনে এদেরকে পশু জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট বলেছেন। আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মতো সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হয়ে যদি যে কারণে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, সেই কারণটা ভুলে যাই, তাহলে সেই শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের থাকবে না।

এজন্য বলেছিলাম, শ্রেষ্ঠ জিনিস নষ্ট হলে নিকৃষ্টের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। আমাদেরকে যদি আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হয়, মানুষ হিসেবে আমাদের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বজায় রাখতে হয়, সকল নবীর উম্মতের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হলে আমাদেরকে পরকালের শান্তি এবং মুক্তির জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ্র হুকুম এবং নবীর তরীকা পালন করতে হবে।

আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে সেই মর্যাদা বজায় রাখতে হলে শুধু নিজেরাই ইবাদত করলে চলবে না, যারা দুনিয়াতে ইবাদত ভুলে যায়, যারা রঙ্গ-তামাশা পেয়ে নামায বন্দেগী ভুলে যায়, তাদেরকে নামায-বন্দেগীর দাওয়াত দিতে হবে।

পরকালের শান্তি এবং মুক্তির পথে তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে। নিজেরা যদি ইবাদত করি মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব হয়ত বজায় রাখা সম্ভব হবে কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র উম্মত হওয়ার সেই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে না।

কাজেই মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বজায় রাখতে হলে নিজেরা যথাযথ আল্লাহ্র ইবাদত ও বন্দেগী করতে হবে, আর শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বজায় রাখতে হলে অপরকেও যারা দুনিয়ার রঙ্গ-তামাশায় লিপ্ত হয়ে পরকাল ভুলে যায়, তাদেরকে পরকালের দাওয়াত দিতে হবে।

এ দাওয়াতের দায়িত্ব অনুভব করেই প্রবাসী বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানদের নওজোয়ানদের মাঝে একটা দল মজলিসে দাওয়াতুল হক' অনেক পরিশ্রম করে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে সুদূর বাংলাদেশ থেকে আমাকে আপনাদের খেদমতে হাজির করার ব্যবস্থা করেছেন। কাতার প্রবাসী বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানদের নওজোয়ানদের যেই দল 'মজলিসে দাওয়াতুল হক' নামে আমাকে আপনাদের সামনে হাজির করার জন্য চেষ্টা করেছেন ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এই কাতার সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়।

কাতার সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মজলিসে দাওয়াতুল হকের সহযোগিতায় আমি সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপাড় সুদূর বাংলাদেশ থেকে মাত্র দু'সপ্তাহের জন্য আপনাদের খেদমতে হাজির হয়েছি।

আমি আমার মূল বক্তব্য পেশ করার আগে বক্তব্য সহজে অনুধাবন করার জন্য দীর্ঘ ভূমিকা আপনাদের সামনে পেশ করেছি। আশা করি ভূমিকাটা বুঝে থাকলে আমার আলোচ্য বিষয়টা বুঝা আপনাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কুরআনের এক আয়াতের সামান্য অংশ তিলাওয়াত করেছি। তিলাওয়াতকৃত আয়াতাংশে আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয়ই নামায সকল প্রকার অশ্লীল কাজ থেকে এবং সকল প্রকার অবৈধ কাজ থেকে নামাযীকে বিরত রাখে, বারণ করে, ফিরিয়ে রাখে।

সারমর্ম হল, নামায নামাযীকে সকল পাপ থেকে ফিরিয়ে রাখে। এই আয়াতের সরল সহজ সারমর্ম শোনা মাত্রই আমাদের বর্তমান সমাজের অনেক নামাযীর নামাযের বেলায় প্রশ্ন জাগে, তারা তো আযান পড়লে মসজিদে যায়, জামাতের সাথে নামায পড়ে, কিন্তু নামায শেষ করে মসজিদ থেকে বের হয়ে যত রকমের পাপ আছে সকল প্রকার পাপে অংশগ্রহণ করে।

আপনারা কি মনে করেন, বর্তমান সময়ে মুসলমানদের সমাজে এমন নামাযী আছে? আছে।

নামাযও পড়ে পাপও করে, নামাযও পড়ে পাপও করে। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন নামায পাপ থেকে ফিরিয়ে রাখে। তাহলে যে সমস্ত মুসলমানেরা নামাযও পড়ে পাপও করে এদের নামায এদেরকে পাপ থেকে ফিরায় না কেন?

আমি আজ এই একটি মাত্র প্রশ্নের জবাব আপনাদের সামনে পেশ করব। তার নামাযই সকল পাপ থেকে ফিরায়। প্রশ্ন জাগে সেই সমস্ত নামাযীর বেলায় যারা নামাযও পড়ে পাপও করে তাদেরকে নামায পাপ থেকে ফিরায় না কেন? কিন্তু বর্তমান সমাজের অধিকাংশ মুসলমান নামাযই পড়ে না। যারা মুসলমান হয়েও নামাযই পড়ে না তারা কোন রকমের মুসলমান।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে,

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ

নামায দ্বীনের স্তম্ভ

مَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ

যে ব্যক্তি নামায কায়েম করল সে তার ধর্মের স্তম্ভ মজবুত করল

وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ

আর যেই ব্যক্তি নামায ছেড়ে ছিল সেই ব্যক্তি ধর্মের স্তম্ভকে ধ্বংস করে দিল। সুতরাং যেই মুসলমান নামাযই পড়ে না সেই মুসলমান কেমন মুসলমান হল?

ভিন্ন হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান,

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ عَامِداً اَوْقَالَ مُتَعَمِّداً اُلْقِىَ فِى النَّارِ

যেই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিল তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

ভিন্ন হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান –

اَلصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ

নামায বেহেশতের চাবি।

উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন,হে আল্লাহ্র রাসূল! ইসলাম ধর্মের সর্বমোট ভিত্তি হল ৫টি।

প্রথম ভিত্তি হল কালেমা বিশ্বাস করা,

দ্বিতীয় ভিত্তি নামায কায়েম করা।

প্রথম ভিত্তি কালেমা কেন বেহেশতের চাবি হলো না। নামায কেন বেহেশতের চাবি হল?

জবাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান আসলে কালেমাই বেহেশতের চাবি। নামায হল এই চাবির দাঁত। যার অন্তরে কালেমার বিশ্বাস আছে, তার কাছে বেহেশতের চাবি আছে।

কিন্তু নামাযের আমল নেই, সেই চাবির দাঁত নেই। আপনারা কি মনে করেন, কোনো তালা খোলার জন্য যে চাবি ব্যবহার করা হয়, ঐ চাবির দাঁত যদি কেউ ভেঙ্গে ফেলে দাঁতভাঙ্গা চাবি দিয়েও কি তালা খোলা যায়? যায় না।

সুতরাং রাসূলের হাদীসের দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে মুসলমান কালেমা বিশ্বাস করে, নামায পড়ে না তার কাছে বেহেশেতের চাবি আছে। কিন্তু নামায ছেড়ে দিয়ে তার চাবির দাঁত ভেঙ্গে ফেলে দিল। এই মুসলমান জাহান্নামে না যাওয়া পর্যন্ত এই দাঁতভাঙ্গা চাবি দিয়ে বেহেশতের তালা খোলা যাবে না।

আর যে সমস্ত মুসলমান মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নামায পড়ে না, আমার জানামতে বর্তমান দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান নামাযই পড়ে না। যারা নামায পড়ে তাদের বেলায় প্রশ্ন এদের নামায এদেরকে পাপ থেকে ফিরায় না কেন?

যারা নামাযই পড়ে না তাদের বেলায় প্রশ্ন, এরা কেমন মুসলমান? মুসলমান হওয়ার দাবি করে সে নামাযই পড়ে না, সে কেমন মুসলমান?

ভিন্ন হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান, مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ عَامِدًا اَوْقَالَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

মুসলমানের আমল হল নামায পড়ার আমল আর বেদ্বীন কাফেরের আমল হল নামায না-পড়ার আমল। কাফেরের আমলে আর মুসলমানের আমলে সর্বপ্রথম যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য হল নামায।

মুসলমাননের আমলে নামায আছে, কাফেরের আমলে নামায নেই। যে সমস্ত মুসলমানেরা মুসলমান হওয়ার দাবী করে অথচ নামায পড়ে না,

তাদের কাছে মুসলমানের আমল আছে, না কাফেরের আমল আছে? মুসলমানের আমল আছে।

আমল করবেন কাফেরের আর দাবী করবেন মুসলমানের, সে কেমন মুসলমান? কিসের জন্য মুসলমান? গরু খাওয়ার জন্য মুসলমান?

মুসলমানী তো গরু খাওয়ার নাম নয়।

মুসলমানী 'নাম ধারণ' করার নাম নয়।

মুসলমানী কিছু 'কাজের' নাম। কিছু দায়-দায়িত্ব পালন করার নাম।

মুসলমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব হল নামায।

একটা মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর, ইসলামের কালেমা গ্রহণ করার পর সর্বপ্রথম যে ইবাদতটা ফরজ হয়, সেটা হল নামায।

কোনো কোনো হাদীসে পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ আছে হাশরের মাঠে সর্বপ্রথম যেই আমলের হিসাব হবে সেটা হবে নামাজ।

হাশরের বিচারে সর্বপ্রথম নামাযের আমলের হিসাব হবে।

দুনিয়ায় যাদের আমল ভাল হবে মরণকালে তাদের ভাল মরণ হবে। পরকালে তাদের হাশর ভালো হবে।

দুনিয়াতে যাদের আমল ভালো হবে না, মরণকালে তাদের মরণ ভালো হবে না, পরকালে তাদের হাশর ভালো হবে না।

আমার কথা বুঝে থাকলে দয়া করে বলবেন– যে মুসলমান নামায পড়ে না, তার আমল ভালো, না খারাপ?

যদি না বুঝেন সহজে বুঝার জন্য আমি একটা উদাহরণ দেই।

একদল ছাত্র লেখা-পড়া করার পর লেখা-পড়ার পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করার পর পরীক্ষা দেয়।

পরীক্ষার হলে প্রবেশের পর তাদের হাতে যখন প্রশ্নপত্র দেওয়া হল অল্প সংখ্যক ছাত্র প্রশ্নের জবাব দিতে পারল, বেশী সংখ্যক ছাত্র অধিকাংশ ছাত্র প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না।

যে সমস্ত ছাত্র প্রশ্নের জবাব দিতে পারছে না, এরা কি ফলাফল ঘোষণার পরে টের পাবে যে, পরীক্ষায় পাশ, না ফেল,

না পরীক্ষার হলে বসে বসেই মনে মনে টের পাওয়ার কথা?

প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহ্ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য।

কতগুলো আমল করার দায়িত্ব দিয়েছেন, এগুলো করলে পরীক্ষায় পাশ করবে, না করলে পরীক্ষায় ফেল করবে।

মানুষকে যে সমস্ত আমল দিয়েছেন আল্লাহ্ দুনিয়ার জীবনে পরীক্ষা করার জন্য এর মাঝে সর্বপ্রধান আমল হল নামায।

সুতরাং যেই ব্যক্তি দুনিয়ার জিন্দেগীতে নামাজ পড়ে না, সে কি হাশরের মাঠে দাঁড়িয়ে টের পাবে আল্লাহ্র পরীক্ষায় সে পাশ, না ফেল? না দুনিয়ার জমিনে দাঁড়িয়েই মনে মনে টের পাওয়ার কথা?

আমার কথাগুলো বুঝে থাকলে আপনারা দয়া করে বলবেন, আপনারা কি আল্লাহ্র পরীক্ষায় পাশ করতে চান, না ফেল করতে চান? পাশ করতে চাই। পাশ করতে চাইলে কি নামায-বন্দেগী ভুলে গিয়ে থাকলে চলবে, না নামায বন্দেগী ঠিক করতে হবে? নামায বন্দেগী ঠিক করতে হবে।

যে সমস্ত মুসলমানেরা দুনিয়ার রঙ্গ-তামাশা পেয়ে নামায ভুলে গিয়েছেন, আমি তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি, জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে বাঁচার স্বার্থে পরকালে জান্নাত লাভের স্বার্থে আপনারা মেহেরবানী করে নামাজী হয়ে যান।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা যারা নামায পড়ি, আমাদের অধিকাংশের নামায আমাদের পাপ থেকে ফিরায় না।

কেউ নামায বাদ দিয়ে সিনেমা দেখে, কেউ টেলিভিশন দেখে, কেউ ভিডিও দেখে, আর কেউ নামাযের সময়ে মসজিদে এসে নামায পড়ে আর নামাযের আগেও সিনেমা দেখে; নামাযের পরেও সিনেমা দেখে।

কেউ নামায বন্দেগী ছেড়ে দিয়ে বেশ্যাখানায় যায়, আর কেউ আযান পড়লে কোনো রকম মসজিদে এসে নামাযগুলো পড়ার পর মসজিদ থেকে বের হয়েই বেশ্যাখানায় চলে যায়।

যারা নামায ছেড়ে দিয়ে টেলিভিশন দেখে, যারা নামায ছেড়ে দিয়ে সিনেমা দেখে, যারা নামায ছেড়ে দিয়ে বেশ্যাখানায় যায়, যে সমস্ত মুসলমান নারীদেরকে নামায রোযার ধারে-কাছে নেওয়ার চেষ্টাও করে না, বেপর্দা চালায়,

যে সমস্ত পুরুষের অধীনস্থ নারীরা বেপর্দা চলে বেপরওয়াভাবে, কোন পুরুষের সাথে চলে, কার ধারে-কাছে যায়, কি অবস্থায় যায় খবর রাখে না

এই সমস্ত পুরুষদেরকে আল্লাহ্র রাসূল হাদীস শরীফে 'দাইয়ূস' নামে অভিহিত করেছেন।

ভিন্ন হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিয়েছেন 'দাইয়ূস' এর জান্নাত নেই। দাইউসের জান্নাত নেই।

যে পুরুষরা তাদের নারীদেরকে বেপর্দায় চালায় এই পুরুষরা 'দাইয়ূস'। আর যে নারীরা বেপর্দায় চলে সেই সমস্ত নারীরাও 'দাইয়ূস'। হাদীস শরীফে আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন দাইয়ূসের জান্নাত নেই।

চাই তুমি পুরুষ দাইয়ূস হও, চাই তুমি নারী দাইয়ূস হও, কোনো দাইয়ূস বেহেশতে যেতে পারবে না।

কিছু দাইয়ূস আছে নামায বন্দেগী ছেড়ে দিয়েই দাইউসগীরী করে। আর কিছু দাইউস আছে নামাযও আছে, দাইউযীসও আছে। নামাজও পড়ে দাইয়ূসীও ঠিক আছে। যারা নামায পড়ে তারপরেও দাইউযীস থাকে।

যারা নামায পড়ে এরপরেও নিজের স্ত্রীদের বেপর্দায় চলতে দেয়, যে সমস্ত নারীরা নামাযও পড়ে আবার বেপর্দা চলে এই সমস্ত নারী-পুরুষের বেলায় প্রশ্ন জাগে আল্লাহ্ যে কুরআনের আয়াতে বলে দিয়েছেন নামায সব রকমের পাপ থেকে ফিরায়, এ সমস্ত দাইয়ূসদেরকেও এদের নামায এই দাইয়ূসী থেকে ফিরায় না কেন?

এ সমস্ত পাপীষ্ঠদেরকে এদের নামায পাপ থেকে ফিরায় না কেন? সিনেমা দর্শকদের নামায এদের সিনেমা দেখা থেকে ফিরায় না কেন? টেলিভিশন দর্শকদের নামায এদের টেলিভিশন দেখা থেকে ফিরায় না কেন? টেলিভিশনের নাম বললে অনেকেই বলেন, টেলিভিশন দেখা কি নাজায়েয?

টেলিভিশন দেখা জায়েজ না-নাজায়েয, সেই ফতোয়া আপনারা দেবেন। আমি শুধু একটা কথা বলি,

পুরুষের জন্য ভিন্ন নারী দেখা কি জায়েয? জায়েয নয়। যে নারী দেখা নাজায়েয, সেই নারীর ছবি দেখা জায়েয কি?

যেই নারীর ছবি দেখা জায়েয নয়, সেই নারীর ছায়া দেখা জায়েয কি? যেই নারীর ছায়া দেখা জায়েয নয়,

সেই নারীর ছায়া-ছবি দেখা জায়েজ কি?

টেলিভিশনে কি ভিন্ন নারীর ছায়া-ছবি দেখায় না? দেখা যায়।

তাহলে টেলিভিশন দেখা জায়েয, না-নাজায়েয সেই ফতোয়া আমাকে জিজ্ঞেস করেন কেন? اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ নিজের মনকে জিজ্ঞেস করতে পারেন না?

যেই ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল,

সেই স্ত্রীকে আরো তার ঘরে রাখতে পারবে কি না, বুঝার জন্য মুফতী লাগে, না তার মন মুফতী যথেষ্ট ?

যেই লোকেরা টেলিভিশনে নারীর ছায়া-ছবি দেখে এটা জায়েয, না-নাজায়েয বুঝার জন্য মুফতী লাগবে, না তার মন মুফতীই যথেষ্ট ? মনমুফতী বুঝেন ?

মনমুফতী, তোমার মনমুফতীই যথেষ্ট।

অনেক ব্যাপার আছে জানার জন্য মুফতী লাগে না, বিবেকই জানতে পারে এটা কেমন। যে সমস্ত ব্যাপার অবৈধ, যে সমস্ত বিষয়ের অবৈধতা, যে সমস্ত বিষয়ের হুরমত জানার জন্য মুফতীর দরকার নেই; নিজের মন থেকেই জানতে পারা যায় ঐগুলোকে আল্লাহ্ পাক কুরআনে فَحْشَاء বলেছেন।

আর যেগুলো নিজের মন থেকে জানা যায় না যে এটা জায়েয, না-নাজায়েয? হালাল না-হারাম ? বৈধ, না অবৈধ ? করণীয়, না বর্জনীয় ? বুঝার জন্য দলিল লাগে ফতোয়া লাগে,মুফতী লাগে,

ঐগুলোর নিষিদ্ধ যেগুলোকে কুরআনের ভাষায় مُنْكَر বলা হয়েছে।

আর যেগুলো মুফতী লাগে না, ফতোয়া লাগে না, দলিল লাগে না; নিজের বিবেক থেকেই বুঝতে পারা যায়, যে এগুলো অবৈধ এগুলোকে কুরআনের ভাষায় আল্লাহ্ فَحْشَاء বলেছেন। '

ফাহ্‌শা'র বাংলা তরজমা হল বেহায়াপনা।

আল্লাহ্ বলেন, নামায ফাহ্‌শা থেকে ফিরায়, বেহায়াপনা থেকে ফিরায়।

আর 'মুনকার' এর বাংলা তরজমা হল অবৈধ। নামাজ অবৈধ কাজ থেকেও

ফিরায়। বেহায়াপনা থেকেও ফিরায়। অবৈধ কাজ কোন্ গুলো? যেগুলোর অবৈধতা বুঝার জন্য-দলিলের প্রয়োজন পড়ে, ফতোয়ার প্রয়োজন পড়ে। আর ফাহ্‌শা কাজ কোন গুলো?

যেগুলোর অবৈধতা বুঝার জন্য ফতোয়ার দরকার পড়ে না, দলিলের দরকার পড়ে না, নিজের বিবেক থেকেই বুঝা যায়।

এটা হওয়ার ব্যাপার নয়, অবৈধ হওয়ার ব্যাপার।

আমি এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন, আপনার যুবতী স্ত্রী বেপর্দা পথে ঘাটে ঘুরা ফেরা করে। যে ব্যক্তির যুবতী স্ত্রী বেপর্দা অবস্থায় পথে-ঘাটে ঘুরা-ফেরা করে এই লোকের বেপর্দা স্ত্রীকে পথে পুরুষপালেরা কুদৃষ্টিতে দেখে না সুদৃষ্টিতে দেখে ? কুদৃষ্টিতে দেখে।

আপনার যুবতী স্ত্রীকে পথের পুরুষপালেরা কুদৃষ্টিতে দেখার সুযোগ পাবে, এটা বৈধ হওয়া দরকার (?) না অবৈধ হওয় দরকার ?

এটা যে অবৈধ হওয়া দরকার তা বুঝার জন্য দলিলের প্রয়োজন নেই, বিবেকই যথেষ্ট। এটাকে বলে 'মনমুফতী'। দুনিয়ার কোনো মুফতীর কাছে যেও না, তোমার মনমুফতীকে জিজ্ঞেস করো! এটা বৈধ হওয়া দরকার না অবৈধ হওয়া দরকার।

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয়ই নামাজ ফাহ্‌শা কাজ থেকে ফিরায় বেহায়াপনা থেকে ফিরায়, অবৈধ কাজ থেকেও ফিরায়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে ঐ সমস্ত লোকের বেলায়, যারা নামাযও পড়ে বেপর্দাও চলে,

যারা নামাযও পড়ে সিনেমাও দেখে, যারা নামাযও পড়ে, টেলিভিশনও দেখে, যারা নামাযও পড়ে নিজের স্ত্রীকে বেপর্দাও চালায়, যারা নামাযও পড়ে সুদও খায়, যারা নামাযও পড়ে সুদের কারবারও করে, যারা নামাযও পড়ে ঘুষের কারবারও করে, এদেরকে এদের নামায পাপ কাজ থেকে ফিরায় না কেন?

এ প্রশ্নের জবাব আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারব আয়াতের শানে নুযূল থেকে। যে আয়াত আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি, সেই আয়াত সেই আয়াতের অংশ আল্লাহ্‌পাক রাব্বুল আলামীন একটা বিশেষ

ঘটনা উপলক্ষে নাজিল করেছিলেন। যেই ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ্ এই আয়াত নাজিল করেছিলেন, সেই ঘটনাই এই আয়াতের শানে নুযূল। আয়াতের শানে নুযূলের ঘটনায় উল্লেখ আছে ঃ

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামানায় এক ব্যক্তি নুতন মুসলমান হয়েছে। মুসলমানের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান ফরজ হল নামায। এজন্য লোকটা দৈনিক পাঁচবার জামাতের সাথে নামাজ আদায় করত।

এই লোকটার বিরুদ্ধে অন্যান্য মুসলমানেরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে অভিযোগ দায়ের করল। কি অভিযোগ? হে আল্লাহ্র রাসূল! এই লোকটা নতুন মুসলমান হয়েছে, মুসলমান হওয়ার পর থেকে দৈনিক পাঁচ বেলা মসজিদে এসে জামাতের সাথে নামায আদায় করে। কিন্তু মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর সমাজে যত রকমের পাপ চালু আছে, তত রকমের পাপ কাজ করে।

এই তো আমাদের অবস্থা। আমরা মসজিদে এসে জামাতের সাথে নামায আদায় করি আর বাইরে গিয়ে সব রকমের পাপ করি। বেশীর ভাগ মুসলমান মসজিদে আসে না, বাইরে পাপ করে।

আর কমসংখ্যক মুসলমান মসজিদে আসে নামায পড়ে তারপরেও বাইরে গিয়ে পাপ কাজ করে। যারা নামায পড়ে না, পাপ কাজ করে তাদের আলোচনা আমি একটু আগে করেছি।

এখন আমি আলোচনা করছি তাদের ব্যাপার, ঐ সমস্ত মুসলমানের ব্যাপার যারা নামাযও পড়ে পাপও করে। এরা কেন নামায পড়ে আর নামাজ পড়লে পাপ থেকে ফিরে না কেন এই পশ্নের জবাব বুঝার জন্য শানে নুযূলের ঘটনাটা বলছি।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে ঐ নও মুসলিমের ঐ নতুন মুসলমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই লোকটা পাঁচ বেলা মসজিদে এসে জামাতের সাথে নামায পড়ে আর মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলে সমাজে যত রকমের পাপ চালু আছে সব রকমের পাপ করে।

জবাবে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান "তাকে তার নামাযটা ঠিক করতে দাও। যেদিন তার নামায ঠিক হয়ে যাবে, সেদিন তার নামাযই তাকে সব রকমের পাপ থেকে ফিরাবে।"

কিছু দিন পরে দেখা গেল ঐ লোকটাকে শাসন করার দরকার পড়ে নি। ঐ লোকটাকে কোনো রকমের ওয়াজ নসীহত করার দরকার পড়েনি, ঐ লোকটাকে শাসানোর দরকার পড়েনি।

নিজ থেকেই সে সব রকমের পাপ ছেড়ে দিয়েছে। তখন আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন ঐ লোকটাকে কেন্দ্র করে এই আয়াত নাজিল করেন।

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয়ই নামাজ সব রকমের বেহায়াপনা থেকে ফিরায়, নিশ্চয়ই নামাজ সব রকমের পাপ থেকে ফিরায়।

শানে নুযূলের ঘটনা একথা পরিষ্কার করে দিলো সকল নামাযীর নামায তাকে পাপ থেকে ফিরায় না, যেই নামাযী তার নামাযটাকে ঠিক করতে পেড়েছে সেই নামাযীর নামায তাকে সব রকমের পাপ থেকে ফিরায়।

এই পর্যায়ে আমাদের প্রশ্ন জাগে তাহলে নামায ঠিক হয় কিভাবে? আমি অবশ্য সেই জবাব দেওয়ার জন্য আপনাদের সামনে এই আয়াত তিলাওয়াত করেছি। কিন্তু নামায ঠিক হয় কিভাবে,

এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আমি বলতে চাই আমার এতক্ষণের কথা যদি আপনারা বুঝে থাকেন, তাহলে এই কথা না বুঝার আর কোনো কারণ নেই যে, আমরা যারা নামাযও পড়ি, পাপও করি, আমাদের নামায ঠিক, না বেঠিক?

এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা এটা সাব্যস্ত হলো আমরা যারা নামাযও পড়ি পাপও করি আমাদের নামায ঠিক নয়, আমাদের নামায বেঠিক। কাজেই এখন বুঝা দরকার কিভাবে আমাদের নামায ঠিক করা যায়, যেই নামায আমাকে সব রকমের পাপ থেকে ফিরাবে।

নামায ঠিক করার দু'টি দিক আছে। একটা বাহ্যিক আরেকটা আধ্যাত্মিক।

নামাযের বাহ্যিক দিক ঠিক করার মর্ম হল, নামাযে যতগুলো ফরয আছে, সবগুলো সঠিকভাবে আদায় করা, নামাযে যতগুলো ওয়াজিব আছে,

সবগুলো সঠিকভাবে আদায় করা, নামাযে যতগুলো সুন্নাত আছে সবগুলো সঠিকভাবে আদায় করা।

সঠিকভাবে যদি নামাযের এই ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতগুলো আদায় করা হয়, তাহলে নামাযের বাহ্যিক দিকটা ঠিক হল।

যার নামাযের বাহ্যিক দিক ঠিক আছে, তার নামায বিশুদ্ধ বলা যেতে পারে, তার নামায সহীহ বলা যেতে পারে। কিন্তু এই নামায তাকে সুদ থেকে ফিরাবে না, ঘুষ থেকে ফিরাবে না, সিনেমা থেকে ফিরাবে না, টেলিভিশন দেখা থেকে ফিরাবে না, বেশ্যাখানা যাওয়া থেকে ফিরাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নামাযের আধ্যাত্মিক দিকটাও ঠিক না করবে।

নামাযের আধ্যাত্মিক দিক কোনটা? এক হাদীসের নাম হাদীসে জিবরাইল।

হযরত জিবরাইল আ. হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসেছেন, কতগুলো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নবীজীর উম্মতকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য। জিবরাইল ফিরিশতা একজন অপরিচিত মানুষের বেশ ধরে, আকৃতি ধারণ করে এসে ছিলেন।

জিবরাইল প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত করে বিদায় নেয়ার পর হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমবেত ছাহাবায়ে কেরাম কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই লোকটাকে চিনতে পেরেছো? তারা বলেন না, আমরা লোকটাকে চিনতে পরিনি। তখন রাসূল বলেন–

هَذَا جِبْرَائِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ

জিব্রাঈল ফিরিশতা একজন অপরিচিত মানুষের আকৃতি ধারণ করে এসেছিলেন, আমার সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য। যে সমস্ত প্রশ্নোত্তর জিব্রাঈল নবীর সাথে করেছিলেন এই সমস্ত প্রশ্নোত্তরের মাঝে জিব্রাঈল ফিরিশতা নবীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন–

مَا الْإِحْسَانُ؟

নির্ভেজাল ইবাদত কোনটা? খাঁটি ইবাদত কোনটা? যেই ইবাদতে কোনো ভেজাল নেই। নির্ভেজাল। জবাবে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান–

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ

নির্ভেজাল ইবাদত, খাঁটি ইবাদত সেই ইবাদত যেই ইবাদতে তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হয়ে করবে যেন তুমি আল্লাহ্‌কে দেখো। যদিও দুনিয়ার জিন্দিগীতে আল্লাহ্‌কে চর্মচোখে দেখার নিয়ম নেই, বিধান নেই, কিন্তু যদিও তুমি তোমার চর্মচোখে আল্লাহ্‌কে দেখতে না পাও, অন্তত এই ধ্যান অন্তরে রাখবে যে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।

সুতরাং নামাজের আধ্যাত্মিক দিক ঠিক হবে কিভাবে আমরা যদি এই ধ্যানে মগ্ন হয়ে নামাজ পড়ি যেন আমি আল্লাহ্‌কে দেখছি, যদি আমি বাস্তবে আল্লাহ্‌কে দেখতাম যেমনিভাবে আমি একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হয়ে নামায পড়তাম এভাবে যদি নামাজ পড়ি, যদিও আমি আল্লাহ্‌কে দেখি না, তবুও আল্লাহ্ পাক আমাকে দেখছেন সেই মনোভাব নিয়ে যখন নামায পড়ব, তখন সেই নামায আমার নির্ভেজাল নামায হবে, সেই নামায আমার খাঁটি নামায হবে।

সোজা কথায় আয়াতের বাখ্যায় মুফাস্‌সিরীনে কেরাম লিখেছেন আধ্যাত্মিকভাবে নামায ঠিক করার ব্যবস্থা হল, সংসারের সব রকমের জল্পনা-কল্পনা থেকে অন্তরকে মুক্ত করে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হয়ে নামায আদায় করলে আধ্যাত্মিক নামায ঠিক হবে। কিন্তু এই কথাটা মুখে বলা যত সহজ, বাস্তাবায়ন করা, বাস্তবে এই কথাটা পালন করা ততো সহজ নয়।

আপনারা যারা নামায পড়েন তারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন, আপনারা চিন্তা করে দেখুন, আমরা যারা নামায পড়ি আমরা নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকি, নাকি সংসারের কল্পনা-জল্পনাও করি?

সংসারের কল্পনা জল্পনাও করি নামাযও পড়ি। তাহলে আমার নামাযের ফরয ঠিকমত আদায় করলেও আমার নামাযের ওয়াজিবগুলো ঠিক মত আদায় করলেও আমার নামাযের সুন্নাতগুলো ঠিকমত আদায় করলেও আমার নামাজের আধ্যাত্মিক দিকটা ঠিক হল, নাকি বেঠিক হল? বেঠিক হল।

নামাযের আধ্যাত্মিক দিকটা যত দিন পর্যন্ত বেঠিক থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমার নামায আমাকে টেলিভিশন দেখা থেকে ফিরাবে না, আমার

নামায আমাকে সিনেমা দেখা থেকে ফিরাবে না, আমার নামায আমাকে বেশ্যাখানা যাওয়া থেকে ফিরাবে না, আমার নামায আমাকে সুদের কারবার থেকে ফিরাবে না, আমার নামায আমাকে ঘুষের কারবার থেকে ফিরাবে না।

এই জন্য বলেছি, আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হয়ে নামায আদায় করার কথা মুখে যত সহজ, তা বাস্তবায়ন করা ততো সহজ নয়। কেন সহজ নয়? কারণ, হাদীস শরীফে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান– শয়তানের একটা স্পেশাল বাহিনী আছে, তারা কোনো বেনামাযীর কাছে যায় না।

বে-নামাযীকে পাপে লিপ্ত করার জন্য শয়তানের স্পেশাল কোনো বাহিনী দরকার পড়ে না, শয়তানের সাধারণ বাহিনীই যথেষ্ট। কিন্তু নামাযীদের নামাজ নষ্ট করার জন্য শয়তানের সাধারণ বাহিনী পারে না।

এজন্য নামাযীদের নামায নষ্ট করার জন্য শয়তান স্পেশাল বাহিনী রেডি করে ফেলেছে। এই স্পেশাল বাহিনীকে সাধারন বেনামাযীর কাছে পাঠায় না, পাঠায় নামাযীদের কাছে। কখন? নামাযীরা নামাজ শুরু করে যখন। তখন শয়তানের স্পেশাল বাহিনী নামাযীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন শয়তানের স্পেশাল বাহিনী নামাযীর অন্তরের মাঝে বলতে থাকে اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا অমুক কথা স্মরণ কর, অমুক কথা স্মরণ কর, দোকানের কথা স্মরণ কর, বাড়ীর কথা স্মরণ কর, চাকুরীর কথা স্মরণ কর, ক্ষেত-খামারের কথা স্মরণ কর, বিবি বাচ্চার কথা স্মরণ কর,

এভাবে অনবরত যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার অন্তরের মাঝে এমন হাজার কথা জাগিয়ে দেয়।

শয়তান স্পেশাল বাহিনী পাঠিয়ে মুসল্লীদের অন্তরে সংসারের হাজারো কথা জাগিয়ে থাকে কেন? হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান যেন মুসল্লী নামায পড়েও নামাযের ফলাফল থেকে বঞ্চিত থাকে।

নামাযের ফলাফল থেকে বঞ্চিত থাকার মানেই হল নামাযও বরবাদ, ছাওয়াবও বরবাদ। এটা হল নামাযের ফলাফল থেকে বঞ্চিত। শয়তানের

এই স্পেশাল বাহিনীর আক্রমণের কারণে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হয়ে নামায আদায় করা মুখে বলা যত সহজ তা বাস্তাবায়ন করা ততো সহজ নয়। সহজ নয় বলে অসম্ভবও নয়। সম্ভব।

সামান্য একটু চেষ্টা করলেই সম্ভব। মুফাস্‌সিরীনে কেরাম তাফসীরের কিতাবে লিখেছেন কিভাবে সম্ভব? যখন তুমি নামাযে দাঁড়িয়ে দেখবে তোমার অন্তর সংসারের কল্পনা-জল্পনায় চলে গেছে, তখনই তুমি রাসূলের সেই হাদীসে জিব্রাইল অনুপাতে فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ "আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন" এই কথাটা ধ্যান করো।

নামাযে দাঁড়িয়ে যখনই দেখবে তোমার মন দেশে চলে গেছে, তখনই তুমি ধ্যান করো আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন, নামাযে দাঁড়িয়ে যখন তুমি দেখবে তোমার মন দোকানে চলে গেছে তখনই তুমি এই কথাটা ধ্যান করো আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন। এই কথাটা ধ্যান করার সাথে সাথে মন সংসারে থাকবে না, দোকানে থাকবে নাম, দেশে থাকবে না, রং তামাশা মনে থাকবে না, মন চলে আসবে নামাযে।

এইভাবে যতবারই তোমার মনকে শয়তান নামাযের বাইরে নিয়ে যাক না কেন, ততবারই তুমি ধ্যান করো যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন, মন নামাযে ফিরে আসবে। এইভাবে শয়তানের সাথে মন নিয়ে কাড়াকাড়ি করো, টানাটানি করলে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন তোমাকে নামাযের পরিপূর্ণ ছাওয়াব দান করে দেবেন।

যে ব্যক্তি কিছু দিন এই সাধনা করবে, যে কিছু দিন এই রিয়াযত করবে, যে কিছু দিন এই প্রাক্টিস করবে, রাসূলের হাদীস মোতাবেক আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন, এই ধ্যান যে নামাযে অনুশীলন করবে।

এই ধ্যান করা নামাযে প্রাক্টিস করলে যখন শয়তান দেখবে এই সাধনার কারণে আল্লাহ্ তাকে নামাযের পরিপূর্ণ ছাওয়াব দিয়ে দিচ্ছেন, তখন তার কাছ থেকে বিমুখ হয়ে শয়তানের স্পেশাল বাহিনী চলে যায় ভিন্ন নামাযীর কাছে।

সেই দিন থেকে যেই দিন থেকে নামাযী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হয়ে যায়। এইভাবে আমরা আমাদের নামাযের আধ্যাত্মিক দিকটাকে যেদিন ঠিক করতে পারব, সেদিন আমাদের নামায আমাদের সব রকমের পাপ কাজ থেকে ফিরাবে।

এখন আমরা বুঝার চেষ্টা করব যে, এভাবে নামায আদায় করলে নামায আমাকে কিভাবে পাপ থেকে ফিরাবে? নামাযে দাঁড়িয়ে যখন আমি দেখেছিলাম মন চলে গিয়েছিল সংসারের কল্পনা-জল্পনায়, তখনই আমি এই ধ্যান করেছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন, যে ধ্যানের কারণে সংসারের কল্পনা-জল্পনায় মন রাখতে আমার সাহস হল না।

এ রকম অনুশীলনের কারণে আমার অন্তরের মাঝে যে যোগ্যতা অর্জন হল, যে একটা ক্যাপাসিটি অর্জন হল সেই যোগ্যতা সম্পন্ন অন্তর নিয়ে মুসল্লী মসজিদ থেকে বাহির হয়ে যখন দেখবে সামনে বেশ্যাখানার গেইট খোলা, ইচ্ছা করলেই প্রবেশ করা যায়, আপনারা একটু ভেবে-চিন্তে বলবেন, যেই মুসল্লী নামাযের ভেতরে যে একটা সাধনা করেছে, নামাযে দাঁড়িয়ে মন চলে গিয়েছিল সংসারে, তখন আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন বলে মনটাকে ফিরিয়ে আনতে পারল,

সেই মুসল্লী মসজিদ থেকে বের হয়ে যখন দেখবে বেশ্যাখানার গেইট খোলা আছে ইচ্ছা করলেই প্রবেশ করা যায়, তখনও কি তার মনে জাগবে না যে আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন? জাগবে। তখন গেইট খোলা থাকলেও প্রবেশ করা আর সহজ হবে না। যে ব্যক্তি তার অন্তরে এই সাধনা হাসিল করতে পারবে যে, আমাকে আল্লাহ্ সদা সর্বদা দেখছেন, সেই ব্যক্তি কখনো কোনো পাপে লিপ্ত হতে পারবে না।

সুতরাং আল্লাহ্ আমাকে দেখছেন যে একটা সাধনা, এই যে একটা ধ্যান, এই যে একটা প্রাক্টিস, এই যে একটা রিয়াযত, এই যে একটা অনুশীলন সেই অনুশীলনের দ্বারা আমাদের নামায সংশোধন হয়ে যায়, আর এভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে নামায সংশোধন করলে একদিন নামাযের কারণেই সব রকমের পাপ থেকে বিরত থাকা সহজ হয়ে যায়।

আর বর্তমান জামানার যারা বা যে সমস্ত মুসলমান ভাইয়েরা যত রকমের পাপে লিপ্ত আছেন, আমি তাদেরকে অনুরোধ করে বলবো, যে নামায আমাদের সব রকমের পাপ থেকে ফিরায়, সে নামাযের রূপরেখা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। আল্লাহ্ আপনাদের সাথে আমাকেও যেন সেই নামায পড়ার, সেই নামায আয়ত্ব করার তাওফিক দান করেন, যেই নামাজ আমাদেরকে সব রকমের পাপ থেকে ফিরায়।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মাওয়ায়েজে হাসানাহ

খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,

তরজমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত

মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান—১

নারীর জান্নাতে যাওয়ার পথ ও পাথেয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْأَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মুহতারাম উলামায়ে কিরাম,
সম্মানিত সুধী সমাজ ও দূর-দূরান্ত থেকে আগত
পর্দানশীন মা-বোনেরা!

আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সূরার মাঝে এক সূরার নাম সূরায়ে আহযাব। সূরায়ে আহযাবের ৩২নং আয়াত আমি আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি। এর কয়েক আয়াত আগ থেকে অর্থাৎ ২৮নং আয়াত থেকে ৩৪ নং আয়াত পর্যন্ত ৭টি আয়াত একটি ঘটনা উপলক্ষ্যে আল্লাহ্ নাজিল করেছেন। তারপর ৩৫ নং আয়াত কিছু লোকের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্ নাজিল করেছেন। ২৮নং আয়াত থেকে ৩৪নং আয়াত পর্যন্ত ধারাবাহিক তাফসীর এই স্বল্প সময়ে শেষ করা যাবে না। এই ২৮নং আয়াত থেকে ৩৪নং আয়াতের তাফসীর থেকে আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় যেগুলো আমাদের মা-বোনদের বেশী দরকারী মনে করছি, সেগুলো আমি আপনাদের সামনে পেশ করতে যাচ্ছি। وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ। আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাওফীক দান করেন।

যেহেতু এই স্বল্প সময়ে আলোচনা করে শেষ করা যাবে না, তাই যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছুটে যায় অথবা আনুষঙ্গিক কোনো বিষয়ে মা-বোনদের বুঝার বাকী থাকে, তাহলে আমার একটা বক্তৃতা সংকলন আছে; সেটা বই আকারে প্রকাশ হয়েছে যার নাম "নারীর মর্যাদা ও অধিকার"। আপনারা কোনো লাইব্রেরীতে খোঁজ করে সংগ্রহ করতে পারবেন। সেখানে মুসলিম মহিলাদের সম্পর্কে, নারীর মর্যাদা সম্পর্কে অনেক কথাই পাবেন।

সাথে সাথে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি, আমার লেখা কোন বই বা বক্তৃতা যা বই আকারে প্রকাশ হয়, আজ পর্যন্ত এ সকল বই আমার ব্যক্তিগত খরচে প্রকাশ করি নি, অন্যান্যরা নিজেদের খরচে প্রকাশ করেন। এই বইগুলোর লাভ-লোকসানের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বই বিক্রি না হলে যদি কোনো লোকসান হয় সেগুলো আমার নয়, যারা প্রকাশ করেছেন তাদের। বই বিক্রি হলে যদি কোন লাভ হয় সেগুলো আমার নয়, যারা প্রকাশ করেছেন তাদের। তাই কেউ যেন মনে না করেন, আমি যে বইয়ের সন্ধান দিলাম হয়তো এটাতে আমার কোনো ব্যবসা আছে। শুনুন, এতে আমার কোনো ব্যবসা নেই। শুধু এজন্য বললাম যে, আজকের কোনো কথা যদি অসমাপ্ত থাকে আর এ কথাগুলো পাওয়ার আগ্রহ থাকে, তা হলে যেন ঐ বইটি দেখে উপকৃত হতে পারেন।

এখানে সূরায়ে আহযাবের ২৮নং আয়াত থেকে ৩৪নং আয়াত পর্যন্ত ৭টি আয়াতের মাঝে মাত্র একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি সময়ের স্বল্পতার কারণে। সবগুলো আয়াতকে সামনে রেখে কিছু কথা রাখার চেষ্টা করব। ৩৫নং আয়াতটা আল্লাহ্ নাজিল করেছিলেন মহিলাদের প্রশ্নের জবাবে।

মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগের মুসলমান মহিলারা রাসূলের দরবারে একটি প্রশ্ন করেছিলেন, সেই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্ সূরায়ে আহযাবের ৩৫নং আয়াত নাজিল করেছিলেন। প্রশ্নটা ছিল পবিত্র কুরআনে যত আদেশসূচক শব্দ আছে, যে সব শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ মুমিন মুসলমানকে আদেশ করেছেন অথবা পবিত্র কুরআনে যে সব শব্দ দ্বারা মুমিন মুসলমানকে কোনো কাজ করতে নিষেধ

করেছেন, এ শব্দগুলোতে আল্লাহ্ পুরুষলিঙ্গ শব্দ দ্বারা আদেশ-নিষেধ করেছেন, স্ত্রীলিঙ্গ বোধক নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষার কারণে শব্দগঠন বা উচ্চারণে পরিবর্তন হয়।

এ রকম শব্দ বাংলা ভাষায়ও আছে ইংলিশেও আছ, আরবীতেও আছে। যেমন কোনো জোয়ান পুরুষ মানুষকে বাংলা ভাষায় বলে যুবক। কোনো জোয়ান মানুষ যদি নারী হয়, তাহলে বাংলা ভাষায় তাকে যুবক বলে না, যুবতী বলে। এই দু'জন জোয়ান মানুষের মাঝে পুরুষের বেলায় যুবক নারীর বেলায় যুবতী। এখানে কোনো প্রকার অর্থের ব্যবধানে নয়। শুধু লিঙ্গের ব্যবধানে উচ্চারণে ব্যবধান হয়। যুবতী হল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ আর যুবক হল পুরুষলিঙ্গ শব্দ।

এরকমভাবে ইংলিশেও একটা শব্দ আছে HE আরেকটা শব্দ আছে SHE. HE অর্থও সে, SHE অর্থও সে। কিন্তু ব্যবহারে HE ব্যবহৃত হয় পুরুষের বেলায়, SHE ব্যবহৃত হয় নারীর বেলায়। অনুরূপভাবে আরবী ভাষায় একটা শব্দ আছে, اَقِيْمُوْا আরেকটা শব্দ আছে, اَقِمْنَ উভয় শব্দের অর্থ এক। অর্থ হল, তোমরা কায়েম করো, তোমরা প্রতিষ্ঠা করো। কিন্তু اَقِيْمُوْا শব্দটা পুরুষলিঙ্গ আর اَقِمْنَ শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ। এ কথাটা বুঝলে রাসূলের দরবারে মহিলারা কি প্রশ্ন করেছিল, সেই প্রশ্নটা বুঝতে সহজ হবে।

রাসূলের দরবারে মুসলিম মহিলারা প্রশ্ন উত্থাপন করল কুরআন শরীফে মুসলমানদেরকে যত আদেশ-নিষেধের শব্দ ব্যবহার করেছেন, দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া বাকী সবগুলোতে পুরুষলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু স্ত্রী লিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করছেন না, তাহলে কি সরাসরি আল্লাহ্ নারীদেরকে সরাসরি সম্বোধন করতে ঘৃণা করেন? আল্লাহ্ কি নারীদেরকে ঘৃণা করেন? এই প্রশ্নটা যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে পেশ করা হল, সেই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন সূরায়ে আহযাবের ৩৫নং আয়াত নাজিল করলেন।

আয়াতের সারমর্ম হল, আমি নারীদেরকে ঘৃণা করি না; বরং নারীদের মর্যাদা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। আল্লাহ্ নারীদেরকে কি শব্দ দ্বারা তাদের মর্যাদা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করেছেন?

পদ্ধতি হল একান্ত দরকার বশত ছাড়া নারীদের কথা, নারীদের প্রসঙ্গ, নারীদের স্মরণ করা উচিত নয়।

এই কারণে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বহু পুরুষের নাম উল্লেখ করেছেন, বহু নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করেছেন, বহু বেদ্বীন কাফেরের নাম উল্লেখ করেছেন, এমনকি শয়তানের নামও বহু জায়গায়, বহুবার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ত্রিশপারা কুরআনে সারা দুনিয়ার নারীদের মাঝে একটা বিশেষ কারণে একজন নারীর নাম উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া পূর্ণ ত্রিশ পারা কুরআনে আর কোনো নারীর নামই উল্লেখ করেন নি। নারীদের নাম উচ্চারণ না করার কারণ আল্লাহ্ বলেন, তাদের নাম উচ্চারণ না করলে তাদের মান সম্ভ্রম সঠিকভাবে সংরক্ষণ হয়।

অকারণে নারীদের নামও উচ্চারণ করা ঠিক নয়। সে কারণটা কি? যে কারণে নারীদের নামও উচ্চারণ করা যায় না; সে কারণটা কি? নারী এবং পুরুষের মাঝে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন যে একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যদি কোন নারীর কাছে সারা দুনিয়ার পুরুষের নাম উচ্চারণ হয় তাহলে তার অন্তরে কোনো প্রকার কুভাব সৃষ্টি হবে না।

কিন্তু একটা যুবক পুরুষের সামনে ভিন্ন কোন যুবতীর নাম, এমনকি কোনো একটা নারীর নাম উচ্চারণ হয়, তখন এই নারীকে নিয়ে বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়।

আল্লাহ্ মানুষের অন্তরের কথা জানেন বলে কি আপনারা বিশ্বাস করেন? হ্যাঁ জানেন। তা হলে একথা বিশ্বাস করুন, আল্লাহ্ বলতে চাচ্ছেন, কোনো পুরুষের সামনে একটা নারীর নাম উচ্চারণ করলেও এই পুরুষ নারীটাকে নিয়ে বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা করে। এটা নারীর জন্য অপমান।

এ অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যেই আমি বিশেষ দরকার ছাড়া স্ত্রীলিঙ্গের কোনো শব্দও উচ্চারণ করি না, কোনো নারীর নামও উচ্চারণ করি না। এটা হল সারা ত্রিশপারা কুরআনে দুনিয়ার কোনো নারীর নামও কেন উচ্চারণ করেন নি এর কারণ। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু হযরত ঈসা আ.-এর মাতা হযরত মরিয়ম আ.-এর নাম।

পবিত্র কুরআনের একটা সূরাই আছে সেই সূরার নাম সূরায়ে মরিয়ম। আল্লাহ্ এখানে মরিয়ম উচ্চারণ করেছেন আগের বর্ণিত সাধারণ নিয়মের বিপরীতে। সেটা একটা বিশেষ কারণবশত! কি কারণ সেটা? কারণ হল খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা আ.-এর মা হযরত মরিয়ম আ.-কে আল্লাহ্র স্ত্রী বলে থাকে। আর হযরত ঈসা আ.-কে আল্লাহ্র পুত্র বলে থাকে।

অথচ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে যে সমস্ত খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা আ.-এর মাকে আল্লাহ্র স্ত্রী বলত, তখন তাদের সমাজের প্রথা ছিল, ধর্মীয় কোনো বিষয় নয়, একটা সামাজিক প্রথা ছিল, কোনও পুরুষ যদি ভদ্রলোক হয় তখন সে স্ত্রীর নাম মুখে নিতে পারে না। এ ছিল তখনকার খ্রিস্টান সমাজের একটা প্রথা।

এ প্রথাটা বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে অনেক স্ত্রীদের আছে। অনেকের মতে, অনেকের ধারণায় কোনও ভদ্র নারী তার স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে পারে না। এমন একটা প্রথা ধারণা আমাদের সমাজের নারীদের মাঝেও আছে। যেমনভাবে খ্রিষ্টানদের ধারণা ছিল, কোনো ভদ্র পুরুষ স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করতে পারে না। আর আমাদের সমাজের ধারণা হল কোন ভদ্র মহিলা তার স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে পারে না।

আমাদের সমাজের এ ধারণা যেমন সঠিক নয়, ভুল; তেমনিভাবে খ্রিষ্টান সমাজের ধারণাও ছিল ভুল-ভ্রান্ত। কিন্তু বাবাকে নাম ধরে ডাকা, ছোট ভাই, বড় ভাইকে নাম ধরে ডাকা, ছাত্র শিক্ষকের নাম ধরে ডাকা এটা অবশ্যই বে-আদবী।

আমি অকারণে আমার বাবার নাম নিলাম না, বাবাকে সম্মান প্রদর্শন করলাম, আমি আমার শিক্ষকের নাম অকারণে নিলাম না, সম্মান দেখালাম, ঠিক আছে। ঠিক তেমনিভাবে কোনো নারী অকারণে স্বামীর নাম ধরে ডাকলে এটা অবশ্যই বে-আদবী। অকারণে স্বামীর নাম না নিতে পারে, এর দ্বারা স্বামীর সম্মান প্রদর্শন হবে, ঠিক আছে।

যদি কোনো ছেলেকে কেউ পিতার নাম জিজ্ঞাসা করে তোমার বাবার নাম কি? তখন বাবার নাম বলা অসম্মানও নয়, বেআদবীও নয়। যদি কোনো ছাত্রকে কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমার শিক্ষকের নাম কি ? তখন শিক্ষকের নাম বলা অসম্মানও নয়, বে-আদবীও নয়; বরং তখন শিক্ষকের নাম না-বলাটা বে-আদবী। ঠিক তেমনিভাবে কেউ যদি কোনো মহিলাকে স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করে অথবা স্বামীর নাম বলার দরকার পড়ে তখনও

স্বামীর নাম বলা বে-আদবী মনে করে, তা হলে সেটা ভুল ধারণা সেটা সঠিক নয়, এটা প্রচলিত কুপ্রথা ছাড়া কিছু নয়।

হযরত আয়শা ছিদ্দীকা রাযি. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী ছিলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়শা রাযি.-এর স্বামী ছিলেন, জীবনে কোনো দিন নাম ধরে ডাকেন নি কিন্তু দরকারে উচ্চারণ করেছেন বহুবার।

আমাদের সমাজের এই প্রথার সংশোধন দরকার। কোনো নারী যেমন বাবাকে নাম ধরে ডাকবে না, কোনো কারণে নাম নিলে যেমন ভুল-বেআদবী হয় না, ঠিক তেমনিভাবে স্ত্রী স্বামীকে নাম ধরে ডাকবে না। কোনো কারণে নাম নিলে ভুল বা বেআদবী হয় না। কাজেই এ ভুল সংশোধন হওয়া দরকার।

রাসূলের যুগের খ্রিষ্টান সমাজের প্রথা ছিল কোনো লোক ভদ্র হলে সভ্য হলে স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করতে পারে না। আর যে স্বামী স্ত্রীর নাম নেয় সে ভদ্র নয়; সে অভদ্র ছাড়া কিছু নয়। তাই আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন আয়াতে হযরত মরিয়ম আ. এর নাম উচ্চারণ করেছেন।

আল্লাহ্ বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তোমরা তো মনে করো যে ব্যক্তি স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করে সে ভদ্র নয়, অভদ্র; তাহলে বলো আমি আল্লাহ্ ভদ্র না অভদ্র ? এটা আগে ঠিক করো। যদি মনে করো আমি আল্লাহ্ অভদ্র, তা হলে তোরা তো এমনিতেই বেঈমান কাফের। যদি আল্লাহ্কে অভদ্র বলে, তাহলে কি ঈমান থাকবে? না।

আর যদি বলো ভদ্র; তাহলে আমি পবিত্র কুরআনে বারবার মরিয়মের নাম উচ্চারণ করে বলে দিতে চাই, তোমাদের সামাজিক প্রথা মতেও মরিয়ম আমার স্ত্রী নয়। আল্লাহ্ বারবার মরিয়মের নাম উচ্চারণ করে খ্রিষ্টানদের সামাজিক প্রথা মতে বুঝাতে চান মরিয়ম আমার স্ত্রী নয়। একথাটা বুঝানোর জন্য আল্লাহ্ বারবার মরিয়মের নাম উচ্চারণ করেছেন। এছাড়া সারা দুনিয়ার কোনো নারীর নাম আল্লাহ্ উল্লেখ করেন নি। আমাদের মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মায়ের নামও উল্লেখ করেন নি, বিভিন্ন জায়গায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর মুহতারাম স্ত্রীদের আলোচনা করলেও নাম উল্লেখ করেন নি। এর দ্বারা আল্লাহ্ বুঝাতে চাচ্ছেন, নারী যেমন পর্দায় থাকার জিনিস, তেমনিভাবে নারীর নামও পর্দায় থাকার জিনিস।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগের মহিলাদের প্রশ্নের জবাবে সূরায়ে আহযাবের ৩৫নং আয়াত নাজিল করে এ শিক্ষাই দিলেন যে, নারীদের দেহটাই শুধু পর্দা করার জিনিস নয়, নারীদের নামটাও পর্দা করার জিনিস। দেহ পরপুরুষের সামনে খোলা যায় বিশেষ কারণে। যেমন এক মহিলার হাতে একটি ফোঁড়া হল। অপারেশন ছাড়া ভাল হবে না।

আর অপারেশন করার জন্য পুরুষ ডাক্তার ছাড়া মহিলা ডাক্তার পাওয়া যায় না। তখন যে অঙ্গে ফোঁড়া হল, সেই অঙ্গ এ পুরুষ ডাক্তারের সামনে খুলতে হবে। এটা কি স্বাভাবিক অবস্থা, না বিশেষ অবস্থা? বিশেষ অবস্থা। এই রকম বিশেষ অবস্থা ছাড়া, এই রকম বিশেষ ঠেকা ছাড়া নারীদের দেহকে যেমন পুরুষের আড়ালে রাখতে হবে, এটা আল্লাহ্র বিধান।

ঠিক তেমনিভাবে বিশেষ অবস্থা ছাড়া, বিশেষ ঠেকা ছাড়া নারীর নামও পুরুষের আড়ালে রাখতে হবে। এমনকি যে সব শব্দ দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ বুঝায় সেসব শব্দকে পুরুষের আড়াল করে রাখতে হবে। তাই আমি যেসব পুরুষলিঙ্গ শব্দ দ্বারা নারী-পুরুষ উভয়কে আমার বিধানের আওতাভুক্ত করে শিক্ষা দিচ্ছি, যেমনভাবে নারীকে পুরুষের সামনে নেওয়া যাবে না, বিশেষ দরকার ছাড়া, বিশেষ দরকার ছাড়া তেমনিভাবে নারীদের নামও উচ্চারণ করা যাবে না, ঠিক তেমনভাবে বিশেষ দরকার ছাড়া স্ত্রীলিঙ্গ বোধক শব্দও ব্যবহার করা যাবে না।

এবার বুঝে থাকলে বলুন! আল্লাহ্ নারীদের মর্যাদা রক্ষার্থে কি শিক্ষা দিচ্ছেন, আর আমরা নারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের নামে কি করছি? আমরা কি অধিকার আদায়ের আন্দোলনের নামে নারীদের প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করতে পারছি, না নারীদের অধিকার জলাঞ্জলী দিতে যাচ্ছি? আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন নারীদের মান-ইজ্জত, মর্যাদা, সম্ভ্রম ও অধিকার শিক্ষা দিয়ে সূরায়ে আহযাবের ৩৫নং আয়াত নাজিল করেছেন। আমাদের দেশে ছেলে-মেয়েরা একসাথে বসে লেখা-পড়া করে। আর আল্লাহ্ যেখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীর নাম উচ্চারণ করতে রাজী নন,

আল্লাহ্ যেখানে পুরুষলিঙ্গ শব্দের পাশাপাশি স্ত্রী শব্দও ব্যবহার করতে রাজী নন, সেখানে একসাথে বসে ছেলে-মেয়ে লেখা-পড়া করলে আল্লাহ্র পক্ষে আছেন না বিপক্ষে গেলেন? বিপক্ষে।

গেল সূরায়ে আহযাবে ৩৫নং আয়াতের শানে নুজুল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগের নারীরা প্রশ্ন করেছিলেন, আল্লাহ্ পুরুষলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে নারীদেরকেও সেই বিধানের আওতাভুক্ত করে দেন এমনটা আল্লাহ্ করেন কেন? এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্ সূরায়ে আহযাবের ৩৫নং আয়াত নাজিল করে শিক্ষা দিলেন যে, আমি নারীদের মান-ইজ্জত রক্ষার্থেই এমনটা করে থাকি।

এবার ২৮নং আয়াত থেকে ৩৪নং আয়াতের শানে নুযূল। যেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়াত নাজিল হয়, সেই ঘটনাই সেই আয়াতের শানে নুযূল। আর সূরায়ে আহযাবের ২৮নং আয়াত থেকে ৩৪নং আয়াত পর্যন্ত ৭টা আয়াত একটা বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাজিল করেছিলেন। সুতরাং সেই ঘটনাই এই আয়াতগুলোর শানে নুযূল। সেই ঘটনা হল মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ প্রথম বিয়ে করেছিলেন ২৫ বছর বয়সে।

বিয়ের পর ৫৩ বছর বয়স পর্যন্ত আরো ২৮ বছর পর্যন্ত খুবই কষ্ট স্বীকার করে অভাব অনটনের মাঝে সময় কাটত। হযরত খাদীজা বলেন, একাধারে কয়েক মাস চলে যেত এমনিভাবে যে, অভাবের কারণে রুটি পাকানোর জন্য চুলায় আগুন জ্বলত না। মাত্র এক দু'টা খেজুরের দানা আর সামান্য দুধ পানের মাধ্যমে আমাদের দিন পার হত।

এ রকম অভাব-অনটনের ভেতর দিয়ে নবীর পারিবারিক জীবন হল দীর্ঘ আটাশটি বছর। এর মাধ্যমে আপনারা সহজে অনুমান করতে পারবেন, যার ঘরে মাসের পর মাস রুটি চেকার জন্য আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা হয় না, তার ঘরে স্ত্রীদের কি মহামূল্যবান জেওর অলংকার ছিল। এর মাধ্যমে অনুমান করা যায় না? নবীর বিবিদের পর্দা করার জন্য ঘরের মাঝে যে পর্দাটা হত, সেটা হত ছালার চট। ছালার টুকরা দিয়ে নবীর ঘরের বিবিদের পর্দার ব্যবস্থা হত। এই অবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফে দীর্ঘ আটাশটি বছর নিজের পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করেছেন। আর্থিক সুখ-শান্তির ভেতর দিয়ে, নাকি দারুণ কষ্টের মধ্য দিয়ে? দারুণ দুর্ভিক্ষ ও কষ্টের মধ্য দিয়ে নবীর পারিবারিক

জীবন এভাবে অতিবাহিত হয়েছে। তারপর ৫৩ বছর বয়সে যখন বিবিসহ নিজের সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মদীনা শরীফে চলে যান, তখন বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন এলাকা বিজিত হয়, বিভিন্ন বিজিত এলাকার ধন সম্পদ মুসমানদের হস্তগত হয়। সেই সময় বিভিন্ন এলাকার যুদ্ধে বিজয় হওয়ার পর সেই এলাকার ধন-সম্পদ বণ্টন করার ক্ষমতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতেই ছিল। এমতাবস্থায় রাসূলের দরবারে বিবিগণ তাদের খোরপোষের হিস্যা বাড়িয়ে দিতে আরজ করলেন।

মক্কা থাকা কালে দুর্যোগ ছিল, মদীনায় আসার পর বিভিন্ন এলাকা বিজয় হওয়ার পর, বিভিন্ন এলাকার মানুষ মুসলমান হওয়ার পর, বিভিন্ন এলাকার ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হওয়ার পর, আগের মত মুসলমানদের অভাব-অনটন থাকে নি। সুদিন ফিরে এসেছে এবং এ সমস্ত ধন-সম্পদ বণ্টন করার দায়িত্ব রাসূলের হাতেই অর্পিত হয়।

এমতাবস্থায় রাসূলের বিবিগণের পক্ষ থেকে তাদের খোরপোষের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন অসঙ্গত নয়, নিতান্ত সঙ্গত। সুদিন ফিরে এসেছে, তাই নবীর বিবিগণ তাদের খোরপোষ কিছু বাড়িয়ে দেওয়ার আবদার করলেন।

এ পর্যন্ত ঠিক আছে, অসুবিধার কিছু নেই, আপত্তিকর কিছু নেই। আবদারটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিবিগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সুস্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্য দু'জন শাসনকর্তার উপমা দিলেন। একজন হল পারস্য সম্রাট, তৎকালীন বিশ্বের এক পরাশক্তি হিসেবে পরিচিত।

আরেকজন হল রোম সম্রাট, তৎকালীন বিশ্বে দ্বিতীয় পরাশক্তি হিসেবে পরিগণিত। যেই যুগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুভাগমন করেছিলেন, সেই যুগে বিশ্বে দুটি রাষ্ট্রই ছিল শক্তিশালী রাষ্ট্র। একটা রোম, আরেকটা পারস্য। এদের মোকাবেলায় কেউ যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার সাহস করতে পারত না। এরা ধনী ছিল, এদের সুসজ্জিত সেনাবাহিনী ছিল, পর্যাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রের অধিকারী ছিল। তারা যেহেতু ধনী, শক্তিশালী, তাই সেই যুগে তাদেরকে পরাশক্তি হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। একটা রোম, আরেকটা পারস্য।

তৎকালীন রোম ও পারস্য সম্রাটের বহু স্ত্রী ছিল। তৎকালীন সময়ে যারাই ধনি, শক্তিশালী হত, তারাই ১০জন, ২০ জন, ১০০জন, ২০০জন স্ত্রী রাখত ঘরে। সেই সমাজের প্রথাই ছিল এটি। এই বিপুল সংখ্যক স্ত্রীকে একেকজন ঘরে রাখত। এবার বলুন একজন পুরুষ যদি ১০০জন ২০০জন স্ত্রী রাখে, তাহলে কি তাদের ঘরে স্ত্রীরা অধিকার থেকে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হত না? তাই আল্লাহ্ পাক আয়াত নাজিল করে একটা সীমরেখা দিলেন। একজন মুসলমান পুরুষ চারের বেশী স্ত্রী একত্রে রাখতে পারবে না, জায়েজ নেই, হারাম।

চার স্ত্রী থাকা অবস্থায় যদি কেউ পঞ্চম বিয়ে করে সেটা আর বিয়ে থাকবে না, ক্যান্সারে পরিণত হবে। কেউ যেন নারীদের অধিকার খর্ব করতে না পারে, সেজন্য আল্লাহ্ কুরআনে এই সীমারেখা দিলেন। তারপরও বর্তমান বিশ্বের আধুনিক নারীদের অনেক আপত্তি। আপত্তি হচ্ছে নারীদেরকে যেমন একের অধিক স্বামী রাখার অধিকার দেওয়া হয়নি, তেমনিভাবে যদি পুরুষকে একের অধিক স্ত্রী রাখার অধিকার দেওয়া হত না, তাহলে নারী-পুরুষের সমান অধিকার হত।

এই যুক্তি অন্তঃসারশূন্য, এই যুক্তির কোনো ভিত্তি নেই। যারা বলে নারীদেরকে একের অধিক স্বামী রাখার যেমন অধিকার দেওয়া হয়নি, তেমনিভাবে পুরুষকে একের অধিক স্ত্রী রাখার অধিকার দেওয়া উচিৎ নয়। তাদের যুক্তি যৌক্তিক নয়, অযৌক্তিক। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন যুগে আদমশুমারীতে দেখা যায় পুরুষের তুলনায় নারীদের সংখ্যা বেশী।

যেমন ধরুন কয়েক বছর আগের আদমশুমারী মতে সারা বিশ্বের লোকসংখ্যা ছয়শ কোটি। এর মাঝে তিনশ কোটি পুরুষ আর তিনশ কোটি নারী নয়, সমান সমান নয়, নারীদের সংখ্যা অনেক বেশী। আমরা আপাতত বিষয়টা বুঝানোর জন্য ধরে নিই যে, যদি ছয়শ কোটি মানুষের মাঝে পৌনে তিনশত কোটি পুরুষ আর সোয়া তিনশ কোটি নারী হয়, তাহলে পুরুষের তুলনায় পঞ্চাশ লক্ষ নারী বেশী।

কাজেই যারা বলে পুরুষদেরকেও একের অধিক স্ত্রী রাখার অধিকার না দেওয়া হোক, তাহলে তাদের যুক্তি মেনে নিয়ে বর্তমান জামানার পৌনে তিনশ কোটি পুরুষের সাথে পৌনে তিনশ কোটি নারীকে বিয়ে দেওয়ার

পর বাকী পঞ্চাশ লক্ষ নারীদের বিয়ে কোন যুক্তিতে কার সাথে হবে? আর যারা বলে নারীদের যেমন একের অধিক স্বামী রাখার অধিকার দেওয়া হয়নি, তেমনিভাবে পুরুষকেও একের অধিক স্ত্রী রাখার অধিকার না দেওয়া হোক, তাদের দাবী যৌক্তিক না অযৌক্তিক? অযৌক্তিক। দুই নম্বর পুরুষদেরকে একাধিক স্ত্রী রাখার অধিকার দিয়েছেন জাহিলিয়াতের যুগের মত সীমাহীন না সীমিত? সীমিত। কতজন পর্যন্ত? চারজন পর্যন্ত। তাও বিনা শর্তে নয়; শর্তে। আল্লাহ্ বলেন,

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ

তোমরা দরকারে দু'স্ত্রী রাখতে পার, দরকারে তিন স্ত্রী রাখতে পার, দরকারে চার স্ত্রী রাখতে পার, এর বেশী নয়। আল্লাহ্ বলেন,

فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً (النساء/٣)

যে পুরুষ একের বেশী বিয়ে করবে, সে যদি আশঙ্কা করে, উভয় স্ত্রীকে সমান ব্যবহার করতে পারবে না, উভয় স্ত্রীকে সমান খানা দিতে পারবে না, উভয় স্ত্রীকে সমান মূল্যের কাপড় দিতে পারবে না, উভয় স্ত্রীকে সমান মানের বাসস্থান দিতে পারবে না, উভয় স্ত্রীকে সমান সময় দিতে পারবে না, সেই পুরুষের জন্য একের বেশী স্ত্রী রাখা হালাল নয়। আপনারা বলুন, আল্লাহ্ বিধান দিয়েছেন একদিক বিবেচনা করে, না সবদিক বিবেচনা করে বিধান দিয়েছেন? সবদিক বিবেচনা করে।

কাজেই আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে যারা আপত্তি উঠানোর চেষ্টা করে, তারা নিঃসন্দেহে বেঈমান। আমার বুঝে আসুক বা না আসুক আল্লাহ্র বিধান যথার্থ। আল্লাহ্র বিধান সঠিক, আল্লাহ্র বিধান চূড়ান্ত সত্য, এমন ধারণা, এমন আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতে পারলেই একজন মানুষ ঈমানদার হতে পারে। রাসূলের যুগে পুরুষরা একজন, দুজন, তিনজন নয়; বরং শত শত নারীকে স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করতো। বুঝে থাকলে বলুন, এসব নারী স্বামীর কাছ থেকে স্বীয় অধিকার আদায় করতে পারতো, না নির্যাতন ও কষ্ট করতে হতো? কষ্ট করতে হতো।

রাসূলের যুগে একজন শাসনকর্তা ছিল রোম সম্রাট এরকম আরেকজন শাসনকর্তা পারস্য সম্রাট। তারা তাদের স্ত্রীদেরকে মহামূল্যবান গয়না-অলংকার আর সুন্দর কাপড় পরিয়ে হাঁটে-ঘাটে মাঠে-ময়দানে যেখানে-

-সেখানে নিয়ে ঘুরাফেরা করত। এই রোম ও পারস্য সম্রাট তাদের অধিক স্ত্রীদেরকে অলংকারাদি দিয়ে সাজিয়ে যথায়-তথায় সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করত। সেই সময়ে যখন আমাদের নবীর স্ত্রীগণ নিজেদের খোরপোষের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়ার জন্য রোম ও পারস্য সম্রাটের স্ত্রীদের উদাহরণ টানলেন।

তারা বেঈমান হয়েও তাদের স্ত্রীদের মহা মূল্যবান অলংকার-জেওর দিতে পারে, তাহলে আপনি দু'জাহানের সরদার, আপনি সায়্যিদুল মুরসালীন আপনাকে আল্লাহ্ জগৎবাসীর মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেছেন, আপনি কি আপনার স্ত্রীদের খোরপোষ আগের তুলনায় বাড়িয়ে দিতে পারেন না?

নবীর বিবিগণের এই আবদারের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ সূরায়ে আহযাবের ২৮নং থেকে ৩৪নং পর্যন্ত আয়াতগুলো নাজিল করলেন, নাজিলকৃত আয়াতগুলোর সারমর্ম হল হে আমার নবীর বিবিরা! আমার নবী যখন দুর্যোগে ছিলেন তখন তিনি তোমাদের খোরপোষে কম দিয়েছেন।

শ্রোতাদের প্রশ্ন ঃ নবী কেন চারের অধিক বিয়ে করেছেন?

আপনারা যৌক্তিক প্রশ্ন করেছেন। আপনাদের প্রশ্ন করার আগেই আমার মনে সেই প্রশ্ন ছিল। ভেবে ছিলাম আজ যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাই, তাহলে আলোচনা লম্বা হয়ে যাবে। এবার আপনারা যদি ধৈর্যসহকারে শোনেন, তাহলে এখানেই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে চাই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারের অধিক বিয়ে করেছিলেন। রাসূল যতগুলো বিয়ে করেছেন, সবগুলোই নিজে থেকে করেন নি, আমাদের মত আনন্দ আর রং তামাশা নিয়ে বিয়ে করেন নি। রাসূলের সবগুলো বিয়ে ছিল উম্মতের স্বার্থে। রাসূলের সবগুলো বিয়ে কিভাবে উম্মতের স্বার্থে ছিল?

এক হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল বলেন, اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا। আল্লাহ্ আমাকে উম্মতের জন্য উস্তাদ বানিয়ে পাঠিয়েছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের উস্তাদ। শুধু পুরুষ উম্মতের, না নারীদেরও ? নারীদেরও। উম্মতের মাঝে যত পুরুষ আছে, তাদের জন্য যেমন নবী উস্তাদ, তেমনিভাবে উম্মতের মাঝে যত নারী আছে তাদের

জন্যও নবী উস্তাদ। কিন্তু নারীদের জীবনে এমন কিছু জটিল বিষয় আছে, যেগুলো কোন পুরুষ উস্তাদের পক্ষে শিক্ষা দেওয়া লজ্জার ব্যাপার।

যেমন সহবাস কোনভাবে করলে হালাল হবে, সহবাস কোন পদ্ধতিতে করলে হালাল হবে, সহবাস কখন করলে হালাল হবে, কখন করলে হারাম হবে, মাসিক ঋতুস্রাব থেকে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে, কতদিনের রক্তকে মাসিক ঋতুস্রাব গণ্য করা হবে, কত দিনের রক্তকে মাসিক ঋতুস্রাব গণ্য করা হবে না, এ রকম অনেক বিষয় আছে যা অন্য পুরুষের কাছে শিখবে দূরের কথা নিজের বাবার কাছেও শিক্ষা করা লজ্জার ব্যাপার? নিজের ভাইয়ের কাছেও শিক্ষা করা লজ্জার ব্যাপার।

এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরকার ছিল কিছু নারীকে বিয়ে করে নিজের স্ত্রী হিসেবে রাখবেন। কেননা স্ত্রীদেরকে এ ধরনের বিষয় শিক্ষা দেওয়া লজ্জার কথা নয়।

স্ত্রীদের জন্য নিজের স্বামীর কাছে যে কোনও বিষয়ে শিক্ষা নেওয়া লজ্জা নয়। সহবাসের বিষয়ে স্বামীর কাছে শিক্ষা নেওয়া লজ্জা নয়। মাসিক ঋতুস্রাবের ব্যাপারে স্বামীর কাছে শিক্ষা নেওয়া লজ্জা নয়। সন্তান প্রসবের ব্যাপারে স্বামী থেকে শিক্ষা নেওয়া লজ্জা নয়।

এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরকার ছিল উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর কয়েকজন সহকারী শিক্ষিকা। যে সকল বিষয়ে পরপুরুষ থেকে শিক্ষা করা লজ্জার ব্যাপার সেই সকল বিষয়ে এই সহকারী শিক্ষিকারা নারীদেরকে শিক্ষা দেবেন। কাজেই রাসূল নিজের বিলাসিতার জন্য নয়, উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, চারের অধিক বিয়ে করেছিলেন।

যাই হোক! হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের সর্বপ্রথম যে বিয়ে করেছিলেন সেটা পঁচিশ বছর বয়সে করেছিলেন। স্ত্রী ছিলেন হযরত খাদীজা রাযি.। তার বয়স ছিল ৪০ বছর। তিনি ছিলেন বিধবা এবং কয়েক সন্তানের মাতা। আছে কি এমন কোনো যুবক! যে যুবক ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বিধবা কয়েক সন্তানের মাকে জীবনের প্রথম স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে? না। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতগুলো বিয়ে করেছিলেন, এর কোনটাই নিজের

গরজে নয়, সবই উম্মতের স্বার্থে করেছিলেন।

এ ছাড়াও এক হাদীসে আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গায়ে চার হাজার বীরপুরুষের শক্তি ছিল। কতজন? চার হাজার। সাধারণ পুরুষদের, না বীরপুরুষদের? বীরপুরুষদের। এবার চিন্তা করুন! যে পুরুষের গায়ে চার হাজার পুরুষের শক্তি আছে, আর সাধারণ একজন পুরুষ যদি চারটা স্ত্রী রাখতে পারে,

তাহলে যে পুরুষটার গায়ে চার হাজার পুরুষের শক্তি আছে সে যুক্তি সঙ্গতভাবে কতজন স্ত্রী রাখার অধিকার রাখেন ? যুক্তি সঙ্গতভাবে ষোল হাজার স্ত্রী রাখার অধিকার রাখতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করেন নি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সেই অধিকার প্রয়োগ করতেন, তাহলে রোম সম্রাট প্রশ্ন করার সুযোগ পেত, পারস্য সম্রাট প্রশ্ন করার সুযোগ পেত।

আমরা যারা দু'শ স্ত্রী রাখছি বা তিনশ স্ত্রী রাখছি, কাজেই চার বিবি রাখার কথা, তোমার মুখে মানায় না। আল্লাহ্‌র রাসূল সে দিকেও সতর্ক ছিলেন এমন কথাও যেন বলার সুযোগ না পায়। একদিকে শরীয়তের চাহিদা অনুপাতে অনেক বিবি রাখার দরকার ছিল, সবদিক বিবেচনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একত্রে তাঁর ঘরে ৯ বিবি রেখেছিলেন।

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন নবীর বিবিদের এই প্রশ্নের জবাবে সূরায়ে আহযাবের ২৮নং থেকে ৩৪নং পর্যন্ত আয়াতগুলো নাজিল করেছেন। আমি আগেই বলেছি, এই আয়াতগুলোর ধারাবাহিক তাফসীর বলে শেষ করা যাবে না। তাই যেগুলো মুসলমান মা-বোনদের জন্য বেশী দরকারী, যে কথাগুলো আমি বেশী দরকারী মনে করি, সেই কথাগুলো উপস্থাপন করব।

আল্লাহ্ আয়াতগুলো নাজিল করে বলে দিলেন নবীর বিবিগণের খোরপোষ বাড়িয়ে দেওয়ার আবদার এর সঙ্গে পারস্য সম্রাটের বিবিদের তুলনা, রুম সম্রাটের বিবিদের তুলনা আল্লাহ্‌র পছন্দসই হয় নি। আল্লাহ্ এর খণ্ডনে এই আয়াতগুলো নাজিল করেছেন। আল্লাহ্ বলেন,

يَـٓا اَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا (الأحزاب/٢٨)

হে নবীয়ে করীম! আপনার বিবিরা খোরপোষ এর পরিমাণ বাড়ানোর আবদার করেছিলেন, ভালকথা, কিন্তু পারস্য সম্রাটের স্ত্রীদের তুলনা দেওয়া, রোম সম্রাটের স্ত্রীদের তুলনা দেওয়া ঠিক হয় নি। এই তুলনাতে আমি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট নই। সুতরাং আপনার সমস্ত স্ত্রীকে বলুন, পারস্য সম্রাটের স্ত্রীরা, রোম সম্রাটের স্ত্রীরা আল্লাহ্‌র বিধানে বিশ্বাসী নয়। তারা অবিশ্বাসী কাফের।

অবিশ্বাসী কাফেররা পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের সুখ শান্তি চায় না, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ-বিলাস চায়। সুতরাং কাফের বাদশার স্ত্রীদের মধ্যে আর নবীর স্ত্রীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান। কাফেরের বিবি পরকালের জীবনের সুখ-শান্তি চায়, না দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাস চায় ?

নবীর বিবি তো বহু দূরের কথা সাধারণ একজন মুমিন মুসলিম নারী কাফেরদের মত ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ-বিলাসে, তুচ্ছ ভোগ-বিলাসে কখনো তুষ্ট হতে পারে না। মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হল দুনিয়াতে সুখ-শান্তি করব, দুনিয়াতে আমোদ-প্রমোদ করব, দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসও করব এতটুকু যতটুকু করলে আমার পরকাল বরবাদ হয় না, আমার পরকাল রক্ষা হয়।

বুঝে থাকলে বলুন, মুমিন-মুসলমানেরা দুনিয়াতে পুরুষ হোক আর নারী হোক ভোগ-বিলাস, আমোদ-প্রমোদ মোটেই করবে না? না একটা সীমারেখার ভেতরে করবে? সেই সীমারেখাটা কি? আপনি আমোদ-প্রমোদ করবেন, আপনি ভোগ-বিলাস করবেন, আপনি মজার খাবার খাবেন, আপনি আনন্দ উপভোগ করবেন, কি পরিমাণ?

যে পরিমাণ আনন্দের কারণে পরকালে আমার জাহান্নামী হতে না হয়, যে পরিমাণ ভোগ-বিলাসের কারণে পরকালে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে না হয়, আমি সেই পরিমাণ আমোদ-প্রমোদ করব, সেই পরিমাণ ভোগ-বিলাস করব, এর বেশী নয়।

এই স্কেলটা বর্তমান দুনিয়ার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মুসলমানের ভাল রকম বুঝার এবং স্মরণ রাখার প্রয়োজন।

আল্লাহ্ দুনিয়াতে মুসলমানের আমোদ-প্রমোদ করতে সমূলে নিষেধ করেন নি। ভোগ-বিলাস করতে সমূলে নিষেধ করেন নি। শুধু একটা সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যতটুকু আমোদ-প্রমোদ করা হালাল, ততটুকু আমোদ-প্রমোদ করো, ততটুকু ভোগ-বিলাস করো। হারাম উপায়ে ভোগ-বিলাস করতে গিয়ে পরকালের জাহান্নাম খরিদ করো না। পরকালের জান্নাত থেকে বঞ্চিত থাকবে না। এই হল দুনিয়াতে নারী হোক পুরুষ হোক আমোদ-প্রমোদ আর ভোগ-বিলাস করার সীমারেখা।

বুঝে থাকলে বলুন! আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মুসলমানদের দুনিয়াতে আমোদ-প্রমোদ, ভোগ-বিলাস করা সমূলে নিষিদ্ধ? না অনুমতি আছে? প্রথম কথা হল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মুসলমানদের দুনিয়াতে আমোদ- প্রমোদ করার অনুমতি আছে। দ্বিতীয়ত সীমাহীন না নির্ধারিত, একটা সীমানা পর্যন্ত? সীমানা পর্যন্ত। বর্তমান দুনিয়াতে মুসলমানরা প্রথম কথাটা মনে রেখেছে আর দ্বিতীয়টা ভুলে গিয়েছে।

আমোদ-প্রমোদ করার অধিকার আমার আছে কিন্তু সীমানা নেই? সীমাহীন ? বর্তমান দুনিয়ার বেশীর ভাগ মুসলমানেরা এই দুটি মহা মূল্যবান নীতিকথার প্রথমটি স্মরণ রেখেছে আর দ্বিতীয়টি ভুলে ফেলেছে। দুনিয়াতে ভোগ-বিলাস করার অধিকার আমার আছে, কিন্তু সেই অধিকারের কোনো সীমারেখা নেই –এটাই চরম ভুল। তাহলে তোমার ভোগ-বিলাস আর বেঈমান কাফেরদের ভোগ-বিলাসে ব্যবধান রইল কোথায় ?

আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন নবীর বিবিদেরকে একথাই বলতে চান

اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا

আল্লাহ্ বলেন, হে রাসূলে কারীম! আপনার বিবিরা যে পারস্য-রোম সম্রাটের বিবিদের তুলনা দিলেন, সেই প্রসঙ্গে আপনি আপনার বিবিদের জিজ্ঞেস করুন, ঐ কাফের নারীরা দুনিয়াতে যেভাবে অবাধে ভোগ-বিলাস চায়, আপনার বিবিরাও এই রকম অবাধ ভোগ-বিলাস চায় কি না।

যদি আপনার বিবিরা বলে আমরাও বেঈমান কাফিরের মত দুনিয়াতে অবাধ ভোগ-বিলাস চাই, তাহলে ওরা আপনার বিবি হয়ে থাকার অধিকার রাখে না। এরা আপনার .....?

বিবি হয়ে থাকার অধিকার রাখে না। আপনার যা সামর্থ্য আছে বিবিদের দেওয়ার তা দিয়ে তালাক দিয়ে আপনার ঘর থেকে বের করে দিন। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন এই আয়াত নাজিল করার পর সর্বপ্রথম হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সবচেয়ে মুহব্বতের স্ত্রী। সব চেয়ে বেশি .....?

মহব্বতের স্ত্রী হযরত আয়শা সিদ্দীকা রাযি.-কে একাকি ডাকলেন।

এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূল আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ্! আমি সবগুলো বিবিকে খোরপোষ সমানভাবে দিই, সবগুলো বিবিকে আমি সময় সমানভাবে দিই, কিন্তু আমার অন্তরে আয়শার মুহব্বত বেশী। এই মহব্বতের দ্বারা আমি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না। এর জন্য আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। এখানে আমাদের বুঝার মত ব্যাপার যে, আয়শাকে আল্লাহ্‌র রাসূল অন্য বিবিদের থেকে বেশী মহব্বত করতেন কেন?

কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, অন্য বিবিদেরকে আল্লাহ্‌র রাসূল বিধবা অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন। আর আয়শা রাযি. কে আল্লাহ্‌র রাসূল কুমারী অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন। সুতরাং বিধবা নারীদেরকে ভালো বাসতেন কম, আর কুমারী স্ত্রীকে ভালোবাসতেন বেশি। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এটা একজন নবীর বেলায়, শ্রেষ্ঠ নবী দূরের কথা একজন সাধারণ মুমিন পরহেজগার মুসলমানের ব্যাপারেও কল্পনা করা যায় না।

কাজেই প্রশ্ন জাগে আয়শাকে নবী বেশী মহব্বত করতেন কেন ? আমি আগেই বলেছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবগুলো বিয়ে করেছিলেন কিসের স্বার্থে? মনের আনন্দে? না উম্মতের স্বার্থে? উম্মতের স্বার্থে। এই স্বার্থটা হযরত আয়শার দ্বারা বেশী আদায় হত। আপনাদের কেউ শিক্ষক হয়ে থাকলে বিষয়টা বেশী বুঝবেন। আপনারা যখন ক্লাসে যান শিক্ষা দেওয়ার জন্য আপনার ক্লাসে যদি ৫০টা ছাত্র থাকে, এর মাঝে যে ছাত্র আপনার শিক্ষা সঠিকভাবে বুঝে, সঠিকভাবে গ্রহণ করে অর্থাৎ যে

ছাত্র অন্যের চেয়ে লেখা-পড়া ভালো পারে বেশী পারে, ঐ ছেলেটাকে আপনার বেশী ভালো লাগে কি না? এটা কি আপনার স্বার্থে, না তার স্বার্থে? তার স্বার্থে।

ঠিক তেমনিভাবে উম্মতের স্বার্থ হযরত আয়শার দ্বারা বেশী আদায় হত। এই কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়শা রাযি. কে অন্য বিবিদের থেকে বেশী মহব্বত করতেন। তাহলে কিভাবে ? এটাও বুঝার মত একটা চমৎকার ঘটনা আছে। এক সময় একটা মাসয়ালা নিয়ে হযরত উমর ফারুক রাযি. এবং হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর মাঝে দ্বিমত হল। মাসয়ালাটি লজ্জাজনক। কিন্তু যখন দ্বিমত হল তখন শরীয়তের ফায়সালা জানা জরুরী হয়ে দাঁড়াল। কাজেই লজ্জাজনক হলেও আর গোপন করা গেল না। আলোচনায় বাধ্য হলেন তারা।

মাসয়ালা কি? মাসয়ালা হল সহবাস শুরু করার মাধ্যমেই গোসল ফরয হয়ে যায় নাকি সহবাস সমাপ্ত হওয়ার পর গোসল ফরয হয়? হযরত উমর রাযি. বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সহবাস সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত গোসল ফরয হয় না। আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সহবাস শুরু করার সাথে সাথেই গোসল ফরয হয়ে যায়। এবার সহবাস সমাপ্ত হোক বা নাই হোক।

এমতাবস্থায় হযরত উমর ফারুক রাযি. এই মতবিরোধ মীমাংসার জন্য একটা প্রস্তাব দিলেন। বললেন. দেখো এটা তো স্বামী-স্ত্রী সংক্রান্ত ব্যাপার। দাম্পত্য জীবনের সাথে সম্পর্কিত। আর রাসূলের ঘরে আমার এক মেয়ে আছে, রাসূলের স্ত্রী হযরত হাফসা রাযি.।

রাসূল হলেন স্বামী আর আমার মেয়ে হাফসা হল রাসূলের স্ত্রী। সুতরাং আমার মেয়ে রাসূলের কাছ থেকে এই ব্যাপারে মীমাংসা শিখে থাকবে। সুতরাং তুমি আর আমি রাসূলের বিবি হাফসার কাছে যাই। আবু হুরাইরা রাযি. রাজী হলেন। হযরত হাফসা রাযি. বলেন, এর সুষ্ঠু মীমাংসা আপনারা আমার কাছে পাবেন না। এই মাসয়ালার সুষ্ঠু মীমাংসা আমার জানা নেই। সুষ্ঠু মীমাংসা পেতে হলে আপনারা হযরত আয়শা রাযি.-এর কাছে যান।

বুঝে থাকলে বলুন হাফসাও রাসূলের বিবি আর আয়শাও রাসূলের বিবি। আর এমন একটা বিষয়ে বিরোধ হল যা স্বামী-স্ত্রী সংক্রান্ত ব্যাপার। যা দাম্পত্য জীবন সংক্রান্ত ব্যাপার। উমর প্রস্তাব দিলেন রাসূলের স্ত্রী আছে আমার মেয়ে হাফসার কাছে যাই। হল কি মীমাংসা সেখানে? হল না; বরং তিনি নিজেই পরামর্শ দিলেন আয়শার কাছে যান। শেষ পর্যন্ত হযরত আয়শা রাযি. এর কাছে গেলেন।

হযরত আয়শা বলেন, উমর! আপনি যে বলেন নিজের কানে শুনেছেন এটাও ঠিক। আর আবু হুরাইরা যে বলেছেন, রাসূল বলেছেন এবং নিজের কানে শুনেছেন তাও ঠিক। তবে উমর আপনি যে কথাটা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, সহবাস সমাপ্তির মাধ্যমে গোসল ফরয হয়। শুরু করার সাথে সাথে গোসল ফরয হয় না, এই কথাটা আল্লাহ্র রাসূল প্রথম প্রথম বলেছিলেন অস্থায়ী বিধান হিসেবে সাময়িকভাবে কিছু দিনের জন্য।

এই অস্থায়ী বিধানের মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্থায়ী বিধান দিয়ে আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন, এখন থেকে আর গোসল সহবাস সমাপ্তির মাধ্যমে ফরয নয়, এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সহবাস শুরু করার মাধ্যমেই গোসল ফরয হয়ে যাবে। সুতরাং উমর রাযি.-এর হাদীসের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে আর আবু হুরাইরা রাযি.-এর হাদীস কিয়ামত পর্যন্ত বলবত।

বুঝে থাকলে বলুনতো, উমর রাযি. আর আবু হুরাইরা রাযি.-এর মাসয়ালার বিরোধের মীমাংসা হয়েছিল হাফসার কাছে, না আয়শার কাছে ? আয়শার কাছে। এবার বুঝে থাকলে বলুনতো! রাসূল একত্রে ৯ বিবি যে শরীয়তের স্বার্থে রেখেছিলেন, এই স্বার্থটা সবচেয়ে বেশী হাসিল হয়েছিল কোন্ বিবির দ্বারা? হযরত আয়শার দ্বারা।

এজন্য হযরত আয়শাকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশী মায়া করতেন। এবার বলুন, হযরত আয়শাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুমারী হওয়ার কারণে বেশী মহব্বত করতেন নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্বার্থে অধিক বিয়ে করেছিলেন, সেই স্বার্থ বেশী হাসিলের কারণে? বেশী স্বার্থ হাসিলের জন্য। যাতে শরী'অতের স্বার্থ ও উম্মতের ফায়দা জড়িত। ক্লাসের ভাল

ছেলেকে বেশী মহব্বত করা ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়, স্বভাবগত ব্যাপার। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে। স্বভাবগতভাবে যদি নিজের এক বিবির প্রতি মনের আকর্ষণ বেশী থাকে, সেটা অপরাধ হবে না। কিন্তু সময় দিতে হবে সমান। খাবার দিতে হবে সমান মূল্যে। কাপড় দিতে হবে সমান মূল্যে। বাসস্থান দিতে হবে সমমানের।

তাহলে সকল বিবির সাথে সাম্য রক্ষা করতে হবে মনের আকর্ষণের ব্যাপারে? না সময়ের ব্যাপারে,কাপড়ের ব্যাপারে, খোরাকের ব্যাপারে, বাসস্থানের ব্যাপারে? কোন ব্যাপারে? মনের আকর্ষণের ব্যাপারে? না। মনের আকর্ষণ কারো ইচ্ছাধীন নয়। মনের আকর্ষণ কারো নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

একজন পুরুষের যদি দু'জন স্ত্রী থাকে আর একজন স্ত্রীর প্রতি মনের আকর্ষণ বেশী থাকে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমা ঘোষণা হয়ে গেছে। কিন্তু মনের আকর্ষণ বেশী থাকার কারণে তাকে সময় বেশী দেওয়া যাবে না। মনের আকর্ষণ বেশী থাকার কারনে তার কাছে বেশী সময় কাটানো যাবে না। তাকে বেশী দামের কাপড় দেওয়া যাবে না। তাকে বেশী মানের খানা দেওয়া যাবে না। তাকে বেশী মূল্যের বাড়ি দেওয়া যাবে না।

বাড়ি দিতে হবে উভয় বিবিকে সমান মূল্যের, খাবার দিতে হবে উভয় বিবিকে সমান দামের, পোশাক দিতে হবে উভয় বিবিকে সমান দামের, সময় দিতে হবে উভয় বিবিকে সমান সমান, এই চার ক্ষেত্রে একাধিক বিবির ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করতে হবে। অন্তরের আকর্ষণ বেশী হওয়া কোনো মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই। এই কারণে উম্মতের জন্য এটা যেমন ক্ষমা, রাসূলের জন্যেও সেটা ক্ষমা।

এ পর্যায়ে আমি আপনাদের সামনে আয়াতগুলোর তরজমা শুনাচ্ছি। ২৮নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

يَآ اَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا (الأحزاب/٢٨)

হে নবী ! আপনার বিবিগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা করো, তবে এসো আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থাৎ পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা করো, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণের জন্য আল্লাহ্ মহা পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন। এরপর আল্লাহ্ ৩০ নং আয়াতে বলেন,

يٰنِسَآءَ النَّبِىِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ - وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا

আল্লাহ্ বলেন, হে নবীর বিবিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগণ শাস্তি দেওয়া হবে। এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

৩১নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দু'বার পুরস্কার দেব এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক রিযিক প্রস্তুত রেখেছি। ৩২নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

يٰنِسَآءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

হে নবীর বিবিগণ ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কু-বাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।

৩৩নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

আল্লাহ্ বলেন, তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে মূর্খতাযুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ ! আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।

তারপর আল্লাহ্ ৩৪নং আয়াতে বলেন,

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا

আল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন।

রাসূল বলেন,

اَلْمَرْأَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

অর্থাৎ যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রমাযানের রোযা রাখবে, নিজের লজ্জা স্থান হেফাজত করবে ও স্বামীর আনুগত্য করবে, সেই নারী জান্নাতের যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে কুরআন-হাদীস মত জিন্দেগী চালানোর তাওফীক দান করুন।

গতকাল বলেছিলাম, স্বামী-স্ত্রী সংক্রান্ত একটা জটির মাসয়ালার ব্যাপারে হযরত উমর ফারুক ও হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে হযরত উমর রাযি. প্রস্তাব দিলেন, আমার মেয়ে হাফসা রাসূলের স্ত্রী, আর রাসূল হলেন হাফসার স্বামী। নিশ্চয় আমার মেয়ে হাফসা তার স্বামী রাসূল থেকে এই মাসয়ালাটা শিখে থাকবে।

কাজেই চলো আমরা রাসূলের বিবি হাফসার কাছ থেকে এই মাসয়ালার মীমাংসা নিয়ে আসি। আবু হুরাইরা রাযি. রাজি হলেন। দু'জন হাফসার কাছে গেলেন। ঘটনা পেশ করলেন। হাফসা বললেন, আপনাদের এই জটিল কথা, উমর যা বলছেন তা-ও রাসূলের হাদীস, আবু হুরায়রা যা

বলছেন, তাও রাসূলের হাদীস। রাসূলের এক হাদীসের বিরুদ্ধে অন্য হাদীসকে দাঁড় করানো হয়েছে।

সুতরাং এত বড় কঠিন সমস্যার সমাধান-মীমাংসা আপনারা আমার কাছ থেকে আশা করতে পারেন না, এর সুষ্ঠু মীমাংসা পেতে হলে হযরত আয়শার কাছে যেতে হবে। হযরত হাফসার কাছ থেকে সমাধান না পেয়ে হযরত আয়শার কাছে গেলেন। আয়শা বললেন, উমর! আপনি যে বলেছেন সহবাস সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত গোছল ফরয হয় না আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন সত্য। তবে এটা সাময়িক নিয়ম, কিছু দিনের জন্য। এই কিছু দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে রাসূল স্থায়ীভাবে যে নিয়ম বলে দিয়েছেন, সেটা হল সহবাস শুরু করার সাথে সাথে গোসল ফরয হয়ে যায়।

এই নিয়মই কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকছে, যা আবু হুরায়রা বলেছেন। উমর রাযি.-এর বর্ণিত হাদীস একটা মেয়াদী ছিল। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর এই হাদীসের বিধান রহিত হয়ে গেছে। আবু হুরাইরা রাযি.-এর বর্ণিত হাদীস মেয়াদী নয়, চিরস্থায়ী বিধান। সুতরাং দুই হাদীসের মাঝে হযরত আয়শা সমাধান করে দিলেন মীমাংসা করে দিলেন।

বুঝে থাকলে বলুন! উম্মতের স্বার্থ রাসূলের কোন বিবি দ্বারা বেশী হয়েছিলো ? আয়শার দ্বারা। তাই একজন ফাষ্টবয়কে যে কারণে শিক্ষক বেশী ভালোবাসেন একই কারণে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়শা ছিদ্দিকা রাযি.-কে বেশী ভালোবাসতেন। সুতরাং আয়শার প্রতি রাসূলের অতিরিক্ত ভালোবাসাকে আমরা যেন কু-ধারণায় না-দেখি।

অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার নবীগণের বেলায় অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার। নবীর বিবিগণের বেলায়, নবীর ছাহাবীগণের বেলায়। যেহেতু আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়শাকে বেশি মহব্বত করতেন, এদিকে আল্লাহ্ রাসূলকে কি নির্দেশ দিয়েছেন, আপনার সমস্ত বিবিগণকে বলুন, তোমরা বেদ্বীন কাফিরের মত শুধু দুনিয়া চাও না আখেরাত চাও। আপনার বিবিরা যদি বলে আমরা দুনিয়া চাই, আমি

আল্লাহ্ এদেরকে আপনার বিবি হিসেবে পছন্দ করি না। যা পারেন ধন-সম্পদ দিয়ে জলদি তালাক দিয়ে দেন

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তা করলেন, তাহলে তো আয়শাকেও তালাক দিয়ে দিতে হবে। আয়শা তো আমার বিবিদের মাঝে একজন, অথচ আয়শাকে আমি বেশী মহব্বত করি। এজন্য সর্বপ্রথম হযরত আয়শাকে একা একা ডাকলেন। আয়শা অত্যন্ত অল্প বয়স্কা ছিল। রাসূলের ইন্তিকালের সময় হযরত আয়শার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। কত দিন? ইন্তিকালের সময় বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর।

কাজেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অল্প বয়স্কা বিবি আয়শাকে একাকি ডাকলেন আর ভাবলেন, অল্প বয়সের কারণে জবাব যদি বুদ্ধি খাটিয়ে দিতে না পারে, তাহলে তো আল্লাহ্র বিধান আমার পালন করতে হবে। তালাক দিয়ে দিতে হবে। এজন্যে আগে একটা ভূমিকা দিলেন।

বললেন, আয়শা ! তোমার কাছে আমি একটা প্রস্তাব রাখব। এখনই জবাব দেবে না, তোমার মা-বাবার সাথে পরামর্শ করে এসে জবাব দেবে। আর রাসূলের মনে রয়েছে: আয়শা যখন তার মা-বাবার কাছে বলবে যে রাসূল বলছেন দুনিয়া চাই, না আখেরাত চাই। দুনিয়া চাইলে যা পারেন সম্পদ দিয়ে তালাক দিয়ে দেবেন।

আর নিশ্চয়ই আয়শার মা-বাবা আয়শাকে এই পরামর্শ দেবেন না যে, তুমি রাসূলের কাছ থেকে ধন-সম্পদ নিয়ে তালাক নিয়ে এসো। এটা অবশ্যই তার মা-বাবা দেবেন না। কিন্তু তার বয়স যখন কম, হয়তো বুদ্ধি খাটাতে ভুলও করতে পারে। এজন্য বললেন, তুমি নিজে নিজে জবাব দেবে না, আমি তোমার কাছে প্রস্তাব রাখছি মা-বাবার কাছে পরামর্শ করে জবাব দেবে।

এরপর বললেন, তোমরা আমার কাছে যে আবদার রেখেছ এবং আবদার রাখতে গিয়ে পারস্য সম্রাটের স্ত্রীদের সাথে আর রুম সম্রাটের স্ত্রীদের সাথে তোমাদের তুলনা করেছ, যা আল্লাহ্র পছন্দ হয়নি। তাই আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা দুনিয়া চাও, না আখেরাত চাও তা পরিষ্কার ভাষায় বলতে হবে। যদি দুনিয়া চাও তোমাদেরকে আমার বিবি হিসেবে

রাখব না। যা পারি দুনিয়ার ধন-সম্পদ দিয়ে তালাক দিয়ে দেব। যাও, তোমার মা-বাবার সাথে পরামর্শ করে এসে জবাব দাও। আয়শা বলেন, আল্লাহ্র রাসূল! বে-আদবি মাফ করবেন। আমরা ভুল করেছি। আমরা ভাবতে পারি নি যে, আল্লাহ্র কাছে আমাদের একথা পছন্দ হবে না।

আমার মা-বাবার সাথে পরামর্শের কোনো দরকার নেই, আমি দুনিয়া চাই না, আমি আখেরাত চাই। আপনি যা পারেন দেন আর না পারলে না দেন আমি আজীবন দুনিয়াতে আপনার স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতে চাই।

ভুল তো করেছিলেন ঠিক, ভুলে রইলেন নাকি সংশোধন হয়ে গেলেন? সংশোধন হয়ে গেলেন। এই কারণে, এই ভুলের কারণে এখনো তাদের দোষী বলা যাবে ? জ্বী না। (শ্রোতাদের) এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা মতে নবীর বিবিগণের সমালোচনা করা হারাম। নবীর ছাহাবাগণের সমালোচনা করা হারাম।

নবীর বিবিগণ যত ভুল করে ছিলেন নবীর দরবারে, নবীর ছাহাবাগণ যত ভুল করেছিলেন আল্লাহ্র দরবারে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষ থেকে তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কেমন ক্ষমা? সাধারণ ক্ষমা। কোনো ভুল ত্রুটি বাকী নেই, তাদের সকল ভুল-ত্রুটি আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারা সংশোধন না হওয়ার কারণে, না পরিপূর্ণভাবে সংশোধিত হয়ে গিয়েছেন এজন্য আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষ থেকে তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

আরেকটা জটিল ব্যাপার আছে। তারা এটুকু ভুল করেছিলেন, যে কারণে আল্লাহ্ আয়াতগুলো নাজিল করলেন। "ভুল করেছিলেন" না বললে আয়াতের শানে নুযূল বুঝানো যায় না।

ভুলের কথা উল্লেখ না করে আয়াতের শানে নুযূল বুঝানো গেল? না। তবে "ভুল করেছিলেন" কথাটা সমালোচনা নয়? অনেকে এই প্রশ্নের জবাব না বুঝে এই প্রশ্নের ভেড়াজালের ফাঁকে ছাহাবায়ে কেরাম এবং নবীর বিবিগণের সমালোচনার দরজা খুলে দিতে চায়।

অথচ মুফাসসিরীনে কেরাম তাফসীরের কিতাবে লিখেছেন, তাদের অতীতকালে যে দোষের কথাটা না বললে আয়াতটা বুঝা যায় না, তাদের অতীত ও জীবনের যে গুনাহ্র কথাটা না বললে হাদীসের ব্যাখ্যাটা বুঝা যায় না, সেখানে এটা বলতে পারবে, সাথে সাথে বলে দিতে হবে "তারা

সংশোধন হয়ে গিয়েছেন এবং আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন।" তার সংশোধন হয়ে গিয়েছেন এটা লুকিয়ে রাখবে, "আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন" ঐটা লুকিয়ে রাখবে আর শুধু 'ভুল করেছিলেন' দোষ করেছিলেন বলবে, হারাম হবে, হারাম হবে, হারাম হবে, হারাম হবে।

এভাবে একে একে নবীর সমস্ত বিবিগণ একই জবাব দিলেন। সমস্ত বিবিগণ সম্মিলিতভাবেই আবদার রেখেছিলেন, সমস্ত বিবিগণ একই জবাব দিলেন। কি জবাব দিলেন দুনিয়া চাই, না আখেরাত চাই? আখেরাত চাই। এই যে শানে নুযূলের ঘটনা আমি আপনাদের সামনে পেশ করলাম, এখান থেকে আমাদের সমাজের মা বোনদের সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমান দুনিয়ার অধিকাংশ নারীরা ইয়াহুদী, খ্রিষ্টানদের নারী যেভাবে রাস্তা-ঘাটে বেপর্দা অবস্থায় চলাফেরা করে সেভাবে চলাফেরা করতে চায়।

বর্তমান দুনিয়ার মুসলমান নারীদেরকে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান নারীদের সাথে পাল্লা দিয়ে যদি অবাধে চলা-ফেরার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহলে নবীর বিবিগণের অপরাধটা ছিল কি? বর্তমান দুনিয়ার আমাদের মুসলমান মা-বোনদেরও এই আয়াতগুলোর বিধান অনুপাতে তাফসীরের একটা পরিভাষা আছে 'শানে নুযূল' খাছ হুকুম আম' অর্থাৎ নবীর বিবিগণের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করেছেন।

আয়াতের বিধানগুলো শুধু নবীর বিবিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় সমস্ত মুসলমান নারীদের জন্য প্রযোজ্য। নবীর বিবিগণের প্রশ্নকে উপলক্ষ করে আল্লাহ্ আয়াত নাজিল করেছেন, বিধান শুধু নবীর বিবিগণের জন্যে দিয়েছেন, না সমস্ত নারীদের জন্য? সমস্ত নারীদের জন্যে।

সুতরাং এ আয়াতের বিধানের আওতায় আসে সমস্ত মুসলমান নারীরাও, যারা অবাধে চলাফেরা করতে চাও তোমাদের কাছেও আল্লাহ্র জিজ্ঞাসা যে, তোমরা কি দুনিয়া চাও, না আখেরাত চাও, সেই কথা আগে সিদ্ধান্ত করো তারপরে তোমরা যা চাও তা তোমরা পাবে কি পাবে না সেই মীমাংসা হবে। আগে সিদ্ধান্ত হতে হবে তোমরা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের মত দুনিয়া চাও, না আখেরাত চাও।

যদি বল আমরা দুনিয়া চাই, তাহলে তোমরা কোনো সুযোগ্য মুমিন-মুসলমানের স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা রাখ না। আর যদি তোমরা আখেরাত

চাও, তবে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের নারীদের মত পাল্লা দিয়ে দুনিয়াতে অবাধে চলাফেরাকে 'অধিকার' বলতে পারো না। পুরুষের সমাজে নারীদের অবাধ চলা-ফেরা নারীদের অধিকার নয়, নারীদের অবমাননা। পুরুষের সমাজে নারীদের অবাধে চলাফেরা অধিকার না নারীদের অবমাননা? অবমাননা। অবমাননা কিভাবে তা বুঝার জন্য অনেক কথা।

বর্তমান দুনিয়ার ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানের যত দেশ আছে সবগুলো দেশে আপনারা গিয়ে দেখুন, নারীরা পুরুষের সাথে অবাধে চলাফেরা করে। হাঁটে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে, শহরে-বন্দরে যেখানে সেখানে, হোটেলে, পার্কে, রেস্তুরায়, ক্লাবে, দেশে-বিদেশে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান নারীরা পুরুষের সাথে অবাধে চলা ফেরা করে। কোনো বাধা বিপত্তি নেই।

এর অনিবার্য ফলাফল কি দাঁড়িয়েছে? এর অনিবার্য ফলাফল দাঁড়িয়েছে বর্তমান দুনিয়ার ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের যত দেশ আছে সবগুলো দেশে অধিকাংশ সন্তান জন্ম নেয় হারামজাদা। অধিকাংশ সন্তান কি জন্ম নেয়? হারামজাদা। আমেরিকার অধিকাংশ সন্তান হারামজাদা হয়ে জন্ম নেয়। বৃটেনের অধিকাংশ সন্তান হারামজাদা হয়ে জন্ম নেয়। সবগুলো ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান দেশে অধিকাংশ সন্তানেরা হারামজাদা হয়ে জন্ম নেয়।

এটা হল নারী-পুরুষ অবাধ চলা-ফেরার অনিবার্য ফসল। এই কারণে তাদের দেশের সন্তানেরা যখন স্কুলে লেখা-পড়া করতে যায় নাম রেজিষ্ট্রেশন করার সময় বাবার নামে রেজিষ্ট্রেশন হয় না, নাম রেজিষ্ট্রেশন হয় মায়ের নামে। ছাত্র স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের দেশে বাবার নামে ছাত্রের নাম রেজিষ্ট্রেশন হয় না, ছাত্রের নাম রেজিষ্ট্রেশন হয় মায়ের নামে। কারণ 'এই ছেলেটার বাবার নাম কি' ছেলে জানবে তো দূরের কথা তার মা-ও জানে না।

মা না জানার কারণ আগের সপ্তাহে এক পুরুষের সাথে অবাধে চলাফেরা করেছিল, পরের সপ্তাহে আর এক পুরুষের সাথে অবাধে চলাফেরা করেছিল,

এর পরের সপ্তাহে আরেকটা পুরুষের সাথে অবাধে চলাফেরা করেছিল, তার পরের সপ্তাহে আরেকটা পুরুষের সাথে অবাধে চলাফেরা করেছিল। একমাসে চারটা পুরুষের সাথে অবাধে চলাফেরা করল। পরের মাসেও গর্ভ

ধরা পড়ল না। তার পরের মাসেও গর্ভ ধরা পড়ল না। গর্ভ ধরা পড়ল তিন মাস পরে আর অবাধ চলাফেরা করেছিল তিন মাস আগে কোন পুরুষটার মেলামেশায় গর্ভ সাব্যস্ত হল, তা সন্তান জানবে দূরের কথা সন্তানের মা-ও জানে না।

যেমনভাবে আমাদের দেশের গরু ছাগল, কুকুর, শৃগাল, বিড়াল এর গর্ভে যে বাচ্চা হয়, কুত্তীর বাচ্চা হলে কোন কুত্তার বাচ্চা নিল তা কেউ জানে না। কারণ, কত কুত্তার সাথে চলা-ফেরা করেছে। কোন কুত্তা থেকে গর্ভ নিয়েছে, কোন কুত্তা থেকে বাচ্চা নিল, সেও জানে না। সুতরাং ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের দেশে মানুষের বাচ্চা কুত্তা-কুত্তির মত জন্ম হয়। এটার নাম পাশ্চাত্য সভ্যতা!

বাবার পরিচয় ছাড়া বিয়ে-শাদী ছাড়া মায়ের গর্ভ থেকে সন্তান জন্ম হওয়া এর নাম পাশ্চাত্য সভ্যতা। এ দুটি শব্দের ব্যাখ্যা আজ থেকে ভালো রকমের স্মরণ রাখবেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতা! এটার নাম পাশ্চাত্য সভ্যতা !!

মেয়ের গর্ভ থেকে সন্তান জন্ম হওয়ার জন্য কোনো পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার দরকার নেই। পশু জানোয়ারের মত যেখান থেকে মন চায়, সেখান থেকে সন্তান গর্ভে নেবে এবং বাপের পরিচয় ছাড়া শুধু মায়ের গর্ভ থেকেই সন্তান জন্ম হবে, এ চরম অসভ্যতার নাম আধুনিক পরিভাষায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ! বুঝে থাকলে বলুন, আসলেই কি পাশ্চাত্য সভ্যতা, না চরম অসভ্যতা? চরম অসভ্যতা। এ চরম অসভ্যতাকে তারা সভ্যতা নামে অবহিত করছে।

এরপরে তাদের খবর হল আমরা এত বড় অসভ্য হলাম কিন্তু মুসলমানরা এত বড় অসভ্য হল না কেন। চালালো অনুসন্ধান। মুসলমানদের সমাজে এত ব্যাপকভাবে হারামজাদা জন্ম হয় না কেন ? অনুসন্ধান চালিয়ে দেখে একটা মুসলমানের নারী যত বেপর্দাই হোক না কেন একটা পুরুষের সাথে রাতে একা একা হোটেলে থাকবে না।

একটা মুসলমান নারী যত বড় বেপর্দা হোক না কেন একটা পুরুষের সাথে রাতে ক্লাবে থাকবে না। রাতে পার্কে থাকবে না। একটা পুরুষের সাথে নিজে একা একা বিদেশ ভ্রমণে যাবে না; বরং বিশেষত বাচ্চা গ্রহণ

করার বেলায় যেখানে মন চায় সেখান থেকে মুসলমানের মহিলারা বাচ্চা ধারণ করে না।

একটিমাত্র পুরুষকে নিজের স্বামী হিসেবে সাব্যস্ত করে দলিলপত্র করে ঐ পুরুষ স্বামীর কাছ থেকেই বাচ্চা গ্রহণ করে। এজন্য মুসলমান সমাজে আজ পর্যন্ত মানুষের বাচ্চা মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করে আর আমাদের সমাজে মানুষের বাচ্চা কুত্তা-কুত্তির মতো জন্মগ্রহণ করে। ব্যবধান অবাধ চলাফেরা করা আর আখেরাত বজায় রেখে বাধ্য-বাধকতার ভেতর দিয়ে চলাফেরা করা, এই দুই রকম চলাফেরা করার দুই রকম ফসল।

বলুন, ইয়াহুদী খ্রিষ্টানের নারীরা যে কোনো পুরুষের সাথে যে কোনো সময় যেখানে সেখানে চলাফেরা করে কি না? করে। আখেরাত পাওয়ার আশায়, না আখেরাত বরবাদ করে? মুসলামনের নারী এ রকম চলাফেরা করে ? না। কেন করে না ? আমার আখেরাত যেন বরবাদ না হয়।

বিয়ে ছাড়া যে কোন পুরুষ থেকে সন্তান গর্ভে নেওয়া অন্তত এই পর্যায়ে আমার ধারণা আমাদের দেশের দুই প্রধান নেত্রী খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনা তারাও ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের এই অসভ্যতা গ্রহণ করেন নি। আমাদের দেশের বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েই তারেককে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

আর আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ড. ওয়াজেদকে স্বামী হিসাবে বরণ করে নিয়ে তার কাছ থেকেই জয়কে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তাহলে আমাদের দেশে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের মতো পশু-হায়েনাদের মতো বাচ্চা জন্ম হয় না। কিসের ফসল ? পুরুষদের সাথে অবাধ চলাফেরার ফসল, নাকি বাধ্য-বাধকতার ফসল? বাধ্য-বাধকতার ফসল।

সুতরাং নারী পুরুষের মধ্যখানে বাধা-বিপত্তি মানা আর না মানার উপর মানুষের সভ্যতা আর অসভ্যতা নির্ভর করে। সভ্যতা আর অসভ্যতা (?) নির্ভর করে।

কাজেই আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন সূরায়ে আহযাবের ২৮ থেকে ৩৪ পর্যন্ত আয়াতগুলো নাযিল করে "মানুষ কিভাবে সভ্য হয়, আর কিভাবে অসভ্য হয়" এ সংক্রান্ত যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাদান করেছেন,

এ থেকে যদি আমাদের বর্তমান সমাজের মুসলমান নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান নারীরা বেপর্দা হয়ে পথে-ঘাটে চলতে পারে, আমরা কেন বেপর্দা হয়ে পথে-ঘাটে চলতে পারব না,

ইয়াহুদী-খ্রিষ্টাননের পুরুষরা যদি তাদের নারীদেরকে মহামূল্যবান জেওর কাপড় দিয়ে সাজিয়ে সাথে নিয়ে পথে-ঘাটে ঘুরাফেরা করতে পারে, আমরা কেন জেওর কাপড়ে সুসজ্জিত হয়ে আমাদের স্বামীদের সাথে শহরে, বন্দরে অবাধে ঘুরাফেরা করতে পারব না ।

এ কথা ঐ মুসলমান নারীর অন্তরে স্থান পেতে পারে না, যে মুসলমান পরকালে জান্নাতে যেতে চায়, পরকালে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে চায়। যারা পরকালে জান্নাত চায় না, যারা পরকালের জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায় না, একমাত্র তারাই ঐ বেঈমান ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান নারীদের মতো যেভাবে মন চায় সেভাবে চলতে চায়। যারা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায় যারা জান্নাত পেতে চায়, তারা বেঈমান কাফির নারীদের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেরা চলার কল্পনাও করতে পারে না।

বর্তমান দুনিয়ার ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান নারীদের পোশাক পরিচ্ছেদ কেমন? যারা তাদের দেশে যান নি হয় তো বলতে পারবেন না। যারা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের কোনো না কোনো দেশে কোনো-না-কোনো সময় গিয়েছেন, তারা বলতে পারবেন ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান নারীদের পোশাক পরিচ্ছেদ কেমন। যা লেংটা থাকার চেয়ে আরো খারাপ। লেংটা থাকার চেয়ে (?) আরো খারাপ।

ঐগুলো দেখে দেখে আমাদের দেশের অতি বিলাশী নারীরাও এই লেংটা পোশাক পরে শহরে বন্দরে ঘুরাফেরা করতে চায়।

হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুই দল জঘন্যতম জাহান্নামী, তারা আমার যুগে দুনিয়াতে আসে নি। আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পর দুনিয়াতে আসবে। দুদল জঘন্যতম জাহান্নামী।

এর মাঝে একদল ঐ সমস্ত অত্যাধুনিক চরমপন্থী নারীরা, যে সমস্ত নারীরা এমন পোশাক পরে রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করবে, যে পোশাক পরা আর উলঙ্গ থাকা সমান। যে পোশাক পরা আর উলঙ্গ থাকা (?) সমান।

এরা নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে পুরুষরদেরকেও নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে।

আল্লাহ্‌র রাসূল বলেন, এই সমস্ত নারীরা পরকালে জান্নাতে যাবে দূরের কথা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।

মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বললেন এমন পোশাক পরে রাস্তা-ঘাটে ঘুরাফেরা করবে, যে পোশাক পরা আর লেংটা থাকা সমান, এটা কোন পোশাক? এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। দু'টা ব্যাখ্যা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি।

একটা ব্যাখ্যা হল এমন চিকনকাপড় পড়ে নারী ঘর থেকে বের হবে যে কাপড় বেশী চিকন বেশী পাতলা হওয়ার কারণে রাস্তার পুরুষেরা গায়ে কাপড় থাকা সত্ত্বেও নারীর শরীরের রং দেখতে কোনো অসুবিধে হয় না। কাপড়ের আবরণের ভেতরেই নারীর শরীরের রং দেখতে পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রকম কাপড় পড়াকে লেংটা থাকার সাথে তুলনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত কাপড় চিকন নয়, কাপড় মোটা। কিন্তু এমন টাইটফিটিং শরীরের সাথে এমন টাইট করে ফিট করা, যা কাপড় পরার পরে শরীরের কোন অঙ্গ কেমন কোন অঙ্গের আয়তন কত, এইগুলো রাস্তার পুরুষের জরিপ করতে কোনো ফিতা লাগবে না। আল্লাহ্‌র রাসূল বলেন, এমন পোশাক পরা আর লেংটা থাকায় সমান।

বলুন এবার, আমাদের মুসলমান সমাজের কিছু মেয়েরা এমন কাপড় পড়তে চায় কি না? চায়। এরা হল পরকালের জাহান্নাম থেকে মুক্তিকামী ? না। জান্নাত প্রত্যাশী? না। রাসূল বলেন, এরা জান্নাত পাওয়া দূরের কথা, জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।

এই অসভ্যতা আমাদের সমাজের একদল নারীরা কোথেকে আমদানি করছে, ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান নারী থেকে আমদানি করছে।

তাই আল্লাহ্ বলেন, পরিষ্কার ভাষায় জিজ্ঞেস করুন

تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

তোমরা কি দুনিয়ার অবাধ ভোগ-বিলাস চাও?

তাহলে ইচ্ছেমতো জাহান্নামে যাও।

আর যদি আখেরাত চাও, তবে দুনিয়াতে অবাধ ভোগ-বিলাস চেও না। আল্লাহ্র বিধান মতো নবীর তরীকামত জীবন যাপন করতে হবে।

আল্লাহ্ আমাদের মা-বোনদেরকে এই নির্দেশ, এই নির্দেশের গুরুত্ব অনুধাবন করার এবং এই অনুপাতে জীবন যাপন করার সৌভাগ্য দান করুন। সবাই বলুন আমীন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

মাওয়ায়েজে হাসানাহ

খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,

তরজমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত

মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান—১

বিষয় ঃ কুরআনের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা

স্থান ঃ দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী চট্টগ্রাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

. اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

হযরত উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত সুধী সমাজ,
দূর-দূরান্ত থেকে আগত মুসলমান ভাইগণ!

আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, প্রকৃত শিক্ষা কি? এই বিষয়ের উপর অতি সংক্ষেপে আলোচনা করার জন্য আমি আপনাদের খেদমতে আল্লাহর পবিত্র কালাম থেকে সূরায়ে আর-রাহমান এর প্রথম তিন আয়াত তিলাওয়াত করেছি এবং হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক সংক্ষিপ্ত হাদীস তিলাওয়াত করেছি।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর মর্ম সহজে বুঝার জন্য ধারাবাহিকভাবে তাফসীর থেকে কিছু কথা বলা দরকার এবং সেই ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে আনুষঙ্গিকভাবে কিছু কথা আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত হতে পারে। তবে সেই কথাগুলো মূল বিষয় বুঝতে সহায়ক হবে ইনশা আল্লাহ। সূরার নাম সূরাতুর রাহমান। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের প্রসিদ্ধ ৯৯ নামের এক নাম রাহমান।

এক হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রসিদ্ধ ৯৯টি নাম আছে। তাফসীরের কিতাবাদিতে উল্লেখ আছে, আল্লাহর ৯৯ নাম প্রসিদ্ধ, আর অপ্রসিদ্ধ নামের সংখ্যা ১০ হাজারের চেয়েও বেশী। আল্লাহর প্রসিদ্ধ ৯৯ নামের এক নাম রাহমান। যে সমাজে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন সেই সমাজের লোক আল্লাহকে 'আল্লাহ' নামে ডাকত।

আল্লাহর নাম যে 'আল্লাহ' তা জানত। মুসলমানদের সাথে ব্যবধান শুধু এতটুকু ছিল, তারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য দেব-দেবীকে শরীকদার মনে করত এবং সেগুলোর পূজা করত। কিন্তু আল্লাহকে আল্লাহ নামেই ডাকত এবং জানত। কিন্তু আল্লাহরই আরেক নাম রাহমান এটা তারা জানত না। আল্লাহর যে আরেক নাম রাহমান সেটা জানত না। ওরা আল্লাহর সামনেও মাথা নত করত এবং দেব-দেবীর সামনেও মাথা নত করত।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ঘোষণা দিলেন, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত করা যাবে না। মুসলমান একমাত্র আল্লাহর সামনে মাথা নত করবে।

এ ঘোষণা দেওয়ার কিছুদিন পর আল্লাহ পাক এমন আয়াতাংশ নাজিল করলেন, যা তিলাওয়াত করলে, শোনলে সিজদা দেওয়া ওয়াজিব হয়। সেই আয়াতগুলো মাইকে তিলাওয়াত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ, মাইকে তিলাওয়াত করলে যে সকল মানুষের কানে তিলাওয়াতের আওয়াজ পৌঁছবে, তারা যদি সেজদা না করে, তা হলে সেই গোনাহ তিলা-ওয়াতকারীর আমলে লিখা হবে।

তাই আমি সেই আয়াতাংশ তিলাওয়াত করলাম না। যার অর্থ হল, তোমরা রহমানকে সিজদা করো। যেহেতু মক্কার মুশরিকরা জানত না যে, আল্লাহরই আরেক নাম রহমান। একদিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে সেজদা করা যাবে না; আরেকদিকে আয়াত নাজিল হল, তোমরা রাহমানকে সিজদা করো।

তখন তাদের প্রশ্ন জাগল, মুহাম্মদ একবার বলল, আল্লাহকে ছাড়া কাউকে সিজদা করা যাবে না আবার বলছে, তোমরা রাহমানকে সিজদা

করো, তাহলে তো তার কথা পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল। রাহমান কে? আল্লাহকে সিজদা করার পরও রাহমানকে সিজদা করতে হবে সেই রাহমান কে? তাদের সেই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ পাক এই সূরা নাজিল করেছেন। এ সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি আয়াতে রাহমানের পরিচয় দিয়েছেন। এই জন্য আল্লাহ পাক এই সূরাকে সূরাতুর রাহমান নামে নামকরণ করেন। গেল শানে নুজুল এবং রাহমান নামে নামকরণের কারণ। মক্কার মুশরিকদের প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ এই সূরা নাজিল করলেন এবং কেন নামকরণ করেছিল রাহমান আবার কে?

এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ সূরা নাজিল করেছেন এবং নাম দিয়েছেন সূরায়ে রাহমান আর আয়াতে আয়াতে শুধু রাহমানের পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহর 'রাহমান' পরিচয়টা এমন অনুপম ভঙ্গিতে দিয়েছেন, সেই ভঙ্গিটা বুঝাতে গ্রামারের একটা সূত্র বুঝাতে হয়। যে কোন ভাষার গ্রামার মতে কোন কথা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত কথাটার দু'টা অংশ থাকে না।

একটা কথা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য প্রধানত যে দু'টি অংশের দরকার এর প্রথম অংশটিকে বাংলা ব্যাকরণের পরিভাষায় বলা হয় 'উদ্দেশ্য' আর দ্বিতীয় অংশটিকে বলা হয় 'বিধেয়'। আরবী গ্রামার মতে প্রথম অংশকে বলা হয় 'মুবতাদা' আর দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় 'খবর'।

English Grammar মতে একটা Sentence এর যে দু'টা Parts ছাড়া Complete হয় না, এর প্রথমটার নাম Subject দ্বিতীয়টার নাম Predicate এখন আপনারা যারা যেই ভাষার গ্রামার বুঝেন, সে অনুপাতে বুঝার চেষ্টা করুন।

আপনারা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, সূরায়ে রাহমানের প্রথম আয়াতটি একটিমাত্র শব্দ اَلرَّحْمٰنُ যে দু'টা অংশ মিলে একটা কথা পরিপূর্ণ হয়, এর দু'টা অংশ নেই; একটা অংশ আছে اَلرَّحْمٰنُ সুতরাং প্রথম আয়াতটি কি একটি পরিপূর্ণ কথা?

একটু দয়া করে বলুন! পরিপূর্ণ নয় কেন? যে দুই অংশ লাগে কথা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য এর এক অংশ আছে আরেক অংশ নেই। কিসের জন্য পরিপূর্ণ নয়? এখান থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে একটা অপরিপূর্ণ

কথার দ্বারা একটা পরিপূর্ণ আয়াত সাব্যস্ত করলেন কেন? কথা পরিপূর্ণ নয় অথচ আয়াত পরিপূর্ণ। اَلرَّحْمٰنُ আয়াত পরিপূর্ণ। আমি আপনাদেরকে বুঝাতে পারছি বিষয়টা?

প্রশ্নের জবাবে মুফাসসিরীনে কিরাম লিখেছেন, اَلرَّحْمٰنُ কথাটাকে আল্লাহ তা'আলা মুবতাদা/ উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছেন পরবর্তী আয়াতটাকে সাব্যস্ত করেছেন خبر اول (১ম বিধেয়) তার পরের আয়াত خبر ثانى (দ্বিতীয় বিধেয়) তারপরের আয়াত خبر ثالث তারপরের আয়াত خبر رابع তারপরের আয়াত خبر خامس তারপরের আয়াত خبر سادس এভাবে প্রতিটি আয়াতকে এক একটা خبر সাব্যস্ত করেছেন এবং সবগুলো خبر এর একটামাত্র مبتدأ সাব্যস্ত করেছেন। সেটা হল, اَلرَّحْمٰنُ এই পদ্ধতিতে প্রতিটি আয়াতে রাহমানের পরিচয় হয়ে যায়।

যারা আরবী গ্রামার বুঝেন না তারা এভাবে বললে বুঝবেন না। যারা বাংলা ব্যাকরণ বুঝেন তাদের ভঙ্গিতে বলি। বাংলা ব্যাকরণ মতে একটা বাক্য পরিপূর্ণ হয় দু'টা অংশের দ্বারা। প্রথম অংশ 'উদ্দেশ্য' দ্বিতীয় অংশটির নাম 'বিধেয়'। اَلرَّحْمٰنُ একটা শব্দ –এটাকে আল্লাহ 'উদ্দেশ্য' সাব্যস্ত করেছেন।

পরবর্তী আয়াতটাকে করেছেন প্রথম 'বিধেয়' তারপরের আয়াত দ্বিতীয় বিধেয়, তারপরের আয়াত তৃতীয় বিধেয়, তারপরের আয়াত চতুর্থ বিধেয়, তারপরের আয়াত পঞ্চম বিধেয়, তারপরের আয়াত ষষ্ঠ বিধেয়, তারপরের আয়াত সপ্তম বিধেয় আর উদ্দেশ্য এক।

এই পদ্ধতিতে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন প্রতিটি আয়াতে শুধু রাহমানের পরিচয় দিয়েছেন। যারা ইংলিশ গ্রামার বুঝেন তাদের পরিভাষায় বলি– 'সূরাতুর রাহমান' এর প্রথম আয়াতটি হল, اَلرَّحْمٰنُ এটাকে আল্লাহ Subject সাব্যস্ত করেছেন। পরবর্তী আয়াতটা হল, i Predicate তারপরের আয়াত ii Predicate তারপরের আয়াত iii Predicate তারপরের আয়াত iv Predicate তারপরের আয়াত v Predicate তারপরের আয়াত vi Predicate

ইভাবে সর্বশেষ আয়াত পর্যন্ত একেকটি আয়াতকে একেকটি Predicate সাব্যস্ত করে সকল Predicate এর জন্য একটা Subject সাব্যস্ত করে প্রতিটি আয়াতে আল্লাহ শুধু 'রাহমান'-এর পরিচয় দিয়েছেন।

কেন আল্লাহ এমনটা করলেন? 'রাহমান' সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে সূরা নাজিল করেছেন। মুশরিক মূর্তিপূজারীরা প্রশ্ন তুলেছিল, مَنِ الرَّحْمٰنُ রাহমান কে? প্রশ্নের জবাবে যেহেতু আল্লাহ সূরা নাজিল করেছেন এ কারণে সূরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি আয়াতে শুধু 'রাহমান' এর পরিচয় দিয়েছেন। اَلرَّحْمٰنُ রাহমান তিনি عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন যিনি। خَلَقَ الْاِنْسَانَ মানুষ সৃষ্টি করেছেন যিনি।

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ মানুষকে বাকশক্তি দান করেছেন যিনি। এভাবে প্রতিটি আয়াতে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন শুধু 'রাহমান' এর পরিচয় দিয়েছেন। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা এ সূরার নামকরণ করেছেন 'সূরাতুর রাহমান'। এতক্ষণ আমরা দু'টি জিনিস বুঝেছি।

(১) কোন কারণে সূরাটি নাজিল করলেন আল্লাহ। সেটাকে তাফসীরের ভাষায় শানে নুজুল বলা হয় এবং

(২) কোন কারণে সূরার নাম সূরাতুর রাহমান রাখলেন। সেটাকে নাম করণের কারণ বলা হয়।

এবার আমরা বুঝার চেষ্টা করি, পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্রটা কি? আল্লামা জালাল উদ্দীন রহ. "আল-ইতকান ফি উলূমিল কুরআন" (কুরআন তাফসীরের মূলনীতি বিষয়ক) নামক কিতাবে লিখেছেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন ১১৪টি সূরা যে বিন্যাসে বিন্যাস করেছেন, ৬২৩৬ আয়াত যে বিন্যাসে বিন্যাস করেছেন,

কুরআনের সূরার সংখ্যা যে ১১৪টি এতে কোন রকমের দ্বিমত নেই। আয়াত সংখ্যা কত, তাতে বিস্তর দ্বিমত আছে। এ সমস্ত দ্বিমতে মুসলমানের মুসলমানী জীবনে কোন ব্যাঘাত ঘটায় না। সুতরাং এ দ্বিমত আপত্তিকর নয়। এক বর্ণনা মতে কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬।

অন্যান্য বর্ণনা মতে অন্যান্য সংখ্যার উল্লেখ আছে। যাই হোক জালাল উদ্দীন সূয়ূতী রহ. আল-ইতকান গ্রন্থে লিখেছেন, কুরআন শরীফে সবগুলো সূরা এবং সবগুলো আয়াতকে আল্লাহ যে বিন্যাসে বিন্যস্থ করেছেন এর মাঝে রয়েছে একটা গভীর যোগসূত্র, একটা গভীর কানেকশন।

আগের আয়াতের সাথে পরের আয়াতের একটা গভীর কানেকশন আছে। যে কারণে এ আয়াতের সাথে এ আয়াতকে স্থাপন করা হয়েছে।

আগের সূরার সাথে পরের সূরার একটা গভীর কানেকশন আছে। যে কারণে ঐ সূরার পাশে এ সূরাকে স্থাপন করা হয়েছে। এটাকে তাফসীরুল কুরআনের পরিভাষায় ربط آيات এবং ربط سور বলা হয়। কুরআন তাফসীরের পরিভাষায় এই যোগসূত্রটাকে এই কানেকশনটাকে ربط آيات এবং ربط سور বলা হয়।

আল-ইতকান কিতাবে আল্লামা সূয়ূতী বলেন, এই আয়াতগুলোর পরস্পর কানেকশন সূরাগুলোর পারস্পরিক যোগসূত্র বুঝতে পারলে কুরআনের মর্মবাণী বুঝা সহজ হয়ে যায়।

আর আয়াত এবং সূরাগুলোর পরস্পর সম্পর্কটা বুঝতে ব্যর্থ হলে কুরআনের মর্মবাণী বুঝা কঠিন হয়ে যায়। সুতরাং সূরাতুর রাহমানের বিষয়টা বুঝার সুবিধার্থে আমাদের বুঝতে হয়, আগের সূরার সাথে এই সূরার কানেকশনটার মর্মগত সম্পর্কটা কি? সূরাতুর রাহমানের পূর্ববর্তী সূরার নাম 'সূরাতুল কামার'।

সূরাতুল কামারে মৌলিকভাবে আল্লাহ যে বিষয়টা আলোচনা করেছেন সেটা হল অবাধ্য বান্দাদের শাস্তির বিবরণ। আর সূরায়ে রাহমানের মৌলিক বিষয়টা হচ্ছে বাধ্য বান্দাদের পুরস্কারের বিবরণ। এক কথায় পূর্ববর্তী সূরায় আল্লাহ তা'আলা আজাব-গজবের বিবরণ দিয়েছেন আর পরবর্তী সূরাতে আল্লাহ নিয়ামত এবং রহমতের বিবরণ দিয়েছেন।

গজব আর রহমত এই দু'টা এই দু'সূরার আলোচ্য বিষয়। গজবে আর রহমতে পরস্পর কোন কানেকশন আছে, না পরস্পর বিরোধী? পরস্পর বিরোধী। কোন যোগসূত্রের কারণে কোন ربط এর কারণে আল্লাহ গজবের বিবরণ সম্বলিত সূরাতুল কামারের পাশে রহমতের বিবরণ সম্বলিত সূরাতুর রাহমান স্থাপন করলেন? এই প্রশ্নের জবাবে মুফাসসিরীনে কিরাম লিখেছেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে রহমত ও গজব পরস্পর বিরোধী হলেও একজন মুমিন সঠিক অর্থে মুমিন হতে গেলে তার অন্তরে এই দু'টি জিনিসের সমষ্টি থাকতে হবে।

যার অন্তরে আল্লাহর গজবের ভয় আছে এবং সাথে সাথে আল্লাহর রহমতের আশা আছে সেই ব্যক্তি হবে আল্লাহর পরিপূর্ণ মুমিন বান্দা। যার অন্তরে আল্লাহর গজবের ভয় নেই, রহমতের আশা নেই, সে আল্লাহর

প্রকৃত বান্দা নয়। সুতরাং একটা মানুষ খাঁটি মানুষ হতে হলে তার অন্তরে দু'টি জিনিস থাকতে হবে। গজবের ভয় আর রহমতের আশা। যদি কোন মানুষের অন্তরে গজবের ভয় না থাকে, সে বেপরওয়াভাবে চলবে আর কোন বান্দার অন্তরে যদি রহমতের আশা না থাকে, তখন সে আর ইবাদত বন্দেগী করবে না; আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

গজবের ভয় থাকলে নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করবে, রহমতের আশা থাকলে ইবাদত-বন্দেগীতে আগ্রহী হবে। একদিকে নিষিদ্ধ হারাম কাজকে বর্জন করতে হবে– এর জন্য ক্রিয়াশীল হবে গজবের ভয়। অন্য দিকে এবাদত বন্দেগী করতে হবে– এর জন্য ক্রিয়াশীল হবে রহমতের আশা।

এবার বলুন! গজবের ভয় আর রহমতের আশা দু'টা জিনিস দু'টি অন্তরে থাকলে মুমিন হবে নাকি দু'টি জিনিস একটা অন্তরে থাকলে মুমিন হবে। দু'টি জিনিস একত্রে একটি অন্তরে থাকতে হবে। সেই দিকে ইঙ্গিত করে গজবের বিবরণ দিয়ে সূরায়ে কামার স্থাপনের পাশাপাশি রহমতের বিবরণ সম্বলিত সূরাতুর রাহমানকে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্থাপন করেছেন।

মুফাসসিরীনে কিরাম লিখেছেন, এই দু'টি জিনিসের সমষ্টির নামই আল্লাহর মারিফত। বাংলাদেশ তো বর্তমানে মারেফতের সাগর। যথায়-তথায় মারিফতের সম্রাট। পথে-ঘাটে যথা-তথায় যখন-তখন যেখানে-সেখানে মারিফতের সম্রাট গজানোর উর্বর স্থান বাংলাদেশে দু'টা। এক নাম্বার চট্টগ্রাম দুই নাম্বার সিলেট।

যখন-তখন যেখানে-সেখানে যথায়-তথায় মারিফতের সম্রাট গজানোর উর্বর জমি বাংলাদেশে কতটা? দুইটা। এক নাম্বার চট্টগ্রাম, দুই নম্বর সিলেট। আপনাদেরটা আর আমাদেরটা। এজন্য নিতান্ত আনুষঙ্গিকভাবেই এই দু'টি জিনিসের নাম যেহেতু মারিফত এ জন্য মারিফত সম্পর্কেও কিছু কথা বলার দরকার মনে করি। এটাও মানুষ গড়ার শিক্ষার মূল।

ইলমে মারিফতই আসলে মানুষ গড়ার প্রকৃত শিক্ষা। ইলমে শরী'আতও মানুষ গড়ার শিক্ষা; কিন্তু এটা প্রাথমিক পর্যায়। আর ইলমে মারিফত হল সত্যিকারের মানুষ গড়ার শিক্ষা। এটা চূড়ান্ত পর্যায়। মারিফত শব্দের অর্থ পরিচয়। পরিভাষায় মারিফত বলা হয় আল্লাহর

পরিচয়কে। যে কোন পেশাগত পরিচয়কে মারিফত বলে, না আল্লাহর পরিচয়কে মারিফত বলে? আল্লাহর পরিচয়কে। মুফাসসিরীনে কিরাম লিখেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর শাস্তির ভয়ে পাপ ছেড়ে দিল, আল্লাহর রহমতের আশায় ইবাদতে লিপ্ত হল, সেই ব্যক্তি আল্লাহর সঠিক পরিচয় লাভ করল, মারিফত হাসিল করল।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর শাস্তির ভয় পায় না, এজন্য হারাম কাজ ছাড়ে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের আশাবাদী হতে পারে না, যে কারণে ইবাদত বন্দেগী করে না। তার মধ্যে আল্লাহর সঠিক পরিচয় নেই, তার মধ্যে আল্লাহর মারিফত নেই। কিন্তু আমার জানা মতে অনেক লোক এত চালাক, যদি তাকে বলেন, তুমি কি আল্লাহর শাস্তির ভয় পাও? বলবে, ভয় পাব না কেন? আমি কি মুসলমান নই? যদি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আল্লাহর রহমতের আশা করো? সে বলবে, আশা করব না কেন? আমি কি মুসলমান নই?

শরহে আকিদাতুত তাহাবীর মাঝে লিখেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত কিতাব শরহে আকীদাতুত তাহাবী। যেমনিভাবে বাংলার আনাচে-কানাচে মারিফতের সম্রাট গজায় ঠিক, তেমনিভাবে রাসূলের সুন্নাত বিবর্জিত অজস্র বিদ'আতে লিপ্তরা আনাচে-কানাচে সুন্নী নামে গজায়।

আলোচনা কোন দিকে করব আর কোন দিকে করব না। সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দেব কোথায়? আমি এই সমস্যার সম্মুখীন। আমি সংক্ষেপে বলতে চাই, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কথার অর্থ হল সুন্নাতের অনুসারী এবং জামাতের অনুসারী। সকল প্রকার গোমরাহী এবং বিদ'আত সম্পর্কে বলব কি না, সেটা আমার ব্যাপার আর শোনবেন কি না, সেটা আপনাদের ব্যাপার। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অর্থ হল, সুন্নাতের অনুসারী, জামাতের অনুসারী।

সুন্নাত বিবর্জিত লোকেরা বিদ'আতে লিপ্ত। এই সুন্নী নামের ধোঁকায় পড়ে যেন আপনারা ঈমান বরবাদ না করেন– সে জন্য আজ থেকে বাকী সারা জীবন স্মরণ রাখতে হবে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অর্থটা কি? আহলে সুন্নাত অর্থ সুন্নাতের অনুসারী, ওয়াল জামাত অর্থ, জামাতের

অনুসারী। কিন্তু ব্যাখ্যায় মনে রাখতে হবে, আহলে সুন্নাত অর্থ, যে সুন্নাতের অনুসারী তা কার সুন্নাত? নবীর সুন্নাত। ওয়াল জামাতের অর্থ, যে জামাতের অনুসারী কোন জামাত? গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর জামাত? তারাও তো বলে, আমরা আহমদিয়া মুসলিম জামাত। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দলে নিজেদের জামাত বলে কি না?

ভাল করে স্মরণ রাখবেন, যারা নিজেদেরকে জামাত দাবী করে তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলে না। নবীর সুন্নাতের অনুসারী যারা আর সাহাবায়ে কিরামের অনুসারী যারা, তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলে। আপনারা বিরক্ত না হলে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই– আহলে সুন্নাত অর্থ কি? সুন্নাতের অনুসারী। কার সুন্নাতের? নবীর সুন্নাতের। ওয়াল জামাত অর্থ কি?

(শ্রোতাদের জবাব) জামাতের অনুসারী। না হয়নি।

ওয়াল জামাত অর্থ জামাতের অনুসারী কিন্তু কার জামাতের? আহলে সুন্নাত অর্থ সুন্নাতের অনুসারী ব্যাখ্যায় হল নবীর সুন্নাতের অনুসারী। ওয়াল জামাত অর্থ জামাতের অনুসারী।

এটা শাব্দিক অর্থে, ব্যাখ্যায় গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর জামাত নয় সাহাবায়ে কিরামের জামাত। এখন যদি কেউ নবীর সুন্নাতকে অনুসরণ করা তো দূরের কথা; নবীর সুন্নাতকে অনুসরণীয় মানেই না, সে আসলে সুন্নী না বিদ'আতী? বিদ'আতী।

ঠিক তেমনিভাবে কেউ যদি সাহাবায়ে কিরামকে অনুসরণ করা তো দূরের কথা; সাহাবাগণের জামাতকে অনুসরণীয় মানেই না, তা হলে সে শুধু কার্যতঃ বিদ'আতীই নয়; নিকৃষ্টতম আকীদাগত বিদ'আতী।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা সংক্রান্ত কিতাব আকিদাতুত তাহাবী সারা পৃথিবী বিখ্যাত কিতাব। সেই কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ শরহে আকীদাতুত তাহাবীতে লিখা আছে, গুনাহের কাজ ছাড়ে না আর বলে, আমি আল্লাহর শাস্তির ভয় পাই, সে ধোঁকাবাজ।

এটা হল আমার মূল কথা। এতক্ষণ আনুষঙ্গিক কথা বলেছি। যে ব্যক্তি হারাম কাজ ছাড়ে না আর বলে, আমি আল্লাহর শাস্তির ভয় পাই, সে

মিথ্যুক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে না এবং বলে– আমি রহমতের আশা করি, সেও মিথ্যুক।

তা হলে এবার বলুনতো! আল্লাহর গজবের ভয় আর রহমতের আশার নাম যে মারিফত কার কাছে আছে আর কার কাছে নেই– এটা বুঝার মত কোন আলামত আছে কি না? আছে। মারিফত কার কাছে আছে? যে ব্যক্তি হারাম ছেড়ে দিয়েছে এবং আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে, তার মাঝে আল্লাহর মারিফত হাসিল হয়েছে।

এখন যদি গোনাহে লিপ্ত কোন লোক দাবী করে আমি মারিফতের সম্রাট, এমন লোক যদি দাবী করে আমি মারিফতের পীর সে পীর না ভণ্ড? সে পীর নয় ভণ্ড। এ কথাগুলো আমার ধারণা মতে ভণ্ডদের খপ্পর থেকে নিজের ঈমান হেফাজত করার জন্য বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের বুঝাও দরকার, স্মরণ রাখাও দরকার।

আমার কথা বুঝে থাকলে বলুন, যে পীর নামায পড়ে না, সে পীর, না ভণ্ড? ভণ্ড। যে পীরে পর্দা পালন করে না, বেগানা মেয়েদের সাথে বেপর্দা হয়ে চলে সেই লোক পীর না ভণ্ড? এবার বলুনতো! আপনাদের চট্টগ্রামে এবং আমাদের সিলেটে অলি আউলিয়াদের মাজারে যত ওরশ মোবারক হয় ওলি-আউলিয়ার মাজার পবিত্র কি না? পবিত্র।

পবিত্রতা রক্ষা করা দরকার কি না? দরকার। পাপের দ্বারা? মাজারে গিয়ে পাপ করলে মাজারের পবিত্রতা রক্ষা হয়? নষ্ট হয়। এই পবিত্র মাজারের মহা পবিত্র ওরশ মোবারক নামে যে অনুষ্ঠান হয়, সেই অনুষ্ঠানে শুধু পুরুষেরা যায় নাকি নারীরাও যায়। নারীরাও যায়। পর্দা রক্ষা করে যায়, না বেপর্দা হয়ে যায়? বেপর্দা হয়ে। হালাল না হারাম? হারাম।

পবিত্র করল না অপবিত্র করল? অপবিত্র। পীর না ভণ্ড? ভণ্ড। আর কোন ভাষায় বললে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ বুঝবে, এর চেয়ে আর সহজ ভাষা আমার জানা নেই। আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি, ছোট্ট শিশির মধ্যে প্রস্রাব করে শিশির মুখ গালা দিয়ে মম দিয়ে বন্ধ করে শিশির গায়ে যদি লেবেল লাগিয়ে দেয় মহা পবিত্র সুগন্ধি আতর সেই শিশির মুখ খুলে ভেতরে যা আছে, তা নাকে ঢেলে দিলে সুগন্ধি পাওয়া যাবে? কেন পাওয়া যাবে না। লেবেলে কি লিখা নেই 'মহা পবিত্র সুগন্ধি'?

মুসলমান ভাইয়েরা আমার! মহা পবিত্র আর মুবারক লেবেলের দ্বারা হয় না জিনিসের দ্বারা হয়? জিনিস দ্বারা হয়। তোমার লেবেল কি আর জিনিস কি? কথায় কাজে গড়মিল এটা মুমিনের কাজ না মুনাফিকের? মুনাফিকের।

কেন এই মুনাফেকী সরল মুসলমানদেরকে নিয়ে? এই মুনাফেকী কেন? সুতরাং যে সমস্ত পীরেরা বেনামাযী এরা সত্যিকারের পীর না ভণ্ড? যে সমস্ত পীর-মুরিদেরা বেপর্দা এরা সত্যিই পীর না ভণ্ড? ভণ্ড।

যে সমস্ত পীর মুরিদেরা মারিফতের দোহাই দিয়ে শরী'আত লঙ্ঘন করে এরা সত্যিকারের মারিফতের দ্বারে-কাছে আছে না ভণ্ড পথে আছে? ভণ্ড পথে আছে। আল্লাহর কোন ওলী বলেন,

علم باطن ہم چوں مسك + علم ظاہرهم چوں شير

كئے شود بے شير مسك + كئے شود بے شرع پير

শরী'আত হল দুধের মত। মারিফত হল ঘি এর মত। দুধের মাঝে মেহনত করলে ঘি পাওয়া যায়। মেহনত ছাড়া ঘি পাওয়ার যেমন উপায় নেই, ঠিক তেমনিভাবে শরী'আতে মেহনত করলে মারিফত পাওয়া যায়, শরী'আতের মেহনত ছাড়া মারিফত পাওয়ার কোন উপায় নেই।

ভণ্ডরা বলে থাকে আমরা নামায পড়ি না, নামায শরী'আতে ফরয মারিফতে নয়। ভণ্ডরা বলে আমরা পর্দা করি না। পর্দা শরী'আতে ফরয। আমরা শরী'আত পন্থী নই; আমরা মারিফতপন্থী। মারিফতে পর্দা ফরয নয়। শরী'আতের ফরয মারিফতে ফরয নয়।

শরী'আতের হারাম মারিফতে হারাম থাকে না। গান-বাজনা হারাম শরী'আতে মারিফতে নয়। যাদের মারিফত হাসিল হয়ে গেছে তাদের গান বাজনা হারাম নয়। এই জন্য মহা পবিত্র (?) ওরশ মুবারকে গান-বাজনাও হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, শরী'আতের হারাম যদি মারিফতে হারাম না থাকে হালাল হয়ে যায়, তাহলে আমার জানা মতে শরী'আতে গোবর খাওয়া হারাম। আপনারা কি জানেন? যাদের মারিফত হাসিল হয়ে গেছে, তোমরা গোবর খাও। তোমাদের তো মারিফত হাসিল হয়ে গেছে। আমরা খাই না। কেননা শরী'আতে হারাম।

আমার জানা মতে, শরী'আতের বিধান মতে বলদের, গাধার, ছাগলের মানুষের প্রস্রাব খাওয়া হারাম। শরী'আতের হারাম যদি মারিফতে হারাম থাকে না হালাল হয়ে যায়, তোমরা সাপ্লাই, টিউবওয়েল ইত্যাদির পানি না খেয়ে গাধার, বলদের, ছাগলের আর মানুষের প্রস্রাব খাও।

তোমাদের জন্য তো হালাল।

(শ্রোতাদের শ্লোগানে রাজারবাগী, দেওয়ানবাগী উচ্চারণের পর)

রাজারবাগী, দেওয়ানবাগী যে আপনারা বললেন, এগুলোর হাকীকত কি জানেন? দেওয়ানবাগী পীর সাহেব নিজের জীবনী লিখেছেন নিজের হাতে। তিনি লিখেন, আমি স্বপ্নে দেখি– আমি সুন্দর-মনোরম বাগানে ঘুরাফেরা করছি।

ঘুরাফেরা করতে গিয়ে এক জায়গায় দেখি, ময়লা-আবর্জনার স্তুপের উপর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মরা লাশ পড়ে আছে। যদি স্বপ্ন সত্যিই দেখে থাকে, তা হলে তার ব্যাখ্যাটি কি শুনেন, ইমামুল মুয়াব্বিরীন আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ. তাবিরুর রু'য়া কিতাবে লিখেছেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যদি কেউ স্বপ্নে দেখে তাহলে তার স্বপ্নের ব্যাখ্যার একটা মূলনীতি আছে।

রাসূলকে স্বপ্নে যে অবস্থায় দেখবে নিজের ঈমান ও আমলের সেই অবস্থা বুঝতে হবে। যদি কেউ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখে সুন্দর তেমনিভাবে তার নিজের আমল হবে সুন্দর।

যদি কেউ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখে বিশ্রী, তাহলে বুঝতে হবে তার নিজের আমল বিশ্রী। যদি কেউ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখে জিন্দা, তাহলে বুঝতে হবে নিজের ঈমান জিন্দা। যদি কেউ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখে মরা লাশ, তাহলে বুঝতে হবে, সে সূফী সম্রাট? স্বপ্ন সত্য দেখে থাকলে তোমার ঈমান মরা।

এরপর লিখে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মরা লাশ দেখে আমার বড় দয়া হল। আমি এই লাশের হাতে

ধরলাম। আমার হাতের ছোঁয়া লেগে মুহাম্মাদের মরা লাশ জিন্দা হল।" কত বড় শয়তান হলে এই স্বপ্ন দেখতে পারে।

সে আবার তার স্বপ্নের ব্যাখ্যাও লিখেছে। লিখে "আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল, মুহাম্মাদী ইসলাম সারা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল। একা আমি মুহাম্মাদী ইসলাম জিন্দা করেছি।" তার স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা স্মরণ রাখুন আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হাদীস শুনুন। হাদীস শরীফে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَنْ تَجْتَمِعَ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ

কখনও আমার উম্মত একসাথে পথহারা হবে না।

একদল পথ হারা হয়ে গেলে একদল সঠিক পথের পথিক থাকবে। আর দেওয়ানবাগী বলে, সারা দুনিয়ার সবাই মুহাম্মাদী ইসলাম হারিয়ে ফেলেছিল। সে একা জিন্দা করেছে। তার কথা মানব না মুহাম্মাদুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা মানব?

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মরা লাশ তার পরশে জিন্দা হয়েছে! সমস্ত জগত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রূহের ফয়েয আর বরকতে জিন্দা হয়েছে।

কত বড় দাজ্জাল! কত বড় ফাত্তান! কত বড় শয়তান হলে এ রকম স্বপ্ন দেখতে পারে।

দেওয়ানবাগী সম্পর্কে কিছু কথা বললাম। এবার রাজারবাগীর কথা শুনুন! রাজারবাগী দিল্লুর রহমান। প্রসিদ্ধ আরবি ডিকশনারী মিসবাহুল লুগাত খুলে দেখুন! দিল্লু বানান 'দাল' দিয়ে হয় না; হয় 'দোয়াদ' দিয়ে। সেই মিসবাহুল লুগাতে লিখা আছে, 'দিল্লু ইবনে দিল্লু দিল্লুর ঘরের দিল্লু। যে ব্যক্তি দুইগুণের কোন এক গুণে গুণান্বিত।

প্রথম গুণটা হল, যে ব্যক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ের পথভ্রষ্ট। তাকে বলা হয় দিল্লু। দ্বিতীয় গুণ যার বাবার ঠিকানা নেই তাকে বলা হয় দিল্লু। এ সমস্ত ভণ্ডদের সম্পর্কে সতর্ক হওয়া মুসলমানদের প্রয়োজন আছে কি? আছে।

তা হলে সূরাতুর রাহমানের সাথে সূরাতুল কামারের বিষয়বস্তুর কানেকশন বুঝারও প্রয়োজন আছে। সূরাতুল কামারের মূল বিষয় গজবের

বিবরণ আর সূরাতুর রাহমানের মূল বিষয় রহমতের বিবরণ। এ দু'টি বিপরীত বিষয়ের দু'টি সূরা পাশাপাশি কেন? এ দু'টি বিষয় যে অন্তরে একত্রে জমা হয় সে প্রকৃত মুমিন হয়। গজবের ভয় থাকলেই হারাম কাজ ছাড়বে; রহমতের আশা থাকলেই ইবাদত-বন্দেগী করবে।

এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন গজবের বিষয় সম্বলিত সূরায়ে কামার রহমতের বিষয় সম্বলিত সূরাতুর রাহমান পবিত্র কুরআনে পাশাপাশি স্থাপন করেছেন। একই অন্তরে এই দু'টি জিনিস একত্র করতে হবে পূর্ণ মুমিন হতে হলে।

এজন্য হযরত উমর ফারুক রাযি. বলেন, আল্লাহ যদি ঘোষণা দিতেন সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ জান্নাতে যাবে, একটিমাত্র মানুষ জাহান্নামে যাবে, আমি উমর ভয়ে ভীত থাকতাম সেই একটা জাহান্নামী মানুষ আমি উমর হয়ে যাই কি না।

পক্ষান্তরে আল্লাহ যদি ঘোষণা দিতেন সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ জাহান্নামে যাবে আর একটিমাত্র মানুষ জান্নাতে যাবে আমি উমর আশাবাদী থাকতাম, সেই একটা জান্নাতী মানুষ আমি হতে পারি কি না?

গজবের ভয় কি পরিমাণ ছিল হযরত উমরের অন্তরে, রহমতের আশা কি পরিমাণ ছিল হযরত উমরের অন্তরে একটু চিন্তা করুন। এই দু'টা জিনিস দু'টা অন্তরে থাকলে মুমিন হবে, না এক অন্তরে স্থান দিতে হবে? এজন্য এই দুই বিষয় সম্বলিত সূরাকে আল্লাহ একত্রে করেছেন আল্লাহর মারিফাতের দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য।

গেল তিনটা প্রশ্নের জবাব। সূরার শানে নুযূল কি? সূরাতুর রাহমানের নাম করণের কারণ কি? সূরাতুর রাহমানের পূর্ববর্তী সূরার সাথে বিষয়গত সম্পর্ক কি?

এবার তিলাওয়াকৃত আয়াতগুলোর মর্ম বুঝার চেষ্টা করুন। আল্লাহ বলেন,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ....

দয়ালু আল্লাহ। কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি করেছেন।' রহমান' সেই আল্লাহরই আরেক নাম যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন,

রহমান ভিন্ন কেউ নয়, রহমান সেই আল্লাহরই আরেক নাম, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। রহমান সেই আল্লাহরই আরেক নাম, যিনি মানুষকে বাকশক্তি দান করেছেন।

প্রতিটি আয়াতে আয়াতে রাহমানের পরিচয়। আমি দুঃখিত যে, শুধু নির্ধারিত সময়েই নয়, সারা রাতেও রহমান নামের রহস্য বলে শেষ করা যাবে না। রহমান শব্দের অর্থের ভিতরে এক বিশাল রহস্যের ভাণ্ডার রয়েছে। আমি আভাস দিচ্ছি মাত্র।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের প্রসিদ্ধ ৯৯ নামের এক নাম রহমান আরেক নাম রহীম। অত্যন্ত দয়ালু। রহীম শব্দের শাব্দিক অর্থও অত্যন্ত দয়ালু। তবে বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য নয়।

বাংলাদেশের মুসলমানের জন্য বাবা যথেষ্ট (?)।

দয়াল বাবার রওশ শরীফে যাও রহমানের দরকার হবে না (?)। রহমান কার নাম? শাব্দিক অর্থ কি? অত্যন্ত দয়ালু।

তা হলে রহমান শব্দের যেই অর্থ, রহীম শব্দের সেই অর্থ। দু'শব্দের একই অর্থ হলে দু'টি শব্দের ব্যবহার দরকার হয় না; একটা শব্দই যথেষ্ট? একটা শব্দের ব্যবহারই যথেষ্ট। বাতির আলো যেই জিনিসকে বলে, জ্যোতিও সেই জিনিসকে বলে। আলো অর্থ যা, জ্যোতি অর্থ তা।

সুতরাং আলো বললে জ্যোতি বলতে হয় না। আর জ্যোতি বললে আলো বলতে হয় না। সূর্য বলতে আকাশের যেই গ্রহটা বুঝায় আরেকটা শব্দ আছে রবি। রবি শব্দের সেই অর্থ।

সুতরাং সূর্য বললে আর রবি বলতে হয় না, আর রবি বললে সূর্য বলতে হয় না। আকাশের চন্দ্র– চন্দ্র বলতে যেই গ্রহটা বুঝায়, শশী আরেকটা শব্দ আছে– বাংলা ভাষায় শশী বলতেও তা-ই বুঝায়। এটাকে চন্দ্রও বলে, শশীও বলে।

আর শশী শব্দের যে অর্থ চন্দ্র বলতে সেই অর্থ। কাজেই চন্দ্র বললে, আর শশী বলতে হয় না। আর শশী বললে চন্দ্র বলতে হয় না। এখন রহমান শব্দের যে অর্থ রহীম শব্দের যদি সে-ই অর্থ হয়, তা হলে রহমান বললে রহীম বলার দরকার থাকে? রহীম বললে পাশাপাশি রহমান বলার

দরকার থাকে? কিন্তু আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন রহমান আর রহীম শব্দ অজস্র আয়াতে পাশাপাশি বলেছেন।

দেখুন! কুরআন শরীফের প্রথম সূরার দ্বিতীয় আয়াতেই আল্লাহ বলেছেন– اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ একই অর্থ হলে দুই শব্দ বলার দরকার থাবে না– একটি শব্দ ব্যবহার করাই যথেষ্ট? তাহলে আল্লাহ দু'শব্দ পাশাপাশি বললেন কেন?

এই প্রশ্নের জবাবে মুফাসসিরীনে কিরাম লিখেছেন, রহমান এবং রহীম শব্দের শাব্দিক অর্থ এক হলেও মর্মে রয়েছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। বিভিন্ন রকমের ব্যবধান। এই সমস্ত ব্যবধানের মাঝে আমি আপনাদেরকে দু'টা ব্যবধান শোনাচ্ছি।

(১) রহমান এমন দয়ালুকে বলে, যেই দয়ালু সৃষ্টির আগেই দয়া করে সৃষ্টি করল। রহীম এমন দয়ালুকে বলে, যে দয়ালু সৃষ্টির পরে দয়া করল। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টির আগেও দয়া করে সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেও দয়া করছেন। এই জন্য তিনি রহমানও এবং রহীমও। রহমান এবং রহীম শাব্দিক অর্থে এক রকম হলেও মর্মে বেশকম আছে কি? মর্মে বেশকম আছে আকাশ-পাতাল।

(২) রহমান এমন দয়ালুকে বলে আপন-পর, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলকেই সমানভাবে দয়া দান করেন। এ জন্যে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে সুলায়মান পয়গাম্বরকে রাজত্ব দান করেন, ফেরাউনের মত কাফিরকেও রাজত্ব দান করেন। রাজত্ব দান করা কি আল্লাহর দয়া নয়? ফেরাউনের মত কাফিরকে কেন দান করলেন?

যেহেতু আল্লাহর নাম রহমান তিনি বাধ্যকে যে নেয়ামত দান করেন, অবাধ্যকেও সেই নেয়ামত দান করেন। মিত্রকে যেই দয়া দান করেন, শত্রুকেও সেই দয়া দান করেন। তাই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সুলায়মান পয়গাম্বরকেও রাজত্ব দান করেন এবং ফেরাউনের মত কাফিরকেও রাজত্ব দান করেন।

পক্ষান্তরে রহীম এমন দয়ালুকে বলে যেই দয়ালু শুধু আপনজনকে দয়া দান করেন পরকে নয়। মিত্রকে নেয়ামত দান করেন শত্রুকে নয়। এজন্য পরকালে জান্নাত শুধু মুমিনকে দিবেন, কাফিরকে নয়। তাহলে দুনিয়াতে

রহীম গুণের বিকাশ ঘটালেন, না রহমান গুণের। রহমান গুণের। আর আখেরাতে রহীম গুণের বিকাশ ঘটাবেন।

এই পার্থক্যটা না জানার কারণে অনেক বেঈমান কাফের পাপীষ্ঠরা মনে করে, যারা আল্লাহর বাধ্য তাদের যে নেয়ামত দিচ্ছেন আমরা যারা অবাধ্য আমাদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে সেই নিয়ামত দিচ্ছেন। সুতরাং পরকালেও আল্লাহ মুত্তাকী পরহেজগারদের যে-ই জান্নাত দিবেন, আমাদের মত বেঈমান পাপীষ্ঠকেও সেই জান্নাত দিবেন। খেয়ালী পুলাও কেন খায়? সে রহমান ও রহীমের পার্থক্য জানে না।

রহমান এবং রহীম দুটা শব্দের শাব্দিক অর্থ এক হলেও মর্মগত ব্যবধান আছে। কাজেই দুনিয়ার কোন বে-ঈমান কাফেরকে যদি আল্লাহ সারা দুনিয়ার নেতৃত্ব দান করেন, কর্তৃত্ব দান করে দেন, তা হলে এতে কোনো মুমিন-মুসলমানের চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন,

وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

কাফেরদেরকেও আমি অনেক সময় নেয়ামত দান করে থাকি, কিন্তু পরকালের জাহান্নাম তাদের জন্য নির্ধারিত। যেহেতু কুরাইশসহ মূর্তিপূজারীরা রহমান কাকে বলে চিনত না, তাই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বলছেন–

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

রহমান সেই আল্লাহরই আরেক নাম যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। রহমান সেই আল্লাহরই আরেক নাম যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। রহমান সেই আল্লাহরই আরেক নাম যিনি মানুষকে বাকশক্তি দান করেছেন।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, প্রথম আয়াত اَلرَّحْمٰنُ দ্বিতীয় আয়াত عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ তৃতীয় আয়াত خَلَقَ الْاِنْسَانَ রহমান সেই আল্লাহরই আরেক নাম যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

কাজের বেলায় মানুষ সৃষ্টি আগে করেছেন, কুরআন শিক্ষা পরে দিয়েছেন। আপনারা কি মনে করেন? মানুষ সৃষ্টির আগেই কি আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, না আগে মানুষ সৃষ্টি করেছেন? শিক্ষা আগে না সৃষ্টি আগে? আগে মানুষ সৃষ্টি। কিন্তু বলতে গিয়ে বলেছেন আমি কুরআন

শিক্ষা দিয়েছি, মানুষ সৃষ্টি করেছি।

তাহলে কাজের বেলায় যেই সিরিয়াল, কথার বেলায় সেই সিরিয়াল রইল না; উলট-পালট হল? আল্লাহ এমন করলেন কেন? এই প্রশ্নের জবাবে মুফাসসিরীনে কিরাম লিখেন, আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ মানুষের বংশে জন্মগ্রহণ করলেই মানুষ হয় না, কুরআন শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হলেই মানুষ হয়।

সেই তথ্যের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ পাক মানুষ সৃষ্টি করে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন না বলে বলেছেন, কুরআন শিক্ষা দিয়েছি, মানুষ সৃষ্টি করেছি। একটা উদাহরণ দিয়ে কথা শেষ করে দিব। বাংলার কুলাঙ্গার তাসলিমা নাসরীন "অপর পক্ষ" বইয়ে লিখে আমার পেট, আমার শরীরের অঙ্গ, আমার স্বামীর শরীরের অঙ্গ নয়।

সুতরাং আমার পেটে স্বামী তার ইচ্ছামত বাচ্চা জন্ম দেওয়ার অধিকার রাখে না। আমার পেটে যেখান থেকে ইচ্ছা বাচ্চা নিব, সেটা আমার অধিকার।

আমি জিজ্ঞেস করি, স্বামীর কাছ থেকে বাচ্চা নেবে না, যেখান থেকে মন চায় সেখান থেকে বাচ্চা নেবে এমন পেট মানুষের হয়, না কুত্তীর হয়? কুত্তির হয়। তাহলে তাসলিমার এই মতবাদটা মানুষের মতবাদ, না পশুত্বের মতবাদ? কেন? সে কি অশিক্ষিত? সে তো একজন ডাক্তার হয়েছে।

এত বড় শিক্ষিত হয়ে কুত্তির মতো হল কেন? আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এই জাতীয় প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে বলেছেন, মানুষ সৃষ্টি করে কুরআন শিক্ষা দেই নি, কুরআন শিক্ষা দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছি। কুরআন শিক্ষার প্রভাবে যারাই প্রভাবিত তারাই আমি আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ। মানুষ হওয়ার একমাত্র শিক্ষা কুরআন শিক্ষা।

আমার আলোচ্য বিষয় প্রকৃত শিক্ষা কি? অর্থাৎ মানুষ গড়ার শিক্ষা কি? মানুষ গড়ার শিক্ষা কি? কুরআন।

আমাদের ছাত্র সমাজ আমাদের পাবলিক যদি চালাক হয়, ছাত্র সমাজ চালাক হবে না? আপনারা কি মনে করেন, পাবলিক বেশি চালাক, না ছাত্র সমাজ বেশী চালাক? ছাত্র বেশী চালাক। কারণ ওরা হল অশিক্ষিত চালাক

আর এরা হল শিক্ষিত চালাক। আমাদের ছাত্ররা এতো চালাক যদি জিজ্ঞাসা করুন কেন লেখা-পড়া করো? জবাব দেয় মানুষ হওয়ার জন্য লেখাপড়া করি।

কিসের জন্য লেখা-পড়া করো? মানুষ হওয়ার জন্য। জিজ্ঞাসা করুন, মানুষ কাকে বলে? আর বলতে পারে না। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সূরায়ে রাহমানে বলে দিয়েছেন, মানুষ কাকে বলে।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ

দয়ালু আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, কুরআন শিক্ষার প্রভাব যাদের জীবনে পড়বে তারাই মানুষ। সুতরং মানুষ গড়ার শিক্ষা একমাত্র কুরআন শিক্ষা। কুরআনে মানুষ অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে দু'টা অর্থ বুঝানোর জন্য।

একটা হল বংশগত মানুষ আরেকটা হল গুণগত মানুষ। আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষ দুই প্রকার। এক প্রকার মানুষ বংশগত আরেক প্রকার মানুষ গুণগত। বংশগত মানুষ কাকে বলে? মানুষের বংশে যার জন্ম হয়, সেই বংশগত মানুষ। আমার কথা বুঝে থাকলে এবার বলুনতো! এই মানুষ হতে হলে কি পরিমাণ লেখা-পড়া করা প্রয়োজন? বংশগত কাকে বলে? মানুষের বংশে জন্ম যার।

এমন মানুষ হতে হলে ক, খ, গ, ঘ পড়া লাগে? A, B, C, D পড়া লাগে? ب، ت، ث। পড়া লাগে? লেখা লাগে না পড়া লাগে? এমন মানুষ হওয়ার জন্য লেখা লাগে না, পড়া লাগে না।

যেদিন থেকে মানুষের বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, সেদিন থেকেই তুমি মানুষ। এবার তুমি যে মাঁনুষ হওয়ার জন্য লেখা-পড়া কর বল, মানুষ কাকে বলে?

আরেক প্রকার মানুষ কাকে বলে? গুণগত মানুষ। মানুষের গুণ অর্জন করলে সে গুণের মানুষ, শুধু বংশগত মানুষ নয়। মানুষের গুণ কি? বুঝার জন্য এক দু'টা উদাহরণ দিচ্ছি।

মাইক ফিট করা হয়েছে। আওয়াজ দেওয়ার জন্য নাকি না-দেওয়ার জন্য? বাতি ফিট করা হয়েছে আলো দেওয়ার জন্য, নাকি না দেওয়ার জন্য? ড্রাইভার রাখা হয়েছে গাড়ী চালানোর জন্য, না না চালানোর জন্য?

গাড়ী না চালানোর জন্য চালক, না চালানোর জন্য চালক।

দোকানে কর্মচারী রাখা হয়েছে বেচা-কেনা করার জন্য, নাকি না করার জন্য? করার জন্য।

ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ বলেছেন মানুষ সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য। আল্লাহর ইবাদত করা হল মানুষের গুণ।

সুতরাং যেই শিক্ষার দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করতে পারা যায় সেই শিক্ষা হল গুণের মানুষ বানানোর শিক্ষা।

শিক্ষা একমাত্র কুরআন ছাড়া জগতে আর কোথাও নেই। কুরআন শিক্ষা একমাত্র মানুষ গড়ার শিক্ষা। কুরআন শিক্ষা ছাড়া মানুষ গড়ার শিক্ষা আর জগতে নেই।

সেই দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ

اَلرَّحْمٰنُ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

বলেননি; তিনি বলেছেন,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ

মানুষ সৃষ্টি করে কুরআন শিক্ষা দেইনি, কুরআন শিক্ষা দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছি।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

মাওয়ায়েজে হাসানাহ

খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,

তরজমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত

মাওলানা নুরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান–১

শান্তিময় সমাজ গঠন ঃ পথ ও পদ্ধতি

স্থান

পশ্চিম তিলক, জগন্নাতপুর, সুনামগঞ্জ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

اما بعد فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَاِيَّاكُمْ بِالْاٰيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

হযরত উলামায়ে কেরাম, মুহতারাম হাজীরিন!

আপনারা লিফলেটে দেখে থাকবেন, আমার বিষয় দেওয়া হয়েছে শান্তিময় সমাজ গড়ার ব্যবস্থা। সূরায়ে নিসার ৩৬ নম্বর আয়াতের তাফসীরের আলোকে আমাকে এ বিষয়টি দেওয়া হয়েছে। একারণে আমি সূরায়ে নিসার ৩৬ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেছি।

বিষয়বস্তু বুঝার আগে আমাদের জেনে রাখা দরকার সমাজ কাকে বলে? শান্তিময় সমাজ বুঝার আগে সমাজই যদি না বুঝি, তা হলে শান্তিময় সমাজ গঠন বুঝাব কিভাবে? এই কারণে সমাজ কাকে বলে বুঝলে শান্তিময় সমাজ গঠন বুঝে আসবে।

মানুষকে আল্লাহ্পাক রাব্বুল আ'লামীন এমন ধরনের জীবন ব্যবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া এদের জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। সমস্ত মানুষই একে অপরের সহযোগিতায় জীবন যাপন করে। এর এক দু'টি উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি, যাতে সহজে বুঝতে পারেন। আমরা যে সময় খানা খাই, আমার মুখের এক লোকমা ভাত তো আমি গিলে ফেললাম, এক মিনিটও লাগল না। আমার মুখের এই ভাত উপযোগী করতে এর পেছনে কি পরিমাণ মানুষের পরিশ্রম লেগেছে। এই ভাত যে চাউল থেকে হল, এই চাউল যে ধান থেকে হয়েছে, এই ধান উৎপাদনে কি পরিমাণ মানুষ মেহনত করেছেন।

ক্ষেত থেকে ধান কেটে এনে চাউল বানাতে কি পরিমাণ মানুষের মেহনত লেগেছে। এই চাউল থেকে ভাত রান্না করে আমার সামনে হাজির করতে কি পরিমাণ মেহনত লেগেছে। আর শুধু ভাত তো আর খাওয়া যায় না। এর সাথে তরকারী। আমার এক লোকমা ভাতে যে তরকারী মিশ্রণ করলাম, সেই তরকারী বানাতে কি পরিমাণ মেহনত লেগেছে।

আমার গায়ে যে কাপড়, যে সুতা দিয়ে জামা বানাল এই সুতা যে তুলা দিয়ে বানাল, এই তুলা চাষ করতে কি পরিমাণ মানুষের মেহনত লেগেছে। এই তুলা দিয়ে সুতা বানাতে কি পরিমাণ খাটনি লেগেছে। সুতা দিয়ে কাপড় বানাতে আরো কি পরিমাণ মানুষের মেহনত লেগেছে।

কাপড় দিয়ে জামা বানাতে আরো কি পরিমাণ মানুষের মেহনত লেগেছে। মাত্র দু'টা উদাহরণ থেকে আশা করছি আপনারা বুঝতে পারবেন যে, এক লুকমা ভাত আর একটা জামা এই খেলাম আর গায়ে দিলাম– আমি নিজে নিজে নাকি বহু মানুষের সহযোগিতায়? বহু মানুষের সহযোগিতায়।

এক লোকমা ভাত আমি নিজে নিজে উৎপাদন করে, রান্না করে খেলাম নাকি বহু মানুষের সহযোগিতায় খেলাম? বহু মানুষের সহযোগিতায়।

একটা জামা আমি গায়ে দিলাম, নিজে নিজে তুলা চাষ করে সুতা বানিয়ে কাপড় বুনে সেলাই করে গায়ে দিলাম নাকি বহু মানুষের সহযোগিতায়? বহু মানুষের সহযোগিতায়।

এই দু'টা জিনিসে যদি এত মানুষের সহযোগিতা লাগে, তা হলে আমি জীবনভর চলাফেরা করতে যত কাজকর্ম করি, সেই সকল কাজে কি পরিমাণ মানুষের সহযোগিতা লাগে?

এভাবে একে অপরের সহযোগিতায় জীবন যাপন করার নাম, জীবন যাপনের পথে পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকার নাম সমাজ। এবার বুঝে থাকলে বলুন, মানুষ অসামাজিক হতে পারে, না মানুষ মাত্রই সামাজিক?

পাখিদের দেখবেন দু'টা করে এক জুটি। জন্মগতভাবেই দুইপাখি এক জুটি। এরা দু'জন যেখানে যায় একসাথে যায়। যেখানে থাকে এক সাথে থাকে। বাসা তৈরি করার সময় দু'জন মিলে বাসা বানায়। একজনে ডিম পাড়ে বাচ্চা ফুটায়, আরেকজন দেখা-শোনা করে মাত্র। তার বাসা বানাতেও বহু পাখির সহযোগিতা লাগে না।

তার ডিম পাড়তেও বহু পাখির সহযোগিতা লাগে না। বাচ্চা ফুটাতেও বহু পাখির সহযোগিতা লাগে না। এভাবে প্রাণী, জীব-জানোয়ার সামাজিক জীব নয়। সমস্ত জীব-জানোয়ার মানুষের মত পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জীবন যাপন করে না। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় জানোয়ারেরা জীবন যাপন করে। কিন্তু মানুষের পক্ষে পশুর মত বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। একেবারেই অসম্ভব।

একটা পুরুষের কাছে একটা মেয়েকে বিয়ে দিয়ে যদি ছেড়ে দেন যে তোমরা খেতে, পড়তে, চলা-ফেরা করতে, বাড়ী-ঘর বানাতে জীবন যাপন করতে দুনিয়ার কোন মানুষের সহযোগিতা পাবে না। ওরা কি চলতে পারবে? সাথে সাথে অচল হয়ে যেতে বাধ্য।

কিন্তু পাখি জন্মগতভাবে যে দু'জন মৃত্যু পর্যন্ত দু'জনই আর কোনও পাখির সহযোগিতা ছাড়াই তারা চলে। তাহলে জীব জানোয়ার সামাজিক না মানুষ সামাজিক? মানুষ। যেহেতু আমরা সামাজিক প্রাণী, আমরা মানুষ পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে জীবন যাপন করি। একের সহযোগিতা ছাড়া অপরের জীবন যাপন করার কোন উপায় নেই।

কাজেই কে কাকে কি পরিমাণ সহযোগিতা করতে হবে, কার কি পরিমাণ সহযোগিতা করার দায়িত্ব আছে আর কার কাছ থেকে কি পরিমাণ সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার আছে? সহযোগিতা করাটা হল দায়িত্ব আর সহযোগিতা পাওয়া হল অধিকার। মায়ের উদরে জন্ম নেওয়ার পর মা যদি দুধ পান করায় না তা হলে কি সে বাঁচবে? না। অতএব সন্তানকে দুধ পান করানো মায়ের দায়িত্ব। আর এই সহযোগিতা পাওয়াটা মায়ের কাছে সন্তানের অধিকার। যেখানেই পারস্পরিক সহযোগিতার প্রশ্ন আসে, সেখানেই দু'টি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ সহযোগিতা করবে আরেক পক্ষ সহযোগিতা পাবে। সহযোগিতা করাটা হল দায়িত্ব আর সহযোগিতা পাওয়াটা হল অধিকার।

আমার কাছে কি পরিমাণ অধিকার আছে, আপনাদের সহযোগিতা পাওয়ার, আপনাদের কি পরিমাণ দায়িত্ব আছে আমাকে সহযোগিতা করার? আমার এ সহযোগিতা করার কি কোনও সীমানা আছে? অবশ্যই। অসীম অবিরাম সহযোগিতা কোন মানুষ কোন মানুষকে করতে পারে না। কোন কাজে আমি আপনাদের সগযোগিতা করব আর কোন কাজে আপনারা আমার সহযোগিতা করবেন।

এভাবেই আমরা সামাজিকভাবে দুনিয়াতে জীবন যাপন করি। কিন্তু কতখানি? আমি আপনাদেরকে কতখানি সহযোগিতা করার দায়িত্বশীল? আপনি আমাকে কতটুকু সহযোগিতা করবেন? কতটুকু সহযোগিতা পাওয়া আমার অধিকার? এর একটা সীমানা আছে, নিয়ম-নীতি এবং সীমারেখা আছে।

ঐ নিয়ম-নীতি সীমারেখা যতক্ষণ পর্যন্ত সামাজের মানুষ রক্ষা করে চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সমাজে কোন রকমের অশান্তি সৃষ্টি হয় না। আমাকে সহযোগিতা করার যতটুকু দায়িত্ব আপনার আছে এর মাঝে যদি 'কম' করেন, আপনার কাছে যতটুকু পাওয়ার অধিকার আমার আছে, এর থেকে যদি 'বেশী' চাই তখনই অশান্তি সৃষ্টি হয়।

যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া দুনিয়াতে মানুষ জীবন যাপনই করতে পারে না। কাজেই কে কাকে কোন সহযোগিতা, কতটুকু করবে, এর একটা সীমারেখা

থাকা দরকার। একটা সীমারেখা আছেও। এই সীমারেখাটা যতদিন মানুষ রক্ষা করে চলে, ততদিন পর্যন্ত মানুষের সমাজে কোন অশান্তি দেখা দেয় না। মানুষের সমাজে অশান্তি কোন সময় দেখা দেয়? যখন সহযোগিতা কারীরা দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে। আমার আপনাকে যতটুকু সহযোগিতা করার দায়িত্ব ছিল, আমি যদি এর মাঝে কম করি, আপনি যদি এর চেয়ে বেশী দাবী করেন তখনই অশান্তি দেখা দিবে। কাজেই শান্তির সমাজ গড়তে হলে বুঝতে হবে, আমাদের কার কি পরিমাণ সহযোগিতা করার দায়িত্ব আছে, আর কার কি পরিমাণ সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার আছে। এটা জানতে, বুঝতে হবে তারপর এটা রক্ষা করতে হবে। তা হলেই শান্তির সমাজ গঠন হবে।

আমি সহযোগিতা রক্ষা করব দূরের কথা, আমি যদি জানিই না কাকে কতটুকু সহযোগিতা করার দায়িত্ব আছে, তাহলে আমার দ্বারা শান্তির সমাজ গড়ার আশা করা যায় কি? কখনও নয়। এই মূলনীতিটা একটা মহা মূল্যবান মূলনীতি। একমাত্র কুরআন ছাড়া আর কোথাও পাবেন না।

শুধু কুরআনই মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার সীমারেখা বর্ণনা করে দিয়েছে। কাজেই শান্তির সমাজ গড়ার জন্য কুরআনের কোন বিকল্প নেই। কুরআন ছাড়া আর কোথাও শান্তির সমাজ গড়ার ব্যবস্থা নেই। আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে কে কাকে কতটুকু সহযোগিতা করবে, কে কার কাছে কতটুকু সহযোগিতা পাবে, এর সীমারেখা বয়ান করে দিয়েছেন। এর মাঝে এক আয়াত হল, সূরায়ে নিসার ৩৬ নম্বর আয়াত। আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ্ বলেন-

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো।

আল্লাহ্র অধিকার আছে তোমাদের ওপর। আল্লাহ্র কিছু প্রাপ্য আছে তোমাদের কাছে। আল্লাহ্র কিছু পাওনা আছে তোমাদের কাছে তা দিবে, যদি দুনিয়া এবং আখেরাতে শান্তি চাও। আর আল্লাহ্র কাছেও তোমাদের কিছু পাওনা আছে সেটা বুঝে নাও যদি শান্তি চাও।" আপনার পাওনা আমার দেওয়াটা দায়িত্ব আর আপনার পাওয়াটা অধিকার। আল্লাহ্র কাছে বান্দার কিছু পাওনা আছে, বান্দার কাছেও আল্লাহ্র কিছু পাওনা আছে।

আল্লাহ্ বলেন, আমার পাওনা দিবে তোমার পাওনা নিবে। যদি দুনিয়াতে শান্তি চাও, আখেরাতে শান্তি চাও।

এখন আল্লাহ্র কি পাওনা আছে, আমি যদি জানিই না তখন দেব কি আল্লাহ্র পাওনা? আর আল্লাহ্র কাছে আমার কি পাওনা আছে জানিই না তাহলে নেওয়ার কথা বলব কি? না। এজন্য হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে : রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান, রাসূল এক ছাহাবীকে জিজ্ঞেস করেন– তুমি কি জান মানুষের কাছে আল্লাহ্র পাওনা কি? আর বান্দার কাছে আল্লাহ্র পাওনা কি? ছাহাবী বলেন, আমি জানি না। আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন।

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বান্দার কাছে আল্লাহ্র পাওনা হল দু'টি জিনিস।

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

আল্লাহ্কে লা-শারীক জানবে আর ইবাদত করবে। এই দু'টি তোমার কাছে আল্লাহ্র পাওনা। এই হাদীসের মাঝে আল্লাহ্র রাসূল যে দু'টি পাওনার কথা বলেছেন, সূরায়ে নিসার ৩৬ নম্বর আয়াতেও আল্লাহ্ এ দু'টি পাওনা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্র পাওনা আছে বান্দার কাছে দু'টি জিনিস। একটি হল আল্লাহ্র কোনও শরীক নেই, বিশ্বাস করবে। দু' নম্বর আল্লাহ্র ইবাদত করবে। এখন যদি কেউ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক বানায়, তা হলে আল্লাহ্র পাওনা কি দিল? দিল না। এর দ্বারা অশান্তি হবে দুনিয়া ও আখেরাতে।

কেউ যদি আল্লাহর ইবাদত না করে, তা হলে আল্লাহ্র পাওনা কি দিল? না। আপনারা বুঝে শুনে বলুন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পাওনা দেয় না সে আপনাদের পাওনা কি পরিমাণ দিবে? দিবে না। তাহলে যে ব্যক্তি ইবাদত করে না, সে আল্লাহ্র পাওনা দেয় না। সে সমাজের মানুষের পাওনা কি পরিমাণ দিবে? এই কারণে বান্দার আগে তৈরি হতে হয় আল্লাহ্র পাওনা আল্লাহ্র প্রাপ্য দেওয়ার জন্য। এরপর আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে বান্দা আল্লাহ্র পাওনা দিবে আল্লাহ্ও তার পাওনা দিয়ে দেবেন। আল্লাহ্র রাসূল বলেন, বান্দার কাছে আল্লাহ্র দু'টি পাওনা।

(এক) আল্লাহ্ লা-শারীক জানবে (দুই) আল্লাহ্র ইবাদত করবে।

আল্লাহ্র কাছে তোমার পাওনা একটি। সেটি হচ্ছে তোমাকে জান্নাত দেওয়া। তা হলে আল্লাহ্র কাছে আমাদের পাওনা হল জান্নাত। আর আমাদের কাছে আল্লাহ্র পাওনা হল ইবাদত। তারপর আল্লাহ্র রাসূল বলেন, যে বান্দা আল্লাহ্ পাওনা দিয়ে দিবে আল্লাহ্ তার পাওনা দিয়ে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত করবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দিয়ে দেবেন। আল্লাহ্র কাছ থেকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পাওনা দিয়ে জান্নাত আদায় করল, দুনিয়ার জীবনে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদত করে জান্নাত আদায় করল, অনন্ত কাল পর্যন্ত বিন্দুমাত্র অশান্তি হবে না।

এটাই শান্তির জীবন গড়ার ব্যবস্থা। এ কারণে আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন সূরায়ে নিসার ৩৬ নং আয়াতের প্রথমেই বলেন–

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।"

ইবাদত করলেই আল্লাহ্র পাওনা দেওয়া হল। আল্লাহ্র পাওনা দিয়ে তোমার পাওনা জান্নাত লাভ করলে কোন দিন আর অশান্তির মুখ দেখবে না। যে দিন থেকেই জান্নাতে যাবে কোন দিন আর অশান্তির মুখ দেখবে না।

তারপরে আল্লাহ্ বলেন, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا আল্লাহ্র পাওনা দেওয়ার পরে সমাজের মানুষের পাওনাদারদের মাঝে সর্বপ্রথম পাওনা দিবে তোমার মা-বাবার। মা-বাবার কিছু পাওনা আছে, সন্তানের কাছে আর সন্তানেরও কিছু পাওনা আছে মা-বাবার কাছে। দিয়ে দিলে পারস্পরিক সহযোগিতা ঠিক আছে।

যে মা-বাবা ছোট বেলা সন্তানের পাওনা আদায় করবেন, সন্তানও বড় হয়ে সেই মা-বাবার পাওনা আদায় করবে। তাহলেই শান্তির সমাজ গঠন হবে, শান্তির পরিবার গঠন হবে। মাত্র দু'টা পক্ষের আলোচনা হল। আল্লাহ্র কাছে বান্দার কি পাওনা আর বান্দার কাছে আল্লাহ্র কি পাওনা। আদায় করলে শান্তির জীবন গঠন হবে। আদায় না করলে শান্তির জীবন গঠন হবে না।

মা-বাবার কাছে সন্তানের কি পাওনা, আর সন্তানের কাছে মা-বাবার কি পাওনা, আদায় করলে শান্তির সমাজ গঠন হবে, আর আদায় না-করলে

অশান্তি দেখা দেবে। ঠিক তেমনিভাবে কেউ যদি স্বামী হয়ে থাকে, তার কাছে স্ত্রীর পাওনা আছে। দিলেই শান্তি হবে, না-দিলে অশান্তি হবে। কেউ যদি শিক্ষক হয়ে থাকে, তার কাছে ছাত্রের পাওনা আছে। দিলেই শান্তি হবে, না-দিলে অশান্তি হবে।

কেউ যদি ছাত্র হয়ে থ কে তার কাছে শিক্ষকের পাওনা আছে। দিলেই শান্তি হবে, না-দিলে অশান্তি হবে। সে যদি পীর হয়ে থাকে, তার কাছে মুরীদের পাওনা আছে। দিলেই শান্তি হবে, না-দিলেই অশান্তি হবে। সে যদি মুরীদ হয়ে থাকে, তার কাছে পীরের পাওনা আছে। দিলেই শান্তি হবে, না-দিলেই অশান্তি হবে। তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন তার কাছে উম্মতের পাওনা আছে।

যদি উম্মত হয়ে থাকে তার কাছে নবীর পাওনা আছে। যদি মানুষ হয়ে থাকে তার কাছে জীব জানোয়ারের পাওনা আছে, ফিরিশতার পাওনা আছে। যদি ফিরিশতা হয়ে থাকে, তার কাছে মানুষের পাওনা আছে। আপনারা বুঝে থাকলে বলুন! আপনারা যারা এখানে বসেছেন আপনাদের কাছে কার কি পাওনা আছে জানেন কি? জানার জায়গা এখানে আর মানার জায়গা সেখানে। জানার জায়গা সভা আর মানার জায়গা বাড়ী।

দু'টি উদাহরণ দিলাম। আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার পাওনা আর বান্দার কাছে আল্লাহ্‌র পাওনা। আর সন্তানের কাছে মা-বাবার পাওনা আর মা-বাবার কাছে সন্তানের পাওনা। স্বামীর কাছে স্ত্রীর পাওনা আর স্ত্রীর কাছে স্বামীর পাওনা।

এখানে যারা বসে আছেন তাদের মাঝে কেউ স্বামী আছেন কি? যারা স্বামী আছেন আপনার স্ত্রীর কি কি পাওনা আছে, আপনি যদি না জানেন অথবা না-দেন আপনার পারিবারিক জিন্দেগীতে অশান্তি হবেই হবে অশান্তি কেউ ফিরাতে পারবে না।

স্ত্রীর পাওনা না দিলে অশান্তি যে হবেই, তা কেউ ফিরাতে পারবে না। একটা উদারহণ দিচ্ছি, আজকাল আমাদের সমাজে অনেক ব্যক্তি বিয়ের সময় কাবিনের মাঝে লিখেন লাখ লাখ টাকা। দেন না মোটেও।

এক লোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত টাকার কাবিন লিখিয়েছেন দেবেন কিভাবে? বলে- এটা দেওয়া লাগে না। বললাম, দেওয়া লাগে না

যখন লিখিয়েছেন কেন? বলে, ফ্যাশন। শুধু বাহাদুরির জন্য এত টাকার কাবিন লিখে।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান, যে ব্যক্তি এমন একটা পরিমাণ মহর দেওয়া সাব্যস্ত করল যে, মহর দেওয়ার নিয়তই নেই, সেই ব্যক্তি যতদিন স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করবে ততটা যিনা তার আমলনামায় লিখা হবে। বুঝে থাকলে বলুন, আমাদের সমাজে এমন স্বামী আছে কি যারা স্ত্রীর পাওনা দেয় না? আছে।

খুব শান্তির (?) জীবন নিয়ে আছেন, খবর নিয়ে দেখুন। আকদ এর আগেই বায়না ধরে মোটর সাইকেল দেবে, নাকি কার দেবে, না বাজারে ভিটা দেবে, না ৫০ লাখ টাকার তহবিল দেবে, আগে বল তার পর বিয়ে করব। এগুলো আছে কি? আছে।

এখন জামানার চাহিদা পুরা করতে গিয়ে শ্বশুর সম্পত্তি বিক্রি করে অন্তত একটি মোটর সাইকেল দেয়। অথচ আমি যে আমার শ্বশুরের সম্পত্তি বিক্রি করিয়ে হোন্ডা নিয়ে বিয়ে করলাম, আমার স্ত্রীর মনে মনে জানা আছে কি যে, তিনি হোন্ডা নিয়ে আমার বাবার সম্পত্তি বিক্রি করিয়ে আমাকে বিয়ে করেছেন আর আমার বাবা ছোট ছোট ভাই বোনদেরকে নিয়ে কষ্ট করছেন? আছে।

যে স্ত্রী মনে মনে জানে তোমার মতো স্বামীর চাহিদা মিটাতে আমার বাবা সম্পত্তি বিক্রি করেছেন আর আমার মা এবং ছোট ছোট ভাই বোনকে নিয়ে কষ্ট করে জীবন কাটায়, সেই স্ত্রী মুখে মুখে স্বামীর কাছে যতই ভাব দেখাক না কেন অন্তর দিয়ে একটা কুকুরকেও তত ঘৃণা করবে না যত ঘৃণা স্বামীকে করবে।

বড় শান্তির পরিবার গঠন হল (!) কি মনে করেন? তাহলে শ্বশুর বাড়ী থেকে সম্পত্তি চেয়ে নিলে দাম্পত্য জীবনে শান্তি আসে না অশান্তি? অশান্তি। কেন? শ্বশুর বাড়ী তোমার কোনই পাওনা নেই। তুমি পাওনার অতিরিক্ত চেয়ে নিয়েছ। সীমারেখা লঙ্ঘন করেছ।

এটার অশান্তি এখন তোমার শ্বশুর বাড়ী দেখা দিয়েছে, দুদিন পর তোমার বাড়ীতেও দেখা দেবে। তোমার স্ত্রী তোমাকে ঠ্যাঙ দিয়েও হিসাব করবে না; বলবে আমার বাবার বাড়ী সম্পদ খেয়ে আছ তোমাকে কেন

হিসাব করব? বুঝে থাকলে বলুন, মানুষের সমাজে অশান্তি দেখা দেয় কিসের কারণে? পারস্পরিক লেনদেনের সীমারেখা লঙ্ঘনের কারণে।

বুঝে থাকলে বলুন, শ্বশুর বাড়ী দামানের কোন পাওনা আছে? নেই। পাওনা নেই, তারপরও যদি চায়, সে অধিকার না অনধিকার? অনধিকার। শ্বশুর বাড়ীর সম্পত্তি চেয়ে বিয়ে করা ভিক্ষা করার মত। বাজারে ভিক্ষা করা তত বড় অপমান নয়, শ্বশুর বাড়ী ভিক্ষা করা যত বড় অপমান। যত ব্যক্তি শ্বশুর বাড়ী মাল চেয়ে বিয়ে করে, তারা শ্বশুর বাড়ী ভিক্ষা করে। স্ত্রীর পাওনা না দেওয়ার কারণে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

স্ত্রীর পাওনা দেবে দূরের কথা, মহর দেবে দূরের কথা, স্ত্রীর বাবার কাছ থেকে অনধিকার হিসেবে সম্পত্তি চেয়ে নেয়। তারা ভিক্ষা করে নেয়, চাপে ফেলে নেয়।

আমি একদিন এক ব্যক্তিকে বললাম, স্ত্রীর মহর না দিলে স্ত্রীর দাবীর তলে থাকতে হবে। দাবীর তলে থাকলে আদায় করতে হয়। বলে, না এগুলো মাফ নিয়েছি প্রথম দিনই। আমি বলি, এত লাখ লাখ টাকার কাবিন লিখিয়ে প্রথম দিনই মাফ পাও কিভাবে?

বলে, বাসর ঘরে যখন কন্যাকে দিল আমার কাছে, তখন বলেছি- তোমাকে ছুইবোও না যদি কাবিনের দাবী মাফ না করো। তখন সে কেঁদে কেঁদে বলে, না কোন দাবী নেই, না কোন দাবী নেই। বেচারী মা-বাবা ছেড়ে, ভাই-বোন ছেড়ে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, বাড়ী ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, সবকিছু ছেড়ে আসল আর সেই লোককে বলে ছুঁইবেই না মাফ না করলে। সেই বধূ খুশিতে মাফ করেছে, না বিপদে পড়ে মাফ করেছে? বিপদে পড়ে। এটা কেমন মাফ?

এক ব্যক্তি হালের গরু বিক্রি করে দশ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ী যাচ্ছে। হাওরের মাঝে লাগাল পেল ডাকাতেরা। ডাকাতেরা বুকে ছুড়ি ধরে বলে, ঢুকাব না দিয়ে দিবি? বলে না, ঢুকাবি না, দিয়ে দেই। দশ হাজার টাকা বের করে ডাকাতদের হাতে দিল আর ডাকাতরা ছুড়ি থামাল, খালি হাতে বাড়ী রওনা দিল।

দশ কদম চলার পর ডাকাতরা আবার ডাকল, দাঁড়াও। দাঁড়াল, বলল, এখন আর কি? আরতো কিছু নেই। ডাকাত বলে, দিতে হবে না। যা দিয়েছ, তাতে তোর দাবী মাফ করে যা। তোর কি কোনও দাবী আছে? সে বলে, না সাব, না সাব কোনো দাবী নেই। এই ডাকাতরা যেভাবে হাওরের মাঝে ঐ ব্যক্তি থেকে মাফ নিয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে বাসরের ডাকাতেও সেভাবে মাফ নিয়েছে। দু'বেটাই ডাকাত।

একটা হাওরের ডাকাত আরেকটা বাসরের ডাকাত। এদের দ্বারা সমাজে শান্তি হবে? না। কেন? পাওনার সীমারেখা লঙ্গন। তুমি যদি স্বামী হয়ে থাকো তোমার কাছে স্ত্রীর পাওনা আছে। যদি তুমি স্ত্রী হয়ে থাকো তাহলে তোমার কাছে স্বামীর পাওনা আছে। আমার কাছে এই সময় নেই যে স্বামীর কাছে স্ত্রীর কি কি পাওনা আছে তা বলব। স্ত্রীর কাছে স্বামীর কি কি পাওনা আছে তা বলব। শুধু উদাহরণস্বরূপ এই দু'টি বলি।

স্বামীর কাছে স্ত্রীর যত পাওনা আছে এর মাঝে বড় পাওনা হল শ্বশুর বাড়ী কোন কিছু চাইবে না। আর স্ত্রীর মোহর যা উল্লেখ করেছিল তা দিয়ে দেবে। আর স্ত্রীর কাছে স্বামীর পাওনা হল, তুমি আমার ঘরে থাকবে আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘর দেখা-শুনা করবে। আমার বাচ্চা তোমার পেটে নিবে। আমার বাচ্চা প্রসব করার কষ্ট করবে। আমার বাচ্চা প্রসব করার পর উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত লালন-পালন করে গড়ে তুলবে। এটা হল, স্ত্রীর কাছে স্বামীর পাওনা।

এখন স্বামী ক্ষেতে গেল চাষ করবেন অথবা দোকানে গেল বেচা-কেনা করবেন অথবা অফিসে গেল ডিউটি করবেন, এ সময় যদি স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে আধা মণ চাউল ছোট ভাই এসেছিল তার ব্যাগের মাঝে দিয়ে দিল। এ ধরনের হয় কিনা? হয়। কি ছিল স্বামীর পাওনা? লুকিয়ে চাউল দিয়ে দেবে ছোট ভাইয়ের কাছে? না দেখে হেফাযত করে রাখবে? হেফাযত করে রাখবে। দিয়ে দিয়েছে। এক দিন, দু'দিন, তিন দিনের সময় যখন স্বামী টের পাবে, এই দিন থেকে শান্তি (?) আরম্ভ হল।

তাহলে বলেন, অশান্তি সমাজে কেন হয়? পারস্পরিক সহযোগিতার সীমারেখা লঙ্ঘন করার কারণে? আরেকটি উদাহরণ, স্বামীর কাছে স্ত্রীর পাওনা। স্ত্রীর কাছে আছে স্বামীর পাওনা, শিক্ষকের কাছে আছে ছাত্রের পাওনা, ছাত্রের কাছে আছে শিক্ষকের পাওনা, পীরের কাছে আছে মুরিদের পাওনা, মুরীদের কাছে আছে পীরের পাওনা। সরকারের কাছে আছে

জনগণের পাওনা, জনগণের কাছে আছে সরকারের পাওনা। কি বুঝেন? সারা রাত বলে শেষ করা যাবে? শুধু মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি।

যদি পীর কামেল হয়, তাহলে পীরের কাছে মুরীদের পাওনা আগে। আর মুরীদের কাছে পীরের পাওনা পরে। আর যদি পীর ভণ্ড হয়, তাহলে পীরের কাছে মুরিদের কোন পাওনা নেই। শুধু মুরীদের কাছে পীরের পাওনা। মুরীদের কোন পাওনা নেই। শুধু মুরীদের কাছে পীরের পাওনা। এক তরফা। কি পাওনা? মুরীদে শুধু দিত (?) আর পীর শুধু নিত। এ ছারা তাদের মাঝে আর কোন লেনদেন নেই। আর যদি পীর কামেল হয় তাহলে পীরের কাছে মুরীদের পাওনা আগে।

তারপর হল মুরীদের কাছে পাওনা। মুরীদের কি পাওনা? পাওনা হল পীর মুরীদকে আল্লাহ্ পাওয়ার পথ বাতলে দেবেন। তারপর মুরীদের কাছে পীরের পাওনা হচ্ছে, তুমি আমার বাতলানো পথে চলবে। বলুন কার পাওনা আগে? মুরীদের পাওনা আগে। যদি তুমি শিক্ষক হয়ে থাকো তা হলে তোমার কাছে ছাত্রের পাওনা আছে। ছাত্রের পাওনা আগে, পরে শিক্ষকের পাওনা। শিক্ষকের কাছে ছাত্রের দু'টা পাওনা আছে। একটা হল- শান্তির জীবন গড়ার শিক্ষা দাও।

আরেকটি হল- সমাজ গড়ার শিক্ষা দাও। কোন পথে জীবন যাপন করলে শান্তি হয় তা শিখিয়ে, সে পথে চালিয়ে দেখিয়ে দাও। এটা হল উস্তাদের কাছে ছাত্রের পাওনা। ছাত্রের কাছে উস্তাদের পাওনা হল আমার দেওয়া শিক্ষা তোমাদের গ্রহণ করতে হবে আর আমার প্রদর্শিত পথে তোমাদের চলতে হবে। এটা হল ছাত্রের কাছে শিক্ষকের পাওনা।

বুঝে থাকলে বলুন, সকলের কাছেই সকলের পাওনা আছে কি? পাওনা আছে। এই পাওনার সীমারেখা রক্ষা করলেই শান্তি হয়, আর লঙ্ঘন করলেই অশান্তি হয়। সরকারের কাছে আছে জনগণের পাওনা, জনগণের কাছে আছে সরকারের পাওনা। এক তরফা নয়। সরকারের পাওনা জনগণের আগে নয়। কতটা? একটা দু'টা নয়, ছয়টা পাওনা।

এক নম্বর ঃ দেশে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য ফলে আর যে পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানী হয়, যাদের ঘরে খানা নেই তাদের ঘরে পৌঁছে দেবে আগে। যাদের ঘরে খানা আছে তাদের কে (?) এক বস্তা করে

দিত। যাদের ঘরে খানা নেই তাদের ঘরে আগে দেবে। এটা সরকারের কাছে জনগণের পাওনা। কোন সরকার দেয়? বর্তমান সরকার যাদের ঘরে খানা আছে তাদেরকে আরেক বস্তা দেয়। আর যে ব্যক্তি উপোষ তার কোন খবরই নেই। তাহলে এমন সরকারের মাধ্যমে দেশে শান্তির সমাজ (?) গঠন হবে। আপনারা কি বলেন? শান্তি নয়, অশান্তি? অশান্তি।

আপনারা কি বুঝেছেন অশান্তি কেন হয়? শুধু পারস্পরিক সহযোগিতার সীমারেখা লঙ্ঘন করার কারণে সমাজে অশান্তি হয়। এই পারস্পরিক সীমারেখা রক্ষা করা ছাড়া শান্তির সমাজ গড়ার বিকল্প নেই। বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই। সরকারের কাছে জনগণের দায়িত্ব কয়টা? ছয়টা। এক নম্বর: দেশ বা বিদেশ থেকে খানা এনে থাকে, যার ঘরে খানা নেই তাকে আগে খানা পৌঁছে দিতে হবে।

দুই নম্বর: যে অভাবের কারণে শীতের কাপড় কিনে নিজের মা-বাবাকে অথবা বাচ্চাদেরকে দিতে পারে না, তোমার দেশে যে কাপড় উৎপাদন হয় আর বিদেশ থেকে যে কাপড় আমদানী করো এর মাঝ থেকে যার পোশাকের অভাব তার ঘরে আগে তার অংশ পৌঁছাতে হবে। এটা সরকারের কাছে জনগণের দ্বিতীয় পাওনা।

তিন নম্বর: যে শিক্ষা গ্রহণ করলে জনগণ শান্তির জীবন গড়তে পারে, সার্বজনীনভাবে সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা। দেশের প্রতিটি নাগরিককে সুশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলা সরকারের কাছে জনগণের পাওনা। কত জনকে? সমস্ত জনগণকে।

একটা মানুষও যেন সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না থাকে, এর ব্যবস্থা করা সরকারের কাছে জনগণের তিন নম্বর পাওনা। চার নম্বর: প্রতি রোগী, তোমার দেশে যতজন রোগী আছে, যাদের নিজের পয়সায় চিকিৎসা করার তৌফিক নেই, তাদের চিকিৎসা আগে করার ব্যবস্থা করা। এটা হল সরকারে দায়িত্ব।

আর আমাদের দেশে যার কোটি কোটি টাকা আছে তাকে চিকিৎসা করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিদেশ পাঠায়। আর যে অভাবী ব্যক্তি টাকার অভাবে ঔষধ কিনতে পারে না তার হাসপালে জায়গা নেই। সুতরাং এই সরকার এবং জনগণ দিয়ে একটা শান্তির সমাজ গঠন হবে না অশান্তি ছাড়া কিছু নয়? অশান্তি ছাড়া কিছু নয়।

ইলেকশনের সময় আসলেই তালে তালে ভোট দেয় আর পাঁচ বছর শেষ করার আগেই ঝাড়ু পেটা দিয়ে নামায়। ভোট দেয় তালে তালে আর ঝাড়ু পেটা দিয়ে নামায় কি ব্যাপার? বলে, দেওয়ার সময় ১৫ টাকা চাউলের কেজি ছিল এখন হয়েছে ২০ টাকা। সরকারের কাছে জনগণের পাওনা কয়টা? ছয়টা।

এক নম্বর খাদ্য। দুই নম্বর বস্ত্র। তিন নম্বর শিক্ষা। চার নম্বর স্বাস্থ্য। কত নম্বর গেল? চার নম্বর। পাঁচ নম্বরঃ তোমার দেশের জনগণের বাড়ীঘর নেই। সমস্ত বাস্তুহারাদের ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করে দেবে। একটা মানুষও যেন গৃহহীন না থাকে তোমাদের নাগরিকের মাঝে। এটা হল সরকারের কাছে জনগণের পাওনা।

ছয় নম্বর: দেশের কোন মানুষ যদি পাওনা আদায় না করে জুলুম করে, তাহলে আদালতের মাধ্যমে সুবিচার করা। আর বাইরের দেশের কেউ যদি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা লঙ্ঘন করে, তা হলে সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করা। এটা হল সরকারের কাছে জনগণের ছয় নম্বর পাওনা। আপনি আর আমি ক্ষেতের দখল নিয়ে মারামারি করে একজনে আরেকজনকে আহত করে ফেললাম। যে আহত করল সে কি ন্যায় ছিল, না যাকে আহত করলো সে ন্যায় ছিল; বিচারের জন্য মানুষ স্মরণাপন্ন হয় আদালতের।

আদালতে আসা যাওয়া করতে করতে ছয় মাস নয়, বছরের পর বছর হাজিরা দিতে, সে নিজে নিজে যদি চিকিৎসা করে ফেলত; তাহলে এত পয়সা লাগত না যা আদালতে হাজিরা দিতে দিতে বছরে বছরে খরচ হয়। এটার নাম হল সরকারের কাছে জনগণের সুবিচার (?)। সুবিচার নয় অবিচার।

এই সরকারকে জনগণ অন্তর দিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা করবে, না অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে? যখন একে অপরকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে পাওনা না দেওয়ার কারণে তখন কোন দিন এই সমাজে শান্তি বিরাজ করতে পারে না। শান্তি একটা গাছের গোট (?) পেড়ে গিলে ফেললেই হয়। কোন কারণে শান্তি ভঙ্গ হয় তা বুঝতে হবে।

কিভাবে শান্তি রক্ষা হয়, তা পালন করতে হবে। তখনই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। শুধু মুখে মুখে শান্তি চাই শান্তি চাই যেমনি মুখে মুখে মধু খাই মধু খাই বললে মুখে মিষ্টি লাগে না, তেমনিভাবে মুখে মুখে সমাজে শান্তি চাই শান্তি চাই বললেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। মুখে যদি মিষ্টি লাগাতে চাও তাহলে মধু খাই বললেই হবে না; মধু নিয়ে জিহ্বায় লাগাতে হবে। সমাজে যদি শান্তি চাও তাহলে শান্তি চাই বললেই হবে না, শান্তির পথে চলতে হবে।

এরপরে হল জনগণের কাছে সরকারে পাওনা। কি সেই পাওনা? আল্লাহ্‌পাক রাব্বুল আলামীন বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نسا،/٥٩)

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ যে হুকুম কুরআনে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, তা পালন করে নাও। রাসূল যে কথা হাদীসে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, তা পালন করে নাও। আর তোমাদের সরকার যদি এমন কোন হুকুম করে যে হুকুম আল্লাহ্‌রও বিরুদ্ধে যায় না, রাসূলেরও বিরুদ্ধে যায় না তাও পালন করে নাও। এটা বুঝার জন্য একটা উদারহণ দিচ্ছি। আপনাদের এই জায়গাটা কোন থানায়? জগন্নাথপুর থানা। জেলা কোনটা? সুনামগঞ্জ।

এক সময় সুনামগঞ্জ ছিল সিলেট জেলার মহকুমা। আমার থেকে বয়স যাদের কম তারা বুঝবে না। আমার মত বয়স অথবা আমার চেয়ে বয়স যাদের বেশী তাদের জানা আছে। সিলেট ছিল একটা জেলা। এর কয়েকটা মহকুমা ছিল। সিলেট সদর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার। পরবর্তীতে সিলেট জেলাকে ভেঙ্গে চারটা জেলা বানানো হয়েছে।

সিলেট সদর মহকুমাকে সিলেট জেলা, হবিগঞ্জ মহকুমাকে আলাদা একটা জেলা, সুনামগঞ্জ মহকুমাকে আলাদা একটা জেলা, মৌলভীবাজার মহকুমাকে আলাদা একটা জেলা করা হয়েছে। এক জেলা ভেঙ্গে চার জেলা বানানো হয়েছে।

এই কথাটা কুরআনের কোন জায়গায় আছে? নেই। হাদীসের কোন জায়গায় আছে? নেই। সরকার কেন এ কাজ করলো? দেশের জনগণের সুবিধার জন্য। এতে আল্লাহ্‌র হুকুমেরও লঙ্ঘন হয় না, নবীর তরীকারও

লঙ্ঘন হয় না। সরকারের যে হুকুম পালন করলে জনগণের সুবিধা হয়, দেশের উন্নতি হয়, আল্লাহ্‌র হুকুম লঙ্ঘন হয় না, নবীর তরীকা লঙ্ঘন হয় না- আল্লাহ্‌ বলেন, সরকারের সেই হুকুম পালন করো, এটা তোমাদের কাছে সরকারের পাওনা।

যতদিন সরকার গদিতে আছে এই রকমের যত হুকুম করবে, জনগণ সেই হুকুম পালন করবে। আর কোন সময় যদি বদলানোর দরকার পড়ে, তাহলে যে বেশী করে মিষ্টি খাওয়াবে, তাকে (?) ভোট দিবে। এটা হল জনগণের কাছে নেতাদের পাওনা।

মিষ্টি খেয়ে যারা ভোট দেয়, বিরানী খেয়ে যারা ভোট দেয়, টাকা পেয়ে যারা ভোট দেয় তারা কি খায়? ঘুষ খায়। আমার কথা বুঝে থাকলে বলুন, আমাদের দেশে নেতা আগে ঘুষ খায়, না ভোটার আগে ঘুষ খায়? ভোটার আগে ঘুষ খায়।

তোমার কাছে তার পাওনা হল তোমার কাছে যে বেশী যোগ্য তাকে না খেয়ে ভোট দেবে, এই ভোট তোমার কাছে তার পাওনা। খেয়ে ভোট দিব নাকি না-খেয়ে ভোট দিব? না-খেয়ে ভোট দিব?

এখন যদি জনগণ না খেয়ে ভোট না দেয় তাহলে কি পাওনাদারকে পাওনা দিল? শান্তি হবে না। পাওনা আদায় করতে টাকা নিয়েছ? অশান্তি যে ঘটবেই ঘটবে? কিভাবে ঘটবে? এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি শুনুন। ধরুন, এম. পি. হওয়ার জন্য এক ব্যক্তি নির্বাচনে দাঁড়াল।

কথার কথা ধরুন- নির্বাচনী এলাকায় এক লাখ ভোটার। এই ভোটারদেরকে ১০০ টাকার বিরানী খাইয়ে যদি ভোট নিতে হয়, তাহলে কতটাকা খরচ হল তার? এক কোটি টাকা। ভোটারদেরকে এক কোটি টাকার ঘুষ খাইয়ে সে এম পি হল।

এম পি হওয়ার পর রাস্তা নির্মাণ করার জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দ পেলো। কত টাকা? এক কোটি। ঘুষ খাইয়ে ছিল কত? এক কোটি। এখন রাস্তা নির্মাণের জন্য সরকার কত দিয়েছে? এক কোটি। সে যা খাইয়েছিল তা রেখে রাস্তা বানাবে, না না খেয়ে রাস্তা বানাবে? রেখে।

রেখে যদি রাস্তা বানায় তাহলে কেমন শান্তির রাস্তা হবে? এই শান্তি (?) টা কামাই করলো কে? ঘুষখোর ভোটারেরা। ঘুষখোর ভোটারের কারণে এ দেশের কোন নেতা উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারে না। ভোটারদেরকে ঘুষ দিতে তার বাবার সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়

ভোটারদেরকে ঘুষ দিতে ব্যাংক থেকে লাখ লাখ টাকা ঋণ নিতে হয়। তারপর যখন সে নেতা হল- তখন সে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করবে, না এলাকার রাস্তা বানাবে? শান্তি হল, না অশান্তি? কেন? পারস্পরিক সহযোগিতার সীমারেখা লঙ্ঘন। কাজেই সরকার যতদিন নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদিষ্ট থাকবে ততদিন পর্যন্ত সরকারের হুকুম পালন করতে হবে জনগণকে।

এটা হল জনগণের কাছে সরকারের পাওনা। হুকুমটা যদি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে না হয়, নবীর বিরুদ্ধে না হয়, উন্নয়নের বিরুদ্ধে না হয়, দেশের ক্ষতিকর হুকুম যদি না হয়, তাহলেই সরকারের হুকুম পালন করতে হবে। এটা জনগণের কাছে সরকারের পাওনা।

আর সরকারের মেয়াদ যখন শেষ হয়ে যাবে নতুন সরকার নির্বাচনের জন্য আমার কাছে তার একটা ভোট আছে পাওনা। যে বেশী খাওয়ায় তাকে দেব, না যে বেশী যোগ্য তাকে না খেয়ে দেব। যে বেশী যোগ্য তাকে না খেয়ে দিব।

এটা হল মেয়াদ উত্তীর্ণ সরকার বা নেতার পাওনা আমার কাছে। যে বেশী যোগ্য তার কাছ থেকে একটা পান না খেয়ে তাকে ভোট দিয়ে দেবে, এটা আমার কাছে তার পাওনা। আমার এলাকায় এক ইউপি চেয়ারম্যান। সে দ্বীনদার পরহেজগার মানুষ।

আলেম উলামাদের খুবই শ্রদ্ধা করে। বাড়ীতে একটা হাফিজী মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেছেন। নাম বললে চিনবেন কিন্তু বলবনা। তিনি আমাকে দাওয়াত দিলেন মাদরাসার জলসায়। গিয়ে দেখি এলাকার মানুষ তাকে গালি-গালাজ করে, সমালোচনা করে।

তারা বলে এই বাটপার বলেছিলো পাশ করলে আমাদের বাজারে যাওয়ার রাস্তাটা বানিয়ে দেবে। বাজারে আসা- যাওয়ার সময় পানি ভেঙ্গে যেতে হয়। বলেছিল তাকে ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান বানালে রাস্তাটা বানিয়ে দেবে। আমরা ভোট দিলাম, চেয়াম্যান হল। রাস্তাটা বানিয়ে দিল না। জলসার পরে চেয়ারম্যান সাহেবের ঘরে খানা খেতে বসলাম। বললাম, চেয়ারম্যান সাব! আপনি আমাকে মুহাব্বত করেন বলেই আমাকে দাওয়াত দিলেন আর আমি আপনাকে মুহাব্বত করি বলেই এখানে আসলাম।

কিন্তু আপনাকে যে জনগণ গালি-গালাজ করে আমার তো দুঃখ লাগে। যে রাস্তা বানিয়ে দিতে পারবেন না আগেই জানতেন, তাহলে রাস্তা

বানিয়ে দেবেন বলেছিলেন কেন? তখন তিনি বললেন, হুজুর! এটা রাজনৈতিক ব্যাপার! আপনারা আলেমরা বুঝবেন না।

আপনারা এগুলো আলোচনা করবেন না। আপনারা আলেমরা বুঝবেন না। আমি বললাম, আলেমদের মাথায় আল্লাহ্ মগজ দিয়েছেন একটা আর তোমাদের মাথায় মগজ দু'টা কি না? বলে না, মগজ তো একটাই।

আমি বললাম, আলেম হলেই রাজনীতি বুঝবেন না, রাজনীতি তোমাদের বাপদাদার মৌরসি সত্ব না কি? তখন বলে, আপনি তো বড় শক্ত মানুষ বুঝা যায়।

আমি বললাম, তোমাকে মানুষ গালি-গালাজ করে আমার দুঃখ লাগে। বলতে হবে, কেন বলেছিলেন এই রাস্তা বানিয়ে দেবেন। বলে, হুযুর যখন ছাড়বেন না, তখন বলি, এটার নাম হল পলিটিক্যাল কথা।

আমি বলি, এটা ইংরেজী কথা। আমি ইংরেজী শিখিনি। স্কুলে একাধারে এক বছর পড়ে পরীক্ষা দেইনি। আমি জীবনে যা পড়েছি মাদরাসায়ই পড়েছি। আর আমি যেই জামানায় কওমী মাদরাসায় পড়েছি সেই জানামায় এ বি সি ডি এর বইও ছিলো না।

কাজেই তুমি বলেছ পলিটিক্যাল ওয়াদা, ওয়াদা তো বুঝি আরবি শব্দ কিন্তু পলিটিক্যাল বুঝি না; বুঝিয়ে বলো। বলে, আপনি তো ঠেকিয়েছেন। বললাম, ঠেকাবো না কেন? তোমাকে মানুষ গালি-গালাজ করে আমার দুঃখ লাগে। বলে, পলিটিক্যাল ওয়াদার ব্যাখ্যা হল, আমি জানি এই রাস্তা করে দিতে পারব না কিন্তু যদি আগেই বলে ফেলি, তাহলে এরা ভোটও দিত না। পাশও করতাম না।

গদী দখলের জন্য জেনে-শুনে মিথ্যা বলার নাম হল পলিটিক্যাল ওয়াদা। বুঝে নিন, আমরা কোন সমাজে বাস করি। এখন এই চেয়ারম্যান আর জনগণ মিলে খুব শান্তির (?) সমাজ। দোষ এক চেয়ারম্যানের না জনগণেরও? যে সমস্ত নেতারা ঘুষ খায় আপনারা বিশ্বাস করুন এরা ঘুষখোর ভোটারের ভোটে পাশ করে।

যে দেশের জনগণ ঘুষখোর হয়, সেই দেশের জনগণ ঘুষখোর না হয়ে পারে না। যেই দেশে ভোটার ঘুষখোর হয় না এই দেশের নেতা কোন দিন ঘুষখোর হতে পারে না। (শ্রোতাদের সমস্বরে 'ঠিক')

এখানে ঠিক বলেছেন আর নির্বাচনের সময় যে বিরানী খাওয়াবে তাকে ভোট দিবেন। যারা বিরিয়ানী খেয়ে ভোট দেয় তারা কি খায়?

(শ্রোতাদের সমস্বরে- ঘুষ)

যারা মিষ্টি খেয়ে ভোট দেয় তারা কি খায়? (শ্রোতাদের সমস্বরে- ঘুষ)

যারা টাকা খেয়ে ভোট দেয় তারা কি খায়? (শ্রোতাদের সমস্বরে- ঘুষ)

তাহলে নেতারা আগে ঘুষখোর হয়, না ভোটারেরা আগে ঘুষখোর হয়? এখানে বসে ঠিক ঠিক বললে হবে না। ওয়াদা করে যেতে হবে, জীবনে কোন দিন ঘুষ খেয়ে ভোট দিব না। তাহলে এই দেশে কোন দিন ঘুষখোর নেতা হতে পারবে না।

এভাবে আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে স্ববিস্তারে বুঝিয়ে দিয়েছেন। হাদীস শরীফে আল্লাহ্র রাসূল বলেন,

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেককেই আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে হাশরের মাঠে আল্লাহ্র দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হিসাব দিতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যারা সরকার তারা দায়িত্বশীল সকল জনগণের। যে সরকার দেশবাসীর পাওনা আদায় করে না সরকারকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

যারা জনগণ তাদের কাছে সরকারের আমানত আছে। তারা যদি খেয়ানত করে তাহলে পরকালে হাশরের ময়দানে আল্লাহ্র আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহ্ বুঝাতে বুঝাতে শেষ পর্যন্ত বলেছেন– যার অধীনে দেশ নেই, দেশের নেতা নয়, যার অধীনে সমাজ নেই, সমাজের নেতা নয়, যার অধীনে পরিবার নেই, পরিবারের নেতা নয়, যে বিয়ে করেনি, সন্তানাদি নেই, স্ত্রীও নেই, পরিবাবের নেতা নয়, তার কাছে সাড়ে তিন হাত বডি আছে।

এই সাড়ে তিন হাত বডি তার কাছে আমানত। বডির পাওনা আছে তার কাছে, যদি বডির পাওনা আদায় করে তার দ্বারা শান্তির সমাজ গড়া যাবে।

আর যদি বড়ির পাওনা আদায় করে না তার দ্বারা শান্তির সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। আমার অধীনে যদি কোন মানুষই না থাকে, কোন মানুষেরই নেতা নই আমি। কোন মানুষেরই কর্তা নই আমি।

বিয়ে করলে স্ত্রীর কর্তা হতাম। সন্তানাদি হলে তাদের কর্তা হতাম। আমি বিয়েই করিনি, কাজেই স্ত্রীরও আমি কর্তা নই। সন্তানাদিরও কর্তা নই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার সাড়ে তিন হাত দেহের কর্তা তুমি।

সাড়ে তিন হাত বড়ি ব্যবহারে জন্য স্কেল আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সাড়ে তিন হাত দেহ যেভাবে ব্যবহারের সীমারেখা নবী বর্ণনা করে দিয়েছেন, সেভাবে পরিচালনা করবে। তবেই তোমার দ্বারা শান্তির সমাজ গড়া সম্ভব হবে।

তোমার দেহের উপর যদি অত্যাচার করো, তাহলে সমাজের কর্তা হলে অবশ্যই তাদের অত্যাচার করবে।

আল্লাহ্ পাক এ সমস্ত বিষয় এক আয়াতে বলেন নি, বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা দিয়েছেন। এর মাঝে আজকে আমরা তিলাওয়াত করেছি সূরায়ে নিসার ৩৬ নং আয়াত। আল্লাহ্ বলেন,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"তোমরা আল্লাহ্‌র পাওনা আদায় করো, মা-বাবার পাওনা আদায় করো।"

وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ

"প্রতিবেশীর হক আদায় করো। আমার বাড়ীর পাশে যার বাড়ী, আমার কোন অন্যায় ব্যবহারে তার কষ্ট যেন না হয়। আমার ঘরে খানা থাকলে তার ঘরে কেউ যেন রাতে না খেয়ে ঘুমায় না।

আমার বড় ড্রামে চাল আছে এক মণ। দুই কেজি চাল দিয়ে ভাত পাক করলাম, খেলাম। আরো আটত্রিশ কেজি চাউল ড্রামে রইল। কিন্তু আমার পাশের বাড়ীর লোকটা সারা দিন কষ্ট করে এক কেজি চাল কেনার পয়সা জোগাতে পারে নি। যে কারণে তার স্ত্রী উপোষ, তার বাচ্চা উপোষ।

আল্লাহ্‌র রাসূল বলেন, তোমার ড্রাম থেকে যে পরিমাণ চাউল দিলে দিলে এই রাত তার বিবি বাচ্চা খেয়ে ঘুমাতে পারে, সেই পরিমাণ চাউল এখন আর তোমার নেই, তোমার প্রতিবেশী গরীবের পাওনা হয়ে গেছে। এখন যে ব্যক্তি কাজ তালাশ করে পায় নি, এক কেজি চাউল কেনার পয়সা

জোগাতে পারেনি। আমার ড্রামের মাঝে দেড় মণ চাউল ছিল। এখন তাকে ডেকে যদি বলি, আজ কি রোজী করেছ? বলে, না আজ কোন রুজী পাই নি। তাহলে আজকে তোর বউ বাচ্চাকে কি খাওয়াবি? বলে কিছু পাই নি।

এখান থেকে যদি এক কেজি দেড়-কেজি চাউল দিয়ে তাকে বলি নাও, এখন রান্না করে তোর বিবি বাচ্চাকে খাওয়াও। তখন তার মনের মাঝে (?) অশান্তি আরম্ভ হবে। শান্তি। সে ব্যক্তি আমাকে ঘৃণা করবে নাকি জীবনভর অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করবে? শ্রদ্ধা করবে।

তাহলে পাওনাদারের পাওনা দিয়ে শান্তি হয়, নাকি না দিলে অশান্তি হয়? দিলে শান্তি হয়। এই জন্য আল্লাহ্ বলেন, وَبِذِى الْقُرْبٰى তোমার প্রতিবেশীর পাওনা আদায় করো। وَالْيَتٰمٰى এতিমদের পাওনা আদায় করো। এতিমের অভিভাবক যারা হবেন তাদের কাছে এতিমের পাওনা আছে। এতিমের এক পয়সা খেতে পারবে না।

এতিমকে কোন রকমের শ্রম খাটাতে পারবে না। এতিমের মাল হেফাজত করবে। শুধু তার তরে খরচ করবে। আর বাকী যা বাচে আমানত রাখবে। যে দিন সাবালক হবে সে দিন তার হাতে সমজিয়ে দেবে। এটা হল অভিভাবকের কাছে এতিমের পাওনা। যদি খেয়ে ফেলে আর এতিমের মনে মনে জানে আমার বাবা মরার পর তুমি আমার অভিভাবক হয়েছিলে, সম্পত্তি তুমি লুণ্ঠন করে খেয়েছিলে।

তার অন্তরে শ্রদ্ধা জাগবে না, ঘৃণা জাগবে। এই ঘৃণার অন্তর নিয়ে শান্তিতে বসবাস করবে? অশান্তি সৃষ্টি হবে। সুতরাং পারস্পরিক সহযোগিতায় এই সমাজে যার যত অধিকার আছে, তার ততটুকু অধিকার আদায় করলেই শুধু শান্তির সমাজ গড়া সম্ভব।

তার অধিকার আদায় করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি করলে কোন দিন শান্তির সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। وَالْمَسٰكِيْنِ ফকির মিসকিনদের পাওনা আছে তোমার কাছে তা আদায় করো। وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى বিশেষ করে তোমার প্রতিবেশীদের মাঝে যদি আত্মীয়-স্বজন থাকে, তাদের দ্বিগুণ পাওনা আছে তোমার কাছে।

একটা প্রতিবেশী হিসাবে আরেকটা আত্মীয় হিসাবে। পাওনা আছে তোমার কাছে। আদায় করো শান্তির সমাজ গঠন হবে। وَالْجَارِ الْجُنُبِ আর তোমার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী যারা, নিকটবর্তী প্রতিবেশী যারা তাদের

পাওনা আগে দাও। দূরবর্তী প্রতিবেশী যারা তাদের পাওনা পরে দাও। وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ যে ব্যক্তি তোমার আত্মীয়ও নয়, প্রতিবেশীও নয়, কিছু সময়ের জন্য তোমার কাছে বসেছে। তোমরা যে পরস্পরে বসেছ, তোমাদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার সীমারেখা আছে।

আপনারা হয়তো ভাববেন, এটা টুকিটাকি কথা। টুকিটাকি কথা নয়। ছোটখাট কথা নয়। জরুরী কথা পালন করতে হয়। আর না হলে জাহান্নামে যেতে হয়। বিষয়টা মুফাসসিরীনে কেরাম একটা উদারহণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

আমি সেই উদাহরণটাই আপনাদের সামনে পেশ করি। আমরা দু'জন উঠলাম গাড়িতে। গাড়ীতে প্রতি দু'জন করে একটা সিট তৈরি করেছে। সিটটা তিন হাত লম্বা। তিন হাত লম্বা সিট দুই জনের জায়গা। জনে দেড় হাত সিট পড়ে।

তাফসীরের কিতাবে লিখেন, এই সিটে তোমার বণ্টনে আছে দেড় হাত। তুমি যদি ঠেঙ ছড়িয়ে পৌনে দু'হাত দখল করো, তাহলে তোমার পার্শ্ববতী লোকের পাওনা আদায় কর নি। গোনাহগার হবে আল্লাহ্র কাছে। যদি সে মাফ না করে তাহলে জাহান্নামে যাবে।

কি বুঝলেন আপনারা? গাড়ীর মালিক দু'জনের জন্য তিন হাত সিট দিলেন আর তুমি ঠেঙ ছড়িয়ে পৌনে দু'হাত জায়গা দখল করলে। আমার প্রশ্ন হল, তখন কি তার প্রতি আমার মনে মনে শ্রদ্ধা জাগবে নাকি ঘৃণা জাগবে? ঘৃণা জাগবে। ঘৃণা জাগলে আস্তে আস্তে শান্তি আরম্ভ হয় (?)

আল্লাহ্পাক টুকিটাকি কথাও উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, শান্তির সমাজ গড়তে হলে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে, সাইটম্যানের পাওনা তোমার আদায় করতে হবে। সাইটম্যানের অধিকার আদায় করতে হবে। যদি সাইটম্যানের হক আদায় না কর, তাহলে তার অন্তরে ঘৃণার সৃষ্টি হবে। তোমার দ্বারা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

তোমার দ্বারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হবে। সর্বশেষে আল্লাহ্ বলেন–

وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

মুসাফির পথিকেরও তোমার কাছে পাওনা আছে। আর তোমাদের অধীনে যারা কাজ করে তাদেরও আছে তোমাদের কাছে।

সর্বশেষে আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

অহংকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

এতক্ষণ সামাজিক পাওনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবার অহংকার এর কথা আসল কিভাবে? প্রশ্নের জবাবে মুফসিরীনে কিরাম লিখেন, এই সমস্ত পাওনা আদায় করে না করা? অহংকারী যারা। তিন হাত লম্বা সিট ছিল; আমার ভাগে ছিল দেড় হাত। বসলাম আমি পা ছড়িয়ে জায়গা নিলাম পৌনে দু'হাত।

এটা বিনয় অন্তরে থাকলে না অহংকার থাকলে? অহংকার অন্তরে থাকলে। তাহলে মানুষের পাওনা দেয় না অন্তরে কি থাকলে? অহংকার অন্তরে থাকলে। ছাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে রাসূলকে জিজ্ঞেস করা হল, হে রাসূল! দামি জুতা পড়লাম, সুন্দর পোশাক পড়লাম, এটা কি অহংকার? রাসূল বললেন, না, না, এটা অহংকার নয়।

তাহলে অহংকার কি? অহংকার হল আসল জিনিস বুঝতে পেরেছে কিন্তু মানতে রাজী নয়। এটার নাম হল অহংকার। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে, তাকেও তার নামায রোযা জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না, জাহান্নামে যেতেই হবে।

বুঝে থাকলে বলুন, নামায রোযা সব করলাম আর সমাজের মানুষের অধিকার না দিয়ে অহংকার করলাম। তাহলে নামায-রোযা দ্বারা জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে কি? মানুষের হক আদায় করতে হবে, মানুষের পাওনা দিতে হবে। এক কথায়, সমাজের সকল মানুষের পাওনা আদায় করা হল শান্তির সমাজ গড়ার একমাত্র ব্যবস্থা।

পাওনাদারদের পাওনা না-দেওয়া হল সমাজের শান্তি ভঙ্গের একমাত্র কারণ। আর পাওনা দেব তখন, যদি অন্তরে অহংকার না থাকে। তা হলেই পাওনা দিব অন্যথায় পাওনা দিব না। অহংকার অন্তর থেকে বের করা যাবে তখনই, যখন আল্লাহ্র শাস্তির ভয় অন্তরে থাকে।

এ ব্যাপারে একটা ঘটনা বলে আমার কথা শেষ করে দিচ্ছি। হযরত উমর ফারুক রাযি. আইন করে দিলেন, কোন দুধ ব্যবসায়ী দুধে পানি মিশাতে পারবে না। খরীদদার তোমার দুধের পানির পাওনাদার নাকি

বিশুদ্ধ দুধের পাওনাদার? বিশুদ্ধ দুধের পাওনাদার। তাহলে তুমি পানি মিশিয়েছ এটা সীমারেখা লঙ্ঘন করেছ। উমর আইন করলেন, কোন দুধ ব্যবসায়ী দুধে পানি মেশাতে পারবে না।

আবার রাতে ঘুরাফেরা করে পর্যবেক্ষণ করছেন আইন জনগণ পালন করছে কি না, সরকারের কাছে যে পাওনা তা জনগণ পেল কি না? গভীর রাতে পর্যবেক্ষণের সময় উমর দেখলেন, এক মহিলা তার মেয়েকে বলছে– দুধে পানি মিশিয়ে দাও। পানি মিশিয়ে বিক্রি করতে হবে। মেয়ে জবাব দিল উমর রাযি. তো নিষেধ করেছেন।

মহিলা বলে, উমর কি এখন চেয়ে থাকবেন আমরা পানি মিশালে? মেয়ে জবাব দিল উমর দেখবে না তো কি হয়েছে। উমরের আল্লাহ্ তো দেখছেন। দুধে পানি মিশিয়ে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা থেকে এই মেয়েকে কে ফিরাল? একমাত্র আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীনের ভয়। এজন্য আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন কুরআনে বার বার বলেছেন اِتَّقُوا اللّٰهَ। আল্লাহ্কে ভয় করো। اِتَّقُوا اللّٰهَ। আল্লাহ্কে ভয় করো। اِتَّقُوا اللّٰهَ। আল্লাহ্কে ভয় করো।

আল্লাহ্র ভয় যার অন্তরে থাকবে, তার অন্তরে অহংকারের স্থান হবে না। যার অন্তর থেকে অহংকার বের করতে পারবে, তার দ্বারা সমাজের শান্তি লঙ্ঘন হবে না।

তার সকল প্রকার আচরণ শান্তির আচরণ হবে। তা হলে শান্তির সমাজ গড়তে হলে অন্তর থেকে অহংকার বের করতে হবে। অন্তর থেকে অহংকার বের করতে হলে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় অন্তরে ঢুকাতে হবে। আল্লাহ্ আপনাদেরকে আমাদেরকে সবাইকে তাওফীক দিন। আমীন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

মাওয়ায়েজে হাসানাহ

খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,

তরজমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত

মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান–১

শিক্ষা মৌলবাদ ও পর্দা

স্থান

জামেয়া নূরীয়া, কামরাঙ্গীচর, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلاً لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِىْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلاً وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَدَاَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَاَ فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

হযরত উলামায়ে কেরাম, সম্মানিত সুধী সমাজ!

বাংলাদেশের পরলোকগত বিশিষ্ট বুযুর্গানে দ্বীনের মাঝে উল্লেখযোগ্য বুযুর্গ হযরত হাফিজ্জী হুজুর রহ.-এর স্মৃতি বিজড়িত ছদকায়ে জারিয়া কামরাঙ্গীচর জামেয়া নূরীয়ার বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আজকে আপনারা আমরা এই মুবারক মাহফিলে সমবেত হয়েছি। যেহেতু একটি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়োজিত সমাবেশে সমবেত হয়েছি, তাই ইসলামী শিক্ষা বর্তমানে কতটুকু অবহেলিত ও কতটুকু লাঞ্ছিত এবং এর মূলে কারণ ও প্রতিকার কি– এ তিনটি প্রশ্নের জবাব আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ

আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন, বর্তমান সমাজে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে বিভিন্নভাবে গালি-গালাজ করা হয়। কোন সময় ফাণ্ডা মেন্টালিষ্ট বলা হয়, কোন সময় মৌলবাদী বলা হয়, কোন সময় সাম্প্রদায়িক বলা হয়, কোন সময় জঙ্গি বলা হয়, কোন সময় সন্ত্রাসী বলা হয়, কোন সময় ধর্মান্ধ বলা হয়, কোন সময় মুর্খান্ধ বলা হয়। এই সবগুলো গালি তৈরী করা হয়েছে, শুধু ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য, যারা ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করে। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে এই গালিগুলো ব্যবহার করা হয়।

এজন্য বর্তমান সমাজে ইসলামী শিক্ষা শুধু অবহেলিত নয় বরং রীতিমত লাঞ্ছিত। ইসলামী শিক্ষার এই লাঞ্ছনার পেছনে যে বিষয়টা ক্রিয়াশীল সেটা হচ্ছে, জগতের মানুষের দ্বারা যত প্রকার অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, সকল প্রকার অপরাধী পাপীষ্ঠদের অপরাধের পথে একমাত্র বাধা হচ্ছে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতরা। চোর যদি চুরি করে আর পুলিশের কানে ইসমে আযম দেয় তখন চোর ধরে না। চোরেও ইসমে আযম জানে। চোর বলেন, ডাকাত বলেন, সন্ত্রাস বলেন, সন্ত্রাসী বলেন, যা কিছু বলেন, যত রকমের অপরাধী আছে সমাজে, সব রকমের অপরাধীরা একটা ইসমে আযম জানে, এটা বলে পুলিশের কানে ফুঁক দিয়ে পুলিশ আর কোন অপরাধীকে ধরে না।

অতএব পুলিশ অপরাধীর পথে বাধা নয়, আইন আদালত অপরাধের পথে বাধা নয়, শাসন-প্রশাসন বিচার ব্যবস্থা অপরাধের পথে বাধা নয়, সকল প্রকার অপরাধের পথে একমাত্র বাধা ইসলামী শিক্ষা। এই কারণে সকল প্রকার অপরাধীরা ইসলামী শিক্ষার দুশমন। আপনাদের একথাটা স্মরণ রাখা দরকার যে, ইসলামী শিক্ষার দুশমন কারা, কোন না কোন অপরাধে অপরাধী যারা।

কারণ, ইসলাম সকল অপরাধের পথে বাধা। ইসলাম কোন অপরাধীকে ছাড় দেয় না। চুরি অপরাধ এর পথে বাধা ইসলাম, ডাকাতি অপরাধ এর পথে বাধা ইসলাম, যিনা ব্যাভিচার অপরাধ এর পথে বাধা ইসলাম, সন্ত্রাস অপরাধ এর পথে বাধা ইসলাম, খুন-খারাবী অপরাধ এর পথে বাধা ইসলাম, এক কথায় যত প্রকার অপরাধ আছে, সকল প্রকার অপরাধের পথে একমাত্র ইসলামী শিক্ষা ছাড়া আর কোন বাধা নেই।

এই কারণে ইসলামী শিক্ষার দুশমন কারা? কোন-না-কোন অপরাধে অপরাধী যারা। বর্তমান সময়ে যত অপরাধী আছে, এর মাঝে সবচেয়ে বড় অপরাধী ইয়াহুদী আর খ্রিষ্টান। অতীতকাল থেকে তারা সব রকমের অপরাধের জন্ম দিয়ে আসছে। বর্তমান দুনিয়ার ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের অপরাধ কল্পনার সীমাও ছাড়িয়ে গেছে। বাস্তবতার সীমা তো ছাড়িয়ে গেছেই, কল্পনার সীমাও ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমান জামানায় ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের অপরাধ সম্পর্কে যাদের মোটামুটি ধারণাও নেই, তারা কল্পনাও করতে পারবে না যে, এরা কি পরিমাণ জঘন্য অপরাধ করতে জানে।

ইদানীং খ্রিষ্টান মিশনারী থেকে প্রকাশিত একটি বই আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে হস্তগত হয়। বইয়ের নাম طَرِيْقُ اِلَى الْجَنَّةِ عَلٰى ضَوْءِ الْقُرْاٰنِ বাংলায় কুরআনের আলোকে জান্নাতে যাওয়ার পথ। এই বইয়ে যা প্রমাণ করতে চেয়েছে, তা হচ্ছে– আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন মানুষ জাতিকে অপরাধ থেকে বারণ করার জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন দুনিয়াতে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ সকল নবীদের মাঝে সর্বপ্রথম ছিলেন হযরত আদম আ. তিনি সর্বপ্রথম পাপীষ্ঠ। তার পরে যত নবী-রাসূল মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিল সমস্ত নবী পাপীষ্ঠ।

কারণ মানুষ জাতিই আজন্ম পাপীষ্ঠ। সুতরাং এ জাতিতে উম্মত হয়ে জন্মগ্রহণ করলে যেমন পাপীষ্ঠ, নবী হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও তেমন পাপীষ্ঠ। তাই আল্লাহ আর মানুষ জাতির ঔরসে নয় স্বয়ং আল্লাহর ঔরসে একজন নবী জন্ম দিলেন। তিনি হলেন হযরত ঈসা আ.। আল্লাহ পাক দেখলেন, মানুষ জাতিতে নবী জন্ম দিলে নবী পাপীষ্ঠ হয়ে যায়, এজন্য আল্লাহ নিজে পিতা হয়ে যীশুকে পুত্র হিসেবে জন্ম দিয়ে নবী বানালেন মানুষকে পাপ থেকে বারণ করার জন্য।

যীশু আল্লাহর ঘরে মরিয়মের উদর থেকে জন্ম হয়ে যখন দেখলেন, মানুষকে পাপ থেকে বারণ করার কোন উপায় নেই, তখন তিনি তার পিতা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন যে, মানুষকে যেহেতু পাপ থেকে বারণ করার কোন উপায়ই নেই, অন্তত আমাকে যে সমস্ত মানুষ তোমার পুত্র বিশ্বাস করবে তাদের পাপের একটা কাফ্ফারা করা দরকার।

তাই আমি সেচ্ছায় শূলি বিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণাদায়ক মরণকে বরণ করে নিলাম। যেন যারা ভবিষ্যতে আসবে আর আমাকে তোমার পুত্র বিশ্বাস

করবে, ওদের সকল পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায়। আল্লাহ যীশুর সেই প্রার্থনা মনজুর করলেন। সেই অনুপাতে যীশুকে শূলিবিদ্ধ হয়ে মরণ বরণের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে আর যীশুকে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করবে এরা জীবনে যত অপরাধই করুক না কেন, ওদের সকল অপরাধের অগ্রিম কাফ্ফারা হয়ে গেছে যীশুর শূলিবিদ্ধ হওয়ার কারণে। আমেরিকার ডাব্লিউ বুশের একই বিশ্বাস। এবার বলুন, যাদের ধর্ম বিশ্বাস আমার জীবনে যত পাপই করি না কেন, সবগুলো পাপের আগাম কাফ্ফারা হয়ে গেছে– তারা জগতে কোন শান্তির কাজ করবে, না শুধু অপরাধ আর অপরাধ?

বর্তমান সময় সম্পর্কে যারা ওয়াকেফহাল তারা একটু দয়া করে বলুনতো! বুশ বাহিনীর ইরাক আক্রমণ করার কোন বৈধতা আছে? নেই। তাহলে অপরাধ কি না? আমার কথা বুঝে থাকলে বলুনতো! বুশ জেনে শুনে এত বড় অপরাধ কেন করল? আগাম কাফ্ফারা হয়ে গেছে। সাদ্দামকে বন্দি করল, ইরাকে পুতুল সরকার বসাল, কোটি কোটি টাকার তেল-সম্পদ অহরহ চুরি করা শুরু করল, ইরাকের নারীদের মান-ইজ্জত নিয়ে এই লালকুত্তার বাহিনী দিন রাত ২৪ ঘণ্টা ছিনিমিনি খেলতে লাগল। এত অকল্পনীয় অপরাধ তারা কোন সাহসে করে? অগ্রিম কাফ্ফারা হয়ে গেছে।

আনুষঙ্গিকভাবে আরেকটা কথা স্মরণ রাখা দরকার। এতক্ষণ কি বুঝলেন? মানুষের ঘরে যত নবী জন্মগ্রহণ করে তারা সকল পাপীষ্ঠ। এটা খ্রিষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস। মুসলমানদের মাঝে যদি এমন কিছু লোক পাওয়া যায়, যারা বলে আদমও গুনাহ করেছেন, নূহও গুনাহ করেছেন, ইবরাহীমও গুনাহ করেছেন, ইউসুফও গুনাহ করেছেন, লুতও গুনাহ করেছেন, সুলাইমানও গুনাহ করেছেন, যদি এমন মানুষ মুসলমানের মাঝে পাওয়া যায়? এরা মুসলমানী আকীদায় বিশ্বাসী, নাকি খ্রিষ্টানী আকীদায় বিশ্বাসী? খ্রিষ্টানী আকীদায় বিশ্বাসী।

এরা কার দালাল? খ্রিষ্টানদের দালাল। এই কথাটা বুঝতে কেন মুসলমানের কষ্ট হয়, নবীগণ পাপীষ্ঠ হওয়া মুসলমানী আকীদা নয়; নবীগণকে পাপী বলা খ্রিষ্টানী আকীদা। এখন যদি কোন নামধারী মুসলমানও নবীগণকে পাপী প্রমাণ করতে চায় এই মুসলমানেরা কি সত্যি

ইসলামী আন্দোলন করে নাকি খ্রিষ্টানের দালালী করে? দালালী করে। দালালদের চিহ্নিত করা দরকার।

আরেকদল দালাল আছে তারাও খ্রিষ্টানের দালাল, এরাও নামধারী মুসলমান। একদল খ্রিষ্টানের দালালী করে ইসলামী আন্দোলনের নামে আরেকদল দালালী করে আশেকে রাসূল সেজে। এক আশিকে রাসূলের নাম আব্দুস সামী রামপুরী। বই লিখেছে 'আনওয়ারে সা'তেয়াহ'। এই বইয়ে লেখে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার সাতশ বছর পর যখন ইসলাম সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত হল, খ্রিষ্টানদের দেশের সীমান্তবর্তীরাও মুসলমান হল, খ্রিষ্টানদের দেশের পার্শ্ববর্তীরাও মুসলমান হল।

এখন খ্রিষ্টানদের দেশের পার্শ্ববর্তী মুসলমানরা দেখল খ্রিষ্টানেরা তাদের নবীর জন্ম দিবসে ঈদ উদযাপন করে। অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ থেকে পরবর্তী সাতশ বছর পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের নবীর জন্ম দিবসে ঈদ উদযাপন করে নি।

এখানে তাদের মনে হল ইসলামে একটা কাজের অভাব, যে কাজটা খ্রিষ্টানদের থেকে আমদানী করা দরকার। সাতশ বছর পর্যন্ত ইসলাম ধর্মে নবীর জন্ম দিবসে ঈদ উদযাপনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সাতশ বছর পর একদল মুসলমান যখন দেখল খ্রিষ্টানরা তাদের নবীর জন্ম দিবসে ঈদ উদযাপন করে ঐ সময় একদল মুসলমান নবীর জন্ম দিবসে ঈদ উদযাপন করা আমদানী করল।

আমি বলেছিলাম খ্রিষ্টান মিশনারী থেকে প্রকাশিত বইয়ে প্রমাণ করতে চেয়ে শূলিবিদ্ধ হয়ে মরণ বরণের মাধ্যমে তাকে যারা খোদার পুত্র বিশ্বাস করবে তাদের পাপের অগ্রিম কাফফারা করে গেছেন। অথচ তিনি শূলিবিদ্ধ হননি। তারা শূলিতেও চড়াতে পারেনি বরং ষড়যন্ত্র যারা করেছিল, তাদেরকে আল্লাহ কুদরতী ব্যবস্থায় ধাঁধায় ফেলা হয়েছে, ধাঁধাটা কি শুনেন।

যারা যীশুকে হত্যার জন্য যীশুর ঘরে প্রবেশ করেছিল, সর্বপ্রথম যে প্রবেশ করেছে তার চেহারাকে আল্লাহর যীশুর চেহারার মতো করে দিলেন। হিব্রু ভাষায় শব্দটা হল যীশু। আরবী ভাষায় ঈসা। অতএব আমি যখন তাদের ভাষায় বলি, তখন আপনাদের চিনতে যেন অসুবিধে না হয়। যীশুর

ঘরে যখন ষড়যন্ত্রকারীরা প্রবেশ করল যীশুকে হত্যার জন্য, তখন সর্বপ্রথম প্রবেশকারীর চেহারাকে আল্লাহ যীশুর চেহারার মত করে দিলেন। আর যীশুকে স্বশরীরে জীবন্ত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিলেন। এ সম্পর্কে পরিষ্কার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ কুরআনে বলেন,

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ

স্মরণ করো সে দিনের ইতিহাস, যেদিন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন হযরত ঈসা আ.-কে বলেছিলেন, ওহে ঈসা! আমি তোমার মৃত্যু দিব ভবিষ্যতে বর্তমানে জিন্দা অবস্থায় স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নিব।

তারপর যীশুকে আল্লাহ আসমানে উঠিয়ে নিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের মাঝে যীশুকে হত্যা করার জন্য যে আগে প্রবেশ করল, তার চেহারাকে যীশুর চেহারার মত বানিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে যারা প্রবেশ করল তারা যীশু পেল না, যীশুর আকৃতিতে তাদের দলের নেতা পেল? নেতাকে চিনতে না পেরে যীশু মনে করে হত্যা করল।

হত্যা করার পর তাদের মাঝে ঝগড়া লাগল, যীশু হত্যা হলে আমাদের নেতা গেল কোথায়, আর নেতা হত্যা হলে যীশু গেল কোথায়? এই ধাঁধা, এই হল ধাঁধা। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

এরা যীশুকে হত্যাও করতে পারে নি, এরা যীশুকে শূলিতেও চড়াতে পারেনি বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে এদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছে। ধাঁধা বুঝতে পেরেছেন? বুঝে থাকলে বলুনতো! যীশু শূলিবিদ্ধ হয়েছেন তাদের সকল পাপের আগাম কাফ্ফারা দেওয়ার জন্য, কথাটা বাস্তব না গাঁজাখোরী আর কাল্পনিক? এটা গাঁজাখোরী কথা, কাল্পনিক।

এই ধরনের কিছু গাঁজাখোরী কথাকে খ্রিষ্টান জগৎ তাদের ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস হিসেবে আঁকড়িয়ে আছে। বাস্তব কথা, না গাঁজাখোরী কথা? গাঁজাখোরী কথা।

আল্লাহ বলেন, ধাঁধায় ফেলেছি আর ওরা বলে শূলিবিদ্ধ হয়েছেন আমাদের যত অপরাধ আছে, আগাম কাফ্ফারা স্বরূপ। বাস্তব কথা, না গাজাখোরী কথা? গাঁজাখোরী কথা। যীশুর শূলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা বাস্তব না কল্প-কাহিনী? কল্প-কাহিনী। এ রকম বিশ্বাসরূপে আঁকড়িয়ে ধরে রেখেছিল

বহুদিন পূর্ব থেকে। তারপর খ্রিষ্টানদের জগতে যখন আধুনিক বিজ্ঞান প্রসার লাভ করল, পৃথিবীতে প্রথম আধুনিক বিজ্ঞান প্রসার লাভ করে খ্রিষ্টান জগতের ইউরোপে। সামনে কথাগুলো বুঝতে হলে আপনাদেরকে এই কথাটা স্মরণ রাখতে হবে। পৃথিবীতে আধুনিক বিজ্ঞান প্রসার লাভ করেছে সর্বপ্রথম ইউরোপে। কোন জাতির মাঝে? খ্রিষ্টানদের মাঝে।

আধুনিক বিজ্ঞান চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করে দিল, তোমাদের এই ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো অবান্তর। এগুলো গাঁজাখোরী কথা। এগুলো কাল্পনিক। যে বিজ্ঞান খ্রিষ্টানদের মাঝে প্রসার লাভ করেছে, সেই বিজ্ঞান খ্রিষ্টানদের ধর্মবিশ্বাসকে বাস্তব প্রমাণিত করেছে, নাকি কল্প-কাহিনী প্রমাণ করেছে? কল্প-কাহিনী প্রমাণ করেছে।

একথা আপনারা যদি স্ববিস্তারে জানতে চান, তাহলে ইউরোপের সেরা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ড. মরিচ বুকাইলির লেখা The Baible, The Quran and Science এর বাংলা তরজমা হয়েছে বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান। এই গ্রন্থ পড়ে দেখুন এই ভদ্রলোক বিজ্ঞানের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন খ্রিষ্টান ধর্মের ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে, ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাসের নাম। সুতরাং ইউরোপের খ্রিষ্টানদের মাঝে তাদের ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞানের লড়াই হল। একটা যুদ্ধ হল। বিজ্ঞান ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করে আর ধর্মবিশ্বাস বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে। বাস্তব ধর্ম, না কাল্পনিক ধর্ম? কাল্পনিক ধর্ম।

এখান থেকেই একদল খ্রিষ্টান গোটা ধর্মের প্রতি আস্থাহারা হয়ে নাস্তিক্যের প্রতি চলে গেল। আর একদল খ্রিষ্টান বিজ্ঞানের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে অন্ধ বিশ্বাসেই নিমজ্জিত রইল। যে সমস্ত খ্রিষ্টানরা নাস্তিক্যবাদের পথে চলে গেল, এরা ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাসেই অটল খ্রিষ্টানদেরকে উপাধী দিল ফাণ্ডা ম্যাণ্টালিষ্ট। এই হল ফাণ্ডা ম্যান্টালিষ্ট শব্দের ইতিহাস। যার বাংলা অনুবাদ হল মৌলবাদী।

ফাণ্ডা ম্যান্টালিষ্ট শব্দে কে উপাধী দিল? নাস্তিক্যবাদীরা। কাদেরকে? ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাসী খ্রিষ্টানদেরকে। কেন? বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে এগুলো কোন ধর্ম বিশ্বাস নয়, এগুলো অন্ধ বিশ্বাস। আর অন্ধ বিশ্বাসের নাম যদি ধর্ম হয়ে থাকে, তাহলে এমন ধর্ম আমরা মানতে পারি না। এই

যুক্তিতে যে সমস্ত খ্রিষ্টানরা নাস্তিক্যবাদে চলে গিয়েছিল, তারা যে খ্রিষ্টানরা ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাসে অটল রইল এদেরকে উপাধী দিল ফাণ্ডা ম্যাণ্টালিষ্ট। এর বাংলা অর্থ মৌলবাদী। শব্দটা খারাপ নয়। কথা সত্য মতলব খারাপ। এটাকে আরবীতে বলে كَلِمَةُ حَقٍّ اُرِيْدَ بِهَا الْبَاطِلُ কথা সত্য মতলব খারাপ। এবার বলুন, খ্রিষ্টানরা ধর্মের মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাসী ছিল, নাকি ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাসে অটল ছিল? অন্ধ বিশ্বাসে অটল ছিল। এটা ফান্ডা ম্যান্টালিষ্ট শব্দের অপব্যবহার করল। অপব্যবহার করে যারা ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাসে অটল ছিল, তাদেরকে ফান্ডা ম্যান্টালিষ্ট বা মৌলবাদী বলে উপাধী দিল।

শেষ পর্যন্ত এই শব্দের শব্দগত তত্ত্ব ও তথ্যের ভেতরে না পড়ে খ্রিস্টান জগত ধরে নিল ধর্মের নামে যারা অন্ধ বিশ্বাসী হয়, এদেরকেই ফাণ্ডা ম্যাণ্টালিষ্ট বলা হয়। এদেরকেই মৌলবাদী বলা হয়। এবার বলুন! আমাদের মুসলমান সমাজে কোন মানুষ ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে মৌলবাদী বলে কি না? শব্দটা পেল কোথায়? আমদানী করল কোত্থেকে? সুতরাং আলেমদেরকে যারা মৌলবাদী বলে এরা কাদের দালাল? খ্রিস্টানদের দালাল। দালালদের চিহ্নিত করতে হবে।

সব দালালদের কথা বলে শেষ করা যাবে না। এক দুইটা উদাহরণ দিচ্ছি মাত্র। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কুরআন। ভিন্ন নারী ভিন্ন পুরুষের মধ্যকার পর্দার বিধানকে ফরয করা হয়েছে। এটা পবিত্র বিধান। পর্দা ফরয কথাটা ইসলামের একটি পবিত্র বিধান। পর্দা প্রথা নয় পর্দা পবিত্র বিধান। পর্দাকে প্রথা বলে খ্রিস্টানরা। পর্দাকে প্রথা বলে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা। ইসলামের পর্দা কথাটা কি প্রথাগত না আল্লাহর পবিত্র বিধান? পবিত্র বিধান।

অনেক সরল মুসলমানও যারা আসলে খ্রিস্টানের দালাল নয়-বিষয়টা বুঝতে না পেরে দালালদের মুখ থেকে শোনে শোনে পর্দার মতো পবিত্র বিধানকে প্রথা বলে প্রকাশ করে। এই মারাত্মক ভুল সংশোধন হওয়া দরকার। ইসলামে পর্দার কোন প্রথা নেই। ইসলামে পর্দা নামে একটি পবিত্র বিধান আছে। এই বিধান বর্ণনা করে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বহু আয়াতে বলেছেন। এক দুটা আয়াত আপনাদেরকে শুনাচ্ছি। সূরায়ে নূরের এক আয়াতে বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ (النور/ ٣٠)

হে রাসূলে কারীম! ঈমানদার পুরুষদেরকে বলুন চক্ষু সংযত রেখো তোমাদের চরিত্র সংরক্ষিত থাকবে অর্থাৎ অবাধে মেয়ে লোক দেখবে না, চরিত্র হেফাযতে থাকবে। পরবর্তী আয়াতে বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ (النور/ ٣١)

আর হে রাসূলে কারীম! আপনি ঈমানদার নারীদেরকে বলে দিন, তারাও যেন দৃষ্টি সংযত রাখে চরিত্র সংরক্ষিত হবে। দুই আয়াতের সারমর্ম হল, ইসলামে যে পর্দা নামে পবিত্র একটি বিধান আছে এই বিধান পুরুষের চরিত্র এবং নারীদের সতীত্ব হেফাযত করার একমাত্র রক্ষাকবজ। ইসলামের পর্দার পবিত্র বিধান পুরুষের চরিত্র এবং নারীদের সতীত্ব হেফাযতের একমাত্র রক্ষাকবজ।

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের জগতে এর লেশমাত্র নেই। আপনাদের জানা মতে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের মাঝে পর্দার মতো কোন বিধান আছে? নেই। ফলাফল কি হয়েছে জানেন? তাদের সমাজে শতকরা ৭৫টি সন্তান জন্ম দিতে বিয়ে-শাদির দরকার হয় না। তাদের সমাজের বেশীরভাগ নারীরা কুমারী মা। বিয়ের আগেই সন্তানের মাতা। এর নাম কুমারী মাতা।

তাদের দেশের সরকারী আইনে বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্ম দেওয়া কোন অপরাধ নয়। এই জন্যেই ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের দেশে কোন সন্তান যদি স্কুলে ভর্তি হতে যায় লেখা-পড়া করার জন্য, তাহলে বাবার নামে পরিচয় হয় না; মায়ের নামে পরিচয় হয়। কারণ, বাবাকে সন্তান চিনবে দূরের কথা অনেক সময় মাও চিনে না এই সন্তানের বাবা কে? ছেলে না হয় চিনল না বাবাকে, কিন্তু মা চিনবে না কেন– এই প্রশ্ন জাগতে পারে আপনাদের মনে। এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাক।

একটি মেয়ে লোক ছিল অসৎ। তার ঘরে একটি জারজ সন্তান জন্ম হল। পঞ্চায়েতের মুরুব্বীরা বসল এ ঘটনার বিচার করার জন্য। পঞ্চায়েত এই মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল তুমি সন্তান পেলে কোথায়? কোন পুরুষের কাছ থেকে সন্তান আমদানি করেছ?

এই জারজ সন্তানের মা জবাবে বলে আমি বহু ঘাটে গোছল করেছি, কোন ঘাটের পানিতে সর্দি করেছে তা আমি নিজেই জানি না। এর চেয়ে বেশী বিশ্লেষণ করার অবকাশ নেই। বুঝে থাকলে বলুন, অনেক সময় এমন হয় কি না যে সন্তানের মাও বাবাকে চিনে না? হয়।

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের সমাজের সন্তানদের এই অবস্থা।

এবার বুঝে থাকলে বলুন, ইয়াহুদী-খ্রিস্টান সমাজে যত সন্তান জন্ম হয়, এরা মানুষের মতো জন্ম হয়, না হায়ওয়ান জানোয়ারের মতো জন্ম হয়? হায়ওয়ান জানোয়ারের মতো জন্ম হয়। এরা যখন দেখল, আমাদের সমাজে সন্তান জন্ম হয় হায়ওয়ান জানোয়ারের মতো, আর মুসলমানের সমাজে সন্তান জন্ম হয় মানুষের মতো, এদের সন্তানরা বলতে পারে এদের বাবা কে? মায়ের গর্ভে থাকাকালেও যদি বাবা মারা যায়, তবুও মা থেকে জানতে পারে, তার বাবা কে? সুতরাং মুসলমানের সন্তান জন্ম হয় মানুষের মতো আর ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের সন্তান জন্ম হয় হায়ওয়ান জানোয়ারের মত। কারণ কি?

এরা অনুসন্ধান করে উদঘাটন করেছে এর একমাত্র কারণ হল, এখনও মুসলমান সমাজে যতটুকু পর্দা পালন হয়, এরই ফলাফলে মুসলমানের সমাজে সন্তান মানুষের মতো জন্ম হয়, ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের সমাজে পর্দার মতো পবিত্র বিধানের নাম-গন্ধও নেই, এজন্য তাদের সমাজে মানুষের সন্তান হায়ওয়ানের মতো জন্ম হয়। এবার বুঝতে পেরেছেন পর্দার বিধান পবিত্র কেন? যেই সমাজে পর্দা নেই সেই সমাজে মানুষের সন্তান হায়ওয়ান জানোয়ারের মত জন্ম হয়। যে সমাজে পর্দা আছে যেই সমাজে মানব সন্তান মানুষের মতো জন্ম হয়। এখন যদি ইয়াহুদী-খ্রিস্টানেরা বলে ওহে দুনিয়ার মুসলমানেরা! পর্দার পবিত্র বিধান লঙ্ঘন করার কারণে আমাদের সন্তান জানোয়ারের মতো জন্ম হয়, তোমরাও পর্দার বিধান লঙ্ঘন করো, যেন তোমাদের সন্তানও জানোয়ারের মতো জন্ম হয়। তাহলে কথাটা কোনো মুসলমান গ্রহণ করবে? না।

এই জন্য কথাটাকে বাটপারেরা রূপ দিয়েছে 'পর্দা প্রগতির পথে বাধা'। নারী-পুরুষের মধ্যকার পর্দা মুছে ফেল। নারী-পুরুষ এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করো। সমাজের উন্নতি হবে। এটা কি আসল

কথা ছিল, না নেপথ্য কাহিনী অন্য রকম? এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানদের। কেন বাটপারেরা পর্দাকে প্রগতির পথে বাধা বলে? আসল কথা এটা নয়। আসল কথা হল, পর্দাই একমাত্র পশুত্বের পথে বাঁধা। বর্তমান ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের মানব সন্তানের জন্ম পদ্ধতি আর মুসলমান সমাজের সন্তান জন্ম পদ্ধতি এর জ্বলন্ত প্রমাণ যে, পর্দা প্রগতির পথে বাধা নয়; পর্দা একমাত্র পশুত্বের পথে বাধা। অতএব মুসলমানের সন্তানও যেন পশুর মতো জন্ম হয়, সেই ষড়যন্ত্র নিয়ে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা একটা শ্লোগান উড়াচ্ছে 'পর্দা প্রগতির পথে বাধা'।

এবার বলুন, মুসলমান সমাজের কোন মানুষ পর্দা প্রগতির পথে বাধা বলে কি না? এরা কার দালাল? ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের দালাল। দালালদের চিহ্নিত করতে হবে।

মুসলমানদের মাঝে যারা বলে পর্দা প্রগতির পথে বাধা এই শ্লোগান তারা পেল কোথায়? ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের থেকে। সুতরাং এরা কাদের দালাল? খ্রিস্টানদের দালাল। দালাল-মুনিব দু'দল মিলে ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে লেগেছে। ইসলামী শিক্ষা বন্ধ না করা পর্যন্ত মানুষকে জানোয়ারে পরিণত করা যাবে না।

সত্যিই পর্দা প্রগতির পথে বাধা কি না তা একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রগতি অর্থ কি? প্রগতি অর্থ ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথে যাওয়া। প্রগতি শব্দের অর্থ এক সাথে উন্নতি করে ফেলা, না ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথে যাওয়া? ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথে যাওয়া। যত দিন পর্যন্ত ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের সমাজে পর্দা ছিল, ততদিন পর্যন্ত তাদের মাঝেও সন্তান মানুষের মতো জন্ম হত। যখন পর্দাকে মুছে ফেলল, আস্তে আস্তে মানুষের ঘরে সন্তান জানোয়ারের মতো সন্তান জন্ম হওয়া শুরু করেছে। পর্দা লঙ্ঘন করার কারণে আস্তে আস্তে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে? অবনতির দিকে? অবনতির দিকে। তাহলে পর্দা উন্নতির পথে বাধা না অবনতির পথে বাধা? অবনতির পথে বাধা।

আসল শ্লোগান ছিল, সত্যিকারের শ্লোগন ছিল, বাস্তব শ্লোগান ছিল, পর্দা অবনতির পথে বাধা। এই বাটপারেরা শ্লোগানটাকে পাল্টিয়েছে। পাল্টিয়ে শ্লোগান বানিয়েছে পর্দা প্রগতির পথে বাধা। এই খ্রিস্টানেরা এই

বাটপারিটা করেছে, আর এক দল মুসলমানের মস্তিস্ককে ধোলাই করে এদের মস্তকে ঢুকিয়ে দিয়েছে– শ্লোগান দিতে হবে পর্দা প্রগতির পথে বাধা। এখন একদল মুসলমানও বলে পর্দা প্রগতির পথে বাধা। পেল কোথায় এই শ্লোগান? সুতরাং মুসলমানের মাঝে যারা বলে পর্দা প্রগতির পথে বাধা তারা খ্রিস্টানের দালাল। এই শ্লোগানধারীরা বলে নারী-পুরুষ সমান। নারীর অধিকার পুরুষের অধিকারের সমান। নারী থেকে পুরুষের আলাদা কোন অধিকার নেই। এটা কত বড় অবান্তর কথা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার প্রয়োজন পড়ে না।

তারপরও আপনারা তাদের ধোঁকায় যেন না পড়েন তাই একটু বিশ্লেষণ করে বলি। সন্তান গর্ভ নিলে কষ্ট হয়? হয়। গর্ভে ধারণ করতে কষ্ট হয়? হয়। সন্তান গর্ভে নিয়ে চলতে কষ্ট হয়? হয়। সন্তান প্রসব করতে কষ্ট হয়? হয়। সন্তানকে স্তনের দুধ খাইয়ে লালন-পালন করতে কষ্ট হয়? হয়। যারা বলে নারী-পুরুষ সমান, এরা এ কষ্টগুলো এক তরফাভাবে নারীকে দেয়, না অর্ধেক পুরুষে নেয়? না, নেয় না। তাহলে হে বাটপারের দল! সমান বলো কেন? যদি নারী-পুরুষ সমান হয়ে থাকে, তাহলে একটা সন্তান তোর স্ত্রীর গর্ভে জন্ম দিবি আরেকটা সন্তান তোর গর্ভে নিবি। বুঝে থাকলে বলুন, বাস্তবেই কি নারী-পুরুষ সমান, না ব্যবধান আছে? ব্যবধান। কি ব্যবধান– বুঝা কি কষ্ট কঠিন না বেআকেলও বুঝে? বেআকল, বুঝে। এরপর 'সমান' বলে কেন? ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের দালাল।

ষোলআনা শালীনতা রক্ষা করা যাবে না– যদি আপনারা মাফ করেন তাহলে একটি গল্প বলি। এক বৈরাগী আর এক বৈরাগীনী। কুড়ে ঘর বানিয়ে পাহাড়ের টিলায় বসবাস করত। একদিন ঝড়ের মৌসুমে গভীর রাতে ঝড় বৃষ্টি শুরু হল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রাত ১২ টায় বৈরাগী বলে, বৈরাগীনী! আমার পেশাব করার প্রয়োজন। দরজা খোলতে হবে, ঘরের বাইরে যেতে হবে, পেশাব করতে হবে। বৈরাগীনী বলে সর্বনাশ, ঝড়ের দিনে দরজা খোললে কুড়ে ঘর ঝড় তুফানে উড়িয়ে নেবে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। বৈরাগী বলে, আমার তো প্রস্রাব না করলে উপায় নেই, করব কি? বৈরাগীনী বলে চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি জানালার নিচে বসব, আমার ঘাড়ে দাঁড়াবে, দাঁড়িয়ে জানালা সামান্য ফাঁক করে বাইরে পেশাব

করে দিবে। কিছুক্ষণ পর বৈরাগীনীর পেশাব ধরল। বৈরাগী বলল, চিন্তার কোন কারণ নেই। নারী-পুরুষ সমান। তুমি আমার ঘাড়ে দাঁড়াবে আর জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে প্রস্রাব করে দেবে। এবার বৈরাগী বসল জানালার নিচে আর বৈরাগীনী দাঁড়াল বৈরাগীর ঘাড়ে। দাঁড়িয়ে জানালা ফাঁক করে যেই প্রস্রাব করে দিল, সবগুলো প্রস্রাব জানালার বাইরে চলে গেল(?)। শ্রোতাদের, 'না'। বৈরাগী বলে, হে বৈরাগীনী! আমার মাথায় গরম পানি ঢালছিস কেন? বলে গরম পানি ঢালি না বাইরে প্রস্রাব করি। গল্প বুঝে থাকলে বলুন, সমান? এই বাটপারদের আর কিভাবে বুঝালে বুঝবে সমান না ব্যবধান? এর থেকে সহজ ভাষা আমি জানি না। কিভাবে বললে বুঝালে এই ইংরেজদের দালালরা বুঝবে? নারী-পুরুষ সমান নয়, ব্যবধান।

খ্রিস্টানরা নারী-পুরুষ সমান শ্লোগন দিয়ে নারীদেরকে পর্দার বাইরে নিয়ে হাওয়ান জানোয়ারের মতো বাচ্চা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। মুসলমানরা পর্দা পালনের মাধ্যমে মানুষের মতো সন্তানকে জন্ম দেয়। এই অবস্থায় মুসলমানদের উন্নতি খ্রিস্টানদের গায়ে সয় না। এই জন্য খ্রিস্টানেরা মুসলমানদের নারীদেরকেও পর্দার বাইরে টেনে নিয়ে মুসলমানদের সন্তানদেরকেও তাদের মতো হায়ওয়ান জানোয়ারের মতো জন্মাবার চায়।

কিন্তু খ্রিস্টানদের কথা কোন মুসলমান গ্রহণ করবে না। এজন্য একদল মুসলমানের মস্তিস্ক ওয়াশ করে মস্তকে ঢুকিয়ে দিয়েছে, তোমাদের মুখে বল, নারী-পুরুষ সমান অধিকার। তাহলে ফলাফল হবে প্রগতি। আসলে প্রগতি হবে না, তোমাদের সন্তানরাও আমাদের মতো জানোয়ারের মতো জন্ম হবে। অতএব নারী-পুরুষের সমান অধিকার এই অবান্তর শ্লোগান কেন? খ্রিস্টানদের দালালীর মাধ্যমে মুসলমানের সন্তানগুলোও হায়ওয়ান জানোয়ারের মতো জন্ম দেওয়ার জন্য।

হ্যাঁ, নারী-পুরুষ সমান আল্লাহর কাছে পুরুস্কার পাওয়ার বেলায়। নারী-পুরুষ সমান কিসের বেলায়? আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাওয়ার বেলায়। এ ব্যাপারে একটি হাদীস শুনুন– হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে নারী স্বামীর ঘর করবে এই নারী জিহাদের ছাওয়াব পাবে। পুরুষ স্বামীর ঘর করে জিহাদের

সাওয়াব পাবে, না যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ করে জিহাদের সাওয়াব পাবে? পুরুষ যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করে পাবে জিহাদের সাওয়াব, আর নারী স্বামীর ঘর করার মাধ্যমে পাবে জিহাদের সাওয়াব। বলুন, কাজ সমান, না সাওয়াব সমান? সাওয়াব সমান।

হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, যে মুসলমান নারী সন্তান জন্ম দেওয়ার পরও বেঁচে থাকে, সেই নারী গাজীর সাওয়াব পায়। পুরুষ সন্তান প্রসব করার পর বেঁচে থাকলে গাজীর সাওয়াব পায়, না যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ী হয়ে ফিরলে গাজীর সাওয়াব পায়? যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ী হলে। তাহলে পুরুষের কাজ হল যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ করা, নারীর কাজ স্বামীর ঘর করা।

পুরুষ যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করলে যে সাওয়াব, নারী স্বামীর ঘর করলে সে সাওয়াব। পুরুষ যুদ্ধের ময়দান থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরলে যেমন গাজী, নারী সন্তান প্রসবের পর বেঁচে থাকলে তেমন গাজী। সমান আছে কি না নারী-পুরুষ এক জায়গায়? আছে। কোথায়? সাওয়াবের বেলায়। আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাওয়ার বেলায়। আল্লাহর রাসূল বলেন, যে মুসলমান নারী সন্তান প্রসবের সময় মারা যায় এই নারী শহীদের সাওয়াব পায়। পুরুষও? সন্তান প্রসবের সময় মারা গেলে পুরুষও? শহীদের সাওয়াব পায়?

আরেক গল্প বলি। ইউনিয়ন পরিষদের এক চেয়ারম্যান পরিষদের মিটিং এ বসল। একজন মেম্বারকে জিজ্ঞেস করল (মেম্বার ছিল মূর্খ আর চেয়ারম্যান ছিল এর চেয়েও বড় মূর্খ) গত মিটিং এ তুমি উপস্থিত ছিলে না কেন? মেম্বার বলে, চেয়ারম্যান সাব! গত মিটিং এর তারিখে আমার বাড়ীতে ডেলিভারী কেইস ছিল। চেয়ারম্যান বলে, হ্যাঁ তাহলে তো মিটিং এ অনুপস্থিত থাকারই কথা। কারণ, আমার বাবাও এই কেইসে মারা গিয়েছিল। চেয়ারম্যানের বাবাও ডেলিভারী কেইসে মারা গিয়েছিল।

এই চেয়ারম্যানের বাবা হয়ে থাকলে সন্তান প্রসবের সময় মারা গেলে পুরুষও শহীদ হবে। আর এমন চেয়ারম্যানের বাবা না হয়ে থাকলে বলুন, পুরুষ শহীদের সাওয়াব পাবে কোথায়? যুদ্ধের ময়দানে মারা গেলে পুরুষ শহীদ, সন্তান প্রসবের সময় মারা গেলে, নারী শহীদ। বলুন, যোগ্যতায়

সমান, না কাজে সমান, না আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাওয়ার বেলায় সমান? পুরস্কার পাওয়ার বেলায় সমান। কিন্তু এরা জানে চাই খ্রিস্টান অপরাধী হোক, চাই ইয়াহুদী অপরাধী হোক, চাই নাস্তিক অপরাধী হোক, চাই নামধারী মুসলমান অপরাধী হোক– অপরাধীরা জানে এদের পরকাল অন্ধকার। সমস্ত অপরাধীরা জানে এদের পরকাল অন্ধকার। পরকালে নারী-পুরুষ সমান এটা বলে লাভ নেই, এদের তো পরকাল অন্ধকার। এজন্য এরা বলতে চায় দুনিয়াতেই নারী-পুরুষ সমান, নারী-পুরুষের যোগ্যতা সমান, নারী-পুরুষের কাজ সমান, নারী-পুরুষের কর্মস্থল সমান।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলে দিয়েছেন নারী-পুরুষের যোগ্যতায় ব্যবধান, নারী-পুরুষের কাজে ব্যবধান, নারী-পুরুষের কর্মস্থল ব্যবধান শুধু আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাওয়ার বেলায় সমান।

আমার এ কয়েকটা কথা বুঝে থাকলে বলুন, নারী-পুরুষের যোগ্যতা সমান? নয়। নারীকে আল্লাহ পাক গর্ভে সন্তান রাখার যোগ্যতা দান করেছেন, ঢাকার কোন পুরুষকেও? যোগ্যতা সমান না ব্যবধান? সমস্ত পুরুষকে আল্লাহ আজীবনের জন্য মাসিক ঋতুস্রাব থেকে মুক্ত রেখেছেন। বাংলাদেশের কোন নারীকেও? না। তাহলে নারী-পুরুষ যোগ্যতায় সমান না ব্যবধান? ব্যবধান। যোগ্যতায় ব্যবধান হলে কাজ হবে সমান না ব্যবধান? ব্যবধান। মাসিক ঋতুস্রাবের ঝামেলা সহ্য করা নারীর কাজ, না পুরুষের কাজ? নারীর কাজ। সন্তান গর্ভে ধারণ করা পুরুষের কাজ, না নারীর কাজ? নারীর কাজ। সন্তান প্রসব করা পুরুষের কাজ, না নারীর কাজ? নারীর কাজ। সন্তানকে স্তনের দুধ পান করিয়ে লালন-পালন করা পুরুষের কাজ, না নারীর কাজ? নারীর কাজ।

এই কাজগুলোর যোগ্যতা আছে কোন পুরুষের? নেই। তাহলে তোমরা কি করবে দুনিয়াতে? পুরুষরা শ্রম দেবে উপার্জনে। উপার্জনে শ্রম খাটার জন্য পুরুষের শরীরে শক্তি সামর্থ্য দেওয়া হয়েছে। আর গর্ভস্থ সন্তানের দেহ গঠনের জন্য নারীর শরীরে শক্তি-সামর্থ্য দেওয়া হয়েছে। সুতরাং নারী যেহেতু সন্তান গর্ভে নিবে, এজন্য পুরুষ উপার্জনে শ্রম খাটবে। এবার বলুন

স্বামী স্ত্রী দু'জনই চাকুরী করবে? আমাদের দেশের নারীরা এত বোকা যে, যখন পুরুষ বলে– আমি একটি অফিসে চাকুরী করি পাঁচ হাজার টাকা বেতন পাই, তুমি আরেক অফিসে চাকুরী করো, আরও পাঁচ হাজার টাকা বেতন পেলে মাসিক আমাদের দশ হাজার টাকা ইনকাম হবে।

তখন এই বোকা নারীরা বলতে পারে না, যেহেতু আল্লাহর রাসূল নারীকে نَاقِصَةُ الْعَقْلِ বলেছেন। এই নারীরা জাতিগতভাবে বোকা। বোকা না হলে সাথে সাথে বলে দিতে পারতো হ্যাঁ তুমি একটি অফিসে পাঁচ হাজার টাকা বেতনের চাকুরী করো, আর আমি আরেকটা অফিসে পাঁচ হাজার টাকার বেতনে চাকুরী করলে একমাসে আমাদের পরিবারে দশ হাজার টাকা ইনকাম হবে, এই যুক্তি যদি আমার মেনে নিতে হয়, তাহলে একটি সন্তান আমার গর্ভে নেওয়ার সাথে সাথে আরেকটা সন্তান তোমার গর্ভে ধারণ কর। এক বছরে আমরা দু'সন্তানের জন্মদাতা হয়ে যাব। এই কথাটা বলতে পারে না কেন? রাসূল বলেছেন نَاقِصَةُ الْعَقْلِ নারীরা জাতিগত বোকা। কি বোকা? জাতিগত বোকা।

নারীদেরকে আল্লাহ যে আলাদা কাজ কর্ম দিয়েছেন, দুনিয়ার কোন পুরুষ এই কাজগুলো করতে পারে না। এজন্য পুরুষকে উপার্জনে শ্রম কাটার দায়িত্ব দিয়েছেন। এখন যে পুরুষ নারীর কাজও করতে পারে না, নিজের কাজও নারী দিয়ে করাতে চায়, এই পুরুষটা কি দুনিয়াতে আসল ঘোড়ার ঘাস কাঁটার জন্য? হায়া-লজ্জা নেই? নারীর কাজ করতে পার না তুমি, তোমার কাজও নারী দিয়ে করাতে চাও– হায়া, লজ্জা গেল কোথায়? তুমি কি ঘোড়ার ঘাস কাটার জন্য এসেছ দুনিয়াতে? মাসিক ঋতুস্রাবের ঝামেলাও নিতে পার না, সন্তানও গর্ভে নিতে পার না, সন্তান প্রসবও করতে পার না, সন্তানকে স্তনের দুধও পান করাতে পার না, এগুলোকে সব এক তরফাভাবে নারীকেই করতে হবে, আবার তোমার সাথে অফিসে গিয়ে চাকুরীও করতে হবে, তুমি কি ঘোড়ার ঘাস কাটতে এসেছ?

বুঝে থাকলে বলুন, যে সমস্ত পুরুষেরা নারীর কাজও করতে পারে না, আবার নারীকে দিয়ে নিজের কাজ করাতে চায়, এরা কাজের লোক না নিষ্কর্মা? নিষ্কর্মা। আর যে সমস্ত নারীরা নিজের কাজ তো নিজেই করে, পুরুষ দিয়ে করাতে পারে না, আবার পুরুষের কাজও করতে যায় এরা

বুদ্ধিমতি না বোকা? বোকা। একদল পুরুষকে নিষ্কর্মা আরেক দল নারীকে বোকা সাজিয়েছে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা। আর মুসলমানের একদল পুরুষকে নিষ্কর্মা আরেকদল নারীকে বোকা বানানোর জন্য শ্লোগান শিক্ষা দিয়েছে, নারী-পুরুষ সমান অধিকার। এবার বুঝে থাকলে বলুন, যারা নারী-পুরুষ সমান শ্লোগান দেয়, শ্লোগানটা পেলো কোথায়? খ্রিস্টানদের থেকে। সুতরাং এরা কার দালাল? নারী-পুরুষ সমান শ্লোগান যারা দেয়, এরা খ্রিস্টানদের দালাল। নারী-পুরুষ কাজে ব্যবধান, যোগ্যতায় ব্যবধান বুঝলেন। এবার বুঝুন কাজের কর্মস্থলের ব্যবধান।

পুরুষের কর্মস্থল ভিন্ন, নারীর কর্মস্থল ভিন্ন। এ মর্মে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের সূরায়ে আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে বলেন–

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

এই আয়াতে আল্লাহ ডাইরেক সম্বোধন করেছেন নবীর বিবিগণকে আর ইনডাইরেক সম্বোধন করেছেন সমস্ত মুসলমান নারীদেরকে। আয়াতের মর্ম হল, হে নবীর বিবিরা আর মুসলমান নারীরা! তোমরা তোমাদের বসবাসের ঘরে থাকো।

মুসলমানদের নারীদেরকে আল্লাহ কোথায় থাকতে বলেছেন? বসবাসের ঘরে। বসবাসের ঘরে থাকবে কেন? পুরুষরা চলাফেরা করবে বাজারে, পুরুষরা থাকবে অফিসে আদালতে, পুরুষ থাকবে হাঁটে, ঘাটে, মাঠে, পুরুষ বিচরণ করবে যথায়-তথায়, নারীরা কেন বসবাসের ঘরে থাকবে? বসবাসের ঘর কি নারীদের বন্দীশালা? এই প্রশ্ন একদল মুসলমানও করে কি না? করে।

প্রশ্ন পেল কোথায়? খ্রিস্টানদের থেকে। বসবাসের ঘর নারীর বন্দিশালা নয়, বসবাসের ঘর নারীর কর্মস্থল। বসবাসের ঘর নারীর? কর্মস্থল। না বুঝলে বলুন, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় সারা দিন অফিসের চেয়ারে বসে থাকা ভালো, না বসবাসের ঘর ভালো? বসবাসের ঘর ভালো। সন্তান গর্ভে নিয়ে রাস্তায় মাটি কাটা ভালো, না বসবাসের ঘর ভালো? বসবাসের ঘর ভালো।

সন্তান প্রসবের সময় সংসদ ভবন সুবিধা, না বসবাসের ঘর সুবিধা? বসবাসের ঘর সুবিধা। সন্তানকে স্তনের দুধ পান করাবার সময় গাড়ীর

ড্রাইভিং সুবিধা, না বসবাসের ঘর সুবিধা? বসবাসের ঘর সুবিধা। নারীর জীবনে যে আলাদা কাজ আল্লাহ দিয়েছেন, সেই কাজগুলো পুলিশের চাকুরী করলে নারী পারবে করতে? না।

তাহলে পুলিশের চাকুরী নারীর জন্য, না পুরুষের জন্য? পুরুষের জন্য। এভাবে বললে যারা বুঝেন না তাদেরকে অন্যভাবে বলি। তিনটা পুলিশ নারী যদি একটা চোর ধরতে যায়, আর চোর যদি ৯টা সাথী নিয়ে পুলিশের সামনে পড়ে, তাহলে এবার বলুন পুলিশ চোর ধরবে না চোর পুলিশকে ধরবে? তারপরে কি হবে আমি আর বলতে পারব না।

তারপরও যারা বুঝে না নিশ্চয়ই ওদের ব্রেইনকে ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ধোলাই করে দিয়েছে। বুঝে থাকলে বলুন, নারী-পুরুষ সমান না ব্যবধান? ব্যবধান। নারী-পুরুষের কাজ সমান না ব্যবধান? ব্যবধান। কর্মস্থল সমান না ব্যবধান? ব্যবধান। এবার বলুন সূরায়ে আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ নারীদের কর্মস্থল কি ধার্য করে দিয়েছেন? বসবাসের ঘর। হে মুসলমানের নারীরা! বসবাসের ঘরে থাকো। এটা তোমাদের বন্দিশালা নয়; এটা তোমাদের কর্মস্থল।

আমি জিজ্ঞেস করি, আপনাদের বাংলাদেশে স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির ছাত্র শিক্ষক আছে, এরা কি হাওরে বসে লেখা-পড়া করে আর করায়? মাঠে বসে, না নদীর পাড়ে বসে না বিদ্যালয়ে বসে? বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ে কেন বসবে? মাঠে জায়গা নেই? বিদ্যালয় কি এদের বন্দিশালা, না কর্মস্থল? কর্মস্থল।

অফিসাররা অফিসের কাজ-কর্ম করে অফিস ঘরে বসে, না গাছের তলে বসে? অফিস ঘরে। অফিস ঘরে বসবে কেন? এটা কি এদের বন্দিশালা, না কর্মস্থল? কর্মস্থল। দোকানদারেরা বেচা-কেনা কোথায় বসে করে? দোকান ঘরে বসে। দোকান ঘর কি এদের বন্দিশালা, না কর্মস্থল? কর্মস্থল। এমপি-মন্ত্রীরা বসে বসে আইন বানায় হাওরে বসে, না সংসদ ভবনে বসে? সংসদ ভবন কি এমপি আর মন্ত্রীদের বন্দিশালা, না কর্মস্থল? কর্মস্থল।

তাহলে বিদ্যালয় যদি ছাত্র-শিক্ষকের বন্দিশালা না হয়ে কর্মস্থল হতে পারে, দোকান যদি ব্যবসায়ীদের বন্দিশালা না হয়ে কর্মস্থল হতে পারে, অফিস যদি অফিসারদের বন্দিশালা না হয়ে কর্মস্থল হতে পারে, সংসদ

ভবন যদি মন্ত্রী আর এমপিদের বন্দিশালা না হয়ে কর্মস্থল হতে পারে, তাহলে বসবাসের ঘর নারীদের কর্মস্থল না হয়ে বন্দিশালা হবে কেন? সুতরাং আল্লাহ বলেছেন, মুসলমানের নারীরা বসবাসের ঘরে থাকবে, এর বিরোধিতা যে মুসলমানরা করে, তারা কোন কুরআনে বিশ্বাসী? তারা কুরআনে বিশ্বাসী নয়। এরা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের বন্ধু।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন খুব পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন, কোন মুসলমান ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের বন্ধু হতে পারবে না। আল্লাহ বলেন–

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ (البقرة/ ١٢٠)

হে মুসলমানেরা! ইয়াহুদী তোমার বন্ধু হবে না, খ্রিস্টান তোমার বন্ধু হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে তার মতবাদে বিশ্বাসী করতে পারবে না। কোন মুসলমান যদি ইয়াহুদী মতবাদে বিশ্বাসী হয়, কোন মুসলমান যদি খ্রিস্টানের মতবাদে বিশ্বাসী হয়, তখন ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ঐ মুসলমানের বন্ধু হয়। বুঝে থাকলে বলুন, কোন মুসলমান ইয়াহুদীদের বন্ধু হয় কখন? তাদের মতবাদে বিশ্বাসী হয় যখন।

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে মৌলবাদী বলা কার মতবাদ? ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের মতবাদ। একদল মুসলমান বলে কেন? ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের বন্ধু হতে চায়। পর্দাকে প্রগতির পথে বাধা বলা কার মতবাদ? ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের। একদল মুসলমান বলে কেন? ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের বন্ধু হতে চায়। নারী-পুরুষ সমান কার মতবাদ? ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের। একদল মুসলমান বলে কেন? ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের বন্ধু হতে চায়। নারী-পুরুষ সমান অধিকার কার মতবাদ? ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের। একদল মুসলমান বলে কেন? ইয়াহুদী খ্রিস্টানের বন্ধু হতে চায়। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى أَوْلِيَاءَ

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (المائدة/ ٥١)

হে মুসলমানগণ! ইয়াহুদীকে বন্ধু বানিও না, খ্রিস্টানকে বন্ধু বানিও না। ইয়াহুদী-খ্রিস্টান তোমাদের বন্ধু নয়। এরা তোমাদের চির শত্রু। তারা তাদের বন্ধু। সুতরাং কোন মুসলমান যদি ইয়াহুদীকে বন্ধু বানায় আমি আল্লাহ সেই মুসলমানকে ইয়াহুদী গণ্য করব, কোন মুসলমান যদি খ্রিস্টানকে বন্ধু বানায়, আমি সেই মুসলমানকে খ্রিস্টান গণ্য করব।

এবার বলুন, যারা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত তাদেরকে মৌলবাদী বলে, তারা আল্লাহর কাছে কি গণ্য? ইয়াহুদী-খ্রিস্টান গণ্য। যারা পর্দাকে প্রগতির পথে বাধা বলে তারা আল্লাহর কাছে কি গণ্য? ইয়াহুদী-খ্রিস্টান গণ্য। যারা নারী-পুরুষ সমান বলে তারা আল্লাহর কাছে কি গণ্য? ইয়াহুদী-খ্রিস্টান গণ্য। অতএব ইয়াহুদী-খ্রিস্টানেরা একদল মুসলমানকে তাদের মতবাদ দিক্ষা দিয়ে অপরাপর মুসলমানকে ধ্বংস করার মিশন পাকাপোক্ত করেছে।

এর উদাহরণ হল, কুড়ালের মতো। কুড়াল বাঁশ কাটে নিজে নিজেই না কোন একটার আশ্রয় নিয়ে? আশ্রয় নেয়। কুড়াল অন্য বাঁশকে কাটার জন্য যে বাঁশের আশ্রয় নেয়, সেটা হল আচার (বাঁট)। বাঁশ কাটতে যদি আচার ব্যবহার না করে অন্য বাঁশ কাটতে পারে না। ঠিক তেমনিভাবে ইয়াহুদী-খ্রিস্টান কোন মুসলমানকে যদি দালাল না বানায়, তাহলে অন্য মুসলমানের অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না।

অতএব বর্তমানে ইয়াহুদী খ্রিস্টান হচ্ছে, মুসলমানদের জন্য কুড়াল আর তাদের সুরে যারা সুর মিলিয়ে দালালী করে, তারা হল কুড়ালের আচার। আর যারা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানও নয় এবং ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের দালালও নয়, এই মুসলমানদের তারা এবার কাটা শুরু করেছে। কুড়াল থেকে এই বাঁশগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত খুলে না ফেলা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের দ্বারা মুসলমানের রক্তে লাল হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

যদি আপনারা চান ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের লালকুত্তার কামড় খেয়ে মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত না হোক, মুসলমানের রক্তে দুনিয়া লাল না হোক, তাহলে যে সমস্ত মুসলমানকে আচাড় বানিয়ে ইয়াহুদী-খ্রিস্টান কুড়াল ব্যবহার করছে, এই কুড়াল থেকে 'আচারকে বিছিন্ন করে দিতে হবে, ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের বিষ কামড় থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য। ইসলামী শিক্ষা ছাড়া এর আর কোন বিকল্প নেই।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কুরআনে বলেন–

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا (الفرقان/٣)

হাশরের মাঠে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবেন, হে আল্লাহ! এদের কাছে আমি কুরআন পৌছে দিয়েছিলাম, কিন্তু এরা কুরআন বর্জন করেছিল। তোমার আদালতে

বিচার চাই। কুরআন বর্জনকারী কারা? পর্দাকে প্রগতির পথে বাধা বলে যারা। কারণ পর্দা হল, কুরআনের বিধান আর সে বলে প্রগতির পথে বাধা– সে কুরআন গ্রহণ করল, না বর্জন করল? বর্জন করল। কুরআন বর্জনকারী কারা? কুরআন শিক্ষিতদেরকে ফাণ্ডা ম্যান্টালিষ্ট বলে যারা। কুরআন বর্জনকারী কারা? কুরআন শিক্ষিতদেরকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক বলে যারা।

কুরআন শিক্ষিতদেরকে ধর্মান্ধ, মূর্খান্ধ বলে যারা, কুরআন বর্জনকারী তারা। সূরায়ে ফুরকানে আল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাশরের মাঠে ফরিয়াদ করবেন, হে আল্লাহ! আমি এদের কাছে কুরআন পৌছিয়ে ছিলাম। কিন্তু যে কুরআন মানবরূপী পশুকে মানব বানায়, যে কুরআন শিক্ষা ছাড়া মানুষ গড়ার আর কোন শিক্ষা জগতে নেই, সেই কুরআন আমি এদের হাতে পৌছিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এরা কুরআন বর্জন করেছিল। আজ তোমার আদালতে বিচার চাই।

মুফাসসিরীনে কিরাম বলেছেন, কুরআন বর্জনকারী দু'দল। একদল কুরআনের অবিশ্বাসী। কুরআনকে অবিশ্বাস করার মাধ্যমে কুরআন বর্জন করেছে। এরা হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। পর্দার বিধান কুরআনে আছে কি? আছে। অবিশ্বাস করলে কি শুধু মুসলমান দাবী করলেই মুসলমান থাকে? কুরআনের বিধান অবিশ্বাস করলে আর মুসলমান থাকে না। চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যায়।

আরেক দল কুরআন বর্জনকারী কুরআনের বিধান অবিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করা সত্ত্বেও কুরআনের বিধান পালন করে না। এমন মানুষ কি আছে, যারা পাঁচ বেলা নামায পড়া কুরআনের বিধান তা বিশ্বাস করে কিন্তু নামায পড়ে না? আছে।

আল্লাহর রাসূল হাদীস শরীফে বলেন, হাশরের মাঠে এদের গলায় কুরআন ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ! এই লোকটা আমাকে বিশ্বাস করেছিল কিন্তু আমার বিধান পালন করে নি, আমি তোমার আদালতে বিচার চাই।

সুতরাং যারা কুরআন বিশ্বাস করে অথচ কুরআনের বিধান পালন করে না কাল হাশরের মাঠে কুরআন এদের বিরুদ্ধে নয় পক্ষে সাক্ষ্য বানানোর জন্য আবার মাদরাসা শিক্ষা প্রয়োজন।

কুরআনের বিধানে বিশ্বাসী হওয়ার জন্যও মাদরাসা শিক্ষা ছাড়া বিকল্প নেই। কুরআনের বিধান পালনকারী বানানোর জন্যও মাদরাসা শিক্ষা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। অতএব আসুন আমরা সবাই মিলে যে মাদরাসা শিক্ষা, যে কুরআন শিক্ষা একমাত্র মানুষ গড়ার শিক্ষা সেই শিক্ষার পরশ কোন-না-কোন উপায়ে লাভ করে সত্যিকারের মানুষ হয়ে সকল প্রকার পশুত্ব বর্জন করে আল্লাহর আদালতে নাজাতের ব্যবস্থা করি।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

মাওয়ায়েজে হাসানাহ
খতীবে আ'জম, মুনাজেরে যামান,
তরজমানে আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাত
মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরীর

নির্বাচিত বয়ান—১

সীরাতুন নবী সা. ও বর্তমান প্রেক্ষিত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ - وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ . وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ . اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا -

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ اَبٰى قِيْلَ مَنْ اَبٰى قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, হযরাত উলামায়ে কেরাম,
সম্মানিত সুধী সমাজ!

পবিত্র সীরাতুন্নবী বিষয়ের উপর আলোচনা করার জন্য আলোচনা শুনার জন্যও সীরাতুন্নাবীর আদর্শে আদর্শবান হওয়ার জন্য অদ্যকার এই মোবারক সমাবেশে আমরা সমবেত হয়েছি। মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনেতিহাসকে সীরাতুন্নবী বলা হয়। এমন কিছু কাজ আছে যে কাজগুলোর অনুকরণ-অনুসরণ করার ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। আর কোনো কোনো কাজ এমন আছে, ইচ্ছা করলে যেগুলোর অনুকরণ করতে পারবে কিন্তু শরীয়তে তার অনুমতি নেই।

তাই ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে কারো মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক- আমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনাদর্শে আদর্শবান হব কিভাবে? তাঁর জীবনের এমন কোনো কাজ যদি পাওয়া যায়, যে কাজের অনুকরণ করার ক্ষমতাই আমাদের নেই, তাহলে আমরা তাঁর

আদর্শে- আদর্শবান হব কিভাবে? তাঁর জীবনে এমন কোন কাজ যদি পাওয়া যায় যে কাজ আমরা অনুকরণ করতে পারি কিন্তু ইসলামে তার অনুমতি নেই তাহলে আমরা তাঁর জীবনাদর্শে আদর্শবান হব কিভাবে? এদুটি প্রশ্নের মীমাংসার মাধ্যমেই আজকের আলোচনা শুরু করছি।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের যে সমস্ত কাজ অন্য কেউ অনুকরণ করতে পারবে না, অনুকরণ করার সাধ্য নেই, ক্ষমতা নেই– এই সমস্ত কাজের দু'একটা উদাহরণ আমি আপনাদের খেদমতে পেশ করছি।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোলের শিশু ছিলেন, দুধমায়ের দুধপান করতেন, যেহেতু সেই দুধমায়ের আরো একটি সন্তান ছিল, এজন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধমায়ের এক স্তনের দুধ নিজে পান করতেন অন্য স্তনের দুধ আপন দুধভাইয়ের জন্য রেখে দিতেন। আপনারা কি মনে করেন, রাসূলের এ কাজ অন্য কেউ করতে পারবে? জ্বি না। (শ্রোতাদের) অন্য কারো অনুকরণের ক্ষমতাও নেই সাধ্যও নেই।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোলের শিশু থাকাকালেও উলঙ্গ হননি। কোলের শিশু থাকাকালে উলঙ্গ না হওয়ার কাজটা আর কেউ অনুকরণ করতে পারবে (?) পারবে না। কাজেই আমরা যদি তাঁর কাজের অনুকরণ করার সাধ্য না রাখি, ক্ষমতাই না রাখি, তাহলে আমরা তাঁর আদর্শে আদর্শবান হব কিভাবে? এই হল প্রশ্ন। আবার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একত্রে ৯স্ত্রী রেখেছিলেন।

উম্মতের কেউ ইচ্ছা করলে ৯টা বিয়ে করতে পারে, কিন্তু শরীয়তে এর অনুমতি নেই। তাহলে দেখা গেল, মহানবীর জীবনেতিহাসে এমন একটি কাজ পাওয়া গেল, অন্য কেউ ইচ্ছা করলে যে কাজের অনুকরণ করতে পারে কিন্তু ইসলামী শরীয়তে এর অনুমতি নেই। তাই প্রশ্ন হল যার কাজ অনুকরণ করার সাধ্য নেই অথবা অনুকরণ করার সাধ্য আছে অনুমতি নেই- তার জীবনাদর্শে আমরা আদর্শবান হব কিভাবে?

যেহেতু আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরাআনে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ অবশ্যই

তোমাদের জন্য রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আদর্শ তাকেই বলা যায় যাকে অনুসরণ করা যায়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ-অনুকরণ করার জন্যেই আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন তিলাওয়াতকৃত আয়াতে আদর্শই শুধু বলেন নি উত্তম আদর্শ বলেছেন। আনুষঙ্গিকভাবে একটা প্রশ্নের জবাব প্রথমেই দিয়ে ফেলি, পরে সময় থাকে কি না বলা যায় না।

এই আয়াতে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন আল্লাহর রসূলের মাঝে আমাদের আদর্শ আছে বলেছেন। لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ বলেছেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ তাঁর এবং তাঁর ছাহাবাগণের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে আল্লাহ বলেন নি, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ বলেছেন, وصحابته বলেননি। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে আদর্শ রয়েছে। তাই এখানে কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আমরা ছাহাবাগণকে আদর্শ মানব কেন? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব হল,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الأحزاب/٢١)

এই শুধু একটিমাত্র আয়াতে কুরআন সমাপ্ত নয়। কুরআনে আরো আয়াত আছে। আপনারা কি বলেন, কুরআনে আরো আয়াত আছে কি? আছে। অন্য আয়াতে বলেন,

السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ (التوبة/١٠٠)

এ উম্মতের মাঝে নেক কাজে সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী মুহাজির ছাহাবায়ে কেরাম, আনসার ছাহাবায়ে কেরাম আর যারা তাদেরকে সঠিকভাবে অনুকরণ করল, আর যারা তাদেরকে এ 'তাদের' বলবে কাদেরকে? ছাহাবায়ে কেরাম। এক আয়াতে রাসূলকে আদর্শ বলা হয়েছে, অন্য আয়াতে ছাহাবাকে অনুকরণ করার কথা বলা হয়েছে।

এবার যদি আমরা যেই আয়াতে রাসূলকে আদর্শ বলা হয়েছে, সেই আয়াত মানি আর যে আয়াতে সাহাবায়ে কেরামকে অনুকরণ করার কথা বলা হয়েছে, তা না-মানি, তা হলে পূর্ণ কুরআন মানা হল না আংশিক?

আংশিক। আবার অনেক ব্যাপার এমন আছে, আংশিক মানলে মানাই হয় না। আংশিক মানার নাম মানা নয়। যেমন নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে উজু আছে, সেই উজুর চার ফরয। চার ফরযের মাঝে তিন ফরয পালন করলে আর এক ফরয লঙ্ঘন করলে তিন ফরয পালন করার কোনো ভেল্যু থাকে ? কোনও ভেল্যু নেই। ঠিক এমনভাবে কুরআনের কিছু অংশ মেনে কিছু অংশ না মানলে যেই অংশ মানল সেই অংশের ভেল্যু থাকে না। এজন্য আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন অন্য আয়াতে বলেছেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ (البقرة/٨٥)

তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের একাংশ মানবে আর একাংশ মানবে না? এমন অপরাধ যারা করবে, আল্লাহ বলেন, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে একটা ইহকালে আরেকটা পরকালে। ইহকালীন শাস্তি হচ্ছে, যন্ত্রণা আর বঞ্চনা, পরকালীন শাস্তি হবে তাদের জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আজাব। সুতরাং যে আয়াতে আল্লাহ পাক রাসূলকে আমাদের আদর্শ বলেছেন, সেই আয়াত মানার সাথে সাথে যেই আয়াতে সাহাবাগণকে অনুকরণ করার কথা বলেছেন, সেই আয়াতও মানতে (?) হবে। গেল এক প্রশ্নের জবাব।

আরেক প্রশ্ন হলো যে রাসূলের জীবনে কোন কাজ এমন আছে যা অনুকরণ করার ক্ষমতাই নেই। কিংবা ক্ষমতা আছে, তবে ইসলামী শরীয়তে তার পারমিশন নেই। যেমন একত্রে (?) নয় বিবি রাখা। তবে সেই রাসূল আমাদের জন্য আদর্শ হলেন কিভাবে? এই মূল প্রশ্নের জবাবের আগে আরো একটি প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাক। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর আল্লাহ যে কুরআন নাজিল করেছেন, সেই কুরআনে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন—

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (النسا./٣)

হে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর উম্মতেরা! তোমরা প্রয়োজনে এক বিবি রাখতে পার, দুই বিবি রাখতে পার, তিন বিবি রাখতে পার চার বিবি এর বেশী নয়। যে কুরআনে আল্লাহ উম্মতের জন্য এই বিধান দিলেন, এই বিধান সম্বলিত যে কুরআন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর কাছে যিনি নাজিল

করলেন, স্বয়ং সেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আবার এর চেয়ে বেশী বিয়ের পারমিশন সেই আল্লাহ দিলেন কেন? এই প্রশ্নের একাধিক জবাব আছে। এর একটা জবাব হল, হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে; মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর মুবারকে চার হাজার বাহাদুর পুরুষের শক্তি ছিল।

কত পুরুষের ? চার হাজার। সাধারণ পুরুষের না বাহাদুর পুরুষের ? বাহাদুর পুরুষের। এবার বলুন, একটা সাধারণ পুরুষ যদি চার বিবি রাখার অধিকার পায়, তা হলে চার হাজার পুরুষ কত বিবি রাখার অধিকার পায়? ষোল হাজার বিবি রাখার অধিকার পায়। শারীরিক সামর্থ্য অনুপাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কমছে কম ষোল হাজার বিবি রাখার অধিকারী ছিলেন।

এজন্য রাসূলের বিবিগণের সংখ্যা 'চার' এ সীমাবদ্ধ রাখা হয় নি। যে সমস্ত কারণে আল্লাহর রাসূল এত বিবি রেখেছিলেন, এটা একটিমাত্র কারণ। যাই হোক, 'চার' এর বেশী বিবি রাখা রাসূলের জন্য অনুমোদিত ছিল। উম্মত ইচ্ছা করলে 'চার' এর বেশী বিবি রাখতে পারে কিন্তু সেটা অনুমোদিত হবে না।

তাই নয়জন বিবি রাখার ক্ষেত্রেও রাসূলের অনুকরণ করা গেল না। কোলের শিশু থাকাকালে রাসূলের উলঙ্গ না হওয়ার ব্যাপারেও অনুকরণ করা গেল না। এভাবে রাসূলের জন্ম হওয়ার ব্যাপারে অনুকরণ করা গেল না। দুধমায়ের এক স্তনের দুধ পান করে অন্য স্তনের দুধ অপর দুধ ভায়ের জন্য রেখে দেওয়ার ব্যাপারেও অনুকরণ করা গেল না।

রাসূলের জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে, যেগুলো অনুকরণীয় নয়, অনুসরণীয় নয়, তাহলে কোন কারণে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন আলল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য আদর্শ রয়েছে বললেন ? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী প্রাপ্তির পরবর্তী ২৩ বছরের জিন্দিগীতে। জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর চলে গেল ওহী প্রাপ্তির আগে।

৪০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর তিনি ওহী প্রাপ্ত হলেন। এই ওহী পাওয়ার দিনের ব্যাপারেও সহীহ মুসলিম শরীফে একটা হাদীসে আছে; স্মরণ রাখা

দরকার, সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি সপ্তাহের সোমবারে নফল রোযা রাখতেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি প্রতি সপ্তাহের সোমবারে নফল রোযা রাখেন কেন?

জবাবে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিন কারণে আমি প্রতি সপ্তাহের সোমবারে নফল রোযা রাখি। প্রথম কারণ হল আমার কাছে সর্বপ্রথম যে দিন ওহি নাজিল হয়েছিল সে দিনটা ছিল সোমবার। এ কারণে আমি প্রতি সপ্তাহের সোমবারে নফল রোযা রাখার মাধ্যমে আমার জন্মের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকি। আল্লাহ আমাকে মা-বাবার ঘরে যে জন্ম দিয়ে পাঠালেন আমি তার শুকরিয়া আদায় করে থাকি। কিসের মাধ্যমে? রোযার মাধ্যমে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম উপলক্ষে কেউ যদি ছাওয়াবের কাজ করতে চায়, আল্লাহর রাসূল শিক্ষা দিয়ে গেছেন প্রতি সোমবারে নফল রোযা রাখতে পারে। নবীর জন্ম উপলক্ষে ছোয়াবের কাজ কি? রোযা রোযা। নবীর জন্ম উপলক্ষে নবী ঈদ পালন করেন নি। নবীর জন্ম উপলক্ষে রোযা রেখেছেন। উম্মতের জন্য নফল করে দিয়েছেন।

এটা এমন কাজ নয় যা উম্মত পারবে না। এমন কাজ নয়, উম্মতের জন্য যার অনুমতি নেই। নবীর জন্ম উপলক্ষে প্রতি সপ্তাহের সোমবারে নফল রোযা রাখা এমন কাজ, যা উম্মত করতে পারবে। উম্মতের জন্য শুধু অনুমতি নয়, উৎসাহও আছে। এই ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আমাদের আদর্শ বলেছেন। কোন ব্যাপারে ?

নবীর জীবনের যে কাজ অন্য লোকের করার সাধ্য নেই– সেই কাজের ব্যাপারে নয়; নবীর জীবনের যে কাজ অন্য লোক করতে পারে কিন্তু অনুমতি নেই, সেই কাজের ব্যাপারে নয়; নবীর জীবনের যে কাজ উম্মতের করার ক্ষমতা আছে এবং উম্মতের জন্য করার প্রেরণা আছে, উৎসাহ আছে, উদ্দীপনা আছে– ঐ সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলকে আমাদের জন্য আদর্শ বলেছেন।

বুঝে থাকলে বলুনতো! ৯ বিবি রাখার ব্যাপারে নবীর আমল আমাদের অনুকরণীয়? না। রাসূলের অনুকরণে কোলের শিশু অবস্থায় উলঙ্গ না হওয়া

আমাদের জন্য আদর্শ ? না। কেন? অনুকরণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে ও ইসলামে অনুমতি থাকতে হবে। এ দুটি যেখানে পাওয়া যাবে সেই সমস্ত কার্যাবলীর বেলায় আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে, রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ।

পরিষ্কার হল কি না? দেখুনতো! কোন কাজের বেলায় রাসূল আমাদের আদর্শ যে কাজে আমাদের সাধ্য নেই ? সাধ্য আছে।

কোন কাজের বেলায় রাসূল আমাদের আদর্শ– যে কাজের বেলায় পারমিশন নেই? পারমিশন আছে, সাধ্যও আছে– রাসূলের জীবনের যে কাজ উম্মতের অনুকরণ করার সাধ্য আছে এবং ইসলামী শরীয়তে অনুমতি আছে, সেই সমস্ত কাজের বেলায় আল্লাহ বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

গেল আয়াতের প্রথম অংশের মর্ম। দ্বিতীয় অংশে বলেন,

لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে কাদের لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিসর্জন দিয়ে কোনো মানুষের সন্তুষ্টি চায়, কোন মাখলুকের সন্তুষ্টি চায়, জীবনের কোন স্বার্থ চায়– তাদের জন্য রাসূলের মাঝে আদর্শ ছিল কিন্তু গ্রহণ করতে পার নি।

সুতরাং রাসূলের জীবন দর্শন সব লোক গ্রহণ করতে পারবে না । যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তারা গ্রহণ করতে পারবে।

لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ

যারা পরকালীন জীবনের সাফল্য চায় শুধু দুনিয়ার সাফল্য নয়, যারা পকালীন সাফল্য চায় তারা রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا যারা 'লোক দেখানো' যিকির করে না, যারা সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই আল্লাহর যিকির করে– তারাই শুধু রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করতে পারবে। মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন এই তিনটা

কথার মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য। পরকালীন সাফল্য চাওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহকে যথাসাধ্য বেশীবেশী যিকির করা স্মরণ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

তিন বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাসূলের মাঝে যে আদর্শ রয়েছে, তা গ্রহণ করতে পারবে কারা (?) যারা মুমিন মুসলমান।

যারা মুমিন মুসালমান আন্তরিকভাবে কেবল নামে মুসলমান নয় যারা আন্তরিকভাবে রাসূলের তরীকায় বিশ্বাসী নয়, মিছামিছি সমাজকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য–ধোঁকা দেওয়ার জন্য নিজেকে নিজে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়, এদেরকে কুরআনের ভাষায় মুমিন বলে না, বলে মুনাফিক।

কুরআনের বিধানে বিশ্বাসী নয় নবীর তরীকায়– বিশ্বাসী নয়; অথচ নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনের অন্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন– যারা কুরআনের বিধানে বিশ্বাসী নয়, যারা নবীর তরিকায় বিশ্বাসী নয়, এরা নিজেদেরকে মিছামিছি– মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয় কেন? মুসলমানের সমাজকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আসলে তারা আল্লাহর সাথে ধোঁকা দেওয়ার জন্য করে, আর বাহ্যিক অর্থে এরা মুমিনদের সাথে ধোঁকাবাজী করে, প্রতারণা করে।

আল্লাহর বিধানে বিশ্বাসী না হয়েও নবীর তরীকায় বিশ্বাসী না হয়েও যারা মুসমান সমাজে নিজেদেরকে মুসলমান বলে, وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ এরা মুমিন নয়, তারা মুনাফিক।

আমাদের বর্তমান সমাজে ঈমান ইসলাম সংক্রান্ত কথা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কথা বার্তা সঠিকভাবে বুঝার জন্য সঠিকভাবে কাফির চেনার জন্য, মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য জানার জন্য বলা দরকার।

আল্লাহর বিধানে এবং রাসূলের তরিকায় যারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী তাদের মুমিন বলে। যারা বিশ্বাসী না হয়েও মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়? কুরআনের ভাষায় তাদের নাম মুনাফিক।

মুফাসসিরীনে কেরাম তাফসীরের কিতাবে লিখেছেন– আল্লাহ যে বলেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

এখানে كان একটা শব্দ আছে আরবী ভাষার। এটা আরবী গ্রামার মতে কোনো সময় অব্যয় পদও হতে পারে আবার কোন সময় ক্রিয়াপদও হতে পারে। আরবী গ্রামারের পরিভাষায় كان ناقصه ও كان تامه বলা হয়। এটা মাদরাসার ছাত্ররা বুঝে। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এখানে এ দুটিরই সম্ভাবনা আছে। অব্যয় পদ গণ্য করলেও অর্থ সঠিক হবে, ক্রিয়াপদ গণ্য করলেও অর্থ সঠিক হবে। কিভাবে? আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ

আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ গ্রহণ করতে পারবে কারা? মুমিন মুসলমানরা। তখন অর্থ হবে 'আছে'। গ্রহণ করার সুযোগ আছে, তাই বলে 'আদর্শ আছে'। আর كان শব্দের আরেক অর্থ হয় 'ছিল'।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে আদর্শ ছিল। কাদের জন্য? মুমিন মুসলমান নয় যারা, মুনাফিক যারা, তাদের জন্য। গ্রহণ করার সুযোগ নেই কিন্তু 'আদর্শ' ছিল। এদের জন্য গ্রহণ করার সুযোগ নেই। সুতরাং 'আদর্শ ছিল' অর্থ হবে মুনাফিকের বেলায় আর 'আদর্শ আছে' অর্থ হবে মুমিনের বেলায়।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাঝে উত্তম আদর্শ আছে কি নেই? আছে। কাদের জন্য?

মুমিনের জন্য। উত্তম আদর্শ ছিল কি না? ছিল। কাদের জন্য? মুনাফিকদের জন্য। মুমিনের জন্য 'আছে' কেন?

এখনও গ্রহণ করতে পারবে। মুনাফিকদের জন্য 'ছিল' কেন? তখনও গ্রহণ করে নি, এখনও গ্রহণ করবে না। এই জন্য মুমিনের বেলায় বলেছেন, 'আছে' আর মুনাফিকের বেলায় আল্লাহ বলেছেন? ছিল। আছে এবং ছিল– এই হল ব্যবধান।

বর্তমান সমাজে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ যারা অনুসরণ করে চলেন, যারা অনুকরণ করে চলেন– এদেরকে একদল নামধারী মুসলমানেরা বলে মৌলবাদী, ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ যারা সঠিকভাবে যথাযথভাবে পালন করেন এদেরকে সমাজ, সমাজের বেশীরভাগ অংশ শ্রদ্ধার সাথে দেখে, না ঘৃণার সাথে দেখে? ঘৃণার সাথে। 'সম্মানিত উলামায়ে কিরাম' বলে না 'মৌলবাদী-ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট' বলে? মৌলবাদী।

এই ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট এর ইতিহাস বর্তমান দুনিয়ার দেড়শ কোটি মুসলমানের সুস্পষ্টভাবে জেনে রাখা দরকার। আলেমদেরকে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শে আদর্শবান লোকদেরকে যারা মৌলবাদী বা ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট বলে–যে সমস্ত মুসলমান পরিচিতরা মুসলমান হিসেবে পরিচিতরা আলেমদেরকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শে আদর্শবানকে মৌলবাদী বলে যারা ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট বলে–

এটা এদের নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত কথা নয়, এটা খ্রিস্টানদের শিক্ষা দেওয়া একটা 'বুলি' মাত্র। খ্রিস্টানদের শিখানো বুলি।

কিভাবে মুসলমান সমাজে খ্রিস্টানদের শিখানো বুলিটা আমদানী হল, এটা বুঝার জন্য ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট শব্দের ইতিহাস জানা থাকতে হবে। আমাদের বর্তমান সমাজের সাধারণ মুসলমানেরা এই শব্দের ইতিহাস জানে না। এই না জানার সুযোগে সাধারণ সমাজে আলেমদেরকে ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট বলে প্রচারণা চালানোর অপূর্ব সুযোগ পেয়েছে তারা। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বপ্রথম প্রসার লাভ করেছিল ইউরোপের খ্রিস্টানদের মাঝে।

এর পূর্ব থেকেই ইউরোপের খ্রিস্টানেরা ধর্মের নামে কতগুলো অন্ধ বিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিল। যেমন আল্লাহ হলেন স্বামী, মরিয়ম হলেন স্ত্রী– এই স্বামী-স্ত্রীর মিলনে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করল। সেই সন্তানের নাম হল হযরত ঈসা আ.। আপনারা কি মনে করেন– এটা বাস্তবিকই ধর্মের কথা, না ধর্মের নামে কল্প-কাহিনী? ধর্মের নামে কল্প-কাহিনী।

আরও কতগুলো কল্প-কাহিনী বিদ্যমান ছিল ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাস। কাদের মাঝে? খ্রিস্টানদের। ধর্মের নামে কতিপয় জঘন্যতম অন্ধবিশ্বাস খ্রিস্টানদের সমাজে প্রচলিত ছিল, চালু ছিল। এর মাঝে আরেকটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল ধর্মের নামে, মানুষ জন্মগত পাপীষ্ঠ। মানুষের বংশে জন্মগ্রহণ করা মানেই জন্মগতভাবেই সে পাপীষ্ঠ হয়ে জন্মগ্রহণ করল।

সুতরাং মানুষের বংশে আল্লাহ যত নবী পাঠিয়েছেন, সমস্ত নবী নিজেরাই জন্মগত পাপীষ্ঠ। এক পাপীষ্ঠ আরেক পাপীষ্ঠকে পাপ থেকে ফিরাতে পারে না– তার কল্পনাও করা যায় না। মানুষের বংশে সর্বপ্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম আ.। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম পাপীষ্ঠ। তিনি কাদের পিতা?

এখানে আমাদের আরও একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে? নবীগণকে গুনাহগার বিশ্বাস করা মুসলমানী আকীদা নয়, খ্রিস্টানী আকীদা। নবীগণকে পাপীষ্ঠ বিশ্বাস করা মুসলমানী আকিদা না খ্রিস্টানী আকীদা? খ্রিস্টানী আকীদা। সুতরাং কেউ যদি নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে নবীগণকে গুনাহগার বলতে চায়– বুঝবেন তার মস্তিস্ক খ্রিস্টানেরা ধোলাই করে দিয়েছে।

আপনাদের আকীদা কি আমার জানা নেই। আপনারাও যদি বলেন নবীগণ পাপীষ্ঠ তাহলে আমাকে এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হবে। আর যদি বলেন, আপনাদের মস্তক খ্রিস্টানেরা ধোলাই করে নি, আপনারা নবীগণকে পাপীষ্ঠ বিশ্বাস করেন না, তাহলে এই আলোচনা আরও চলতে পারে। নবীগণকে পাপীষ্ঠ বিশ্বাস করা মুসলমানী আকিদা, না খ্রিস্টানী আকীদা? খ্রিস্টানী আকিদা।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন যখন দেখলেন এক পাপীষ্ঠ নবী হয়ে আরেক পাপীষ্ঠকে পাপ থেকে ফিরাতে পারে না, তখন নিষ্পাপ জন্ম দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করলেন। মানুষ তো জন্মগতই পাপীষ্ঠ। মানুষের সন্তান হলেই তো পাপীষ্ঠ হবে। এ জন্যে আল্লাহ নিজে মরিয়মের গর্ভে যিশুকে মানুষের সন্তান হিসেবে নয়; আল্লাহর সন্তান হিসেবে জন্ম দিলেন। নাউযুবিল্লাহ।

এগুলো কার আকীদা? খ্রিস্টানদের আকীদা। যিশু খ্রিস্ট বা হযরত ঈসা আ. আল্লাহর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে নিজে তো নিষ্পাপ হলেন কিন্তু পৃথিবীতে আসার পর তার কাছে প্রতীয়মান হল– মানুষ জন্মগতভাবে পাপীষ্ঠ, এদেরকে পাপ থেকে ফিরানোর কোন পথ নেই। অথচ আল্লাহ আমাকে নিজের সন্তান হিসেবে জন্ম দিয়েছেন মানুষকে রক্ষা করার জন্য। শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য। আমার পাপীষ্ঠ উম্মতকে পাপ থেকে শাস্তি থেকে রক্ষা করব কিভাবে?

পিতার কাছে দরখাস্ত করলেন। তাদের আকীদা মত পিতা কে? আল্লাহ। তিনি পিতার কাছে আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করলেন মানুষকে পাপ থেকে ফিরানো সম্ভব নয়। তাই আমাকে যেহেতু পাঠিয়েছেন মানুষের মুক্তির জন্য, মানুষ পাপীষ্ঠ হয়েও কিভাবে মুক্তি পেতে পারে– সেই ব্যাপারে আমি একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছি।

আপনার কাছে দরখাস্ত হল, অনুরোধ হল, আমাকে যারা আপনার পুত্র বিশ্বাস করবে, এদের জীবনে যত পাপ করবে, সকল পাপের কাফফারা দেওয়ার জন্য সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেওয়ার জন্য আমি জন্ত্রণাদায়ক শূলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করব।

শূলিতে চড়ে আমি কষ্টের মরণ বরণ করে নেব। আমি পবিত্র আত্মা আল্লাহর পুত্র হয়ে শূলিতে চড়ে মরণের যে কষ্ট সহ্য করব– সেটা হবে আমাকে যারা আপনার পুত্র বিশ্বাস করবে তাদের পাপের কাফফারা। (নাউযুবিল্লাহ)

ভগবান পিতা পুত্র যীশুর দরখাস্ত মনজুর করলেন এবং তাকে শূলিবিদ্ধ হয়ে মরণের ব্যবস্থা করে দিলেন। এর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত যারা যীশুকে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করবে, এরা যত অপরাধ করবে সবগুলোর অগ্রিম কাফফারা শূলিবিদ্ধতার মাধ্যমে আদায় হয়ে গেছে। (নাউযুবিল্লাহ)

এই সমস্ত অলীক বিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিল খ্রিস্টান জগত আধুনিকতা তাদের সমাজে প্রসারিত হওয়ার আগে। অথচ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন–

وَمَاقَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

যীশু কে? হযরত ঈসা আ.-কে হিব্রু ভাষায় 'যিশু' বলা হয়। আরবী ভাষায় 'ঈসা' বলা হয়। এই জন্য খ্রিস্টানেরা বলে যীশু আর মুসলমানেরা বলে 'ঈসা'। হযরত ঈসা আ.-কে তারা হত্যাও করতে পারে নি, তারা শূলিতেও চড়াতে পারে নি; বরং তাদেরকে ধাঁধাঁয় ফেলা হয়েছে।

ধাঁধাঁ ঘটনা আরও চমৎকার। ঈসা আ.-কে জারজ সন্তান আখ্যায়িত করেছে সমস্ত ইয়াহুদী সর্দারেরা। ঈসা আ.-এর ঘরে ঢুকেছিল তাকে হত্যা করার জন্য। এখানেও একটা মজার কথা আছে– সব মুসলমানের জানা থাকা দরকার, স্মরণ রাখা দরকার।

হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে তিন দল মানুষ ছিল। একদল বলত, আল্লাহর সন্তান। এরা ছিল খ্রিস্টান। আরো একদল বলত, জারজ সন্তান। এরা ছিল ইয়াহুদী। আরেক দল বলত, মানুষের সন্তান। আল্লাহ নিজের কুদরতে বিনা পিতায় জন্ম দিয়েছেন। এরা ছিল হযরত ঈসা আ.-এর সত্যিকারের উম্মত। কয় দল হল? তিন দল।

যারা বলত খোদার সন্তান তারা অতিভক্ত। যারা বলত জারজ সন্তান তারা বেআদব। আর যারা বলত মানুষের সন্তান কিন্তু আল্লাহর কুদরতে। বিশেষ কুদরতে সৃষ্ট। তারা ছিল মধ্যপন্থী।

সর্বযুগেই নবীদের ব্যাপারে তিন দল মানুষ পাওয়া যায়। একদল অতিভক্ত, একদল বেআদব আর একদল মধ্যপন্থী। আমাদের নবীর বেলায়ও এই তিনশ্রেণীর মানুষ পাওয়া যায়। একদল বলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ মানুষ নন, এরা অতিভক্ত।

একদল বলে আমাদের মতোই দোষেগুণে মানুষ, এরা বেআদব। আরেক দল বলে মানুষ কিন্তু আমাদের মতো দোষেগুণে নয়; সর্বগুণে গুণান্বিত। আমাদের নবীর বেলায় কত দল? তিন দল। যারা বলে, মানুষ না এরা অতিভক্ত। যারা বলে আমাদের মতো দোষেগুণে মানুষ, এরা বেআদব। যারা বলে মানুষ কিন্তু দোষী মানুষ নন, সর্বগুণে গুণী– তারা সঠিক। এটা স্মরণ রাখতে হবে।

যে সমস্ত ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা আ.-কে বেআদবী করে জারজ সন্তান বলল, এরা তাঁকে হত্যা করার জন্য তার ঘরে প্রবেশ করেছিল। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন ঈসা আ.-কে কুদরাতীভাবে স্বশরীরে জিন্দা অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন–

يَا عِيْسٰى اِنِّى مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ

ওহে ঈসা! আপনার মরণ আমি ভবিষ্যতের জন্য বাকী রাখলাম। বর্তমানে স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে এই ঘাতকদের হামলা থেকে নিরাপদ করে দিলাম। তারপর ইয়াহুদীদের যে সর্দার সর্বপ্রথম তার ঘরে প্রবেশ করেছিল, সেই সর্দারের চেহারাকে আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে হযরত ঈসা আ.-এর চেহারার মত করে দিলেন। পেছনে যারা ঢুকল, প্রথম সর্দারের মুখে চাইল, সর্দাররূপে চিনল না ঈসারূপে চিনল? ঈসারূপে। 'ইচ্ছেমত' পিটাল। হত্যা করে ফেলল। তারপর অনুসন্ধান করল, আমাদের সর্দার গেল কোথায়? একদল বলতে লাগল সর্দার হত্যা করে ফেলেছ। আরেক দল বলতে লাগল ঈসা হত্যা করেছি।

যারা বলে ঈসা আ.-কে হত্যা করেছি, তাদেরকে দ্বিতীয় দল প্রশ্ন করে তাহলে সর্দার গেল কোথায়? যারা বলে সর্দার হত্যা করেছি, তাদেরকে অপর দল বলে ঈসা গেল কোথায়?

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন, এদেরকে আমি ধাঁধাঁয় ফেলেছি।

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

ঈসা আ.-কে তারা হত্যাও করতে পারে নি, ঈসা আ.-কে তারা শূলিতেও চড়াতে পারে নি; বরং এদেরকে ধাঁধাঁয় ফেলা হয়েছে।

কুরআনের কথা বুঝে থাকলে এবার বলুন, হযরত ঈসা আ. শূলিবিদ্ধ হয়ে মরণ বরণ করেছেন, না মরণ বাকী রয়েছে? মরণ বাকী রয়েছে। এই জন্য কিয়ামতের আগে তিনি দুনিয়াতে আসবেন। দুনিয়াতে তার একটা কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। কোনটা? মৃত্যুবরণ। যেহেতু আল্লাহ পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

সমস্ত প্রাণী-ই মরণশীল।

সমস্ত প্রাণী? মরণশীল। এজন্য হযরত ঈসা আ. কিয়ামতের আগে দুনিয়াতে আসবেন– এই কাজটা সমাধা করার জন্য। কুরআনের কথা বুঝে থাকলে বলুন! হযরত ঈসা আ.-এর মৃত্যু হয়ে গেছে? না। শূলিবিদ্ধ

হয়েছিলেন? না। তবে খ্রিস্টানেরা যে বিশ্বাস করে, খোদাপুত্র শূলিবিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করেছেন–

তাকে যারা খোদার পুত্র বিশ্বাস করবে তাদের সকল পাপের অগ্রিম কাফফারা দেওয়ার জন্য, সকল কাজের প্রায়শ্চিত্ত দেওয়ার জন্য, এটা কি বাস্তবিকই কোন ধর্মীয় বিশ্বাস, না ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাস? ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাস।

এভাবে ইউরোপের খ্রিস্টানদের মাঝে ধর্মের নামে অজস্র অন্ধ বিশ্বাস চালু ছিল। ধর্মের নামে এ সমস্ত অন্ধ বিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিল। সেই খ্রিস্টানদের ইউরোপে যখন সর্বপ্রথম আধুনিক বিজ্ঞান প্রসারিত হল, যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে সামনে কিছু কথা উঠছে, এজন্য আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

আমাদের বর্তমান সময়ের স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে বিজ্ঞানের যে সমস্ত বই-পুস্তক পড়া হয়, পড়ানো হয়, সেই বইগুলোতে বিজ্ঞানের কমপ্লিট ডেফিনেশন আছে কি না আমার জানা নেই। আমি এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের কিছু বই থেকে যা পেয়েছি, সেখানে বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ সংজ্ঞা পাই নি। এখানে শুধু বলা হয়, বিশেষ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। কিন্তু মাদরাসাতে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে কিতাবটা পড়া হয় এই কিতাবটার নাম আল-মাইবুজী।

আল-মাইবুজীতে বিজ্ঞানের কমপ্লিট ডেফিনেশন দেওয়া আছে। পরিপূর্ণ সংজ্ঞা লেখা আছে বিজ্ঞান কাকে বলে? এর ভূমিকাতেই লেখা আছে গোটা সৃষ্ট জগতে যা কিছু আছে এগুলোর বাস্তব অবস্থা কি এবং গুণাগুণ কি, তা জানার নাম বিজ্ঞান।

পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল কি? সৃষ্ট জগতে যা কিছু আছে এগুলোর বাস্তব অবস্থা এবং গুণাবলী জানার নাম বিজ্ঞান। যদি ইহজগতের ব্যাপারে হয় তার নাম আধুনিক বিজ্ঞান, যদি পরকালের ব্যাপারে হয় তার নাম ইসলামী বিজ্ঞান।

এখান থেকে বিজ্ঞান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একটা আধুনিক বিজ্ঞান একটা ইসলামী বিজ্ঞান। ইসলামী বিজ্ঞানের জন্য ইসলামী বিজ্ঞান শিখার জন্য বৈজ্ঞানিক যথেষ্ট নয়। ইসলামী বিজ্ঞান শিখা একমাত্র ইলমে ওহীর উপর নির্ভরশীল।

ইলমে ওহী ছাড়া ইসলামী বিজ্ঞান শিখার কোন পথ নেই, কোন ব্যবস্থা নেই, কোন বিকল্প নেই। সুতরাং যারা ইসলামী বিজ্ঞান শিখতে চায়,

তাদের জন্য ইলমে ওহী শিখতে হবে। আর ইলমে ওহীকে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন দু'ভাবে বিভক্ত করে দিয়েছেন। এক ভাগের নাম কুরআন, এক ভাগের নাম হাদীস।

মাদরাসার ছাত্ররা জানে কুরআনকে وَحي مَتْلُو বলা হয়। আর হাদীসকে وَحي غَير مَتْلُو বলা হয়। আপনাদের সাথে এগুলোর বিশ্লেষণ করার দরকারও নেই আর বিশ্লেষণ করার মত সময়ও আমার হাতে নেই। আপনাদের শুধু এতটুকু স্মরণ রাখা দরকার যে, পরকালীন বিজ্ঞান ইসলামী বিজ্ঞান ইলমে ওহীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর ইলমে ওহী দু'ভাগে বিভক্ত। এক অংশের নাম কুরআন আর এক অংশের নাম হাদীস। এই হল কুরআন-হাদীসের বিজ্ঞান। যদি চান ইহজগতে যত জিনিস আছে, ইহজগতে মানুষের উপকারের জন্য, মানুষকে সেবা করার জন্য আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন– এগুলোর বাস্তব অবস্থা এবং গুণাবলী যে জ্ঞানের দ্বারা জানা যায়, সেই জ্ঞানকে বলে আধুনিক বিজ্ঞান।

এই আধুনিক বিজ্ঞান যখন প্রথম ইউরোপে খ্রিস্টানদের মাঝে প্রসারিত হল, বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ধরা পড়ল, তোমরা ধর্মের নামে যা বিশ্বাস করেছ, এগুলো ধর্ম নয়, এগুলো অন্ধবিশ্বাস। যখন এই ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাসের সাথে ইউরোপের খ্রিস্টানদের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বন্ধ হয়ে গেল, তখন একদল খ্রিস্টান বিজ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ধর্মের নামে অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত রইল।

আরেক দল খ্রিস্টান ধর্মকে পরিহার করে ছন্দে-বর্ণে ধর্মকে অস্বীকার করে নাস্তিক্যবাদে চলে গেল। যে সমস্ত খ্রিস্টানেরা নাস্তিক্যবাদে চলে গিয়েছিল, এই সমস্ত খ্রিস্টানেরা– যে সমস্ত খ্রিস্টানেরা ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাসে নিমজ্জিত রইল, বিজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করল না, এদেরকে উপাধী দিল ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট।

বুঝে থাকলে বলুনতো! ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট শব্দের উৎপত্তি কোথায়? ইউরোপে। কোন সমাজে? খ্রিস্টান সমাজে। মুসলমানদের সমাজে এই শব্দের উৎপত্তি নয়। মুসলমান এই শব্দের উৎপত্তিস্থলও নয়। এই হল ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট শব্দের ইতিহাস। কেন উৎপাদন হল? কিভাবে উৎপাদন হল? কার দ্বারা উৎপাদন হল? কাদের বিরুদ্ধে উৎপাদন হল?

তারপর আস্তে আস্তে যখন আধুনিক বিজ্ঞান গোটা পৃথিবীতে প্রসারিত হতে লাগল তখন মুসলিম দেশগুলোতেও আধুনিক বিজ্ঞান প্রবেশ করল। আবারো বলছি– বিজ্ঞানের ডেফিনেশনে আমরা কি পেয়ে ছিলাম? আল্লাহর সৃষ্ট জগতের কোন কিছুর অবাস্তব অবস্থা (?) না বাস্তব অবস্থা? বাস্তব অবস্থা। ভুল গুণাবলী না সঠিক গুণাবলী জানার নাম বিজ্ঞান? এর সাথে সত্য ধর্মের কোন দ্বন্ধ হতে পারে? না।

ইসলাম ধর্ম সত্য আর বিজ্ঞান বাস্তব। সুতরাং বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের কোন দ্বন্ধ নেই। ব্যবধান শুধু আধুনিক বিজ্ঞান একমাত্র ইহজগত নিয়ে চিন্তা করে আর ইসলাম পরজগত নিয়ে চিন্তা করে– এটার ব্যবধান এতটুকুই। একটার সাথে আরেকটার কোনও (?) দ্বন্ধ নেই, একটার সাথে আরেকটার কোন কম্পিউশন নেই; একটার সাথে আরেকটার কোন মোকাবেলা নেই।

একটার সাথে আরেকটার কোন লড়াই নেই; বরং আপনি বিজ্ঞান চর্চা যতই বেশী বেশী করবেন, ততই দেখতে পাবেন– বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যতই বাড়ছে, ততই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা ইসলামের সত্যতাই শুধু প্রমাণিত হচ্ছে।

এই বিষয়টা স্ববিস্তারে বলার সময় আমার হাতে নেই। শুধু একটা উদাহরণ দিব। ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– (নবীর জীবনের একটা সামান্যতম অংশ)

তোমরা যখন কোন পাত্র থেকে পানীয় পান করবে, এক নিঃশ্বাসে পান করবে না। কমছে কম তিন নিঃশ্বাসে পান করবে। আর পানীয় পদার্থের পাত্রে নাকের নিঃশ্বাস ফেলবে না।

তাই দেখুন, কথার কথা কাপ দিয়ে যখন চা খাবেন, এক নিঃশ্বাসে চা খাবেন না, কমছে কম তিন নিঃশ্বাসে চা খাবেন; বরং গরম চা এক নিঃশ্বাসে পান করলে অবস্থা কি দাঁড়াবে তা আপনাদেরকে বুঝাবার দরকার নেই। আর ঠাণ্ডা পানিও এক নিঃশ্বাসে পান করলে একসিডেন্ট হতে (?) পারে।

সুতরাং আল্লাহর রাসূল বলেছেন, এক নিঃশ্বাসে পান করবে না, অন্তত তিন নিঃশ্বাসে পান করবে। আর নাকের নিঃশ্বাস চা পানের সময় কাপের ভেতরে ফেলবে না।

এভাবে পানি পান করার সময় নাকের নিঃশ্বাস গ্লাসের ভেতরে ফেলবে না। বাইরে ফেলবে। দুধপান করার সময়, শরবত পান করার সময়, যে কোন পানীয় পান করার সময় পানীয় পদার্থের পাত্রের ভিতরে নাকের নিঃশ্বাস না ফেলে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, ইসলামের নবী বলেছেন, পাত্রের বাইরে ফেলবে। এটা হল ইসলামের নির্দেশ, ইসলামের বিধান।

এবার আমরা একটু আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করি, দেখি ইসলামের সাথে আধুনিক বিজ্ঞান কতটুকু সাংঘর্ষিক। আধুনিক বিজ্ঞান বলে– মানুষের শরীরের রক্ত ব্যবহৃত হতে হতে এক সময় রক্তটা শোধন করতে হয়। শোধন না করে যদি দূষিত রক্ত আবারো ব্যবহৃত হয়, তাহলে সেই শরীর রোগাক্রান্ত হতে বাধ্য। এই রক্তের মাঝে আধুনিক বিজ্ঞান বলে প্রধান তিনটা উপাদান আছে। একটা তরল পদার্থ। একটা শ্বেতকণা। একটা রাঙ্গা কণা। তরল পদার্থের দ্বারা তরল পদার্থের সাহায্যে রক্ত সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়। রাঙ্গা কণার দ্বারা শরীর পুষ্ট হয়। শ্বেতকণার কারণে শরীরে রোগজীবাণু প্রবেশ করলে সহজে রোগে আক্রান্ত হয় না বরং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলে।

কোন রোগজীবাণু মানব দেহে প্রবেশের সাথে সাথে ঐ শ্বেত কণার প্রতিটি অংশ ঐ রোগজীবাণুর সাথে লড়াই করতে থাকে। লড়াই করতে করতে এক পর্যায়ে রোগজীবাণু মরে যায়। যে কারণে রোগজীবাণু প্রবেশ করা সত্ত্বেও রোগে আক্রান্ত হয় না।

কিন্তু তার শরীরের রক্তের শ্বেত কণা যদি এত দুর্বল হয় যে লড়াই করে শরীরের রোগজীবাণুকে হত্যা করতে পারে না, রোগজীবাণু বিজয়ী হয়ে যায়, তখন ঐ লোকটা রোগে আক্রান্ত হয়। আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান আরও বলে এইডস মূলত কোন রোগের নাম নয়। সর্বরোগের মায়ের নাম। এইডস কোন সুনির্দিষ্ট রোগের নাম নয়; বরং সর্বরোগের মা। সর্বরোগের মা মানে? ঐ যে রক্তের শ্বেতকণা– এক প্রকারের ভাইরাস মানব দেহে প্রবেশ করার পর রক্তের সমস্ত শ্বেতকণাকে খেয়ে ফেলে। তার পরে তার শরীরের সমস্ত রক্তের মাঝে কোন শ্বেতকণা থাকে না। যে কোন রোগজীবাণু প্রবেশ করার সাথে সাথে সে রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়।

এই অবস্থাটার নামই এইডস।

এই অবস্থাটার নাম (?) এইডস।

যেই ভাইরাস মানব দেহের রক্তের শ্বেতকণাগুলো খেয়ে ফেলার কারণে মানুষ এইডসে আক্রান্ত সেই ভাইরাস বর্তমান বিশ্বে মানব দেহে প্রবেশ করল কেন?

আগের জামানার মানুষের দেহে প্রবেশ করল না কেন– এই প্রশ্নের জবাব কোন আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে নেই, কোন স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের কাছে নেই, কোন পণ্ডিতের কাছে নেই, কোন দার্শনিকের কাছে নেই– ইসলামের কাছে আছে। ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ থেকে দেড় হাজার বৎসর আগে বলে দিয়েছেন–

যে সমাজের মানুষের মাঝে উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা, নগ্নতা, অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচার প্রসারিত হবে, সেই সমাজে এমন নতুন রোগের আবির্ভাব হবে, যেই রোগগুলো তাদের বাপ-দাদার আমলে দুনিয়াতে ছিল না।

আজ থেকে হাজার বছর আগে পৃথিবীর মানুষ এইডসে আক্রান্ত হল না। আজ আক্রান্ত হল কেন? এই প্রশ্নের জবাব কোন আধুনিক বিজ্ঞানে আছে, না একমাত্র ইসলামের কাছে আছে? ইসলামের কাছে। এই প্রশ্নের জবাব কোন স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীর কাছে নেই, এই প্রশ্নের জবাব কোন ডাক্তারের কাছে নেই, এই প্রশ্নের জবাব কোন দার্শনিকের কাছে নেই– এই প্রশ্নের জবাব আছে ইসলামের মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে।

সেই রক্ত ব্যবহারে যখন অনুপযুক্ত হয়ে যায়, তখন তাকে ধোলাই করার প্রয়োজন। শোধন করার প্রয়োজন হয়। তখন তাকে আবার নতুন করে ব্যবহার করার যোগ্য বানানোর প্রয়োজন হয়। দূষিত রক্তকে ধোলাই করার জন্য আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বাতাসের মাঝে একটা সাবান সৃষ্টি করে রেখেছেন। বিজ্ঞানের পরিভাষায় ঐ সাবানটার নাম অক্সিজেন। বিজ্ঞানের ভাষায় সাবানটার নাম (?) অক্সিজেন। অক্সিজেন থাকে মানুষের শরীরের বাইরে বাতাসে মিশ্রিত, আর দূষিত রক্ত থাকে মানব দেহের ভেতরে।

সাবান শরীরের বাইরে আর দূষিত রক্তের ময়লা থাকে শরীরের ভেতরে। বলুন তো সাবান শরীরের বাইরে থাকলেই শরীরের ভেতরের রক্ত ধোলাই করা যাবে? না বাইরের সাবান ভেতরের রক্ত পর্যন্ত পৌঁছতে

হবে? পৌছতে হবে। এই পৌছার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে কুদরতী ব্যবস্থা দিয়েছেন, সেই ব্যবস্থা হল মানুষের শরীরে অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে একটা অঙ্গ আছে যেটাকে ইংরেজীতে বলে, 'লাংস' বাংলায় বলে, 'ফুসফুস'।

এই ফুসফুস সব সময় বাতাস টানছে আর ছাড়ছে। টানছে আর ছাড়ছে। এই ফুসফুস শরীরের বাইরের বাতাস যে রাস্তা দিয়ে টানে সেই রাস্তাটা হল নাকের ছিদ্র। নাকের ছিদ্র দিয়ে বাইরের বাতাস ফুসফুসের ভিতরে ঢুকে আবার নাকের ছিদ্র দিয়ে ফুসফুসের বাতাস বাইরে চলে যায়। এই ফুসফুসের ভেতরে যে বাতাস ঢুকে সেই বাতাসের অক্সিজেন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। দূষিত রক্ত তো ফুসফুসে নয়, দূষিত রক্ত তো শরীরে প্রবাহিত। এই রক্তকে ধোলাই করার জন্য অক্সিজেন নামক সাবান ফুসফুসের ভেতরে ঢুকল। এখন অক্সিজেন রক্তের নাগাল পাবে কিভাবে? নাগাল পাওয়ার জন্য আল্লাহ আরেকটা আভ্যন্তরীণ অঙ্গ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এটাকে ইংরেজী বলে হার্ড, বাংলায় বলে হৃদপিণ্ড।

এটা ঘষিয়ে অক্সিজেনের ছোঁয়া পেল কি না? ঐ হৃদপিণ্ডের তাপে দূষিত রক্ত ফুসফুসের ভেতরে যায় আর ফুসফুসের ক্রিয়ায় বাইরের বাতাস ফুসফুসের ভেতর অক্সিজেন নিয়ে ঢুকে। ঢোকার পর ঐ অক্সিজেনের পরশে দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ হয়ে যায়। যেমনভাবে ময়লা কাপড় সাবানের পানির দ্বারা ধোলাই করলে কাপড় পরিষ্কার হয়।

কিন্তু সাবানের পানি ময়লাযুক্ত হয়ে যায়, তেমনিভাবে অক্সিজেন দ্বারা শরীরের দূষিত রক্ত ধোলাই করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয়ে যায় ঠিক, কিন্তু অক্সিজেন আর অক্সিজেন থাকে না, সেটা কার্বনডাই ওয়াকসাইড নামক দূষিত পদার্থ হয়ে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। নাকের নিঃশ্বাসের সাথে সেই কার্বনসাই ওয়াক সাইড বের হয়ে যায়।

আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা বলে, নাকের নিঃশ্বাস যদি গ্লাসের ভেতর ফেলা হয়, তাহলে ঐ কার্বনডাই ওয়াকসাইড নামক দূষিত পদার্থ গ্লাসের পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে দেহে প্রবেশ করে যায়, তাহলে মারাত্মকভাবে রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা আছে। সুতরাং ইসলাম যেমন বলেছিল,

নাকের নিঃশ্বাস পানীয় পদার্থের পাত্রের বাইরে ফেলতে হবে, আধুনিক বিজ্ঞানও বলে নাকের নিঃশ্বাস পানীয় পদার্থের পাত্রের বাইরে ফেলতে হবে।

বুঝে থাকলে এবার বলুন, আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের দ্বন্ধ আছে? কুরআনের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বন্ধ আছে? না আধুনিক বিজ্ঞান ঐ ইসলামেরই সত্যতা প্রকাশ করছে? ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করছে। সুতরাং যে আধুনিক বিজ্ঞান খ্রিস্টানদের ধর্মের নামে অন্ধবিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল, সেই আধুনিক বিজ্ঞান সত্য ধর্ম ইসলামের শুধু অনুকূল নয়, সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। ইসলাম যে কথা দেড় হাজার বছর আগে বলে দিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান দেড় হাজার বছর পর সেই কথার বাস্তব যুক্তি পেশ করতে লাগল।

এবার বুঝে থাকলে বলুন, আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব ইসলাম ধর্মের সাথে, না খ্রিষ্টধর্মের সাথে? খ্রিষ্টধর্মের সাথে। সুতরাং আধুকিন বিজ্ঞান যখন ইসলামী জগতে প্রবেশ করতে লাগল তখন ঐ খ্রিস্টানদের মাঝে যারা নাস্তিক্যবাদী ছিল তারা চেচামেচি শুরু করে দিল যে, খ্রিস্টানদের মাঝে যেমন ধর্মীয় গোঁড়াপন্থী, যারা বিজ্ঞানকে পরিহার করেছে,

তেমনি মুসলমানদের মাঝে ধর্মীয় গোঁড়াপন্থী আছে– যারা আলেম, যারা কুরআন হাদীসের চর্চা করে এরাও বিজ্ঞানের বিরোধী হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের মাঝে যেমন একদল ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট তৈরী হয়েছে, মুসলমানদের মাঝেও এই বিজ্ঞানের সাথে দ্বন্দ্ব হয়ে সেই ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট তৈরী হবে।

এবার বুঝে থাকলে বলুন, তাদের এই থিওরীটা তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিটা বিশুদ্ধ না গলদ? গলদ। এই গলদ দৃষ্টিভঙ্গি যখন মুসলমানদের কাছে প্রচারিত হল, তখন ইসলাম ধর্মকে যারা সঠিকভাবে পালন করে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যারা যথাযথভাবে পালন করে, এদেরকেও তারা ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট নামে প্রচার করতে লাগল। এই ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট শব্দটাকে বাংলা ভাষায় তরজমা করা হল মৌলবাদী।

মুহাতারাম হাজিরীন! আমার ভাই-বন্ধুগণ! আমার কথা বুঝে থাকলে বলুন, এই ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট বা মৌলবাদী কথাগুলো মুসলমানের সমাজে

আলেমদের বিরুদ্ধে, নবীর আদর্শে আদর্শবানদেরকে যারা এই কথাগুলো বলে– এবার বলুন, এদের এই কথাগুলো নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত, না সেই খ্রিস্টানদের শিখানো বুলি? খ্রিস্টানদের শিখানো বুলি।

সুতরাং যারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শে আদর্শবানদেরকে ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট বলে, যারা মৌলবাদী বলে– এদের ব্যাপারে কুরআনের এই আয়াতটা আবার নতুনভাবে আলোচনা করা দরকার। আবার সেই আয়াতের মর্ম যথার্থভাবে চর্চা করা দরকার, যেই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

অবশ্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাঝে আদর্শ (?) আছে (?) ছিল। 'আছে' কাদের জন্য? মুমিনদের জন্য গ্রহণ করতে হবে। 'ছিল' কাদের জন্য? মুনাফিকদের জন্য। গ্রহণ করতে পারবে (?) না। সুতরাং যারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ গ্রহণ করতে পারে না।

তারাই যারা গ্রহণ করতে পারে তাদেরকে বলে মৌলবাদী, যারা গ্রহণ করতে পারে, তাদেরকে বলে ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট। এর মাধ্যমে এরা কি চায়? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শে আদর্শবানদেরকে খ্রিস্টানী ভ্রান্ত মতবাদের অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে যারা মৌলবাদী আর ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট বলে, এরা আসলে কি চায়? তাও আল্লাহ আমাদেরকে দেড় হাজার বছর আগে কুরআনে বলে দিয়েছেন।

এরা কি চায়? আলেমদেরকে যারা মৌলবাদী বলে, আলেমদেরকে যারা ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট বলে, নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত না খ্রিস্টানদের শিখানো বুলি? খ্রিস্টানদের শিখানো বুলি। তাহলে এই খ্রিস্টানদের শিখানো বুলি জপ্ করার মাধ্যমে এরা কি চায়? আল্লাহ কুরআনে বলে দিয়েছেন দেড় হাজার বছর আগে। কি বলেছেন? শুনুন আল্লাহ বলেন–

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَائَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَائَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (البقرة/ ١٢٠)

আল্লাহ বলেন, ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার বন্ধু হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে তার মতবাদে দীক্ষা দিতে পারবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! সাবধান! ইয়াহুদী-খ্রিস্টানকে বন্ধু বানিও না।

ইয়াহুদী-খ্রিস্টান তোমাদের বন্ধু নয়। এরা তোমাদের চির শত্রু। সুতরাং যে মুসলমান ইয়াহুদীকে বন্ধু বানাবে আমি আল্লাহ সেই মুসলমানকে ইয়াহুদী গণ্য করব। যে মুসলমান খ্রিস্টানকে বন্ধু বানাবে আমি আল্লাহ সেই মুসলমানকে খ্রিস্টান গণ্য করব।

আগেই বলেছি, খ্রিষ্টানী আকীদা। খ্রিস্টানদের আকীদা বলে নি? হ্যা। এর মাঝে একটি কথা বলা হয়েছে, যীশু খ্রিস্ট স্বেচ্ছায় শূলিবিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণাদায়ক মরণবরণ করেছেন, তাকে যারা আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করবে তাদের সারা জীবনের সমস্ত পাপের আগাম কাফফারা অগ্রিম কাফফারা দেওয়ার জন্য। এই খ্রিস্টবাদে বিশ্বাসী আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট বুশও। এই খ্রিস্টবাদে বিশ্বাসী জার্মান প্রফেসর হেন্সও।

এই তো গত অক্টোবর মাসের এগার তারিখ বাংলাদেশের একটা সংস্থার মাধ্যমে জার্মান এবং ফ্রান্সের সহযোগিতায় একটা সেমিনার হয়েছিল ঢাকায়। সেই সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে জার্মান থেকে খ্রিষ্টধর্মের নামে এক অন্ধবিশ্বাসী প্রফেসর হেন্সকে আনা হয়েছিল।

এখানে দাঁড়িয়ে সে বলে গেছে, "ইসলাম সূচনাকাল থেকেই সন্ত্রাসকে লালন করে এসেছে। আর ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিল যুদ্ধবাজ।"

ইসলাম সূচনাকাল থেকেই সন্ত্রাসকে লালন করে এসেছে– আমি বলতে চাই, খ্রিস্টানদের শিক্ষা দেওয়া বুলি জপো, আর আলেমদেরকে

সন্ত্রাসী! সন্ত্রাসী!! সন্ত্রাসী!!! বলো, এবারতো তোমাদের মুনিবেরা শুধু মোল্লাদেরকে নয়, ইসলামকে সন্ত্রাসী বলে ফেলেছে– এবার তোমরা কোথায় যাবে?

এতো দিন তোমরা মোল্লাদেরকে শুধু সন্ত্রাসী! সন্ত্রাসী!! বলে নিজেরা অমোল্লা হয়ে রয়েছ। এখন তো গোটা ইসলামকে তোমাদের মুনিবেরা সন্ত্রাসী বলে ফেলেছে, এবার তোমাদের পরিচয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। এবার হয়ত তোমরাও সন্ত্রাসী– যদি মুসলমান থাক। আর না হয় তোমরা মুসলমান নও! এটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

আজ আমার হাতে এই পরিমাণ সময় নেই– ইসলাম সূচনাকাল থেকে কতটুকু সন্ত্রাস লালন করেছিল, তার দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে পেশ করার।

শুধু সংক্ষেপে বলতে চাই– চল্লিশ বছর বয়সে সর্বপ্রথম যখন ওহী নাযিল হয়, এরপর থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ তেরটি বৎসর মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। হামলাকারী অবস্থায় না নির্যাতিত অবস্থায়? নির্যাতিত অবস্থায়।

এই সমস্ত অন্ধ বিশ্বাসীরা আর এই অন্ধ বিশ্বাসীদের বুলি উচ্চারণকারীরা একটু চোখ খোলে মহানবীর জীবনেতিহাস সীরাত আলোচনা করে দেখুক, ওহী পাওয়ার পর থেকে দীর্ঘ তেরটি বৎসর পর্যন্ত ইসলামের নবীকে এবং ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদেরকে অমানবিক এবং অমানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে।

সুতরাং ইসলাম সূচনাকাল থেকে সন্ত্রাস লালন করেছে, না সূচনাকাল থেকেই সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডের নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা জুলুম নির্যাতন করে ইসলামের নবী এবং তাঁর অনুসারীদেরকে পবিত্র মক্কা নগরী থেকে দেশান্তর করে দিল। হিজরত করে তারা চলে গেলেন মদীনায়। বলুন সন্ত্রাস করার জন্য মদীনায় চলে গিয়েছিলেন, না সন্ত্রাসীদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মদীনায় গিয়েছিলেন? অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে।

তাহলে আসল ঘটনা কি আর এ সমস্ত ধর্মের নামে অন্ধবিশ্বাসীরা বলে কি? যারা মুসলমান নামের পরিচয় দিয়ে ওদের বুলির সাথে নিজেদের বুলি

উচ্চারণ করে –এখনও সময় আছে তাদের সতর্ক হওয়ার। এখনও সময় আছে তাদের হুঁশিয়ার হওয়ার।

মদীনায় গিয়েও রেহাই নেই। দেশান্তর হয়ে মদীনায় যাওয়ার পরও সমস্ত জাতি সম্মিলিতভাবে মদীনা ঘেরাও করল ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য। মুসলমানদেরকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য, মুসলমানদের নবীকে হত্যা করার জন্য মদীনা ঘেরাও করল।

সেই ঘেরাও কর্মসূচির মোকাবেলা করার জন্য পরিখা খনন করেছিলেন। যা ইসলামের ইতিহাসে পরিখা যুদ্ধ নামে/খন্দক যুদ্ধ নামে পরিচিত। ইসলামের ইতিহাস পড়ে দেখুন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ খন্দক খনন করেছিলেন সন্ত্রাস চালানোর জন্য না সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য? সন্ত্রাস থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য।

সুতরাং যারা ইসলামকে সন্ত্রাস বলে, ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যারা যুদ্ধবাজ বলে– এগুলোর সাথে বাস্তব ইতিহাসের সামান্যতমও কোন সম্পর্ক আছে, না শুধু চাপাবাজি? শুধু চাপাবাজি। ইংরেজরা, খ্রিস্টানরা এই সমস্ত ব্যাপারে এক নম্বরের চাপাবাজ। আরেক দল নামধারী মুসলমান যারা ওদের চাপায় তাল মিলিয়ে চাপাবাজি করে তারা দুই নম্বর চাপাবাজ।

বড় মজার, বড় রহস্যের কথা আছে। সেই কথা হল, বুশ যে অভিযোগের ভিত্তিতে ইরাক হামলা করেছিল– সেই অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে, না সেই অভিযোগ একশভাগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে? মিথ্যা। তাহলে ইরাকে বুশের হামলা করা কি সম্পূর্ণ অপরাধ নয়? অপরাধ। এই অপরাধী কি বুঝে না? অবশ্যই বুঝে।

জেনে শুনে এত বড় অপরাধ বুশ এবং তার বাহিনী কেন করে? কারণ, তাদের ধর্মবিশ্বাস যত অপরাধ করি না কেন, যীশুখ্রিস্ট শূলিবিদ্ধ হয়ে তার সমস্ত কাফফারা অগ্রিম আদায় করে গেছেন। শুধু এ পর্যন্তই নয়।

আরও মজার কথা হল, যাদের ধর্মবিশ্বাস আমি যত অপরাধ করি সকল অপরাধের কাফফারা আমার জন্মের আগে হয়ে গেছে। এদের দ্বারা দুনিয়াতে মানবতাবাদী আর শান্তি প্রতিষ্ঠার কোন কাজ হবে, না শুধু সন্ত্রাস

আর সন্ত্রাস হবে? সন্ত্রাস হবে। সুতরাং খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাসের ফাউণ্ডেশন সন্ত্রাস। খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাসের ফাউণ্ডেশন সন্ত্রাস। সন্ত্রাস বন্ধ করলে খ্রিস্টানদের ধর্মের নামে অন্ধবিশ্বাসের অস্তিত্ব থাকবে না।

ইসলাম ধর্মের সাথে সন্ত্রাসের সামান্যতম সম্পর্কও নেই। সন্ত্রাসের ষোলআনা সম্পর্ক ঐ ধর্মের সাথে যে ধর্ম তাদেরকে শিক্ষা দেয় যত অপরাধ কর– সবগুলোর অগ্রিম কাফফারা হয়ে গেছে। এটা আপনাদের জানা থাকা দরকার। এত জঘন্যতম অপরাধ কেন করে যাচ্ছে খ্রিস্টান জগৎ এদের ধর্মবিশ্বাস এদেরকে এটা করায়। ধর্মবিশ্বাস অপরাধ যা পারে কর, অগ্রিম কাফফারা হয়ে গেছে, পরকালে কোন ভয় নেই।

পক্ষান্তরে ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে এমন ফেসেলিটি দিবেন তো দূরের কথা নিজের ঔরষজাত সন্তান ফাতেমাকে বলেন, ওহে ফাতেমা! পরকালে যদি আল্লাহর কাছে নাজাত পেতে চাও, দুনিয়াতে তোমাকে ভাল কাজ করতে হবে।

যে ধর্মের নবী কলিজার টুকরা নিজের সন্তানকে বলেন, আমার ঔরষে তোমার জন্মগ্রহণ করা নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে না, আল্লাহর কাছে পরকালের বিচারে নাজাত পেতে হলে দুনিয়ার জীবনে তোমাকে সৎকর্ম করতে হবে। বলুন, সেই ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের সামান্যতমও সম্পর্ক কি হতে পারে? না। সুতরাং ইসলাম ধর্মের সাথে সন্ত্রাসের সামান্যতম সম্পর্কও নেই, সন্ত্রাসের ষোলআনা সম্পর্ক খ্রিস্টানদের সাথে।

আজকের দৈনিক ইনকিলাবে দেখে থাকবেন, এক নাদান লিখেছে, ধর্ম শিক্ষার প্রসার মানে জাতিকে অন্ধকারে নিয়ে যাওয়া। জানি না এরা ধর্ম বলতে কি বুঝে, আর জাতি বলতে কি বুঝে? অন্ধকার বলতে কি বুঝে, আর আলো বলতে কি বুঝে? এরা এই সমস্ত কথা বলে নিজেদের মস্তিস্ক থেকে, না তাদের মুখে খ্রিস্টানদের শিখিয়ে দেওয়া বুলি? খ্রিস্টানদের শিখিয়ে দেওয়া বুলি।

এদের মুখে খ্রিস্টানদের শিখিয়ে দেওয়া বুলি বলে এদের নিজেদের মস্তিষ্ক থেকে বলে না। এদের মুনিব হল খ্রিস্টান। এই খ্রিস্টান মুনিব প্রফেসর হেন্স এই বাংলার জমি ঢাকার মাটিতে দাঁড়িয়ে বলে গেছে ইসলাম

সূচনাকাল থেকে সন্ত্রাসকে লালন করে এসেছে। ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিল যুদ্ধবাজ। নাউযুবিল্লাহ।

সুতরাং সন্ত্রাসের সাথে, জঙ্গিবাদের সাথে, মৌলবাদের সাথে ফাণ্ডামেন্টালিজমের সাথে আর এই জাতীয় যত শব্দ বর্তমান সময়ে মহানবীর মহান আদর্শে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়– এই শব্দগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক আছে, না যারা বলে তাদের সাথে সম্পর্ক আছে? যারা বলে তাদের সাথে সম্পর্ক আছে।

যারা বলে তাদের সাথে সম্পর্ক আছে আর যারা তাদের শিক্ষা দেওয়া তাদের সাথে সম্পর্ক আছে– এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। মুসলমানের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এজন্য আল্লাহ كَانَ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللّٰهَ

অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে আদর্শ আছে, আদর্শ ছিল।

'আছে' কাদের জন্য? মুমিনের জন্য। 'ছিল' কাদের জন্য? মুনাফিকদের জন্য। মুনাফিক কারে কয়? যে বলে আমরা মুসলমান না (!), না ইসলামী আদর্শের সাথে যার ঘৃণা? ইসলামী আদর্শের সাথে ঘৃণা।

মুসলমান পরিচয় দিয়ে যারা ইসলামের বিধানকে ঘৃণা করে, মুসলমান পরিচয় দিয়ে যারা মহানবীর আদর্শকে ঘৃণা করে, মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়ে যারা ধর্মকে অন্ধত্ব মনে করে! ধর্মকে কি মনে করে? অন্ধত্ব মনে করে– এদেরকে কুরআন বলে খাঁটি মুমিন? খাঁটি মুনাফিক। জানি না কিভাবে বললে আপনারা বুঝবেন। এর চেয়ে সহজ ভাষা আমার জানা নেই।

মহানবীর আদর্শ গ্রহণ করা আর গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে পার্থক্য করার জন্য আল্লাহ كَان শব্দ ব্যবহার করেছেন। মুমিন আর মুনাফিক। মহানবীর আদর্শে আদর্শবান হতে পারবে মুমিনগণ, মহানবীর আদর্শে আদর্শবান হতে পারবে না মুনাফিকরা। মহানবীর আদর্শে আদর্শবান হতে পারবে না কারা? মুনাফিক যারা। গ্রহণ করতে পারবে কারা? মুমিন যারা।

আল্লাহ পাকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস শরীফে বলেন–

كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبٰى قِيْلَ مَنْ أَبٰى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبٰى أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

আমার সমস্ত উম্মত বেহেশতে যাবে। কে বলেছেন? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু যারা আমাকে মানবে না, এরা জান্নাতে যাবে না। আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে যাবে কিন্তু যারা আমাকে মানে না তারা জান্নাতে যাবে না। বলুন তো "আমার সমস্ত উম্মত বেহেশতে যাবে," বলেই কথা শেষ? না, না, কিন্তু আছে? 'কিন্তু' কি?

'কিন্তু' হল যারা আমাকে মানবে না, তারা জান্নাতে যাবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন–

كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبٰى

আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে যাবে কিন্তু যারা আমাকে মানবে না, তারা জান্নাতে যাবে না। যে আমার আদর্শে আদর্শবান হয় না, সে আমাকে মানে না।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে সত্য ধর্ম কে জারি করেছেন? আল্লাহ জারি করেছেন। এটা সম্প্রসারিত হলে যদি জাতিকে অন্ধকারে নিয়ে যাওয়া হয়।

তা হলে এরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শকে মানে, না ঘৃণা করে? ঘৃণা করে। যদি বলে আমরাও মুসলমান? আল্লাহ পরিষ্কার করে দিয়েছেন– দুনিয়ার কে মুমিন আর কে মুনাফিক তা আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন কে রাসূলের আদর্শ মানে আর কে রাসূলের আদর্শ মানে না। সুতরাং আমি আর আমার দল নবীর পাগল আর বাকী সব দল নবীর দুশমন– এই রকম সস্তা বক্তৃতা দিয়ে এই রকম সস্তা বুলি দিয়ে কে নবী মানে আর কে নবী মানে না– তা প্রমাণ করতে হবে না।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাক জবান মুবারকের দ্বারা পরিষ্কার করে দিয়েছেন, যে আমার অনুকরণ করে সে

আমাকে মানে, আমার সাথে জান্নাতে যাবে। আমার উম্মত হয়ে আমার অনুকরণ করা ভাল পায় না, আমার আদর্শকে ঘৃণা করে জাহান্নাম ছাড়া কিছু পাবে না।

সুতরাং কিয়ামতের দিন নবীর উম্মতের কাতারে স্থান পেতে হলে, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে, কিয়ামতের দিন জান্নাতে যেতে হলে নবীর আদর্শে আদর্শবান হওয়া দরকার কি না? দরকার।

সেই কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর আদালতে চাপাবাজি চলবে না, খ্রিস্টানের দালালী চলবে না, বোমাবাজী চলবে না, সন্ত্রাস চলবে না, সন্ত্রাস দমনের নামে সন্ত্রাস চালিয়ে বাটপারী চলবে না।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তুমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর আদর্শে বিশ্বাসী ছিলে, না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শে অনাস্থা গ্রহণকারী ছিলে?

যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শে বিশ্বাসী, সে মহানবীর আদর্শ গ্রহণ করতে পারবে, সে নবীর সাথে জান্নাতে যাবে। যে নবীর আদর্শে বিশ্বাসী নয়, সে হাজারবার প্রতারণা করে নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিক না, কেন– নবীর আদর্শ গ্রহণ করতে পারবে না, ঘৃণাই করবে।

হাশরের মাঠে নবীর উম্মতের কাতারে ঠাঁই হবে না। নবী বলেছেন জাহান্নামে যাবে। জাহান্নাম থেকে নাজাত পাইতে হলে চাপাবাজি নয়, নবীর আদর্শে আদর্শবান হতে হবে। তাতে যদি খ্রিস্টানেরা মৌলবাদী বলে? বলুক। তাতে যদি খ্রিস্টানের দালালেরা ফাণ্ডামেন্টালিষ্ট বলে? বলুক।

তাতে যদি মুনাফিকেরা জঙ্গি বলে? বলুক। তাতে যদি আপনাদের খ্রিস্টানেরা বোমাবাজ বলে? বলুক। বোমাবাজি করে তারা আর যারা করে না তাদেরকে বলে বোমাবাজ।

বলুনতো! বুশের বাহিনী আফগানিস্তানে আক্রমণ করে কিসের মাধ্যমে? বোমাবাজির মাধ্যমে। বুশের বাহিনী ইরাকে প্রথম কিভাবে প্রবেশ করেছিল? বোমাবাজির মাধ্যমে। কোন মুসলমান বোমাবাজ, না বুশের বাহিনী বোমাবাজ। বুশের বাহিনী। বোমাবাজ বিশ্ব সন্ত্রাসীদের বেলায় মুসলমান হুঁশিয়ার! নবীর আদর্শে আদর্শবান হতে হবে– দুনিয়ার বোমাবাজি থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে, সন্ত্রাস থেকে বাঁচতে হলে পরকালে জান্নাতে যেতে হলে, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে– আল্লাহ তাই আপনাকে আমাকে মহানবীর আদর্শে আদর্শবান হয়ে দুনিয়া এবং আখেরাতে শান্তি এবং মুক্তি পাওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ

وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ